সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৬শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা : পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ৩৲, ৪৲

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ.
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ৫৲, ৬॥০

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥০, ৮॥০

চণ্ডীদাস-পদাবলী ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২॥০, ৩

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ.
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩॥০, ৪॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩া০, ৪॥০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩॥০
৩য় খণ্ড— ২॥০, ৩া০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২॥০

দেশীয় সাময়িক-পত্রের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাসের
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ॥৵০

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ১৲, ১া০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১॥০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১॥০

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১া০

জ্যোতিষদর্পণ
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১া০

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad—
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩ খণ্ড)
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ৫৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু ১॥০, ২া০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত ॥০, ৸০

কুরল
শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত ১৸০, ২॥০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬া০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১॥০, ২৲

বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া (যন্ত্রস্থ)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত ২৲

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ষট্‌চত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

কলিকাতা, ২৪৩৷১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৪৬

বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের প্রারম্ভ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম-এ, ডি-লিট

জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচীন নাম যে নির্গ্রন্থ, এ সম্বন্ধে প্রায় সকলেই একমত। নির্গ্রন্থ শব্দ পালিভাষায় 'নিগন্থ,' 'নিগণ্ঠ' ইত্যাদিরূপে উল্লিখিত হয়েছে, সেই কারণে প্রাচীন পালি সাহিত্যে জৈনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীরের আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'নিগন্থনাথপুত্ত' বা 'নিগণ্ঠনাটপুত্ত'। 'নাথ' শব্দ সংস্কৃত 'জ্ঞাত্রিক' শব্দ হতে উদ্ভূত। মহাবীর যে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মেছিলেন, তার নাম ছিল জ্ঞাত্রিক। মহাবীরের নিগন্থনাথপুত্ত বা নির্গ্রন্থজ্ঞাত্রিকপুত্র আখ্যা দেবার কারণ যে, তিনি ছিলেন জ্ঞাত্রিককুলোদ্ভূত এবং নির্গ্রন্থসম্প্রদায়ভুক্ত। নির্গ্রন্থসম্প্রদায় মহাবীরের পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অশোকের শিলালিপিতে নির্গ্রন্থসম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে—"নিগংথেসু পি মে কটে ইমে (ধংমমহামাতা) বিয়াপটা হোহংতি।" অশোকের ধর্ম্মমহামাত্রেরা নির্গ্রন্থসম্প্রদায়ের সুখসুবিধার উপরও লক্ষ্য রাখতেন। উড়িষ্যাপ্রদেশে উদয়গিরি অঞ্চলে কলিঙ্গরাজ খারবেলের যে শিলালেখ পাওয়া যায়, সে লেখ অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের। এই লিপির প্রারম্ভে অর্হৎ ও সিদ্ধদের নমস্কার করা হয়েছে। এই মঙ্গলাচরণ হ'তে অনুমান করা হয় যে, খারবেল ছিলেন জৈন বা নির্গ্রন্থ। লিপির মধ্যভাগে ত্রিরত্ন, অগ্রজিন প্রভৃতি কথার উল্লেখ রয়েছে ব'লে সে কথা আরও নিঃসন্দেহে বলা চলে। এ ছাড়া খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক হ'তে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক পর্য্যন্ত মথুরা অঞ্চলে জৈনসম্প্রদায়ের বহু শিলালিপি পাওয়া যায়, এই লেখমালায় জৈনসম্প্রদায়ের তৎকালীন বহু শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সে উল্লেখ হ'তে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জৈনসম্প্রদায় বহুদিন হ'তেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসার লাভ করেছিল।

খারবেলের শিলালেখ ব্যতীত প্রাচ্যদেশে জৈনধর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে অন্য কোন প্রাচীন উল্লেখ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। অথচ উড়িষ্যাপ্রদেশে জৈনধর্ম্ম যে বঙ্গদেশ হ'তেই গিয়েছিল, এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। পাহাড়পুরে নূতন আবিষ্কৃত শিলালিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের; এ শিলালিপি হ'তে বোঝা যায় যে, পাহাড়পুরের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল নির্গ্রন্থ-সম্প্রদায়ের। বঙ্গদেশে জৈনদের অন্য কোন প্রাচীন শিলালিপি না পেলেও প্রাচীন জৈন-সাহিত্যে বহু প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, জৈনধর্ম্ম বহু প্রাচীন কালেই সে প্রদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

আচারাঙ্গসূত্র জৈনসাহিত্যের একখানি প্রাচীন ও প্রধান গ্রন্থ। এ গ্রন্থের অনেক অংশ যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের পূর্ব্বে রচিত হয়েছিল, তা অধ্যাপক জেকোবি বেশ স্পষ্ট করেই প্রমাণ করেছেন। এই গ্রন্থ হ'তে আমরা জানতে পারি যে, মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করবার পূর্ব্বে কিছু কাল নানা স্থানে পর্য্যটন করেছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচ্য দেশের সুব্বভূমি, লাঢ় ও বজ্জভূমি প্রভৃতি অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। সে সব প্রদেশের অধিবাসীরা ছিল অত্যন্ত অনুন্নত, তারা মহাবীরের উপর ঢিল ছুঁড়েছিল, কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল এবং নানা ভাবে অত্যাচার করেছিল। লাঢ় যে প্রাচীন রাঢ় প্রদেশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সুব্বভূমি অনেকের মতে সুহ্মপ্রদেশ, বজ্জভূমি কোথায়, তা জানা যায় না। এ হ'তে বোঝা যায় যে, মহাবীরের সময় বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল ছিল অসভ্য, সুতরাং সে প্রদেশে সে সময়ে জৈনধর্ম্ম-প্রসারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বস্তুতঃ জৈনসাহিত্যে যে সমস্ত প্রাচীন গণ, শাখা ও কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার কোনটির সঙ্গেই এ অঞ্চলের কোন স্থানীয় নামের সম্বন্ধ দেখা যায় না।

কল্পসূত্র জৈনসাহিত্যের চতুর্থ ছেদসূত্র 'আচারদশাঙ্গে'র অষ্টম দশাঙ্গ। জৈনদের মতে কল্পসূত্র ভদ্রবাহুর রচিত, ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সমসাময়িক; কারণ, চন্দ্রগুপ্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁকে অনুসরণ ক'রে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে কঠোর তপস্যার দ্বারা দেহত্যাগ করেন। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগ হচ্ছে 'জিন-চরিত্র,' এ অংশকে মহাবীরের সম্পূর্ণ জীবনচরিত বা মহাবীর-চরিত্র বলা চলে। দ্বিতীয়াংশ থেরাবলী, এ অংশে জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচীন স্থবিরদের জীবনী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত নানা গণ ও শাখা উল্লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত গণ, শাখা ও গণধরদের নাম হ'তে বোঝা যায় যে, কল্পসূত্রের এ অংশ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্ব্বে রচিত হ'তে পারে না। কল্পসূত্রের তৃতীয় অংশে 'সামাচারী' বা জৈন ভিক্ষুর আচারের নিয়মাবলী উল্লিখিত হয়েছে।

এই কল্পসূত্রের দ্বিতীয়াংশে উল্লিখিত হয়েছে যে, ভদ্রবাহুর চার জন শিষ্য ছিল, এই চার জন শিষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন গোদাস। গোদাস একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্ত্তন করেন, এই ধারার নাম ছিল 'গোদাসগণ'। গোদাসগণ হ'তে চারটি শাখার উদ্ভব হয়, এ চারটি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া এবং দাসীখর্বটিকা। দাসীখর্বটি কোন স্থানের নাম হ'লেও সে স্থান কোথায় ছিল, তা জানা যায় না। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও কোটিবর্ষ যে উত্তরবঙ্গের হু'টি প্রধান স্থান ছিল, তা প্রাচীন শিলালিপি হ'তেই জানা যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নাম খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক হ'তেই পাওয়া যায়, প্রথমতঃ বৌদ্ধ বিনয়পিটকে এবং দ্বিতীয়তঃ মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত অশোকীয় ব্রাহ্মী লিপির অনুরূপ লিপিতে লিখিত একখানি শিলালেখে। এ লিপি অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের। এ লিপিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধন পুণ্ড্রনগর ব'লে উল্লিখিত হয়েছে। ভরহুত স্তূপের বেষ্টনীর উপর যে সমস্ত ভিক্ষুদের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পুঞবঢনীয় (পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়) ভিক্ষুর নামও পাওয়া যায়। কোটিবর্ষ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালের শিলালিপি ও তাম্রপট্টে উল্লিখিত হয়েছে। বাণপুর

নামক নগর কোটিবর্ষে অবস্থিত ছিল। প্রায় সকলের মতেই বাণপুর দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত বর্তমান বাণগড়। কোটিবর্ষ যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত স্থান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাম্রলিপ্ত সুপরিচিত। সুতরাং কল্পসূত্রের এই থেরাবলী হ'তে বোঝা যায় যে, ভদ্রবাহুর শিষ্যেরা যে চারটি ধারা ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে দুটি ছিল উত্তর-বঙ্গে, অন্যটি ছিল নিম্নবঙ্গে, তাম্রলিপ্তি অঞ্চলে। ভদ্রবাহু খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং বঙ্গদেশের জৈনধর্ম্ম অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

এ অনুমানের পক্ষে আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করা চলে। সে প্রমাণ পাওয়া যায় দিব্যাবদান হ'তে। দিব্যাবদান বৌদ্ধ বিনয়গ্রন্থের অংশবিশেষ। এ গ্রন্থ খ্রীষ্টীয় প্রথম দ্বিতীয় শতকে সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। এ গ্রন্থের একটি অবদানে মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোকের ভ্রাতা বীতশোকের গল্প বর্ণিত হয়েছে। বীতশোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষালাভ করবার পর এক সময়ে প্রত্যন্তজনপদে বসবাস করছিলেন।

> "তস্মিন্ চ সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধননগরে নির্গ্রন্থোপাসকেন বুদ্ধপ্রতিমা নির্গ্রন্থস্য পাদয়োর্নিপতিতা চিত্রার্পিতা। উপাসকেনাশোকস্য রাজ্ঞো নিবেদিতং। শ্রুত্বা চ রাজ্ঞাভিহিতং শীঘ্রমানীয়তাম্ তস্যোর্দ্ধং যোজনং যক্ষাঃ শৃণ্বন্তি অধো যোজনং নাগা যাবৎ তং তৎক্ষণেন যক্ষৈরুপনীতম্। দৃষ্ট্বা চ রাজ্ঞা কুপিতেনাভিহিতম্। পুণ্ড্রবর্দ্ধনে সর্বে আজীবিকাঃ (=নির্গ্রন্থাঃ) প্রঘাতয়িতব্যাঃ যাবদেকদিবসে অষ্টাদশসহস্রাণি আজীবিকানাং (=নির্গ্রন্থানাং) প্রঘাতিতানি ॥"
>
> (শেষের দু'টি বাক্যে যে ভুল ক'রে নির্গ্রন্থ স্থানে আজীবিক বলা হয়েছে, তা গল্পের পৌর্বাপর্য্য হ'তে বোঝা যায়, গল্পটির প্রাচীন চীনা অনুবাদ হতেও তা স্পষ্ট ধরা যায়।)

পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নির্গ্রন্থ-উপাসক এমন একটি পট এঁকেছিল, যাতে দেখান হয়েছিল যে, বুদ্ধ নির্গ্রন্থের পদবন্দনা করছেন। এ সংবাদ অশোককে দেওয়া হ'ল। অশোক অত্যন্ত কুপিত হয়ে নির্গ্রন্থদের হত্যা করবার জন্য যক্ষকে নিয়োজিত করলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের সমস্ত নির্গ্রন্থকে হত্যা করা হ'ল (এবং এই সঙ্গে ভুল ক'রে বীতশোককেও হত্যা করা হ'ল, কারণ, তিনি সেই সময়ে না জেনে নির্গ্রন্থদের বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন)। এ হচ্ছে অশোকের প্রথম জীবনের কথা, তখন তিনি নিষ্ঠুরপ্রকৃতির ছিলেন, সেই কারণে তখন তাঁর নাম ছিল চণ্ডাশোক। যখন তাঁর শিলালেখ প্রচারিত হয়, তখন খুব সম্ভব তিনি ধর্ম্মের জন্য কাউকেই উৎপীড়ন করতেন না, এবং সেই সময়েই লিখেছিলেন—"নিগংথেসু পি মে কটে···"।

এ গল্প হ'তেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অশোকের সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নির্গ্রন্থসম্প্রদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উত্তর-বঙ্গে সে সম্প্রদায়ের প্রভাব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত যে প্রবল ছিল, তার প্রমাণ হিউয়ান্ সাংএর বিবরণী হ'তেই পাওয়া যায়। তাঁর সময়েও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে নির্গ্রন্থদের সংখ্যা ছিল অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের চেয়ে অনেক বেশী।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

২। কৃত্তিকাই পূর্বদিকে উদিত হয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

পশ্চিমদেশের বেদপাঠী পণ্ডিতদিগের পরিশ্রম, অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও ধৈর্যের তুলনা নাই। তাঁহারা অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা বেদের শব্দ নিরূপণ করিতেছেন। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গুণ এই, ইহাতে সূক্ষ্ম কেশ দৃশ্য হয়। দোষ এই, স্থূল রজ্জু দৃশ্য হয় না। আর এক দোষ, এই যন্ত্র সর্বদা প্রয়োগ করিতে থাকিলে চক্ষু নিকটদৃষ্টি হইয়া পড়ে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন, বৈদিক সংস্কৃতি খ্রি-পূ ১৫০০ বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। প্রোফেসর উইন্টারনিৎস কদাচিৎ আরও সহস্র বর্ষ পূর্বে যাইতে পারেন। অতএব বেদগ্রন্থে যে কোন বিষয়েরই উল্লেখ থাকুক, উক্ত পরিধির মধ্যে পড়িতেই হইবে।

কিন্তু তিলক ও প্রোফেসর জাকোবি ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ হইতে এমন কয়েকটা বিষয় দেখাইলেন, যাহার ন্যায়সঙ্গত ও সহজ অর্থ করিতে হইলে উক্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া বহুদূর পশ্চাতে যাইতে হয়। কিন্তু যখন খ্রি-পূ ১৫০০ বৎসরের সীমা নিশ্চিত, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে উক্ত প্রদর্শিত বিষয়ের অর্থ উক্ত সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। অগত্যা কেহ গোলে হরিবোল দিয়া প্রশ্নগুলি এড়াইয়া চলিয়াছেন, কেহ অ-যুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া আত্ম-প্রতারণা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বৈদিক কৃষ্টির প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ দুই একটা প্রমাণ দিতেছি। পাশ্চাত্য বেদপাঠী বিদ্বান্‌গণের ব্যাখ্যার সমালোচনাও করিতেছি।

প্রোফেসর ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ লিখিয়াছেন, বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের স্থিতি-সম্বন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু সূর্যের স্থিতি-সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।[১] কিন্তু তাঁহারা ভাবিলেন না, যদি নক্ষত্রদ্বারা সূর্যের স্থিতি-জ্ঞান না থাকিত, অর্থাৎ কবে কোন্ নক্ষত্রে বা নক্ষত্রের নিকট সূর্য আছে, ইহা জানা না থাকিত, তাহা হইলে ঋষিগণ কি উপায়ে বৎসরের দিনসংখ্যা করিয়াছিলেন, কি উপায়ে ঋতুযাগের ঋতুর আরম্ভ নির্ণয় করিতেন। চন্দ্র দ্বারা হইতে পারে না। সূর্য দ্বারা কিরূপে হইতে পারিত?

ঋগ্‌বেদে আছে (১০।৫।২), "সোমকে নক্ষত্রের ক্রোড়ে রাখা হইয়াছে।" ইহার অর্থ কি, চন্দ্র ও নক্ষত্রের যোগ, না আরও কিছু? বাক্যটি অনুধাবন করিলে বুঝি, চন্দ্র

---

১) *Vedic Index*, Nakshatra. Keith : *Cambridge History of India*, Vol. I, p. 111—112.

এক এক রাত্রিতে এক এক নক্ষত্রে থাকে। যজুর্বেদে নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের বিবাহ কল্পিত হইয়াছে। অতএব চন্দ্র এক এক নক্ষত্র ভোগ করিয়া ২৭।২৮ দিন পরে পুনর্বার প্রথম নক্ষত্রে আসে। এই অর্থ স্পষ্ট অসিতেছে। অর্থাৎ চন্দ্রপথ প্রায় সমান সমান অন্তরে অবস্থিত ২৮ নক্ষত্রে বিভক্ত হইয়াছিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর্য জ্যোতির্বিৎ নক্ষত্রচক্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, কোনও বিদেশীর নিকট হইতে উদ্ধার করেন নাই। নানাবিধ প্রমাণ হইতে পাইয়াছি, খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে নক্ষত্র-চক্র নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পূর্বে কতকগুলি নক্ষত্র জানা ছিল, কিন্তু শ্রেণী জানা ছিল না।

দেখা গেল, ঋগ্‌বেদে নক্ষত্র-চক্রের সূচনা আছে, যজুর্বেদে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বেদবিদ্বানেরা সোমকে নক্ষত্রের ক্রোড়ে দেখিলেন, কিন্তু এই বাক্যের ভাবার্থ করিলেন না। কারণ, ঋগ্‌বেদে স্পষ্টবাক্যে নক্ষত্র-চক্রের উল্লেখ নাই। যাহার উল্লেখ নাই, তাহার অস্তিত্ব-স্বীকার অযৌক্তিক বটে, অস্বীকারও অযৌক্তিক। সকল স্থলে একবিধ অনুমান চলিতে পারে না। অমুক বিষয়ের উল্লেখ নাই, কিন্তু তৎসম্পর্কিত বিষয়ের আছে। এরূপ দেখিলে অনুল্লিখিত বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যেমন, ঋগ্‌বেদে লবণের উল্লেখ নাই, কিন্তু মাংসভোজনের আছে। পঞ্জাব প্রদেশে লবণ দুর্লভও ছিল না। অতএব আর্যেরা লবণগ্রহণ করিতেন, এই অর্থাপত্তি আসিতেছে। ঋগ্‌বেদে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের উল্লেখ আছে। শরৎ এক ঋতু আছে। শরৎ অর্থে বৎসরও আছে। এই কয়েকটির যোগে এই অনুমান হয়, ঋষিগণ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, এই দুয়ের মধ্যবিন্দু জানিতেন, যেখানে সূর্য আসিলে শরৎ ঋতুর আরম্ভ হইত। ঋগ্‌বেদে বসন্তও এক ঋতু। দূরস্থ বৃক্ষদ্বারা হউক, শৈলদ্বারা হউক, ক্ষিতিজে তিনটি চিহ্ন করিয়া রাখিতে বিশেষ বিদ্যার প্রয়োজন হয় না। মধ্যবিন্দুই পূর্ববিন্দু। কেবল বিষুবৎ-দিনে পূর্ববিন্দুতে সূর্যের উদয় হয়। বিষুবৎ-দিন, বিষুব-পাত ইত্যাদি নাম না দেখিয়া পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করিলেন, ঋগ্‌বেদের জ্যোতির্বিদেরা বিষয়টি জানিতেন না!

সূর্যের উদয়ে নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। সূর্য অমুক নক্ষত্রে আছে, ইহা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু নিশ্চিত অনুমান করা যাইতে পারে। একটা সোজা উপায় সকলেই জানেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের সময়ে সূর্য অস্তগত হয়। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য বিপরীত দিকে, ১৮০° অংশ অন্তরে থাকে। যে নক্ষত্রে চন্দ্র দৃষ্ট হয়, তাহার পশ্চিমে চতুর্দশ নক্ষত্রে সূর্য অবশ্য থাকে। যদি দেখি, চন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে আছে, আর যদি নক্ষত্রের পর্যায় জানা থাকে, তাহা হইলে বলিতে পারি, পূর্ণিমার সময় সূর্য কোন্ নক্ষত্রে আছে। নক্ষত্রের পর্যায় পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে এই,—

১। কৃত্তিকা	৪। আর্দ্রা
২। রোহিণী	৫। পুনর্বসু
৩। মৃগশিরা	৬। পুষ্যা

৭। অশ্লেষা	১২। চিত্রা
মঘা	১৩। স্বাতী
৯। পূর্বফল্গুনী	১৪। বিশাখা
উত্তরফল্গুনী	১৫। অনুরাধা
হস্তা	১৬। জ্যেষ্ঠা

ইত্যাদি। রোহিণীর পশ্চিম দিকে চতুর্দশ নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা। অতএব সে সময় সূর্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে ছিল।

এইরূপ, ফল্গুনীনক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে সূর্য নিশ্চয়ই তাহার চতুর্দশ নক্ষত্র পশ্চিমে থাকে। যদি উত্তরায়ণ দিনে ফল্গুনীনক্ষত্রে পূর্ণিমা ঘটে, তাহা হইলে সূর্য ফল্গুনীনক্ষত্রে আসিলে দক্ষিণায়ন হয়। কারণ, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মধ্যে ১৮০° অংশ অন্তর। আশ্চর্যের বিষয়, প্রোফেসর ম্যাকডোনেল ও কীথ সূর্যের নক্ষত্র-নির্ণয়ের এই সামান্য উপায় স্মরণ করেন নাই! ইহার কারণ এই মনে হয় যে, এই সম্বন্ধ স্বীকার করিলে তাহাদের অঙ্গীকৃত খ্রি-পূ ১৫০০ বৎসরের বহু পূর্বে যাইতে হয়। এখন আর্দ্রা নক্ষত্রে সূর্যের দক্ষিণায়ন হইতেছে। তৎকালে ফল্গুনীতে হইত। অয়ন এক এক নক্ষত্র পিছাইতে প্রায় সহস্র বৎসর লাগে। আর্দ্রা হইতে ফল্গুনী ষষ্ঠ নক্ষত্র। অতএব তদবধি ছয় সহস্র বর্ষ গত হইয়াছে। আমরা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে দোলোৎসব করি, সেই প্রাচীন কালের স্মৃতি অনুসারে করি। আমাদের বহু পূজার তিথি এইরূপ প্রাচীন স্মৃতির পালন।

কিন্তু আরও পূর্বকালে চন্দ্রপথ নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিভক্ত হয় নাই। তখন পূর্ণিমার নক্ষত্র দেখিয়া সূর্যের নক্ষত্র অনুমান হইতে পারিত না। তখন অন্য উপায় ছিল। আর, সেই উপায় চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন অন্য অন্য জাতিরাও সেই উপায়ে নক্ষত্রদ্বারা সূর্যের স্থান নির্ণয় করিত। সেই উপায়ের নাম নক্ষত্রের 'উদয়াস্তদর্শন'।

সূর্য আর নক্ষত্র একদা দৃশ্য হইতে পারে না বটে, কিন্তু সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে কোনও নক্ষত্রের উদয় দেখিলে বুঝি, সূর্য সে নক্ষত্রের নিকটে। ইহা যে সে লোক দেখিতে পারে। এক দিন অরুণোদয়ের পূর্বে রোহিণীকে উঠিতে দেখিলাম। দেখিতে না দেখিতে রোহিণী অদৃশ্য হইল। পরে সূর্যোদয় হইল। এই যে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে রোহিণীর উদয়, ইহার পারিভাষিক নাম রোহিণীর 'উদয়'। এইরূপ অন্য নক্ষত্রের উদয় বলিলে বুঝি, সে নক্ষত্র সূর্যের নিকটতম দৃশ্য। সূর্য অস্ত হইল, কিছু পরে সূর্যের নিকটস্থ একটা নক্ষত্রেরও অস্ত হইল। ইহার পারিভাষিক নাম সে নক্ষত্রের 'অস্ত'। সূর্যোদয়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে তাহার পশ্চিমস্থিত নক্ষত্রের 'উদয়' হয়। সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাহার পূর্বস্থিত নক্ষত্রের অস্ত হয়। কিছু দিন উদয়াস্ত দেখিতে দেখিতে চক্ষু এমন শিক্ষিত হয় যে, দুই তিন মিনিটের অন্তর ধরিতে পারা যায়। অদ্য যে সময়ে যে ঘণ্টা মিনিটে রোহিণীর উদয় হইল, কল্য প্রায় চারি মিনিট

পরে হইবে। এইরূপে রোহিণী হইতে সূর্য ৪ মিনিট ৪ মিনিট করিয়া দূরে যাইতে থাকে। প্রথম যে দিন রোহিণীর উদয় হইয়াছিল, সেই দিন হইতে গণিয়া গেলে ৩৬৫ দিন পরে পুনর্বার উদয় দেখা যায়। অবশ্য সে দিন সূর্য রোহিণীতে থাকে না। থাকে, রোহিণীর পূর্বস্থিত মৃগনক্ষত্রে। কিন্তু মৃগনক্ষত্রে, কি অন্য কোন্ নক্ষত্রে সূর্য আছে, তাহা জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। নক্ষত্রের উদয়াস্ত দেখিয়া বৎসরের দিনসংখ্যা ও ঋতুর আরম্ভ নির্ণীত হইত। এই উপায়েই আমি বৈদিক কৃষ্টির বহু প্রাচীন কাল পাইয়াছি।

এই যে ক্রম, ইহা প্রয়োগের নিমিত্ত নক্ষত্র-চক্রের জ্ঞান কিম্বা কোন কিছু জ্যোতিষ-জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। পথের পাশে মাইল-শিলা পোতা আছে। পথিক সে পথে যায়, আর কত মাইল গেল, তাহা অক্লেশে জানিতে পারে। নক্ষত্র-চক্রের নক্ষত্রও সেইরূপ মাইল-শিলা। কিন্তু যদি পথে মাইল-শিলা না থাকে, তাহা হইলে পথিক বলে, অমুক সময়ে অমুক বৃক্ষের বা গ্রামের পাশ দিয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় ক্রমটি এইরূপ।

দেশের অক্ষাংশভেদে তারার উদয়-দিনের ভেদ হয়। বর্তমানে বাঁকুড়ার ২৩° অক্ষাংশে ১৯ জুন সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে রোহিণীর উদয় হয়। কিন্তু দিল্লীতে ২৮° অক্ষাংশে ১৮ জুন হয়। পূর্বকালে অনেক দিন পূর্বে হইত। যখন সূর্য রোহিণীর নিকটস্থ হয়, তখন রোহিণী অবশ্য অদৃশ্য থাকে। বৎসরের প্রায় এক মাস অদৃশ্য থাকে। সাড়ে পাঁচ মাস পূর্বদিকে উঠে, আর সাড়ে পাঁচ মাস পশ্চিমে অস্ত যায়।

ইংরেজী পাঁজির বিশেষ গুণ এই, ইহাতে বিষুবদিন ও অয়নদিন স্থির আছে। প্রতিবৎসর ২১ মার্চ বাসন্ত-বিষুব ও ২২ সেপ্টেম্বর শারদ-বিষুব হয়। বিষুব ও অয়নবিন্দু স্থির ধরিলে নক্ষত্র আগাইয়া চলিয়াছে। খ্রি পূ ৩২০০ অব্দে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন বিন্দু ছিল, এখন প্রায় আড়াই মাস অগ্রগত হইয়াছে। সেকালে ফাল্গুনী বা দোলপূর্ণিমা ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে হইত, এখন মার্চ মাসে হইতেছে।

নক্ষত্রের 'উদয়' দেখিয়া কৃত্যদিননির্ণয়ের বিশদ দৃষ্টান্ত শতপথব্রাহ্মণে আছে।

আর্যেরা বিবাহের পর যজ্ঞশালা নির্মাণ করিতেন। ইহা একটা পশ্চিম-পূর্বে লম্বা দু-চালা ঘর। মাঝের উচ্চ খুঁটির উপরে মুদনী ও উত্তর ও দক্ষিণস্থিত খুঁটির উপরে পাড় দিয়া চালা নির্মিত হইত। মুদনীটি ঠিক পূর্বাভিমুখে রাখা হইত। এই কারণে এই যজ্ঞশালার নাম 'প্রাগ্‌বংশ' হইয়াছিল। প্রাগ্‌বংশের পূর্বদিকে ত্রিপদ দূরে বেদি নির্মিত হইত। যজ্ঞশালা ও অগ্নিকুণ্ড নির্মিত হইল, এখন অগ্নির আধান অর্থাৎ উৎপাদন ও স্থাপন করিতে হইবে। সে কোন্ দিনে? শতপথব্রাহ্মণ (৩২।১।২) বলিতেছেন,২

২) সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত শ্রীযুত বিধুশেখরশাস্ত্রি-কৃত বঙ্গানুবাদ।

তিনি কৃত্তিকায় অগ্নিদ্বয় (আহবনীয় ও গার্হপত্য) আধান করিবেন। কেন না, (১) এই যে কৃত্তিকা, ইহাই অগ্নির নক্ষত্র। (২) অন্য নক্ষত্র একটি, দুইটি, তিনটি বা চারিটি (তারা লইয়া), আর এই যে কৃত্তিকা, ইহা বহুতম (ইহাতে ছয়টি তারা আছে)। অতএব তিনি কৃত্তিকায় আধান করিবেন। (৩) কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না, অপর সকল নক্ষত্র পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয়। ইহাতে তাঁহার অগ্নিদ্বয় পূর্বদিকে আহিত হয়।'

এইরূপ পরে পরে অপর নক্ষত্রের নাম করা হইয়াছে। এখানে সমুদয় বিচারে না গিয়া কোন্ কোন্ নক্ষত্রে আধান বিহিত ছিল, কেবল তাহার উল্লেখ করিতেছি।

"তিনি রোহিণীতে অগ্নিদ্বয় আধান করিবেন। তিনি মৃগশিরায় আধান করিবেন। তিনি পুনর্বসুদ্বয়ে পুনরাধেয় আধান করিবেন। তিনি পূর্বফল্গুনীতে, উত্তরফল্গুনীতে আধান করিবেন। তিনি হস্তায় আধান করিবেন। তিনি চিত্রায় আধান করিবেন।

এইখানেই শেষ।

পুনর্বসুতে দুইটি তারা আছে। এই কারণে 'পুনর্বসুদ্বয়ে'। এই নক্ষত্রে পুনরাধেয় অগ্নির আধানের ব্যবস্থা। ইহার অর্থ এই, অগ্নি আধান করিবার পর যদি এক বৎসরের মধ্যে আধানকারীর অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই দুষ্ট অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া নূতন অগ্নি আধান করিতে হয়। এই আধানের নাম পুনরাধেয়।

আধানের আটটি নক্ষত্র পাইলাম। কিন্তু কোন্ কোন্ দিন? "কৃত্তিকায় আধান করিবেন।" 'কৃত্তিকায়' ইহার অর্থ কি? যে রাত্রে কৃত্তিকায় চন্দ্র দেখা যায়, তার পরদিন? চন্দ্র প্রতিমাসে কৃত্তিকায় আসে, মাসে মাসে এই আট নক্ষত্র ভোগ করে। তবে কি বৎসরে আধানের শুভদিন ৮×১২ = ৯৬টি? পুণ্যদিন এত অধিক হয় না। বিশেষতঃ পুনরাধেয় দিন বৎসরে একটি। ইহাতে অনুমান হয়, বৎসরে আধানের দিন সাতটি। অতএব চন্দ্র ত্যাগ করিতে হইতেছে।

কিন্তু কৃত্তিকা ও সূর্য, রোহিণী ও সূর্য ইত্যাদিও একদা দৃশ্য নয়। অতএব সে অর্থও ত্যাগ করিতে হইতেছে। থাকে কৃত্তিকার উদয়, রোহিণীর উদয় ইত্যাদি। এই উদয় বৎসরে এক দিন, আটটি নক্ষত্রের আট দিন। যে উষার পূর্বে কৃত্তিকার উদয় হইল, সে উষার অন্তে সূর্যোদয়ের পরেই অগ্নির আধান বিহিত ছিল। ঋগ্বেদে উষার বহু স্তুতি আছে। সে সব শুভদিনের উষার। বলা বাহুল্য, নক্ষত্রগুলি দৃশ্য তারা ও তারা-সমষ্টি। নচেৎ কৃত্তিকায় বহুতারা, এ বিশেষণ থাকিত না।

এই ব্যাখ্যার সমর্থক আছে। উক্ত ব্রাহ্মণে (২।১।২।১৮) লিখিত আছে, "সূর্য উদিত হইতে হইতেই নক্ষত্রসমূহের তেজ ও বীর্য গ্রহণ করে।" পুনশ্চ, "সূর্য যখন উদিত হয়, তখন আধান করিবেন। নক্ষত্র দৃশ্যমান থাকিতে আধান করিবেন না।" এখানে প্রকারান্তরে নক্ষত্রের উদয় বলা হইয়াছে। অতএব যে দিন প্রত্যূষে কৃত্তিকার উদয় হইবে, সেই দিন সূর্যোদয়ের পরেই অগ্নির আধান করিবেন। এইরূপ রোহিণীর উদয়দিন, মৃগশিরার উদয়দিন, ইত্যাদি বৎসরের আটটি দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

এই অর্থের আরও সমর্থক বাক্য আছে। কৃষ্ণ ও শুক্লযজুর্বেদে ও তাহাদের ব্রাহ্মণে—তৈত্তিরীয় (১।৫।২) ও শতপথে (২।১।৩)—"বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন ঋতু দেবগণ। শরৎ, হেমন্ত ও শিশির, এই তিন ঋতু পিতৃগণ। যখন সূর্য উত্তর দিকে আবর্তন করে, তখন দেবগণের নিকট অবস্থিত হয়। আর যখন দক্ষিণ দিকে আবর্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয়।" ইহার অর্থ এই, বাসন্তবিষুব হইতে শারদবিষুব পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণ আবর্তন। অর্থাৎ সূর্য যে ছয় মাস বিষুববৃত্তের উত্তরে থাকে, সে ছয় মাস শুভ, এবং যে ছয় মাস দক্ষিণে থাকে, সে ছয় মাস অশুভ।

তৈত্তিরীয় ও শতপথ পুনশ্চ বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণ বসন্তে আধান করিবেন, ক্ষত্রিয় গ্রীষ্মে এবং বৈশ্য বর্ষায়।" অতএব উক্ত আটটি শুভদিন বাসন্তবিষুব (২১ মার্চ) হইতে শারদবিষুব (২২ সেপ্টেম্বর) মধ্যে পড়িত। অতএব চন্দ্র-নক্ষত্র পরিত্যাজ্য। নক্ষত্রের উদয় দেখিয়া অগ্নির আধান করা হইত। এখানে নক্ষত্রের সহিত সূর্যস্থিতির সম্বন্ধ স্পষ্ট।

এই বিধান কোন্ কালের স্মৃতি, তাহা নির্ণয়ের উপায় আছে। শতপথব্রাহ্মণের উক্তি, "কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না, অন্যান্য সব নক্ষত্র পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয়।" মূলে আছে, "এতা হ বৈ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্বাণি হ বা অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে।" ইহার অর্থ বুঝিলে সে উপায়টি পাওয়া যাইবে।

শূন্য আকাশে পূর্বদিক্ চিহ্নিত করা যাইতে পারে না, কোন্ নক্ষত্র সে দিকেই থাকে, কোন্টা তাহার উত্তরে, কোন্টা দক্ষিণে আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ভূমিতে পূর্বপশ্চিম রেখা করিয়া সে রেখার দূরে দূরে দুইটা খুঁটি কিম্বা গোঁজ পুতিলে পূর্বপশ্চিম দিক্ চিহ্নিত হয়। প্রাগ্‌বংশ-নির্মাণের পূর্বে ভূমিতে এই রেখা অঙ্কিত করিতে হইত। সে রেখায় মাঝের দুইটা উচ্চ খুঁটি পোতা হইত। সে রেখা পূর্বদিকে বাড়াইয়া বেদিতে যজ্ঞশালার ত্রিপদক্ষেপ দূরে একটা গোঁজ, ষট্‌ত্রিংশ পদক্ষেপ দূরে আর একটা গোঁজ পোতা হইত। শতপথে (৩।৫।১) এই বিধি বর্ণিত আছে। এখন পশ্চিমের গোঁজের পশ্চাতে বসিয়া পূর্বের গোঁজে দৃষ্টি রাখিলে ক্ষিতিজের ও আকাশের পূর্ববিন্দু পাওয়া যায়। সারারাত্রি দেখিতে থাকিলে কোন্ নক্ষত্র পূর্বদিকে উঠে, কোন্ নক্ষত্র উঠে না, তাহা অক্লেশে বলিতে পারা যায়। শতপথ বলিতেছেন, কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে উঠে, অন্যান্য নক্ষত্রের কোনটা সে দিকের উত্তরে, কোনটা দক্ষিণে উঠে। কি উপায়ে পূর্বপশ্চিম উত্তরদক্ষিণ দিক্ নিরূপিত হইত, তাহা এক্ষণে চিন্তনীয় নয়।

বর্তমানে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুর ২৪° অংশ উত্তরে উঠে। কোন্ কালে পূর্ববিন্দুতে উঠিতে দেখা যাইত? আকাশের বিষুববৃত্ত (equator) যে বিন্দুতে ক্ষিতিজে (horizon) লগ্ন হয়, সে বিন্দুই পূর্ববিন্দু। অতএব প্রশ্নটি এই, কোন্ কালে কৃত্তিকা বিষুবরেখায় আসিয়াছিল? গণিত দ্বারা জানিতেছি, খ্রি-পূ ২৯০০ অব্দে। চিত্র দেখিলে গণিতবিষয়টি সুবোধ্য হইবে। চিত্রে বি ষু ব বিষুবরেখা, প পশ্চিম, পূ পূর্বদিক্। মু রবিপথ ও বিষুবরেখার সম্পাত।
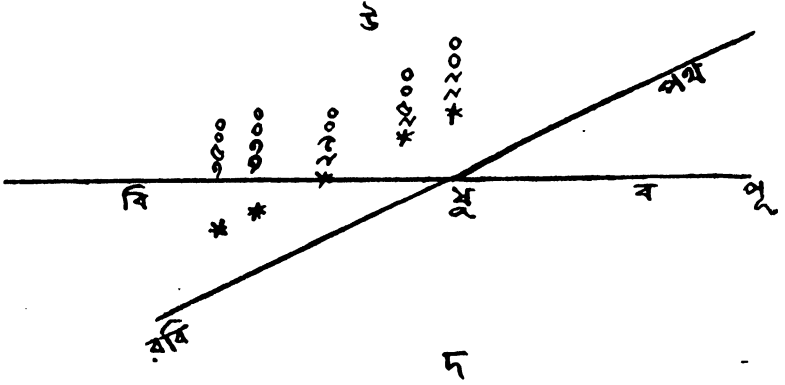
এই বিন্দু স্থির আছে, কৃত্তিকা শনৈঃ শনৈঃ পূর্বদিকে যাইতেছিল। খ্রি-পূ ২৯০০ অব্দে বিষুবরেখায় আসিয়াছিল। ইহার পূর্বে প্রায় তিন শত বৎসর দক্ষিণে ২° অংশের মধ্যে ছিল, এবং পরে তিন শত বৎসর উত্তরে ২° অংশের মধ্যে ছিল। তখনও কৃত্তিকা মূ বিষুবপাত (equinox) হইতে দূরে ছিল।

পূর্ববিন্দু নির্ণয় করিতে ২° অংশ ভুল হইলেও খ্রি-পূ ৩৩০০ হইতে ২৫০০ অব্দ আসিবে। (চারিটি সূর্যবিম্ব পাশে পাশে থাকিলে ২° অংশ হইবে।) অতএব প্রায় সাত আট শত বৎসর, প্রতি বৎসরে সাড়ে পাঁচ মাস, প্রতি রাত্রে কৃত্তিকাকে পূর্ববিন্দুতে উঠিতে দেখা যাইত। নক্ষত্রদর্শক কৃত্তিকার এই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া অসামান্য কিছুই করেন নাই। যে কালে নক্ষত্রচক্র কল্পিত হইয়াছিল, সে খ্রি-পূ ৩২৫০ অব্দে প্রত্যেক নক্ষত্র পুনঃপুনঃ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; কারণ, এক দিনে কিম্বা এক বৎসরে ২৮টি নক্ষত্র নিরূপিত হইতে পারে নাই। সে সময়ে কৃত্তিকার পূর্বদিকে স্থিতি লক্ষ্য হইয়া থাকিবে।

উপরে পাইলাম, খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দে কৃত্তিকা পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হইত না। তৎকালে বৎসরের কোন্ কোন্ দিন অগ্নির আধান বিহিত হইয়াছিল? এখন ২৮° অক্ষাংশে (যেমন দিল্লীতে) ৩ জুন কৃত্তিকার 'উদয়' হয়। সেদিন ভোর ৪টায় কৃত্তিকার উদয় হয়, ৫টায় সূর্যের হয়। খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দে ২৬ মার্চ হইত। রোহিণীর উদয় ২১ এপ্রিল হইত। অন্য কয়েকটি নক্ষত্র এই দিনের পরে পরে হইত। চিত্রা শেষের শুভ নক্ষত্র। ইহার উদয় ২১ আগষ্ট হইত।

এই গণিত দ্বারা জানিতেছি, কৃত্তিকার উদয় ২৬ মার্চ হইত। ২১ মার্চ বাসন্তবিষুবদিন। অর্থাৎ বিষুবদিনের পাঁচ দিন পরে। আমরা উদয় দর্শনের দেশ জানি না। আমাদের গণিতেও দুই এক দিনের ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে কালের কথা হইতেছে, সে কালে কৃত্তিকায় বাসন্তবিষুবপাত হইত না। আরও পাইতেছি, উক্ত আটটি শুভদিন বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা, এই তিন দেবঋতুর মধ্যেই পড়িত। অতএব আমাদের ব্যাখ্যায় ও কালনির্ণয়ে ভুল নাই।

'কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না,' শতপথব্রাহ্মণের এই বাক্যটি প্রথমে শঙ্কর-বালকৃষ্ণ-দীক্ষিত দেখাইয়াছিলেন। তদনন্তর তিলক ও জাকোবি দীক্ষিত-মহাশয়ের ব্যাখ্যার সমর্থন করেন। ব্রাহ্মণের বাক্যে বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ আছে। 'কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না।' ইহা দেখিয়া তিনজনেই ও অপর সকলেই মনে করিয়াছিলেন, খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দ শতপথব্রাহ্মণ-রচনার কাল। এটি ভুল। কারণ, শতপথব্রাহ্মণ শুক্লযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ। অতএব এই বেদের পরে প্রণীত হইয়াছিল। কৃষ্ণযজুর্বেদ খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে রচিত হইয়াছিল। শুক্লযজুর্বেদও তৎকালের। অতএব শতপথব্রাহ্মণ এই কালের পরে প্রণীত। বস্তুতঃ অন্য প্রমাণে পাই, সহস্র বর্ষ পরে প্রণীত হইয়াছিল।

শতপথব্রাহ্মণে পূর্বস্মৃতি অনুসারে অগ্নির আধানের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণ রচনার কালে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুতে উদয় হইত না। তখন অশ্বিনী পূর্ববিন্দুতে উদয় হইত। কিন্তু অশ্বিনীতে অগ্নি-আধানের ব্যবস্থা ছিল না। শতপথব্রাহ্মণ প্রাচীন ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়াছেন। আমরাও প্রাচীন স্মৃতি মানিয়া চলিতেছি।

এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যা শুনা যাউক। প্রোফেসর ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ লিখিয়াছেন,[৩] "শতপথব্রাহ্মণের উক্তিটি বিশ্বাসযোগ্য নয়, কালনির্ণয়ে পর্য্যাপ্ত নয়। কারণ, বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রে এইরূপ বচন আছে, বার্থ সাহেব তাহা হইতে খ্রি-পর ষষ্ঠ শতাব্দ পাইয়াছেন।" প্রোফেসর কীথ লিখিলেন,[৪] "নক্ষত্রের সহিত সূর্যকে যুক্ত করিবার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। শতপথব্রাহ্মণের উক্তি অগ্রাহ্য। যেহেতু শতপথব্রাহ্মণে বিজ্ঞান-সম্মত নক্ষত্রদর্শনক্ষমতার অভাব দেখা যায়। পরন্তু নক্ষত্র-চক্র বিদেশাগত বোধ হয়।" অর্থাৎ এই পণ্ডিতের বিচারে পূর্বদিকে কৃত্তিকার স্থিতি হইলে নক্ষত্রটি বিষুবপাতে ছিল, আর বিষুবপাতে কৃত্তিকা থাকিলে তদ্দ্বারা সূর্যস্থিতি জ্ঞাপিত হইত। যখন এই জ্ঞান ছিল না, তখন কৃত্তিকাও পূর্বদিকে ছিল না। অতএব শতপথব্রাহ্মণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পূর্ববিন্দু নির্ণয় করিতে পারিতেন না। কৃত্তিকাই পরের দ্রব্য, তাহার আবার পূর্বদিক্! দুইটি ভ্রমের এমন অপূর্ব-সংযোগ কদাচিৎ পাওয়া যায়। তাঁহারা ভাবিলেন না, যদি বার্থ সাহেব খ্রি-পর ষষ্ঠ শতাব্দ পাইয়া থাকেন, সেটা কিছুতে সম্ভবপর নয়, তাঁহার ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা। প্রোফেসর উইন্‌টারনিৎস্ শতপথের উক্তিটি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এক বুঝিতে আর বুঝিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,[৫] "বৈদিক গ্রন্থে বিষুবের কোন উল্লেখ নাই। নক্ষত্র ও সূর্যের স্থিতি সম্বন্ধের কোন উল্লেখ নাই। পূর্বদিক্ অর্থে ঠিক পূর্ববিন্দু নয়, কারণ, সে অর্থ করিলে বাসন্তবিষুবের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়। বাক্যটির ব্যাখ্যা এই মনে হয় যে,

৩) *Vedic Index.*

৪) *Cambridge History of India*, Vol. I, p. 148.

৫) Winternitz: *History of Indian Literature*, Vol. I, p. 298.

কৃত্তিকাতারাপুঞ্জ পূর্বপ্রদেশে ('eastern region') প্রত্যেক রাত্রে কয়েক ঘণ্টা দৃষ্ট হইত। খৃ-পূ ১১০০ অব্দের কালে এইরূপ হইত।"

বিদ্বানের এমন বিষম ভ্রম হইতে পারে, তাহার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে বিশ্বাস হইত না। প্রশ্নটা কি, কিরূপে তাহার উত্তর আসিতে পারে, তাঁহারা সে দিক্ মাড়াইলেন না। অগ্নির আধানের দিন-নির্ণয় করিতে হইবে, ইহা মূল প্রশ্ন। 'কৃত্তিকা পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না,' ইহা কৃত্তিকার বিশেষণ। মূল প্রশ্নের সহিত বিষুবের কোন সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ চিত্রে দেখা গিয়াছে, কৃত্তিকা বিষুব-বিন্দুতে ছিল না, ইহার পশ্চিমে ছিল। বিষুব-পাতে নয়, বিষুবরেখায় আসিয়াছিল। কৃত্তিকা বেবিলন হইতে আসুক, তাহাতেও কিছু আসে যায় না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, প্রোফেসর উইনটারনিংস্ মনে করিয়াছেন, আকাশে পূর্বদিকে কৃত্তিকা দেখিয়া যজ্ঞশালার প্রাগ্‌বংশ স্থাপিত হইত!

বস্তুতঃ শতপথব্রাহ্মণের দ্বারা তাঁহার তিনটি উক্তি মিথ্যা প্রমাণিত হইতেছে। নক্ষত্রের দ্বারা সূর্যের অবস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, রবিপথ দুই বিষুব-বিন্দুতে উত্তরদক্ষিণে বিভক্ত হইয়াছে। বিষুববিন্দুর জ্ঞানের কোন প্রয়োজনও ছিল না, কেবল পূর্ববিন্দুটি জানা আবশ্যক ছিল। আর ক্ষিতিজে সে বিন্দু জানা না থাকিলে 'কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না,' এই বাক্য উক্ত হইতে পারিত কি? বাস্তবিক এই সকল তর্ক সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। যজ্ঞশালা নির্মিত হইয়াছে। আর কে বা রাত্রিকালে তারা দেখিয়া পূর্বপশ্চিমরেখা অঙ্কিত করিবে? সে তারা যে পূর্বদিকে আছে, তাহা বলিবার পূর্বে পূর্বদিক্‌জ্ঞান অবশ্য চাই। যদি সে জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে কোন্ নির্বোধ তারা দেখিয়া পূর্বদিক্ আবার নির্ণয় করিবে?

প্রোফেসর উইন্টারনিংস্ বৌধায়ন শ্রৌতসূত্রের (২৫।৫) উপর নির্ভর করিয়া যজ্ঞশালা-নির্মাণের নিমিত্ত পূর্বদিক্ নির্ণয় মনে করিয়াছেন। কিন্তু সে বচনে কৃত্তিকা ব্যতীত শ্রবণা এবং চিত্রা ও স্বাতীর অন্তর উল্লিখিত আছে। যদি 'অন্তর' অর্থে চিত্রা ও স্বাতীর যোগরেখার মধ্যবিন্দু বুঝিতে হয়, তাহা হইলে উক্তিটি অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, সে বিন্দু দৃশ্য নয়, কাল্পনিক।

এই সকল পণ্ডিত ভুলিয়াছেন, শতপথব্রাহ্মণে অগ্নি-আধানের দিননির্ণয়ের কথা, বৌধায়নে যজ্ঞশালা-নির্মাণের দিননির্ণয়ের কথা। শতপথে ও বৌধায়নে কৃত্তিকার বিশেষণটি আছে। কিন্তু উদ্দেশ্য ভিন্ন।

শতপথের উক্তি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি, বৌধায়নের ব্যাখ্যাও সেই ভাবে সহজে করিতে পারা যায়। ইনি বলিতেছেন, প্রথমে যজ্ঞশালার ভূমি পরীক্ষা করিবে। তার পর প্রশ্ন আসে, কোন্ দিন যজ্ঞশালা-নির্মাণ প্রশস্ত। বৌধায়ন তিন মতে তিনটি দিন নির্দিষ্ট করিয়াছেন। (১) কৃত্তিকা দ্বারা, (২) শ্রবণা দ্বারা, (৩) চিত্রা ও স্বাতীর অন্তর দ্বারা নির্ণয় করিবে।

বৌধায়নের নিবাস দক্ষিণাপথে ১৫° অক্ষাংশে ছিল ধরা যাউক, এবং মনে করি, তিনি খ্রি-পূ ১০০০ অব্দে সূত্র লিখিয়াছিলেন। গণিত দ্বারা পাইতেছি, ২১ ডিসেম্বর শ্রবণার, ১৭ সেপ্টেম্বর চিত্রার, আর ২৭ সেপ্টেম্বর স্বাতীর উদয় হইত। চিত্রা ও স্বাতীর উদয়-দিনের মধ্যদিন ২২ সেপ্টেম্বর। এই সকল দিন হইতে বুঝা যায়, যজ্ঞশালা-নির্মাণের নিমিত্ত বাসন্তবিষুব-দিন, উত্তরায়ণ-দিন আর শারদ-বিষুবদিন, এই তিন দিন নির্দিষ্ট ছিল। শারদ-বিষুবদিন চিত্রা কিংবা স্বাতীর একটির দ্বারা পাওয়া যাইত না। ঐ দুই তারার মধ্যবর্তী দিন ২২ সেপ্টেম্বর উদ্দিষ্ট ছিল। বোধ হয়, যজ্ঞশালা-নির্মাণে রবির দক্ষিণায়ন-দিন বিহিত ছিল না। কারণ, দক্ষিণাপথে তখন বর্ষা পড়িয়াছে। কৃত্তিকা বহুকাল পূর্বে বাসন্তবিষুবদিনে উদয় হইত। সেই স্মৃতি ছিল। বোধ হয়, শতপথ হইতে কৃত্তিকাই পূর্বদিক্ হইতে চ্যুত হয় না, কৃত্তিকার বিশেষরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃত্তিকার উদয়দিন ত্যাগ করিলে দেখা যাইতেছে, শারদ-বিষুবদিন ও উত্তরায়ণ-দিন ঠিক পাওয়া যাইত। ইহাতে এই মনে হয়, বৌধায়ন-সূত্র দক্ষিণাপথে ও খ্রি-পূ ১০০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মনে করি, উত্তরাপথে ২৫° অক্ষাংশে ও খ্রি-পূ ৫০০ অব্দে বৌধায়ন ছিলেন। গণিতদ্বারা জানিতেছি, সেখানে ২৬ সেপ্টেম্বর চিত্রার ও ২০ সেপ্টেম্বর স্বাতীর উদয় হইত। অর্থাৎ প্রথমে স্বাতীর, পরে চিত্রার। ইহাতে ক্রমটি বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। অতএব দক্ষিণাপথ ও খ্রি-পূ ১০০০ অব্দই ঠিক মনে হইতেছে।

শতপথব্রাহ্মণের অগ্নি-আধানের নক্ষত্রে বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ের আরও কয়েকটি মূল্যবান্ প্রমাণ আছে। বিস্তার করিতে গেলে অন্যান্য প্রমাণের উল্লেখ আবশ্যক হইয়া পড়ে। অতএব প্রমাণের ব্যাখ্যা না করিয়া দুই একটি স্থূল বিষয় নির্দেশ করিতেছি।

প্রথম দ্রষ্টব্য, যে আটটি নক্ষত্রের নাম করা হইয়াছে, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, (আর্দ্রা), পুনর্বসু, (পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা), পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা ও চিত্রা, সেগুলি পরে পরে আটটি নয়। আর্দ্রা, পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘার উল্লেখ নাই। পূর্বকালে আর্দ্রা নক্ষত্রের নাম বাহু ছিল। ইহা মৃগ নক্ষত্রের এক অঙ্গ বিবেচিত হইত। অতএব ইহা মৃগ নক্ষত্রের অন্তর্গত ছিল, এই হেতু পৃথক্ নাম আসে নাই। কিন্তু পুষ্যা, অশ্লেষা ও মঘা, এই তিন নক্ষত্রের নাম নাই কেন? ইহার কারণ এই বোধ হয় যে, এই এই নক্ষত্রে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিবার কোন স্মৃতি ছিল না। বস্তুতঃ নির্দিষ্ট আটটি নক্ষত্র সম্বন্ধে, বিশেষতঃ মৃগ এবং চিত্রা সম্বন্ধে যে যে উপাখ্যান লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা বহু পূর্বকালের স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে। এই অনুমানের সমর্থন উক্ত আটটি নক্ষত্রের তালিকাতেই পাওয়া যায়। দেখা যায়, প্রথম চারিটি এককালে বাসন্ত-বিষুবদিনের নক্ষত্র ছিল। পরের চারিটি নক্ষত্র কৃত্তিকা ব্যতীত তৎতৎ কালের দক্ষিণায়নের নক্ষত্র ছিল। যথা,—

বিষুব	দক্ষিণায়ন
কৃত্তিকা	মঘা (খ্রি-পূ ২৩০০)
রোহিণী	পূর্বফল্গুনী (খ্রি-পূ ৩২০০)
মৃগ	উত্তরফল্গুনী (খ্রি-পূ ৪০০০)
পুনর্বসু	হস্তা (খ্রি-পূ ৫৫০০)
	চিত্রা (খ্রি-পূ ৬৩০০)

(ঐ ঐ নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন কালের অব্দ)।

যখন পূর্বফল্গুনীতে দক্ষিণায়ন হইত, তখন কৃত্তিকা বাসন্ত-বিষুবরেখায় থাকিত না। তখন রোহিণী থাকিত। কৃত্তিকা যখন বাসন্ত-বিষুবে আসিয়াছিল, তখন মঘা দক্ষিণায়নের নক্ষত্র। অতএব মঘায় দক্ষিণায়ন (খ্রি-পূ ২৩০০) হইবার পূর্বেই কৃত্তিকা যাজ্ঞিক নক্ষত্র স্বীকৃত হইত। এই কারণে কৃত্তিকা অগ্নির নক্ষত্র বলা হইয়াছে। অগ্নি, যজ্ঞাগ্নি। মঘার বহু পরে অশ্লেষা ও পুষ্যা দক্ষিণায়ন-নক্ষত্র হইয়াছিল। এই তিন নক্ষত্র ত্যাগ করাতে এই অনুমান হয়, যে যে যাজ্ঞিক নক্ষত্রের স্মৃতি ছিল, কেবল সে সে নক্ষত্রের নাম করা হইয়াছে। সে সে নক্ষত্র বাসন্ত-বিষুব ও দক্ষিণায়ন-দিনের নক্ষত্র হইতে পারিত, অন্য কালের নক্ষত্র হইতে পারিত না। অতএব উক্ত আটটি নক্ষত্র হইতে খ্রি-পূ ৬০০০ হইতে খ্রি-পূ ৩০০০ অব্দের বৈদিক কৃষ্টির কাল পাইতেছি। ঋগ্‌বেদে খ্রি-পূ ৬০০০ অব্দের পূর্বের স্মৃতিও আছে। কিন্তু ঋগ্‌বেদেই তাহা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল, শতপথেও আসে নাই।

শেষোক্ত কাল তিন বিভিন্ন উপায়ে নির্ণীত হইল। (১) ইহা মঘায় দক্ষিণায়নের পূর্বের ঘটনা; (২) ইহা সে সময়ের কথা, যে সময়ে কৃত্তিকা পূর্ববিন্দুতে উদিত হইত; (৩) সে সময়ের কথা, যে সময়ে বাসন্ত-বিষুবদিনের চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই কৃত্তিকা উদিত হইত।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এক জন খ্যাতনামা নৈয়ায়িক ও আলঙ্কারিক ছিলেন। আনুমানিক ১৮০৫ সনে কলিকাতার দক্ষিণে ২৪-পরগণার অন্তর্গত মুচাদিপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বরচিত একখানি পুস্তকের শেষে সংক্ষেপে যে বংশ-পরিচয় সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

> পূর্ব্বে সাবর্ণগণ বড়িসাতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে বসতিস্থান দিয়া স্থাপিত করেন। শ্যামসুন্দর বাচস্পতি নামে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর এক ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই পূজনীয় ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার; রামচন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। ইনি বাল্যকালে পিতার নিকটে ব্যাকরণ প্রভৃতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করেন। পরে 'প্রাণতোষণীলতা'-প্রণেতা রামতোষণ বিদ্যালঙ্কারের নিকট অলঙ্কারশাস্ত্র, শালিখানিবাসী জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের নিকট ন্যায়শাস্ত্র, এবং গুর্জ্জরদেশীয় পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জয়নারায়ণ পরে কলিকাতার রাজকীয় পাঠমন্দিরে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং নারিকেলডাঙ্গায় লৌহপথের নিকটে বসতি স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন। জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদন তর্কবাগীশ শালিখার একটি মঠে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপন করাইতেন।—'পদার্থতত্ত্বসারঃ'।

স্বীয় অধ্যাপক জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্তের মৃত্যু হইলে (১৮৩১ সনে ?) জয়নারায়ণ শালিখায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায় অধ্যাপনা করিতে করিতে তিনি হিন্দু-ল কমিটির পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি জজ-পণ্ডিত পদের প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একই বৎসরে (১৮৩৯ সনে) এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ইহার পর-বৎসরে জয়নারায়ণ সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। এই সময় হইতে নিমাইচাঁদ শিরোমণি সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৬ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপকের পদপ্রার্থী হন। শিরোমণির মৃত্যুর দুই দিন

পরে—১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর নিকট যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

মহামহিম শ্রীযুক্ত কাপ্তেন মার্ষল সাহেব সংস্কৃত পাঠশালাধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীজয়নারায়ণতর্কপঞ্চাননস্যাবেদনমিদং গত ১২ ফেব্রুওরি বুধবার উক্ত পাঠশালার ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক ৺নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইয়াছে এইক্ষণে আমি ঐ কর্ম্মের প্রার্থনা করি অতএব মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই আবেদন কমিটির গোচর করাইতে আজ্ঞা হয়—

আমি ন্যায়শাস্ত্র বহুদিবসাবধি অনেক ছাত্র লইয়া ক্রমিক অধ্যাপনা করিতেছি এবং পাঠশালার ব্যবহার্য্য ব্যাকরণকাব্যালঙ্কারাদিশাস্ত্র প্রায় তাবৎ অধ্যয়ন করাইতে সমর্থ কদাচিৎ যদি অন্য কোন পণ্ডিত পাঠশালায় অনুপস্থিত হয়েন তদা তৎকার্য্য আমাহইতে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক বিশেষত আমি লা কমিটির সার্টিফিকেট ও অন্যান্য অনেক খ্যাত্যাপন্ন পণ্ডিতেরদিগের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উক্ত ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক জীবদ্দশায় আমাকে স্বীয়কম্ম প্রতিনিধি দিতে মহাশয়সমীপে আবেদন করেন্ তাহাতে কমিটির পরীক্ষা দিতে আজ্ঞা হয় আমিও তদনুসারে অন্য কতিপয় পণ্ডিতের সহিত ২ নবম্বরে পরীক্ষা দিয়াছি কিন্তু ঐ পরীক্ষা-কালে পরীক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রামকমল সেন মহাশয় আমার অত্যন্ত প্রতিকূলাচরণপূর্ব্বক প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট করিয়াছেন্ তাহা মহাশয় স্বয়ং এবং অন্যান্য যাঁহারা তথা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিলক্ষণ বিদিত আছেন্ উক্ত বাবু পরীক্ষাকালে তাদৃশ ব্যাঘাত না জন্মাইলে যেরূপ উত্তর লিখিয়াছি তদপেক্ষা উত্তমোত্তর লিখিতে পারিতাম ইহাতে সন্দেহ নাই সে যাহা হউক এইক্ষণে যাহা লিখিয়াছি তাহাতেও যে তিনি আমার পক্ষে যথার্থ বিবেচনা করিবেন তাহা পরীক্ষাকালের ব্যবহার দ্বারা বোধ হয় না আরো শ্রবণ করিতেছি অস্মৎসহিতপরীক্ষিত অনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিতকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে তাঁহার ইচ্ছা আছে ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে উক্ত পণ্ডিতের ও আমার উত্তরপত্রের সংস্কৃত রচনার শুদ্ধাশুদ্ধি ও প্রশ্নানুযায়ি উত্তরের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিষয় উত্তম পণ্ডিত দ্বারা বিবেচনা করেন্ উক্ত বাবুর সম্মত ঐ হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ জানেন্ না এবং কাব্যাদিশাস্ত্রাবিজ্ঞ ও অল্পবয়স্ক ও কদাচ অধ্যাপনা করেন্ নাই আত্মবোধ হইতে পরবোধনা সুকঠিনা এবং বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণকে তদ্দেশীয়াধ্যাপকের ন্যায় বিদেশীয়াব্যবসায়ি অবহুদর্শি পণ্ডিতের সুশিক্ষা কদাচ সম্ভবে না তাহা ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেই সপ্রমাণ হইবেক্ অতএব প্রার্থনা এই যে এ বিষয় মহাশয় কমিটিতে জানাইয়া যথার্থ বিবেচনা দ্বারা যাহার প্রাপ্য হয় তাহাকে দেন্ আমি আরও নিবেদন করিতেছি যে কমিটি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিলে আমি ছাত্রগণকে বিলক্ষণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠনা ও উত্তমরূপে প্রশ্নোত্তর শিক্ষাদ্বারা শ্রীযুক্তেরদিগের পরিতোষ সম্পাদন করিবো ইহাতে কোনোপ্রকারে ঔদাস্য হইবে না ইতি।

পরবর্ত্তী আগষ্ট মাসের ১১ই তারিখ হইতে তর্কপঞ্চানন মাসিক ৮০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগের পূর্ব্বে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ কিছু দিন অস্থায়িভাবে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণের নিকট যে-সকল ছাত্র সংস্কৃত কলেজে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ইঁহাদের এক জন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপর জন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন; উভয়েই জয়নারায়ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। জয়নারায়ণ তৎসম্পাদিত 'শঙ্করবিজয়ঃ' গ্রন্থে ইঁহাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়নারায়ণ ৩০ বৎসর সংস্কৃত কলেজে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। অবসর গ্রহণের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ছুটি লইয়া তিনি কাশীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ২৪ জুলাই ১৮৬৯ তারিখে কাশী 'মানসসরোবর' হইতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি একখানি পত্র লেখেন; জীবনের অবশিষ্ট কাল কাশীতেই কাটাইবেন—এ কথারও উল্লেখ পত্রে ছিল।

১০ আগষ্ট ১৮৬৯ তারিখে, ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শনের নিকট সংস্কৃত কলেজে জয়নারায়ণের চাকুরীর বিবরণ পেশ করিয়া, কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী লিখিলেন :—

....in consideration of the continuous services of the venerable Professor and of his vast and profound erudition by which the College has benefited so long, the highest scale of pension allowed by the rules be granted to him, namely half of his average monthly salary for the last five years amounting to Rs. 57-5-4.

জয়নারায়ণের পেন্‌সনের প্রার্থনা ২৬এ নবেম্বর তারিখে মঞ্জুর হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের মাহিনার হিসাব-বই হইতে জানা যায়, তিনি ৩ নবেম্বর ১৮৬৯ হইতে পেন্‌সন গ্রহণ করেন। তাঁহার পেন্‌সনের পরিমাণ ছিল মাসিক ৫৭৷৹।

১০ আগষ্ট ১৮৬৯ তারিখে, সংস্কৃত কলেজে জয়নারায়ণের চাকুরীর যে বিবরণ শিক্ষা-বিভাগে প্রেরিত হয়, তাহাতে প্রকাশ, ঐ তারিখে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৩ বৎসর ৪ মাস; এবং ঐ তারিখ-পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে তাঁহার কার্য্যকাল ২৯ বৎসর, ৩ মাস, ২১ দিন। উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাঁহার বেতনেরও এইরূপ হিসাব পাওয়া যায় :—

আগষ্ট	১৮৪০	হইতে	জানুয়ারি	১৮৪১	···	মাসিক ৮০৲
ফেব্রুয়ারি	১৮৪১	হইতে	মে	১৮৬৩	···	মাসিক ৯০৲
জুন	১৮৬৩	হইতে	ফেব্রুয়ারি	১৮৬৬	···	মাসিক ১০০৲
মার্চ	১৮৬৬	হইতে	অবসর গ্রহণ পর্য্যন্ত		···	মাসিক ১২০৲

মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসরগ্রহণের তিন বৎসর পরে ১২ নবেম্বর ১৮৭২ (২৮ কার্ত্তিক ১২৭৯) তারিখে জয়নারায়ণ কাশীতে দেহরক্ষা করেন।* মৃত্যুকালে তাঁহার

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'চরিতমালা', ২য় ভাগে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। তাহাতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর তারিখ "১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাস" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ভুল। 'বিশ্বকোষে'র "জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন" প্রবন্ধটি (পৃ.৬৭০) প্রধানতঃ 'চরিতমালা' অবলম্বনে লিখিত; ইহাতেও তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুকাল "১২৮০ সাল" দেওয়া আছে।

বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। ২৬ নবেম্বর ১৮৭২ তারিখের 'সুলভ সমাচার' পত্রে তাঁহার মৃত্যু-সম্পর্কে যাহা লিখিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন।— ...গত ২৮শে কার্ত্তিক সোমবার ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

ইহাঁর সমান নৈয়ায়িক বাঙ্গালা দেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের নৈয়ায়িকেরা সচরাচর কাজ চালান মত দুই এক খান গ্রন্থ পড়িয়া দুই চারটা ফাঁকি শিখিয়া কেবল টিকি নাড়িয়া "অবচ্ছেদাবচ্ছেদক" করিয়া বেড়ান। কিন্তু তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্রে প্রকৃত গভীর বিদ্যা ছিল। তাঁহার নিকট যাঁহারা পড়িতেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার গভীর বিদ্যা ও পরিষ্কার বিচারশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। অধিক সুখের বিষয় এই যে এত বিদ্যা থাকিয়াও তাঁহার লোক দেখান ছিল না ; বৃথা আস্ফালন তিনি কখন করিতেন না। কোন প্রশ্ন হইলে অতি ধীর, প্রশান্ত ও গম্ভীর ভাবে ফল কথা গুলি বলিয়া দিতেন। তিনি দুই পক্ষের মধ্যস্থতা করিবার অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সমক্ষে আসল কথা ছাড়িয়া আগড়ম বাগড়ম বকা কাহারও সাধ্য হইত না। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃত পথে আনিয়া দিতেন। ন্যায়ে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল বটে, কিন্তু অন্য সকল বিষয়েও তিনি এক জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, "তর্কপঞ্চানন মহাশয় ভিন্ন প্রকৃত পণ্ডিত আমি দেখিতে পাই না।"

তাঁর সরলতা, মৃদুতা, শান্তস্বভাব মনে হইলে তাঁহাকে যথার্থ অন্তরে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার এই সকল গুণের পরিচয় স্বরূপ দুই একটী কথা পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে। তিনি স্থূলকায় ছিলেন ও ইদানীং এক প্রকার অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তিনি একখানি সামান্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি ভাড়া করিয়া কলেজে আসিতেন। এক দিন কলেজ হইতে যাইবার সময় তিনি গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় স্কুলের একপাল ছোট ছোট ছেলে তাঁহার গাড়ির পিছন ও চাকা ধরিয়া পিছন দিকে টানিতে লাগিল ; ঘোড়া আর চলিতে পারে না ; গাড়োয়ান মহারাগে বকাবকি করিতে লাগিল। কিন্তু ছেলেরা শুনে না ; অবশেষে তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুখ বাহির করিয়া বলিলেন, "ও বাবারা তোমরা টানিলে ঘোড়া যাবে কেন?" ছেলেরা আরও আনন্দ পাইল, এবং আরও টানাটানি করিতে লাগিল। অবশেষে অন্য এক জন আসিয়া ছেলেদের হস্ত হইতে তাঁহার গাড়ি উদ্ধার করিয়া দিল। তিনি স্বভাবতঃ এমনি শান্ত প্রকৃতি ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তাঁহার মন আবার এমন উদার ছিল যে ইংরাজী হইতে ভাল ভাল মত ও ভাল ভাল কথা বলিলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতেন এবং ইংরাজদিগের শাস্ত্রের উপর তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা বাড়িত। এক দিন ন্যায় পড়াইবার সময় ন্যায়ের যেখানে আছে যে বায়ুর ভার নাই, সেইখানে একজন ছাত্র বলিলেন যে "বায়ুর ভার আছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! কেমন করিয়া জানিলে?" তাহাতে সেই ছাত্র যে উপায়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বাতাসের ভার সপ্রমাণ করিয়াছেন তাহা বুঝাইয়া দিলেন। শুনিয়া তিনি ৫।৭ মিনিট চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে বলিলেন "দেখ দেখি বাবা, এই উপায়টী না জানার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এমন সত্যটী জানিতে পারেন

নাই।" এমন কি তিনি "পদার্থতত্ত্বসার" নামে যে ন্যায়ের গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহাতে অনেক ইংরাজ মত নিবেশিত করিয়াছেন। তাঁহার আর একটী বিশেষ গুণ এই ছিল যে তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। একটু বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী দেখিলে তিনি একেবারে মোহিত হইতেন। এমন অনেক দিন হইয়াছে যে, তিনি নিজকৃত কবিতা আনিয়া ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন "বাবারা একবার দেখিয়া কাটিয়া কুটিয়া দেও দেখি, তোমরা আমা অপেক্ষা এসব বোঝ ভাল।" বাস্তবিক তাঁহার সরলতা ও বিনয় মনে হইলে গায় কাঁটা দেয়। ঈশ্বর তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন। তাঁহার নাম স্মরণ রাখিবার জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং তাঁহার ছাত্রদের কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার একখানি ছবি সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে রাখিলে অতি উত্তম হয়। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এবং তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এ বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

গ্রন্থাবলী—রচিত ও সম্পাদিত

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের রচিত ও সম্পাদিত যে-সকল গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির একটি তালিকা দিলাম।—

১। উদয়নাচার্য্য-কৃত **আত্মতত্ত্ববিবেকঃ**। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক "পরিশোধিতঃ"। ১৯০৬ সংবৎ (= ১৮৪৯ সন)।

২। **কণাদসূত্রবিবৃতিঃ**। ১৮৬১ সন। (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা)। ইহা বৈশেষিক দর্শনের টীকা।

৩। **সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ**। ১৮৬১ সন।

৪। গোতম-মুনি-কৃত **ন্যায়দর্শনম্**। বাৎস্যায়ন-ভাষ্যসমেত। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৮৬৫ সন। (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা)।

৫। **পদার্থতত্ত্বসারঃ**। ১৮৬৭ সন। (প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আনুকূল্যে প্রকাশিত)।

৬। আনন্দগিরি-কৃত **শঙ্করবিজয়ঃ**। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৮৬৮ সন। (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা)।

এই সকল গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত, কেবল 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' বাংলায় লিখিত ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত।

'পদার্থতত্ত্বসারঃ' পুস্তকের শেষে জয়নারায়ণ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তাহাতে তিনি 'কণাদসূত্রবিবৃতিঃ' ছাড়া স্বরচিত আরও কয়েকখানি পুস্তকের উল্লেখ করিয়াছেন; সেগুলি—

(ক) নীরাজনপ্রকাশঃ
(খ) স্বরসংক্রমদীপিকা
(গ) তারকেশস্তবঃ
(ঘ) বচঃপুষ্পাঞ্জলিঃ (চামুণ্ডাশতকং)

জয়নারায়ণ সুকবিও ছিলেন। 'তারকেশস্তবঃ' ও 'চামুণ্ডাশতকং'-এর ন্যায় তিনি সংস্কৃত পদ্যে আরও একখানি পুস্তক—'পদ্যপদ্মমালানামিকা ভৈরবপঞ্চাশিকা' রচনা করিয়াছিলেন; ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬; প্রকাশকাল ১৭৯০ শকাব্দা (= ১৮৬৮ সন)। সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে এক খণ্ড 'ভৈরবপঞ্চাশিকা' দেখিয়াছি।

মুসলমান-সাহিত্যে ভারতবাসীর দান

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ভারতবাসীদের মধ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট পণ্ডিত মুসলমান-সাহিত্যের মধ্য দিয়া নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে বলিতে পারা যায় এইরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা সত্তরের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব। ইঁহারা ইতিহাস, দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, কাব্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন। আনন্দরাম, আনন্দ রায়, কন্কহ্, কিষণ সিং, কৃপারাম, কিবলরাম, গঙ্গাকিষণ, গিরিধর, চতুর্ভুজ, চন্দরমন, চন্দরভান ব্রাহ্মণ, ছিতরমল, জসবন্ত রায়, জুরাবার সিং, দতরাম নন্দী, দামোদর, দিতরাম, দেবীদাস, দুনীচাঁদ বালী, ধন্নূন মিশ্রী, নবলকিশোর, নরনারায়ণ, নিহালচাঁদ, পরতাব, বনওয়ালি দাস, বসাবন লাল, বিষণনারায়ণ, বিয়াড়ী, বিন্দ্রাবন, ভূপতরায়, মনসারাম, মন্নুহর রায়, মহতাব সিং, মুহবীব, মেদ্নীমল, রাঘিব, রাধাকান্ত তর্ক, রামপ্রসাদ, রূপনারায়ণ, লছমীনারায়ণ, লালা টীকারাম, শনক, সদাসুক, সনজহল, সলিহ, সুজানরায়, হরকরন, হরচরণদাস, হীরালাল—মুসলমান সাহিত্যে এই সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ইঁহাদের সামান্য সামান্য বিবরণ যতটুকু আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ হইল। এ ছাড়া অপর কয়েক জন পণ্ডিতের নাম মাত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের কোন বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। মুসলমান সাহিত্যের সেই সমস্ত হিন্দু পণ্ডিতের নাম—বাথর, দাহর, জভর, রাহ্হ, অঙ্কর, অন্দি, সকহ্, জঙ্গল ও জারি। গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (*J. R. A. S.*, Vol. VI, 119) এক জন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"all these being authors of various books, were philosophers and physicians of India; and to them are to be referred the rules laid down relating to the science of stars. The Indians at present occupy themselves with the works of these men, and imitate them, handing them down from one to another. Razi in his book called *Addavi* and in several others, has copied from the works of many of the Indians."

মুসলমানগণ এই সমস্ত কীর্তিমান্ পণ্ডিতকে ভারতবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের নাম পড়িয়া ইঁহারা যে ভারতবাসী তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মুসলমান গ্রন্থকারগণ বলিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে ভারতবাসী বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি। সাত নকলে আসল ভেস্তা হইয়া গিয়াছে। নিম্নে আমাদের সংগৃহীত পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণানুক্রম অনুসারে প্রদত্ত হইল :—

আনন্দরাম মুখ্‌লিস

আনন্দরাম 'মুখ্‌লিস' (=অকপট, অকপট বন্ধু) উপাধিভূষিত ছিলেন। নাদির াাহ্‌র ভারতে অবস্থানকালে ইনি তৎকালীন বহু ব্যাপার স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের দেখা ঘটনা, বিশেষতঃ নাদির শাহ্‌র আক্রমণ-ব্যাপার অবলম্বন করিয়া আনন্দরাম এক ইতিহাস রচনা করেন। তাহার নাম 'তজ্‌কিরা'। গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণই ।হিয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। লফ্‌টনেণ্ট পারকিন্স (Lt. Perkins) স্যর চার্লস্‌ এলিয়টের ইতিহাসের অষ্টম খণ্ডে পৃ. ৭৬-৯৪) আনন্দরামের এই ফার্সী ইতিহাসের কয়েক স্থানের তর্জমা দিয়াছেন। গ্রন্থখানি ১১৫১ হিজরার ঘটনা লইয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইহা সমাপ্ত য়।—J. N. Sarkar : *Fall of the Mughal Empire*, Bibliography ; Elliot : *History of India*, p 76.

আনন্দ রায়

প্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার কবিনাম 'মুখ্‌লিস'। ইনি 'মুখ্‌লিস হিন্দী' নামেও পরিচিত ছিলেন। 'আনন্দ রায় হিন্দু' নাম দিয়া 'দিবান-ই-সঈদে' বহুবার ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে ('দিবান-ই-সঈদ', ১৬৪ পত্রাঙ্ক ইত্যাদি)। আনন্দ রায় জাতিতে ক্ষত্রী ছিলেন। ইনি অহ্‌মদ শাহ্‌র রাজত্বের চতুর্থ বর্ষে ১১৬৪ হিঃ (১৭৫১ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন। ইনি ৫০,০০০ ফার্সী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন।—Beal : *Oriental Biographical Dictionary.*

কন্‌কহ্‌ (=কঙ্ক বা কাঙ্কায়ন) খ্রীঃ ৮ম শতক

কন্‌কহ্‌ ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের অন্যতম। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌গণ একবাক্যে ইঁহাকে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্‌ বলিয়া স্বীকার করিতেন।[১] ইনি চিকিৎসক ও পদার্থবিদ্যাবিৎ ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াও ইঁহার খ্যাতি ছিল। ঔষধের গুণবিষয়ে ইনি এক জন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মিশ্রিত পদার্থের প্রকৃতি এবং সাধারণ ভেষজের গুণাবলী সম্বন্ধে ইঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিশ্বের আকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের ন্যায় ইনি যথার্থ মত পোষণ করিতেন। নভোমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান ও গঠন সম্বন্ধে এবং গ্রহাদির গতি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আধুনিক পণ্ডিতদিগের ধারণার অনুরূপ ছিল।

তিনি কোন্‌ সময়ের লোক তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না, তবে তিনি যে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন তাহা অল্‌ হুসেন বিন মুহম্মদ

১ অবূ মা অশীর জফ্‌ফর বিন্‌ মুহম্মদ বিন উমর অল্‌ বল্‌খি ইন্‌ কিতাব অল্‌ উলিফ কন্‌কহ্‌ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

বিন হামিদের* গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন যে ৭৭৩ খ্রীঃ কন্‌কহ বাগ্‌দাদ্ শহরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। খলিফ্ মামুন তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। ইনি ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞান লইয়া গিয়াছিলেন, সেগুলি খালিফ্ অল্ মনসুরের আদেশে মুহম্মদ বিন ইব্রাহিম অল্ ফজারী ভাষান্তরিত করেন। এই অনুবাদ-পুস্তকের নাম বৃহৎ 'সিন্দ হিন্দ'। মুসলমানগণ যত দিন পর্যন্ত গ্রীক জ্যোতিবিদ্‌গণের পুস্তকাবলীর সহিত পরিচিত না-ছিলেন তত দিন পর্যন্ত এই পুস্তক হইতে উপকরণ লইয়াই মুসলমান জ্যোতিষিগণ স্বকীয় ভাষায় জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী রচনা করিয়াছিলেন।†

কন্‌কহ্-রচিত গ্রন্থাবলী—

১ অল্‌মুমুজার্ ফী অল্ 'অমার—জীবনাদর্শ।

২ কিতাব অস্‌রার্ অল্ মবালিদ্—জন্মপত্রিকারহস্য।

৩ কিতাব অল্ কিরানাত্ অল্ কবীর—রাশিচক্রে গ্রহসংযোগ-সম্বন্ধীয় বৃহৎ গ্রন্থ।

৪ কিতাব অল কিরানাত্ অল্ সঘী'র্—রাশিচক্রে গ্রহগণের সংযোগ-পুস্তকের সংক্ষিপ্তসার।

৫ কিতাব ফী অল্ তিব্ বা হবা য়জ্‌রী কন্নাশ—কন্নাশ নামে পরিচিত চিকিৎসাগ্রন্থ।

['কন্নাশ' শব্দ সম্ভবতঃ সিরিয়া দেশের ভাষা হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ—সংগ্রহ করা। ইহাতে লেখকের অভিজ্ঞতার ফলে প্রাপ্ত ব্যবস্থাপত্র (prescriptions) ও তাঁহার পূর্ববর্তী চিকিৎসকগণের ব্যবস্থাপত্রও সংগৃহীত আছে।]

৬ কিতাব অল্ তবাহম—কল্পনাশীর্ষক পুস্তক।

৭ কিতাব ফী ইহদাস্ অল্ আলম্ ওয়ালজোর ফীল ক্বিরান্—বিশ্বসৃষ্টি ও রাশিচক্রের আবর্তসম্বন্ধীয় পুস্তক।

গুলাম জিলানী-রচিত 'তারিখ-উল-অতিব্বা' নামক পুস্তকে এই কয়খানি গ্রন্থের নাম আছে। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালেও (৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১১৭) এই কয়খানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। হাজি খলিফাও তাঁহার মূল্যবান্ গ্রন্থে পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির নাম করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তক কন্‌কহ্ অল্ হিন্দী-রচিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—

৮ কিতাব অল্ ইখতিয়ার—জ্যোতিষবিষয়ক পুস্তক।

* ইনি সাধারণতঃ ইবন বিন অদমী নামে পরিচিত।

† *Ibn al-Quifti*, p .303; F. Wuestenfeld—*Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher*, p. 3; Johann Gildmeister—*Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opuscula inedita*, 1838, pp. 94, 102, 103, 107; von Bohlen—*Das alte Indien II*, p. 281; Dietz—*Anal. Med.* p. 117; A. Weber—*Indische Litteraturgeschichte*, pp. 287, 284 and 302, *J. R. A. S.*, Vol. VI, p. 116.

৯ কিতাব মনজিল্ অল্ কমর্—চন্দ্রের সংস্থান-বিষয়ক গ্রন্থ।—হাজি খলিফা ১০৫৩০ সংখ্যক পুস্তক।

কন্‌কহ্‌র জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। আরবদেশের জ্যোতিষ-শাস্ত্রের পুস্তকে কন্‌কহ্‌র নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। মুসলমানগণ বলেন, চিকিৎসক বলিয়া ইঁহার যশ বহুদূর বিস্তৃত ছিল। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের ইনি এক জন প্রামাণিক গ্রন্থকার। ইঁহার প্রকৃত নাম কি, তৎসম্বন্ধে নানা লেখক নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। রাইস্কে (Reiske) ও শুল্‌টেন্স (Schultens) বলেন, ইঁহার প্রকৃত নাম 'কন্‌গহ্‌'। পারস্য ভাষায় 'কাফ্‌' ও 'গাফ্‌' একই প্রকারে অনেক সময় লিখিত হইয়া থাকে। তাই শেষের 'কাফ্‌'টীকে ইঁহারা 'গাফ্‌' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। 'তারিখ অল হুকমা কতকা' গ্রন্থে কন্‌কহ্‌—'কসিরী' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোলব্রুক ইঁহার নাম গর্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। D' Herbelot-এর *Bibliotheque Orientale* নামক গ্রন্থে কঙ্কর, কঙ্কা ও কঙ্কা বলিয়া ইনি অভিহিত হইয়াছেন।* উইলসন সাহেব ইঁহার নাম গঙ্গা বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে গঙ্গার সহিত অন্য কোন শব্দের সমাস হইলে তবে পুরুষনামবাচক হইবে এই আশঙ্কায় তিনি কন্‌কহ্‌ নাম স্বীকার করিয়াছেন। 'কঙ্ক' বা 'কাঙ্কায়ন' ইঁহার নাম ছিল বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

কাশীরাজ ক্ষত্রী লাহুরী—১৯শ শতক

ইনি 'লুগা'ত্‌-ই-পঞ্জাবী' নামক পঞ্জাবী ভাষার একখানি কোষগ্রন্থ সংকলন করেন। ইহাতে প্রতি শব্দের সহিত হিন্দী ও ফার্সী প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। পঞ্জাবী শব্দগুলি গুরমুখী হরফে এবং হিন্দী শব্দগুলি লাল কালিতে প্রচলিত নাগরী হরফে লিখিত। হিন্দুস্থানীতে একটী সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও ইহাতে দেওয়া হইয়াছে। সংকলনকাল ১৮১৫। গ্রন্থখানি লর্ড ময়রাকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। পৃ. ৭৫৬। বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।—Ivanow : *Cat. Pers. Mss.*—No. 1445.

কির্‌পারাম (= কৃপারাম)—১৮শ শতক

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় কলিকাতার পারসীক অনুবাদ অফিসে ইনি মুনশী ছিলেন। ইনি সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগী পণ্ডিত ছিলেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায়ও ইঁহার বিশেষরূপ পারদর্শিতা ছিল। ইনি পারস্য ভাষায় ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে সংস্কৃত পুরাণ ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশক্রমে ১১৯০ হিজরায়

*" Kenker ou Kankar Al Hendi, Kenker l'Indien, Nom d'um philosophe and d'un Astrologue des Indes, duquel on a un livre d'Astronomie Judicaire, sous le titre d'Elchtiarat. Il est aussi nomme Kenghch, ou Kanghah and Kankah."—Tom II. p. 363.

(১৭৭৬ খ্রীঃ) একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত।—Rieu : *B. M. Pers. Cat.*, p. 63*a*.

কিবলরাম (=কেবলরাম)—১৮শ শতক

'তজকিরতু'ল-উমরা' একখানি জীবনী-সংগ্রহ পুস্তক। ভারতীয় তৈমুরবংশীয়গণের অধীনে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও 'অমীর-ওমরা কর্ম করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহাদেরই জীবনবৃত্তান্ত আছে। এই গ্রন্থখানি রঘুনাথ দাসের পুত্র কিবলরাম ১১৯৪ হিঃ (=১৭৮০ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ করেন। এলিয়টের ইতিহাসে (৮ম খণ্ড, ১৯২ পৃ.) ও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে (২৩শ খণ্ড, পৃ. ২৩৯) কিবলরামের উল্লেখ আছে। কিবলরামের গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে ('বাব'-এ) বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মুসলমান ও দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আবার প্রত্যেক খণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত—প্রথম ভাগে উপাধিভূষিত ব্যক্তির জীবনী এবং দ্বিতীয় ভাগে যাঁহারা কোন উপাধি পান নাই তাঁহাদের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে। বডলিয়ান গ্রন্থাগার (২৫৮), ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার (৬২৯) ও ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে (৩৩৯) ইহার পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে।

কিশরারী (=কিশোরী)

পারস্যভাষাভিজ্ঞ এক জন প্রাচীন হিন্দু কবি। ইহার সময় জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইনি যে সম্রাট্ অকবরের পূর্বে বর্তমান ছিলেন তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিশরারীর কোন কাব্যগ্রন্থ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু 'মজমূ'আ-ই-অশার' নামক প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ-গ্রন্থে ইহার কবিতা স্থান পাইয়াছে। এই গ্রন্থে ১০০০ হিঃ (=১৫৯২ খ্রীঃ) পর্যন্ত প্রসিদ্ধ কবির কবিতা স্থান পাইয়াছে। অথচ অকবরের সময়ের একটী কবিরও কবিতা ইহাতে নাই। সুতরাং এই কবিকে অকবরের পূর্ববর্তী মনে করা অসঙ্গত নয়।

কিষণ দাস বাসদেও

ইনি লাহোরের অধিবাসী ছিলেন। সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে ইনি বত্রিশ সিংহাসনের ফার্সী অনুবাদ করেন। ইহা নূতন অনুবাদ নহে। পূর্বতন অনুবাদগুলির সংশোধিত অনুবাদ। কিষণ দাস তাঁহার পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন—কৃষ্ণবিলাস।

B. M. Pers. Cat., p. 7636; Pertsch : *Berlin Cat.* No. 1088; *Ind. Off. Cat.* No. 1989.

কিষণ সিং—১৭শ-১৮শ শতক

ইনি সিয়ালকোট-নিবাসী রায় প্রাণনাথের পুত্র। জাতিতে ক্ষেত্রী। কিষণ সিং সংস্কৃত ও ফার্সীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 'ইন্‌শা' নামক অলঙ্কারবহুল গদ্য ও পদ্য রচনায়

কৃতিত্ব দেখাইয়া কাব্য প্রণয়ন করিয়া 'নিশৎ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১১৫৭ হিঃ= ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নিম্নলিখিত চারিখানি গ্রন্থ ইঁহার রচিত—

১। পঞ্চক্রোশী—সংস্কৃত 'পঞ্চক্রোশী' গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ। ইহাতে পঞ্চকোশী বারাণসীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বনাথের পূজায় প্রায়শ্চিত্তের শক্তি কত দূর তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ইণ্ডিয়া অফিস ও বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগারে ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।

Rieu : *B. M. Pers. Cat.*, p. 795-6;
Ethe : *India Office Cat.*, No. 1758;
Aufrecht : *Bod. Cat.*, p. 28.

২। শিবপুরাণ—শিবপুরাণের ফার্সী অনুবাদ। উইলসন (*Vishnupuran*, 1st ed. 140, p. lvi) ও বার্থ (*Religion of India*, p. 262) এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। [Pertsch : *Berlin Cat.*, p. 1028 ; *Ind. Off. Cat.* No 1958 ; Weber : *Berlin Cat.*, p. 347.]

৩। 'আইন অল্ জুহুর—এখানি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ফার্সী অনুবাদ। ইহাতে বারাণসীর আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ১৭৯৪ সংবতে (১৭৩৭ খ্রীঃ) রচিত। বার্থ (*Religion of India*, pp. 187, 236 & 262) ও উইলসন (*Select Works*, Vol. III) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের লাটিন অনুবাদও হইয়াছিল। Stenzler বার্লিন হইতে তাহা সম্পাদন করেন (১৮২৯ খ্রীঃ)।

৪। গরীব অল্ ইন্‌শা—ফার্সী ভাষায় আলঙ্কারিক গদ্যে রচিত পুস্তক। ইহা দেওয়ান রূপনারায়ণ সাহিবের 'শশ-জিহৎ'-গ্রন্থের অনুকরণে রচিত। পুস্তকখানির রচনা ১১৫৭ হিঃ (= ১৭৪৪ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ হইয়াছিল। এই পুস্তকখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।—Rieu : *B. M. Pers. Cat.*, p. 7956.

গঙ্গাবিষণ (=গঙ্গাবিষ্ণু)

ইনি এক জন কোষকার। প্রচলিত ফার্সী ও আরবী শব্দের একখানি কোষগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থের নাম—'ফরহঙ্গ-ই-শির-উ শকর'। গ্রন্থে সংকলনের সময় উল্লিখিত নাই। ত্রয়োদশ শতক হিজরার প্রারম্ভের ইহার একখানি নকল বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীতে সংরক্ষিত আছে।—Ivanow, 1440.

গিরিধর দাস

হিন্দু কায়স্থ পণ্ডিত। সম্রাট্ শাহ্‌জহানের সমসাময়িক। সম্রাটের প্রতি ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১০৫০ হিঃ

ইহার মৃত্যু হয়। রচিত গ্রন্থ—'তর্জুমা-ই-রামায়ণ'। এখানি পারস্য ভাষায় সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ। ১০৩৩ হিঃ ইহা লিখিত হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ম গ্রন্থাগার (56*a*) ও ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারে (নং ১৯৬৫) ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

চতুর্ভুজ

ইনি মিহ্‌সিচাঁদ নামক কায়স্থের পুত্র। সোপতের অধিবাসী। সংস্কৃত ও ফার্সী সাহিত্যের ইনি একজন রসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ধর্মানুরাগী পণ্ডিত বলিয়া হিন্দুদিগের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। সম্রাট্ অকবর মহাভারত ফার্সীতে অনুবাদ করাইবার জন্য ইহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদকার্য-সম্পাদনে ইহার অদম্য উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া সম্রাট্ অকবর ও পণ্ডিতমণ্ডলী ইহার যথোচিত গুণগ্রাহী হইয়া পড়েন।* ইনি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'সিংহাসন দ্বাত্রিংশতিকা' বা বত্রিশ সিংহাসনের ফার্সী অনুবাদ করেন। অনুবাদের নাম—'সিংহাসন-বত্তীসী'। বড্‌লিয়ান গ্রন্থাগারে ইহার পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।—*Bod. Cat.*, No. 1324.

চন্দরভান ব্রাহ্মণ

১০৬৮ হইতে ১০৭৩ হিজরার (১৬৫৭-১৬৬৩ খ্রীঃ) মধ্যে ইঁহার মৃত্যু হয়। পঞ্জাবের অন্তর্গত পাতিয়ালানিবাসী এই ব্রাহ্মণ শাহ্‌জহান ও তৎপুত্র দারা-শেকোর সেক্রেটারী ছিলেন। 'মজ্‌মুয়া' ও 'মজ্‌মুয়া-অশর' নামক দুইখানি বিখ্যাত কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থে ইহার রচিত একাধিক কবিতা স্থান পাইয়াছে।—মজ্‌মুয়া (৪); মজ্‌মুয়া-অশর (৩৩, ৯৮, ১০০, ১০৮ সংখ্যক কবিতা)। ইহার রচিত গ্রন্থ—

১ মুনশা' আত্-ই-ব্রাহ্মণ—শাহ্‌জহান ও অন্যান্য আমীর-ওমরাহ্‌র নামে লিখিত পত্রাবলী। সমুজ্জল বাক্‌ছন্দে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ।—H.Ethe : Neuperschische lit, 341 ; *Ind. Off. Cat.* Nos. 2094, 2940 ; *Bod. Cat.* 1385-1386, Pr 1017, R 397-398 etc. ; Ivanow, 368.

২ দিবান-ই-ব্রাহ্মণ—নানাবিষয়ক কবিতা-পুস্তক। বর্ণানুক্রমিক গজলে লিখিত। H. Ethe : Neupers. lit, 341-342 ; *Ind. Off. Cat.* 1574-1575 ; *Bod. Cat.* 1123, R 838, 1087 etc. ; Sprenger : Cat. 376.

চন্দরমন

হিন্দু কায়স্থ পণ্ডিত। পিতা—শ্রীরাম। সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইনি দীল্লি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১১০৭

---

* *Journal Asiatique* (1845), Vol. II, p. 278; Garcin de Tassy, *Histoire de la litterature hindouie*, Tom II, pp. 90, 178, 233.

হিজরায় (১৬৯৫ খ্রীঃ) ইঁহার মৃত্যু হয়। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে (১০৯৭ হিঃ) 'আলমগীরের রাজত্বকালে ইনি 'তর্জুমা-ই-রামায়ণ' রচনা করেন। ইহা গদ্যে সংস্কৃত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। গ্রন্থের শেষে চন্দরমন বাল্মীকি-রামায়ণের রচনা সম্বন্ধে একটী পরিশিষ্ট ও মহাভারত হইতে শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী প্রদান করিয়াছেন।

H. Ethe : *Ind. Off. Cat.* No. 1964.
Rieu : *B. M. Cat., p. 56a*
Mackenzie Collection, II, p. 144.

চাঁদ

ইঁহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইনি মথুরামের পুত্র। সিংহাসন বত্তীসীর ইনি ফার্সী অনুবাদ করেন।—*Munich Cat.* p. 29.

ছিতরমল

ইনি রায় প্রাণচাঁদ মুন্শীর পুত্র। ইনি রাজস্ব-বিধি (principles of taxation) সম্বন্ধে ফার্সীতে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এখানি পুরাতন গ্রন্থ নয়। গ্রন্থখানি চারিটী দপ্তরে বিভক্ত। Rieuর পারস্য গ্রন্থের তালিকায় (No. 990) নকলের তারিখ ১২৩৫ হিঃ।—Ivanow, 1637.

জরদর

ইনি ভারতীয় দার্শনিকগণের অন্যতম ছিলেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়াও ইঁহার খ্যাতি ছিল। অতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি। ভেষজ সম্বন্ধে ইঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। দর্শন সম্বন্ধেও ইনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। জন্মপত্রিকা সম্বন্ধে ইনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেখানি আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর জর্নালে (VI, 119) ভারতবাসী জরদর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে।—Wuestenfeld, p. 5 ; Dietz, p. 120 ; Gildmeister, p. 97, 109.

জশবন্ত রায়

ইনি একজন বিখ্যাত কবি। 'মুন্শী' এই ছদ্মনামে কবিতা লিখিতেন। ইঁহার রচিত দিবান-ই-মুন্শী' নামক কবিতাপুস্তকে গজল, রুবাই প্রভৃতি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীতে ইঁহার স্বাক্ষরিত পুথি রক্ষিত আছে। নকলের সময় ১১২৪ হিঃ = ১৭১২ খ্রীঃ)।—Ivanow, 830 ; Sprenger, 507-508 ; *Ind. Off. Cat.* 1695.

জুরাবর সিং

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ইনি জীবিত ছিলেন। ইহার যে ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য অধিকার ছিল তাহা ইহার রচিত "পুরাণার্থ-প্রকাশ" হইতে অবগত হওয়া যায়। হেস্টিংসের আদেশে ইনি ঐ পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎকালীন পণ্ডিতপ্রবর রাধাকান্ত তর্কবাগীশ "পুরাণার্থপ্রকাশ" নামে মূল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী কালনিরূপক তালিকা (chronology), সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দু নৃপতিবৃন্দের তালিকা আছে। জুরাবর সিং এই গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়া নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই অনুবাদ ১১৯০ হিঃ (=১৭৭৬ খ্রীঃ) সম্পূর্ণ হয়। বঙ্গাক্ষরে মূল সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় অনূদিত মূলের নাথানিয়েল ব্রাসী হালহেড্-কৃত ইংরেজী অনুবাদ ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।—*B. M. Pers. Cat.* p. 636 ; *Ind. Off. Cat.* No. 2003, Brown : *Cambridge Cat.* p. 94.

দিতরাম (=আদিত্যরাম)

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাজহানাবাদের অন্তর্গত বিজনূরের অধিবাসী। কিছু কাল ইনি লখনৌ শহরে বাস করেন। ঐ সময় ইনি মেজর জেনারেল ক্লড মার্টিনের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অত্যধিক ধর্মানুরাগের জন্য দেশবাসীর ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত দুইখানি পুস্তক রচনা করেন—

১। ষড়্‌কর্মকাণ্ড—এখানি নেমি চন্দ্রাচার্য কর্তৃক জৈনপ্রাকৃতে রচিত ৮১টী গাথা-সম্বলিত কর্মকাণ্ডের ফার্সী টীকা। দোহার আকারে এই টীকাখানি ক্লড মার্টিনের জন্য লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থসমাপ্তিকাল ১২১১ হিঃ (=১৭৬৯ খ্রীঃ)।

২। ষড়্ পঞ্চাশ গৈ। এখানি গোবিন্দাচার্য-কৃত ৩৪৬ দোহা-সম্বলিত জৈনপ্রাকৃত গ্রন্থের ফার্সী টীকা। এখানিও ক্লড মার্টিনের জন্য লিখিত। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ইহা সম্পূর্ণ হয়।—Rieu : *Pers. Cat.* p. 67 ; Aufrecht : *Cat.* No. 262.

দূনীচাঁদ বালী

ঐতিহাসিক। ইনি 'কয়গৌহর নামা' নামক গ'কৃখর জাতির ইতিহাস রচনা করেন। ১১৩৭ হিঃ (=১৭২৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত গ'কৃখর জাতির মধ্যে যে সমস্ত সাধু জন্মিয়াছিলেন এই গ্রন্থে তাঁহাদেরও বিবরণ আছে।—Rieu, 1012-1003 ; *J. A. S. B.*, xl, 67-101.

দেবীদাস

ইনি হিন্দু কায়স্থ। ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণের ইনি ফার্সী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদে দেবীদাস লব ও কুশের এবং মেঘনাদ-পত্নী সুলোচনার কাহিনী সংযোগ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

নয়নারায়ণ (=নরনারায়ণ ?)

সম্রাট্ ফরোকসিয়রের সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। নয়নারায়ণ পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। ইনি রাজা মুকিম সিং-এর মুন্শী ছিলেন। রাজা সাহেব ইঁহার গুণবত্তায় এত দূর মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে ইঁহাকে তিনি আপনার অতি বিশ্বস্ত কর্মচারী ভাবিতেন। রাজা সাহেব যখন মাড়োয়াড় যাত্রা করেন, তখন তিনি ইঁহাকে সঙ্গী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইনি ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত বহু শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। সমসাময়িক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ও বড়লোকেরা ইঁহাকে অত্যধিক সম্মান করিতেন। অন্যূন ১১৪০ হিজরায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

নয়নারায়ণ-রচিত গ্রন্থের নাম—'গুলশান-ই-রাজ'। ১১৩৪ হিজরায় ইহা সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও হরিবংশ হইতে পুরাণোক্ত কাহিনী ও বীরগাথা সংগ্রহ করিয়া লেখক ফার্সী ভাষায় সেগুলি অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের নাম 'গুলশান-ই-রাজ'। এই গ্রন্থের তিনটী অধ্যায়—(১) বিশ্ব-সৃষ্টি ও বিশ্বের কালনিরূপণ; (২) হরিবংশের ঘটনাবলী; (৩) মহাভারতের ঘটনাবলী।

নবলকিশোর

সরকারী দলিল দস্তবেজ, সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, ওজস্বিতাপূর্ণ সালঙ্কার পদ্যের নমুনা, সাধুসন্ন্যাসীদের প্রশংসাসূচক কসীদা—এই সমস্ত উপকরণ-সমবায়ে তিনি একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। নাম—"তিলিস্‌মাতুল-খিয়াল্"। গ্রন্থখানি সাতটী ভাগে (তিলিস্‌ম) বিভক্ত। ইঁহার এই গ্রন্থ হইতে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক গবেষণার উপকরণ পাওয়া যায়।—**Ivanow, 403.** ইনি স্বনামধন্য পুরুষ। আলিগড়ের অন্তর্গত বস্তই গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম যমুনাদাস। ইনি প্রথমে মুন্শী হরসুখ রায়ের নিকট লাহোরের 'কোহিনূর' সংবাদপত্র-কার্যালয়ে কর্ম করিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া লখ্‌নৌ শহরে আসিয়া ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে নিজে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা হইতে নানা ভাষার বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পর বৎসর 'অবধ আখবার' নামে দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

নিহালচাঁদ লাহূরী

উর্দু অনুবাদক। ১২১৭ হিজরায় ইনি ফার্সী জনপ্রিয় কাহিনী 'গুল্-ই-বকাবলী'-র উর্দু ভাষায় প্রাঞ্জল ও সরল অনুবাদ করেন।—Ind. Off. Cat. 828 ; Ivanow, 1741.

পরতাব (=প্রতাপ)

ইনি ফার্সী ভাষার এক জন প্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তবে ইঁহার কবিতা পশ্চিমাঞ্চলে এক সময় লোকে অভ্যাস করিত। 'মজমুয়া-অশারে' ইঁহার একটী কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।—Ivanow, 934.

বনওয়ালি দাস (=বনমালী দাস)

ইনি ধার্মিক হিন্দু ছিলেন। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষজ্ঞ। সাধারণতঃ ইনি 'বালী' এই ছদ্মনামে ফার্সী কবিতা লিখিতেন। ইঁহার যশ সুশিক্ষিত শাহ্‌জাদা দারাশেকোকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বনওয়ালি দাস দারাশেকোর সভাসদ ছিলেন। তিনি কেবল সাহিত্যিক বলিয়া যশ অর্জন করিয়াছিলেন তাহা নয়, পরন্তু তিনি শাহ্‌জাদার বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। ইঁহাকে সর্বব্যাপারে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধুগণের অন্যতম মনে করিতেন। চিঠিপত্র-বিভাগের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। ১০১৫ হিজরায় ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

বসাবন লাল

জীবনী-লেখক। অমীর-উদ্দৌলা মুহম্মদ অমীর খাঁ একজন অফগান সর্দার। ১৮৩২ খ্রীঃ পরে ইঁহার মৃত্যু হয়। বসাবনলাল নামে একজন হিন্দু ১২৪০ হিঃ (=১৮২৪ খ্রীঃ) এই সর্দারের জীবনী সঙ্কলন করেন। বসাবন লাল বল্‌গ্রাম-নিবাসী ছিলেন। 'শাদান' এই উপনামে তিনি এই জীবনী-গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইঁহার সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক অবস্থারও পরিচয় এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। H.T. Prinsep-লিখিত অমীর খাঁর বিবরণ তুলনীয়।—Ivanow, 217 ; Rieu, 1119.

বিয়াড়ী (=ব্যাড়ী)

কবি। ইঁহার একটী মাত্র ফার্সী কবিতা 'মজমুয়া-অশার'-এ ৯৫ সংখ্যক কবিতাতে উল্লিখিত আছে। ইঁহার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বিষণ নারায়ণ (=বিষ্ণুনারায়ণ)

Lieut. T. Postans ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন হইতে সিন্ধুপ্রদেশের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আলোচনা-মূলক একখানি গ্রন্থ ইংরেজিতে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের নাম—*Personal Observations On Sind.* বিষণ লাল ইহা ফার্সীতে তর্জমা করেন এবং ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিপ্পনী সমেত ঘটনাবলী স্বীয় অনুবাদের সহিত যোগ করিয়া দেন।

বিস্‌বরৈ (=বিশ্বরায়)

ইনি হরিগরব দাস নামক এক কায়স্থের পুত্র। সম্রাট্ জহাঙ্গীরের সময় ইনি সিংহাসন বত্তীসীর ফার্সী অনুবাদ করেন। চতুর্ভুজ ও ভারীমলের অনুবাদের এখানি একটী অপূর্ব সম্মিলন। অনুবাদকের কৃতিত্ব বা নিজস্ব ইহাতে নাই বলিলেই চলে।—*B. M. Pers. Cat.* p. 763*a* ; *India Off. Cat.* No. 1229, 2373 ; *Bod. Cat.* No. 1325.

ভারীমল—খ্রীঃ সপ্তদশ শতক

ইনি রাজমল ক্ষত্রীর পুত্র। সম্রাট্ জহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১০১৯ হি॰ (=১৬১০ খ্রী॰) ইনি সিংহাসন বত্তীসী ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন।—*India Office Cat.* No. 1250 ; Pertsch—*Berlin Cat.* No. 1087 ; *B. M. Pers. Cat.* p. 763*a*.

ভিচক্‌রাম

আধুনিক কালের টীকাকার। অযোধ্যার অধিবাসী। গুলিস্তানের অনেকগুলি টীকা আছে। তন্মধ্যে ভিচক্‌রামও একটী টীকা প্রণয়ন করেন। ইহার টীকার নাম—'শরহ্-ই-গুল্‌শানী'। এই গ্রন্থের রচনাকাল ১২১৫ হি॰ (=১৮০০ খ্রী॰)।

ভীমসেন

ভীমসেন এক জন কবি ছিলেন। তিনি ১১৪৭ হিঃ (১৭৩৫ খ্রীঃ) 'মুহ্‌বিব' এই উপনামে কবিতায় শাহ্‌নামার বিষয়-সূচী রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম 'ফিহ্‌রিস্ত্-ই-শাহ্‌নামা'। ইহা দুই খণ্ডে (মকাল) বিভক্ত। খণ্ডগুলি আবার কয়েকটী ফস্‌লে বিভক্ত।—Ivanow, 424.

ভূপত্ রায়

ফার্সী পত্রলিখন-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-প্রণেতা। ইহার গ্রন্থের নাম—'দস্তুর-ই শিগর্ফ'।

ভূপত্ রায় কোন্ সময়ের লোক তাহা স্থির করা যায় না। তবে তিনি যে ১০২৫ হিজরার (=১৬১৬ খ্রীঃ) পরবর্তী লেখক তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থেই বিদ্যমান। তিনি জুহুরীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। জুহুরীর মৃত্যু-বৎসর ১০২৫ হি॰।—*Ind. Off. Cat.* 2138-2139 Rieu, 1043.

মন্‌সারাম মুন্‌শী

দামোদর নামক একজন হিন্দী সাহিত্যিক হীর ও রাঞ্জন বা রাঞ্ঝার প্রণয়-কাহিনী রচনা করেন। এই গ্রন্থ ফার্সী কবিতায় অনূদিত হয়। প্রথমে ১১৫৪ হিঃ (=১৭৪১ খ্রীঃ) তর্জমা করেন আফরীন নামক একজন মুসলমান। পরে ১১৫৭ হিঃ (=১৭৪৪ খ্রীঃ) অনুবাদ করেন একজন হিন্দু—নাম মন্‌সারাম মুন্‌শী। তার পর ১১৯৫ হিঃ (=১৭৮১ খ্রীঃ) অনুবাদ করেন মিন্নত্ নামে এক মুসলমান।—Rieu, 770 ; Ivanow, 918.

মহ্‌তাব সিং

ঐতিহাসিক পণ্ডিত। ইনি হজরা-রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ইহাতে অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৮১৯ হইতে ১৮৪৯ পর্যন্ত ৩০ বৎসরের ঘটনা বিশেষ করিয়া ইহাতে লিখিত হইয়াছে। মহ্‌তাব সিং হজরা জেলার সরকারী কর্মচারী ছিলেন।

মেদ্‌নীমল

কল্যাণমল শাক্ত-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এক জন কায়স্থ ছিলেন। ইঁহার পুত্র ছিলেন ধরমদাস নারায়ণ। ধরমদাসের পুত্র মেদ্‌নীমল। মেদ্‌নীমল আওরঙজেবের রাজ্যের তৃতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১০৭৪ হিঃ (১৬৬৪ খ্রীঃ) সংস্কৃত 'লীলাবতী' অবলম্বন করিয়া 'বদাই'উ'ল-ফুনূন' নামে গণিতশাস্ত্রের একখানি উপাদেয় গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।—India Office Cat. 2259 ; Ivanow, 1497.

রাজা দুর্গাপ্রসাদ

ইনি আগ্রায় অবস্থানকালে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে বত্রিশ সিংহাসনের একটী উর্দু তর্জমা করেন।

রামপরসাদ (=রামপ্রসাদ)

ঐতিহাসিক ও ফার্সী অনুবাদক। ইনি প্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী সহৃদয় পণ্ডিত ছিলেন। ফৈজাবাদের নবাব মুহম্মদ দরাব আলি খাঁর মুন্‌শী পদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব শুজাউদ্দৌলার প্রধানা মহিষী বেগম সাহেবা রামপরসাদকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যু ১২৩০ হিজরায় হয়। ইহার রচিত গ্রন্থ—

১। মখজন অল্-ইর্ফান্—ইহা হিন্দী কাব্য 'অমৃত চরিত্রে'র ফার্সী ভাষায় লিখিত ভাষ্য। এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় অজ্ঞেয়বাদ (agnostioism)। গ্রন্থখানি গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত।

২। খুলাসা মুনতখব অত্তারিখ—এখানি ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহাতে প্রধানতঃ তৈমুর-বংশীয় সম্রাট্‌দিগের রাজত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। সম্রাট্ দ্বিতীয় অকবর শাহ্‌র রাজত্বকাল পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে।

রায় বিন্দ্রাবন

'তারিখ-ই-ফিরিস্তা' (নামান্তর—গুলশন-ই-ইব্রাহিমি, তারিখ-ই-নৌরসনামা-ই-ফিরিস্তা) মুসলমান আক্রমণের সময় হইতে ১৬০৭ খ্রীঃ (=১০১৫ হিঃ) পর্যন্ত ভারতের একখানি প্রসিদ্ধ সাধারণ ইতিহাস। রায় ভারামলের পুত্র রায় বিন্দ্রাবন (=বৃন্দাবন) পারস্য ভাষায় এই ইতিহাসখানির একটী সারসঙ্কলন করেন। ইহাতে তিনি একটী পরিশিষ্ট রচনা করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করেন। তাঁহার লিখিত পরিশিষ্টের আলোচ্য বিষয় ছিল হিজরার ১১শ শতক হইতে ১২শ শতক (১১০১ হিঃ =১৬৯০ খ্রীঃ) পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা। এই গ্রন্থখানির নাম—'লুব'ত'-তারিখ'। ইহা ১১০৬ হিঃ (=১৬৯৪-৯৫ খ্রীঃ) সঙ্কলিত। গ্রন্থখানি ১০টী পরিচ্ছেদে বা ফস্‌লে বিভক্ত। বডলিয়ান গ্রন্থাগার (২৪৫, R ২২৮ ইত্যাদি), ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার (৩৫৮-৩৬১) ও বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীতে (১৬১, Ivanow-সঙ্কলিত পারস্য গ্রন্থতালিকা, ৪৯ পৃ.) বিন্দ্রাবন-কৃত এই গ্রন্থের প্রতিলিপি সংরক্ষিত আছে। হিঃ ১২শ শতকের নকল। এলিয়টের ভারতেতিহাসে (৭ম খণ্ড, ১৬৮) এই গ্রন্থের আলোচনা আছে।

রূপনারায়ণ

সিয়ালকোট-নিবাসী হরিরাম ক্ষত্রীর পুত্র। ইনি এক দিকে যেমন সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, অপর দিকে তেমনই নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। দেবদেবীর প্রতি তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। ইনি ৫ বৎসর ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন। ১১৫০ হিজরায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—'মখজন-অল্ ইর্ফান'। ইহা পারস্য ভাষায় লিখিত। ইহাতে ব্রজধামের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে; এ ছাড়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাস্থানের বিবরণও ইহাতে আছে। লাহোর শহরে ১১২৯ হিজরায় ইহা লিখিত হয়। এই গ্রন্থের নামান্তর—'ব্রজমাহাত্ম্য'।—Rieu, 626.

লছমীনারায়ণ

ইনি ঔরঙ্গাবাদের অধিবাসী ছিলেন। 'শফীক' এই ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি এক জন ঐতিহাসিক পণ্ডিত ছিলেন। লছমীনারায়ণ ১২০৪ হিঃ (১৭৯৪ খ্রীঃ) 'হকীকত্‌হা-ই হিন্দুস্তান' নামক ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্বের অনুপাত ও বিবরণ-সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন।—Bankipore (Patna) Library Cat., 543. কাপ্তেন উইলিয়ম পাট্রিক এই গ্রন্থখানিকে সাজাইয়া চারি অধ্যায়ে (মকল) বিভক্ত করেন।—Ivanow, 179.

লছমীনারায়ণ আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহার নাম—'ম'আসির-ই-আসফী'। এই গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের আসফীগণের বা নিজামগণের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম আসফ্‌জা (জন্ম ১০৮২, মৃত্যু ১১৬১ হিঃ ১৬৭১-১৭৪৮ খ্রীঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া নিজাম আলি খাঁ বহাদুর দ্বিতীয় আসফজার রাজ্যারম্ভ (১১৭৫ হিঃ = ১৭৬১ খ্রীঃ) পর্যন্ত ঘটনাদি এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।—Ind. Office Cat. 468 ; Ivanow, 196.

লালা টীক্কারাম

প্রসিদ্ধ কবি। ইনি 'বহ্‌জৎ' এই উপনামে কবিতা লিখিতেন। ইনি নিজে যেমন এক জন আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন, ইঁহার ফার্সী কবিতাগুলিও প্রধানতঃ দেওয়ালী, গঙ্গা প্রভৃতি হিন্দুর ব্যাপার লইয়াই রচিত হইত। ইঁহার কাব্যগ্রন্থের নাম—'দীবান-ই-বহ্‌জৎ'।—Sprenger, 369-370 ; Ivanow, 884.

লালা সিং

সম্রাট্ শাহ্‌জহানের অনুরোধক্রমে সুন্দরী দাস সর্বপ্রথম ব্রজভাষায় বত্রিশ সিংহাসনের একটী অনুবাদ করেন। লালা সিং নামক এক ব্যক্তি ১৮০১ খ্রীঃ উর্দু ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ ইহা মুদ্রিত হয়। কলিকাতা (১৮৩৯), আগ্রা (১৮৪৩), ইন্দোর (১৮৪৯) ও লণ্ডনে (১৮৬৯) এই গ্রন্থের কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

শনক্

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন, শনক্ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ চিকৎসকগণের অন্যতম ছিলেন। ইনি চিকিৎসার অনেক প্রকার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ব্যাবহারিক চিকিৎসায় ইনি বহুবিধ নূতন পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের বহু বিভাগে ও দর্শনে ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ফলিতজ্যোতিষ সম্বন্ধে ইঁহার জ্ঞান ছিল অসাধারণ এবং বাগ্মিতায় ইঁহার সময়ে ইঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। ভারতীয় রাজন্যবৃন্দ ইঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কিন্তু শনক্ নামে এরূপ কোন চিকিৎসকের নাম প্রাচীন ভারতে পাওয়া যায় না। কয়েক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইঁহাকে চাণক্য বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু চাণক্য শনকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট কখনই ছিলেন না। মুসলমান গ্রন্থকারদের হস্তে পরিবর্তিত হইতে হইতে কোন ভারতীয় চিকিৎসকের 'শনক'ত্ব লাভ হইয়াছে। এই শনক কে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। অন্ততঃ আমি পারি নাই। সে যাহা হউক, শনক্—তিনি যিনিই হউন, তিনি ভারতবাসী। তাঁহার রচিত গ্রন্থ—

১ কিতাব অস্‌সুমূম ফি খমস্ মকালত্—এখানি বিষ সম্বন্ধে পঞ্চাধ্যায়ে সম্পূর্ণ পুস্তক।
২ কিতাব অল্-বৈতরহ্—পশুচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় ব্যাবহারিক পুস্তক।
৩ কিতাব-ফি ইব্‌ন্ অল মুজান—জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তক।

৪। কিতাব মুনতহল্ অল্-জব্বহর—ইহা জনৈক রাজার রাজত্বের ইতিহাস—রাজার নাম ইবন্ কামনাস্ অল্ হিন্দী। ইবন্ কামনাস কোন ভারতীয় হিন্দু রাজাই হইতে পারেন না। হইলেও সাত নকলে ভেস্তা হইয়া গিয়াছে।

সদাসুক্ (= সদাসুখ)

গুলাব রায় নামক এক কায়স্থ এলাহাবাদে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র বিষণপ্রসাদ। ইহার পুত্র সদাসুক। ইনি 'মুরসসা খুরশেদ' নামক পদ্য ও গদ্য লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ ১২১৭ হিঃ (১৮০২ খ্রীঃ) রচনা করেন। উর্দুতে একখানি কথাকাহিনীও লিখিয়াছিলেন।

সদাসুখ

সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত হিন্দু। সদাসুখ দীল্লির অধিবাসী ছিলেন। ইনি নিয়াজ নামে কবিতা রচনা করিতেন। এই কবিতা-রচনায় ইনি প্রভূত যশোলাভ করিয়াছিলেন। সদাসুখ নজফ খাঁর অধীনে আগ্রায় সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হন। ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি এলাহাবাদে আসিয়া ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮১৯ খ্রীঃ (হিঃ ১২৩৪) ইহার মৃত্যু হয়।—Rieu, 914*a*; Elliot: *History of India*, Vol. VIII, 403.

সন্জহল্

অল্‌বিরুনী (Vol. I, p. 158) ইহাকে সঙ্কহিল বলিয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম কি জানিবার উপায় নাই। ইনি ভারতের এক জন শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ভেষজবিদ্যা ও ফলিতজ্যোতিষে ইহার অসামান্য জ্ঞান ছিল। জন্মপত্রিকা সম্বন্ধে ইনি একখানি গ্রন্থ লেখেন, গ্রন্থের নাম—'কিতাব অল্ মবালিদ অল কবীর'। ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। হজিখ বলেন এ গ্রন্থখানি কন্কহ্র রচিত—সন্জহলের নয়। কিন্তু অন্য কেহ একথা বলেন নাই। ইহা সন্জহলেরই রচিত।

সুজান রায়

ইনি পাতিয়ালা-নিবাসী ছিলেন। প্রাচীনতম কাল হইতে আওরঙজিবের রাজ্যারোহণ-কাল (১০৬৮ হিঃ = ১৬৫৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত 'খুলাসতুত্-তারিখ' নামে ভারতের একখানি সাধারণ ইতিহাস ইনি ১১০৭ হিঃ (= ১৬৯৫ খ্রীঃ) প্রণয়ন করেন। পরে তিনি ইহাতে আওরঙজিবের রাজ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, স্থিতিকাল ও প্রধান প্রধান ঘটনা সংযোজিত করেন।

তিনি যে সমস্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করেন তাঁহার গ্রন্থের ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় সেগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর তালিকায় (৩৬২-৩৬৪) ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বডলিয়ান গ্রন্থাগার (২৪৬), মিউনিক্ লাইব্রেরী (৮৪) ও রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারেও (৬৯-৭১) ইহা সংরক্ষিত আছে। তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলির নাম—

তবকাত-ই-অকবরী, অকবরনামা জহাঙ্গীরী, জহাঙ্গীরীনামা, তারিখ-ই-শাহ্‌জহান, তারিখ-ই-আলমগিরি, তারিখ-ই-কাশ্মিরী, তারিখ-ই-বহাদুরশাহী, গোলে আয়সা, তরজুমা সিংহাসন বত্তীসী ; (শেখ অল্লাখদাদ মুন্‌শী মুরতজা খানি-রচিত) অকবরনামা, রজমনামা, রামায়ণ, হরিবংশ, ভাগবত, যোগবাশিষ্ঠ, পদ্মাবত, রাজাবলি, তারিখ-ই-সুলতান মহমুদ গজনী, রাজতরঙ্গিণী, তারিখ-সুলতান সাহাবুদ্দীন ঘোরী, তৈমুরনামা, তারিখ-ই-বাবরী, তারিখ-ই-অকবরশাহী, অকবরনামা, তারিখ-ই অকবরনামা এবং তারিখ-ই-সুলতান অলাউদ্দীন খিলজী।

হরকরন

ইনি মথুরদাস কম্বু মুলতানীর পুত্র। ইনি ফার্সী লিপিমালার আদর্শ গ্রন্থরচয়িতা। বড় বড় অথচ শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগে কি করিয়া পত্রাদি লিখিতে হয়, হরকরনের 'ইন্‌শা-ই-হরকরনে' তাহার যথেষ্ট নমুনা দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি ১০৩৪ হিঃ (১৬২৫ খ্রীঃ) হইতে ১০৪০ হিঃ (১৬৩১ খ্রীঃ) মধ্যে সঙ্কলিত হয়। কয়েক বার ইহার লিথো সংস্করণ ছাপা হইয়াছিল। F. Balfour এই গ্রন্থখানি সম্পাদন করিয়া ইংরেজী অনুবাদ সহ ১৭৮১ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। ১৮৩১ খ্রীঃ ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়। ইণ্ডিয়া অফিস (২০৬৯-২০৭৬, ২৯৩২), কেম্ব্রিজ (১৮৮) ও বডলিয়ান (১৩৮৪) প্রভৃতি গ্রন্থতালিকায় এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

হরচরণ দাস

ইনি 'চহার গুলজার-ই-শুজাই' নামক গ্রন্থ ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। শাহ্‌জহানের পুত্রের বিবরণ ইহাতে আছে। ইহার পাণ্ডুলিপি পাটনায় (EI, 204) রক্ষিত। —J. N. Sarkar, *Fall of the Mughal Empire*, Bibliography.

বর্ত্তমান প্রবন্ধের ছাপা প্রায় শেষ হইবার সময় আরও কয়েক জন ভারতবাসী কবি, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক প্রভৃতির বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু ক্রম ভঙ্গ হইবে বলিয়া সেগুলি এক্ষেত্রে সংযোজিত হইল না, পরে আলোচিত হইবে।—লেখক।

গঙ্গারাম দত্তের রামায়ণ

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইল গ্রামের 'রায়'-উপাধিধারী সুবিখ্যাত জমিদার-বংশ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পরিচিত। ইঁহারা আদিশূর-আনীত পুরুষোত্তম দত্তের বংশধর। ইঁহাদের সুবিস্তীর্ণ জমিদারীর ভিত্তিস্থাপন করেন রূপরাম বাবু। ইঁহারই নামানুসারে বিখ্যাত "রূপগঞ্জ" নামক বন্দর ও বাজার। কবি গঙ্গারাম এই রূপরামের কনিষ্ঠ।*

গঙ্গারাম সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের হস্তলিখিত অনুলিপি (পুথি) তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তাঁহার স্বরচিত কয়েকখানি বাংলা গ্রন্থের মধ্যে একমাত্র রামায়ণের পুথিই বিনষ্টপ্রায় অবস্থায় এখনও বর্ত্তমান আছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বহু মূল্যবান্ পুথি এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নষ্ট হইতেছে। গঙ্গারামের রামায়ণ এই শ্রেণীর গ্রন্থের অন্যতম।

পুথিখানি তুলট কাগজে লেখা, ৩৩৫ সংখ্যক পত্র পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি। এইখানেই লঙ্কাকাণ্ডের সমাপ্তি। গ্রন্থকার আশ্বাস দিয়াছিলেন, "ইহার পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ।" কিন্তু উত্তরাকাণ্ডের একখানি পত্রও পাওয়া যায় নাই। পুথিখানির উপর উদ্দেশ্যহীন কৌতূহলী প্রতিবেশীদিগের লাঞ্ছনার চিহ্ন বর্ত্তমান। তাহারই ফলে গ্রন্থের শেষ ভাগ লুপ্ত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না।

পুথির পত্রগুলি প্রায় পনর ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওড়া। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৫।১৬ পংক্তি। ৩৩৫ পত্রের ও ৬৭০ পৃষ্ঠার এই পুথিখানিকে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ বলা অসঙ্গত হইবে না। প্রথম পত্রটি নিরুদ্দেশ হইয়াছে। উহাতে গ্রন্থকারের নিজের এবং তৎকালের কোন ঘটনার পরিচয় থাকা অসম্ভব নহে। দুইখানি নিমকাঠের পাটা পুথিখানিকে রক্ষা করিতেছে। পাটা দুইখানির উপর ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতিতে নর, বানর ও রাক্ষসাদির মূর্ত্তি আঁকিয়া রামায়ণের দু-একটি ঘটনা চিত্রিত করা হইয়াছে। কথিত আছে, গঙ্গারাম স্বহস্তে ঐগুলি আঁকিয়াছিলেন। দেড় শত বৎসর পরেও চিত্রগুলি মোটামুটি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রহিয়াছে।

* গঙ্গারামের সুযোগ্য বংশধর নড়াইলের উকিল শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত কবির পুস্তকভাণ্ডার দেখিবার সুযোগ দিয়া এবং এই প্রবন্ধ লিখিতে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভণিতার মধ্যে গঙ্গারামের নিজের ও নিজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সুন্দরাকাণ্ডের শেষে এইরূপ একটি বংশ-পরিচয় আছে ঃ—

বালী সমাজের দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম।
সেই বংশে নারায়ণ নারায়ণ সম ॥
মদনগোপাল নাম তাহার নন্দন।
সুতরাম গোবিন্দ কীর্ত্তির বিবর্দ্ধন ॥
রূপরাম দত্ত নাম তাহার তনয়।
তাহার অনুজে এই ভাষা করি কহে (কয়) ॥
নিবাস নড়াল গ্রাম নলদ্বিপ মাঝে।*
চাকলে ভূষণা নাম (মহিদেব ?) রাজে ॥ (পত্র—৪৪)

লঙ্কাকাণ্ডের উপসংহারে আর একটি আত্মপরিচয় আছে, উহাতে গঙ্গারামের নিজ-বংশের কয়েক ব্যক্তির নামের উল্লেখ আছে।

সমাপ্তশ্চেদং লঙ্কাকাণ্ডমিতি।
ইহার পশ্চাতে হবে উত্তরা প্রকাশ।
অগস্ত্যের মুখে রাম সুনে ইতিহাস ॥

গঙ্গারাম দত্ত কহে শুনহ ভারতী।
শ্রীনন্দকিশোরে মাতা কর শুদ্ধমতি ॥
কালীশঙ্করে মতি রামনিধি দত্তে।
ধনধান্যে পূর্ণ করি রাখিবা মহত্তে ॥
গদাধর শ্রীধর কিঙ্কর তব পায়।
প্রথমে করিবা দয়া মূর্খতার দায় ॥
পঞ্চ ভাই একমতি সুদ্ধে সুদ্ধাচার।
পদছায়া দিয়া রাখ তনয় তোমার ॥
কবিতার ভালোমন্দ কিছুই না জানি।
জে বোল বোলাও তুমি বাগ্‌ময়ি বাণী ॥
শশাঙ্ক বামনে ধরিবারে যেই আশ।
তেন রামায়ণ কহে গঙ্গারাম দাস ॥ (পত্র ৩৩৫)

গঙ্গারামের উল্লিখিত "পঞ্চ ভাই" এই কয় জন—কবির নিজের দুই পুত্র, গদাধর ও শ্রীধর ; এবং রূপরামের তিন পুত্র, নন্দকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি।

* নলদ্বীপ বর্ত্তমান "নল্‌দী" পরগণা। ৺সতীশচন্দ্র মিত্র-প্রণীত 'যশোহর খুলনার ইতিহাসে' গঙ্গারামকে ভ্রমক্রমে রূপরামের জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

এই কালীশঙ্কর সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, যাঁহাকে ওয়েষ্টল্যাণ্ড (Westland) সাহেব "লাঠিয়াল জমিদার" আখ্যা দিয়াছিলেন।

স্থানাভাববশতঃ রচনার নিদর্শনস্বরূপ গঙ্গারামের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করা সম্ভব হইবে না। তবে এইটুকু বলা দরকার যে, এই রামায়ণের বহু স্থানেই কবিত্ব-শক্তির উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত আবশ্যক মনে করি। গঙ্গারামের বাংলা রামায়ণের বৈশিষ্ট্য—উহার মূলানুবর্ত্তিতা। গঙ্গারাম সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। স্বরচিত রামায়ণের সর্ব্বত্রই তিনি যথাসাধ্য মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণ করিয়াছেন। দু-একটি দৃষ্টান্ত না দিলে ইহা ভাল বুঝা যাইবে না।

গঙ্গারাম	বাল্মীকি
(দণ্ডকারণ্যে রাবণের প্রতি সীতা)	
মহাবীর পতি মোর মহেন্দ্র সমান।	মহাগিরিমিবাকম্প্যং মহেন্দ্রসদৃশং পতিং।
মহোদধি সম গুণে মহাবলবান্॥	মহোদধিমিবাক্ষোভ্যং… (অরণ্য—৪৭)
আদিত্যের প্রভা যেন ছুইতে না পারি।	নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা।
কালকূট বিশ পিয়া সুখে হবে গতি।	কালকূটবিষং পীত্বা স্বস্তিমান্ গন্তুমর্হসি।
	… … …
সূর্য্য চন্দ্র আদি দেব চাহো পরশনে।	সূর্য্যাচন্দ্রমসো চোভৌ পাণিভ্যাং হর্ত্তুমিচ্ছসি। (অরণ্য—৪৭)
(জটায়ুর মৃত্যুকালে রামের সাক্ষাৎ	
প্রাণ ত্যজে পক্ষরাজ দেখেন সাক্ষাত।	ব্রূহি ব্রূহীতি রামস্য ব্রুবাণস্য কৃতাঞ্জলেঃ।
কহো২ বলি রাম জোড় করে হাত॥	ত্যক্ত্বা শরীরং গৃধ্রস্য প্রাণা জগ্মুর্বিহায়সম্॥ (অরণ্য—৬৮)
	… … …
শিতা হরণের দুঃখ পিতার মরণে।	সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথাগতম্।
তাহার অধিক দুঃখ ইহার কারণে॥	যথা বিনাশে গৃধ্রস্য মৎকৃতে চ পরন্তপ॥ (অরণ্য—৬৮)
	… … …
মূঢ়মতি হৈয়া তুমি পণ্ডিতমানিনী। ইত্যাদি।	অল্পপুণ্যে নিবৃত্তার্থে মূঢ়ে পণ্ডিতমানিনী। (লঙ্কা—৩১) ইত্যাদি।

গঙ্গারাম রামায়ণ ব্যতীত আরও তিনখানি বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সেগুলি এই :—১। উষাহরণ। ২। সুদামচরিত। ৩। সত্যনারায়ণের পুথি।

প্রথমোক্ত পুথিখানির কয়েকটি পত্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত আছে। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে নড়াইল হইতে 'আচার্য্য' নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার দ্বাদশটি সংখ্যা মাত্র বাহির হয়। উক্ত পত্রিকার ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত নামক জনৈক ভদ্রলোক গঙ্গারাম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উহাতে কেবল 'উষাহরণে'র আলোচনা ছিল এবং লেখক জানাইয়াছিলেন, ভবিষ্যতে গঙ্গারামের অন্যান্য কাব্যগুলিরও পরিচয় দিবেন, কিন্তু সে পরিচয় আর প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত যে সত্যনারায়ণের পুথিখানি গঙ্গারাম দত্ত-প্রণীত বলিয়া পরিচিত, গঙ্গারাম দত্তের 'রামায়ণ' ও 'উষাহরণে'র সহিত লিপি-সাদৃশ্যবশতঃ আমার মনে হয়, উহা আলোচ্য গঙ্গারাম দত্তেরই রচিত।

গঙ্গারাম কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহার সন তারিখ নির্ণয় করা দুরূহ। কুঞ্জবিহারী দত্ত স্বীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন।" 'সুদামচরিতে'র কয়েকখানি মাত্র পত্র আমি দেখিয়াছি। বাংলা ভাষায় রচিত অথচ সুন্দর দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত পৃষ্ঠাগুলির একটিতে "১১৭৭, ৮ শ্রাবণ, শনিবার" এইরূপ লেখা আছে। ১১৭৭ = ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ।* এবম্বিধ কয়েকটি প্রমাণ হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, গঙ্গারাম পলাশীর যুদ্ধের সময় বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার লিখিত ও সংগৃহীত অনেক কাগজপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু নামক এক ভদ্রলোক নড়াইলে আসিয়া গঙ্গারামের যে-সমস্ত পুথি ও কাগজের "টুক" (notes) দেখিয়াছিলেন, আমি তাহাও দেখি নাই। যোগেন্দ্র বাবু স্বহস্তে যে নোট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিবাস নলধা, খুলনা, এইরূপ আছে। কায়স্থ-সমাজের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার সঙ্কল্প করিয়া উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন। গঙ্গারামের পুথি ও অন্য কাগজপত্র দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, 'মহারাষ্ট্রপুরাণ'-রচয়িতা গঙ্গারাম এবং এই গঙ্গারাম দত্ত অভিন্ন ব্যক্তি। গঙ্গারাম কার্য্যব্যপদেশে মুরশিদাবাদে বহুদিন ছিলেন এবং রাঢ়দেশের নানা অঞ্চলেও গিয়াছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামা তাঁহার সমসাময়িক ঘটনাও বটে। অন্য কোন গঙ্গারাম-নামধারী লেখকের পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই। এমতাবস্থায় উক্ত অনুমান একান্ত ভিত্তিহীন না হইতেও পারে।

* গঙ্গারামের পুথিগুলির মধ্যে 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' এক খণ্ড এখনও আছে। উহাতে "১১৯২ সাল" এই উল্লেখ আছে।

গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন যৌগিক

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এচডি

গ্যালিয়ম ধাতুর আবিষ্কার-কাহিনী

গ্যালিয়ম ধাতু একাধিক কারণে রাসায়নিকের প্রিয়। ইহার আবিষ্কার-কাহিনী অজৈব-রসায়নশাস্ত্রের একটি স্মরণীয় অধ্যায়। রুশিয়ার বিশ্ববিশ্রুত রাসায়নিক মেণ্ডেলিয়েফ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মৌলিকপদার্থসমূহের পিরিয়ডিক শ্রেণী-বিভাগ (Periodic classification of elements) আবিষ্কারকালে দেখিতে পাইলেন যে ঐ তালিকায় এলুমিনিয়ম ধাতুর নিম্নশ্রেণীতে একটি স্থান শূন্য রহিয়াছে। সে স্থানটি পূর্ণ করিতে না পারিলে তাঁহার শ্রেণী-বিভাগ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করিলেন যে, বর্ত্তমানে অজ্ঞাত কোনও নূতন ধাতু ভবিষ্যতে ঐ শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে। তিনি সেই অনাবিষ্কৃত ধাতুর নাম রাখিলেন 'এক-এলুমিনিয়ম'। 'এক' শব্দটি তিনি লইলেন সংস্কৃত হইতে। ইহার পূর্ব্বে কোনও সংস্কৃত শব্দ রসায়নশাস্ত্রে স্থান লাভ করে নাই, গ্রীক ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষার অক্ষর বা শব্দই ঐরূপ স্থলে ব্যবহৃত হইত। রুশিয়ার এই সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিকের দ্বারা সংস্কৃত ভাষার এই অভিনব মর্য্যাদা দানের কথা স্মরণ করিয়া ভারতীয় এক জন রাসায়নিক আজ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। সংস্কৃত 'দ্বি' ও 'ত্রি' শব্দও তিনি এই শ্রেণী-বিভাগ সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং 'বৌদ্ধ-নির্ব্বাণে'র কথাও তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'রসায়নের মূলসূত্র' (Principles of Chemistry) গ্রন্থে দেখিতে পাই।

মেণ্ডেলিয়েফ শুধু এই একটি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি আরও দেখিলেন যে, 'বোরন' (Boron) এবং সিলিকন (Silicon) নামক আরও দুইটি মূল-পদার্থের নামের নীচে ঐরূপ দুইটি স্থান শূন্য রহিয়াছে। তিনি এ ক্ষেত্রেও দুইটি অনাবিষ্কৃত নূতন মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা করিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃত 'এক' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাহাদের নাম দিলেন—'এক-বোরন' ও 'এক-সিলিকন'। এই তিনটি মূল-পদার্থের অস্তিত্ব ঘোষণা ও নাম-নির্দ্দেশ করিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন না; উহাদের স্বরূপ, রাসায়নিক ও পদার্থমূলক গুণাবলী, যৌগিকগণের নাম ও তাহাদের ফরমুলা—এ সকলেরই সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেলেন। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীই উত্তরকালে সফল হইয়াছে। একে একে এই তিনটি মূলপদার্থই আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মেণ্ডেলিয়েফের শ্রেণী-বিভাগের শূন্য স্থানগুলি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিয়াছে। ফরাসী রাসায়নিক লেকক. ডি. বইসবর্দ্ধন 'গ্যালিয়ম' ধাতু আবিষ্কার করিলেন। এই ধাতুটির আণবিক ওজন, গুণাবলী প্রভৃতি সমস্তই 'এক-এলুমিনিয়মে'র বিজ্ঞাপিত ওজন ও গুণাবলীর সহিত

হুবহু মিলিয়া গেল। সেইরূপে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া-নিবাসী নিলশন সাহেব 'স্ক্যাণ্ডিয়ম্' এবং জার্ম্মানী-নিবাসী উইনক্লার 'জার্ম্মানিয়ম্' আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, গুণাবলীর সর্ব্বাঙ্গীন একতায় স্ক্যাণ্ডিয়ম্ হইতেছে 'এক-বোরন' এবং জার্ম্মানিয়ম্ 'এক-সিলিকন'।[১] সমগ্র রসায়নশাস্ত্রে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ও তাহার পরবর্ত্তী কালে সর্ব্বাঙ্গীন সফলতার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না।

গ্যালিয়ম ধাতুর এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আবিষ্কারের কাহিনী পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহার গুণাবলী এলুমিনিয়ম ধাতুর মত হইবে। এই দুইটি ধাতুর গুণাবলীর সাদৃশ্য পরীক্ষামূলকভাবে দেখাইতে হইলে উহাদের যতগুলি সম্ভব যৌগিক আবিষ্কার করার যে একান্ত প্রয়োজন, সে কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। এই প্রশ্নও আমার ছাত্রবর্গ ও আমার মনেও উদয় হয়। গ্যালিয়ম ধাতু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্। সৌভাগ্যবশতঃ কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ঐ ধাতু খানিকটা আমরা পাইয়াছিলাম এবং উহার সাহায্যেই আমি ও আমার ছাত্রবর্গ গ্যালিয়মের নূতন নূতন যৌগিক আবিষ্কার-কার্য্যে ব্যাপৃত আছি। ইতিমধ্যে এই সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্যে আমার সহকর্ম্মী শ্রীমান্ সরজিতকুমার নন্দী ও শ্রীমান নীহারকুমার দত্ত।* এইখানে গ্যালিয়ম ধাতুর এই সকল নূতন যৌগিকের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। বাস্তবিক গ্যালিয়ম ধাতু ও তাহার যৌগিক সম্বন্ধে রাসায়নিক জ্ঞান এত অসম্পূর্ণ যে উহা পূর্ণতর করিতে হইলে অনেক অর্থ, সময় ও ছাত্রের সহযোগিতা আবশ্যক।

গ্যালিয়ম ধাতু ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে তরল পদার্থ

প্রথমে গ্যালিয়ম ধাতু দেখিতে কিরূপ, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে গ্যালিয়ম ধাতু বোধ হয় খুব কম লোকেই দেখিয়া থাকিবেন—দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান্ বলিয়া অধিকাংশ রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উহা থাকিবার কথা নহে। সেই জন্য নিবেদন করিতেছি যে গ্যালিয়ম ধাতু ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে পারদের মতই চক্‌চকে সাদা তরল পদার্থ, শীতকালে উহা কঠিন হইয়া রূপার মত দেখায়। রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক আমরা সকলেই ক্লাসে পড়াইয়া থাকি যে, পৃথিবীতে মাত্র একটি তরল ধাতু আছে—

---

[১] বলা বাহুল্য দেশপ্রিয়তায় বৈজ্ঞানিকেরা কাহারও নিকট পরাজিত নহেন। পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, গ্যালিয়ম্, স্ক্যাণ্ডিয়ম্ ও জার্ম্মানিয়ম্ ধাতুগুলির নাম আবিষ্কারকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ মাতৃভূমির নামেই রাখিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মাদাম ক্যুরীও তাঁহার মাতৃভূমি পোলাণ্ডের নামে তাঁহার দ্বারা আবিষ্কৃত 'পোলোনিয়মে'র নামকরণ করিয়াছিলেন।

* New Compounds of Gallium, Pts. I, II & III.—*Journal of the Indian Chemical Society* for 1936, 1937 and 1938.

পারদ। কিন্তু বাস্তবিক এ দেশে এবং অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সে কথা বলা ঠিক হইবে না। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মকালে অন্ততঃ দুইটি তরল ধাতুর কথা পড়াইতে হইবে, একটি অবশ্য পারদ, অপরটি গ্যালিয়ম্ ।* শীতল অবস্থায় উহা কঠিন হইলে উহাকে পিটাইয়া এলুমিনিয়মের মত পাত করা যায়।

গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন অজৈব (inorganic) যৌগিক

এক্ষণে গ্যালিয়মের যে সকল নূতন যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। তিন প্রকার যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে—

(১) অজৈব, (২) জৈব ও (৩) কো-অর্ডিনেটেড অজৈব (co-ordinated inorganic)। শেষোক্ত প্রকারের যৌগিক এই সর্ব্বপ্রথম আলোক-ক্রিয়াশীল (optically active) বিভাগে বিশ্লিষ্ট (resolved) হইল। ইহার বিবরণ পরে দিতেছি। নিম্নলিখিত অজৈব যৌগিকগুলি প্রস্তুত হইয়াছে ; তাহাদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ, বিস্তৃত প্রস্তুত-প্রণালী প্রভৃতি জানিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত তিনটি প্রবন্ধ দেখিতে হইবে :—

গ্যালিয়ম হাইড্রেট—পূর্ব্বে একটি মাত্র হাইড্রেট জানা ছিল। এখানে দুইটি হাইড্রেট প্রস্তুত হইয়াছে—$Ga_২O_৩$,৩$H_২O$ এবং $Ga_২O_৩$,২$H_২O$ ।† গ্যালিয়ম্ নাইট্রেটের দ্রব-কে উত্তপ্ত করিয়া সোডিয়ম বাইকার্ব্বনেটের উত্তপ্ত দ্রব ফোঁটা ফোঁটা ঢালিলে একটি সাদা ন্যাল্‌নেলে দ্রব্য তলায় পড়ে। উহাকে ফিল্টার করিয়া গরম জলে ধুইয়া লইয়া ফিল্‌টার কাগজের মোড়কে চাপ দিয়া একেবারে শুষ্ক করিয়া লইলে $Ga_২O_৩$, ৩$H_২O$ প্রস্তুত হয়। কিন্তু ধৌত অধঃস্থ দ্রব্যকে বায়ুনিষ্কাশিত ডেসিকেটারে (vacuum desiccatorএ) কয়েক দিন ধরিয়া একেবারে শুষ্ক করিয়া লইলে $Ga_২O_৩$, ২$H_২O$ প্রস্তুত হয়। এলুমিনিয়ম ধাতুরও $Al_২O_৩$, ২$H_২O$ হাইড্রেট আছে। এলুমিনিয়ম ও গ্যালিয়ম ধাতুর এই দুইটি যৌগিকের গুণ প্রায় সমান—সাধারণতঃ উহারা অম্ল ও ক্ষার দ্রবে সহজে গোলে না। বাস্তবিক গ্যালিয়মের এতগুলি যৌগিক প্রস্তুত ব্যাপারে আমাদের সাফল্য

* যদি কোনও রাসায়নিক এই তরল গ্যালিয়ম ধাতু দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে চান, তিনি অনুগ্রহ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আসিলে আমি সানন্দে তাহা দেখাইব।

† রাসায়নিক দ্রব্যগুলির নাম ও ফরমুলা ইংরাজী প্রথা অনুযায়ী লিখিত হইল ; কেবল ইংরাজী 1, 2, 3 ইত্যাদি, বাঙ্গালা ১, ২, ৩, ইত্যাদি রূপে লিখিত হইয়াছে। আর mono-, di-, tri- প্রভৃতি, বাঙ্গালা এক-, দ্বি-, ত্রি-, প্রভৃতি লিখিত হইল। নাম ও ফরমুলা লিখিবার এই প্রথাই সমীচীন বলিয়া আমার মনে হয়।

নির্ভর করিয়াছে ইহারই উপর। গ্যালিয়ম হাইড্রেট প্রস্তুত করিয়া তখনই তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, এক দিন রাখিয়া দিলে জৈব ও দুর্ব্বল অজৈব অম্লগুলিতে উহা গুলিবে না।

গ্যালিয়ম ফস্‌ফাইট—দুই প্রকার গ্যালিয়ম ফস্‌ফাইট প্রস্তুত হইয়াছে—নর্ম্মাল ফস্‌ফাইট, $GaPO_৩,H_২O$ এবং অম্ল-ফস্‌ফাইট, $GaH_৩(PO_৩)_২,H_২O$। প্রথমটি প্রস্তুত হইয়াছে গ্যালিয়ম নাইট্রেট দ্রবের উপর সোডিয়ম ফস্‌ফাইটের দ্রব ঢালিয়া। একটি সাদা জিনিষ অধঃস্থ হয়, সেটিকে ফিল্‌টার করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইতে হয়। উহা জল, সুরাসার ও ইথারে অদ্রবণীয়, কিন্তু জলযুক্ত হাইড্রোক্লোরিক অম্লে দ্রবণীয়।

নব-অধঃস্থীকৃত (freshly precipitated) গ্যালিয়ম হাইড্রেটকে জলমিশ্রিত ফস্‌ফরস অম্লে গুলিয়া, বায়ুনিষ্কাশিত ডেসিকেটারে শুষ্ক করিয়া লইয়া সুরাসারে ধুইয়া লইলে অম্ল-ফস্‌ফাইট প্রস্তুত হয়। এই জিনিষটিও জলে, সুরাসার ও ইথারে অদ্রবণীয় এবং হাইড্রোক্লোরিক অম্লে দ্রবণীয়।

গ্যালিয়ম হাইপো-ফস্‌ফাইট—দুই প্রকার গ্যালিয়ম হাইপো-ফস্‌ফাইটও প্রস্তুত হইয়াছে—নর্ম্মাল ও অম্ল। নর্ম্মাল হাইপো-ফস্‌ফাইটের ফরমুলা $GaPO_২,H_২O$ এবং অম্ল হাইপো-ফস্‌ফাইটের ফরমুলা $GaH_৩(PO_২)_২$। এই দুটি দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রক্রিয়া যথাক্রমে গ্যালিয়ম নর্ম্মাল ফস্‌ফাইট ও অম্ল-ফস্‌ফাইটের প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার অনুরূপ। এগুলিও দেখিতে শ্বেত, এবং সুরাসার ও ইথারে অদ্রবণীয় এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক অম্লে দ্রবণীয়। অম্ল হাইপো-ফস্‌ফাইট গরম জলে দ্রবণীয়, নর্ম্মাল হাইপো-ফস্‌ফাইট জলে অদ্রবণীয়।

গ্যালিয়ম অর্থো-ফস্‌ফেট—$GaPO_৪,৩H_২O$ ফরমুলার ফস্‌ফেট প্রস্তুত হইয়াছে। দুই উপায়ে উহা প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথম উপায়—সদ্য অধঃস্থীকৃত গ্যালিয়ম হাইড্রেটকে স্বল্পতম অর্থো-ফস্‌ফরিক অম্লে দ্রব করিয়া, বায়ু-নিষ্কাশিত ডেসিকেটারে শুষ্ক করত তাহাকে উত্তমরূপে বার বার সুরাসারের দ্বারা ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া। দ্বিতীয় উপায় গ্যালিয়ম নাইট্রেট দ্রবের উপর সোডিয়ম হাইড্রোজেন ফস্‌ফেট দ্রব ঢালিয়া দেওয়া। উহা ধৌত করিয়া বায়ু-নিষ্কাশিত ডেসিকেটারে শুষ্ক করিয়া লইলে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য পাওয়া যায়। দেখিতে শ্বেত ; জল, সুরাসার ও ইথারে অদ্রবণীয় ও জল-মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক অম্লে দ্রবণীয়।

গ্যালিয়ম ক্লোরেট, $Ga(ClO_৩)_২,H_২O$—ইহা গ্যালিয়ম সাল্‌ফেট ও বেরিয়ম্‌ ক্লোরেটের দ্রব মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। এই মিশ্রণ খুব সাবধানে করিতে হইবে—যেন ঐ দুটি দ্রবের কোনটির আধিক্য না থাকে। বেরিয়ম্‌ সাল্‌ফেট ফিল্‌টার করিয়া ফেলিয়া দ্রবটি ডেসিকেটারে রাখিয়া দিলে সূচাকৃতি দানাদার অবস্থায় গ্যালিয়ম ক্লোরেট পাওয়া যায়। উহা জলে দ্রবণীয় কিন্তু সুরাসার ও ইথরে অদ্রবণীয়। উত্তপ্ত করিলে উহা ক্লোরাইডে পরিণত হয়।

গ্যালিয়ম ব্রোমেট—ব্রোমেটও ক্লোরেটের মত প্রস্তুত হইয়াছে, কেবল বেরিয়ম্ ক্লোরেটের স্থানে বেরিয়ম্ ব্রোমেট লওয়া হইয়াছিল। দানাদার অবস্থায় পাইবার জন্য ফিল্টারীকৃত দ্রবটি ডেসিকেটারে ঘন করিবার কালে ব্রোমেটটি ভাঙ্গিয়া গিয়া উহা হইতে ব্রোমিন বাহির হইতেছিল। স্বল্প-শুষ্ক ব্রোমেটেও কতকটা অংশ অবিকৃত থাকে, কিন্তু একেবারে শুষ্ক দ্রব্যে ব্রোমেট মোটেই অবিকৃত ভাবে থাকে না। ব্রোমেট দ্রবের উপর খাঁটি সুরাসার (absolute alcohol), এসিটোন এবং সুরাসার-ইথার মিশ্রণ প্রভৃতি ঢালিয়াও কোনও অধঃস্থ (precipitated) ব্রোমেট কঠিনাকারে পাওয়া যায় নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে ব্রোমেট, ক্লোরেট অপেক্ষা অনেক ভঙ্গুর।

গ্যালিয়ম আইয়োডেট—দুই প্রকার আইয়োডেট পাওয়া গিয়াছে। একটি সাধারণ আইয়োডেট $Ga(IO_৩)_৩$,২$H_২O$ এবং অপরটি বেসিক আইয়োডেট, $Ga(IO_৩)_৩$, $Ga_২O_৩$, ৩$H_২O$। সাধারণ আইয়োডেটটি একটি বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত হইয়াছে। গ্যালিয়ম ধাতুকে প্রথমে নাইট্রিক অম্লে দ্রবীভূত করিয়া, ওজন-করা আইয়োডিক অম্ল যোগ করা হইয়াছিল। তার পর ওয়াটার-বাথের উপর উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রিক অম্ল তাড়াইয়া দিলে ক্রমে আইয়োডেটের দানা বাহির হয়। সেগুলি জলে ধুইয়া লইয়া ডেসিকেটারে শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়। ইহা জলে স্বল্প-দ্রবণীয়, সুরাসার ও ইথারে অদ্রবণীয় এবং জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক ও নাইট্রিক অম্লে দ্রবণীয়। খাঁটি হাইড্রোক্লোরিক অম্লের সহিত উত্তপ্ত করিলে আইয়োডিনের বাষ্প বাহির হয়। বেসিক আইয়োডেটটি, গ্যালিয়ম নাইট্রেটের দ্রবের উপর সোডিয়ম আইয়োডেট দ্রব ঢালিয়া দিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। একটি সাদা জিনিষ অধঃস্থ হয়। উহা জলে ধুইয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া হয়।

গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন জৈব যৌগিক

এক্ষণে আমরা গ্যালিয়ম ধাতুর নূতন জৈব যৌগিকের কথা বলিতেছি। অনেকগুলি জৈব যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে ; সেগুলির প্রস্তুত-প্রণালী বিশদভাবে এখানে বর্ণিত হইল না। তাহাদের সংক্ষিপ্ত প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ :—সদ্য-অধঃস্থীকৃত গ্যালিয়ম হাইড্রেট বা হাইড্রক্-সাইড বিবিধ জৈব অম্লে দ্রবীভূত করিতে হইবে। দুইটি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—(১) হাইড্রেট সদ্য-অধঃস্থীকৃত হইবে, (রাখিয়া দিলে উহা আর জৈব অম্লে গুলিবে না) এবং (২) জৈব অম্ল প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত হইবে না, এবং যদি হয় তাহা হইলে তাহাকে তাড়াইয়া দিতে হইবে। পরে ঐ দ্রবকে বায়ুনিষ্কাশিত ডেসিকেটারে শুষ্ক করিয়া লইয়া সুরাসার বা ইথারে ধুইয়া আবার শুষ্ক করিয়া লইতে হইবে। এই জৈব যৌগিকগুলির নাম ও ফরমুলা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) **বেসিক গ্যালিয়ম ফরমেট,** Ga(HCO৲)৩, Ga_2O_3, ৫H_2O—জলে অদ্রবণীয়।

(২) **বেসিক গ্যালিয়ম এসিটেট,** ৪Ga(CH৩CO২)৩, ২Ga২O৩, ৫H_2O জলে অদ্রবণীয়।

(৩) **নর্ম্ম্যাল গ্যালিয়ম অক্‌জ্যালেট** Ga২(C২O৪)৩, ৪H_2O—জলে খুব দ্রবণীয়।

(৪) **গ্যালিয়ম সাইট্রেট,** Ga (C৬H৫O৭)৩, ৩H_2O—জলে দ্রবণীয়।

(৫) **গ্যালিয়ম ল্যাকটেট,** Ga(C৩H৫O৩)৩, ২H_2O—জলে দ্রবণীয়।

(৬) **গ্যালিয়ম ম্যালেট,** Ga২(C৪H৪O৫)৩, ৩H_2O—জলে দ্রবণীয়।

(৭) **গ্যালিয়ম টারটারেট**—একটি গ্যালিয়ম টারটারেটের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তুত-প্রক্রিয়ার সংবাদ পাওয়া যায় না। এখানে ডেক্সট্রো, লিভো, রেসিমিক ও মেসো এই চারি প্রকারের টারটারেটই প্রস্তুত হইয়াছে এবং ডি- ও এল- টারটারেটের আলোক-অয়ন (optical rotation) বাহির করা হইয়াছে। চারিটি টারটারেটেরই ফরমুলা হইতেছে—Ga২(C৪H৪O৬)৩, ৪H_2O। ইহারা সবই জলে দ্রবণীয়। আলোক ক্রিয়াশীল (optically active) গ্যালিয়ম যৌগিকের আবিষ্কার বোধ হয় এই প্রথম।

গ্যালিয়মের কো-অর্ডিনেটেড অজৈব যৌগিক (Co-ordinated inorganic Compounds)।

গ্যালিয়মের কো-অর্ডিনেটেড অজৈব যৌগিকের উল্লেখ এতাবৎ কাল রসায়নশাস্ত্রে দেখা যায় না। এখানে আমরা গ্যালিয়মের সোডিয়ম, পোট্যাসিয়ম ও এমোনিয়ম জটিল (complex) অকজ্যালেট (sodium, potassium & ammonium complex oxalates of gallium) প্রাপ্তির সংবাদ দিতেছি এবং উহাদের আলোক-ক্রিয়াশীল অবস্থাতে প্রাপ্তিরও উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডি- ও এল- টারটারেট গ্যালিয়মের প্রথম আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিক, এবং তার পর এই সর্ব্বপ্রথম রেসিমিক গ্যালিয়ম যৌগিক আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিকে বিশ্লিষ্ট হইল। এই সম্পর্কে যে-সকল নূতন জটিল যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে সেইগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) **এমোনিয়ম গ্যালিয়ম অক্‌জ্যালেট,** (NH৪)৩ [Ga (C২O৪)৩], ৩H_2O।

(২) **পোট্যাসিয়ম গ্যালিয়ম অক্‌জ্যালেট,** K৩ [Ga (C২O৪)৩], ৩H_2O।

(৩) **সোডিয়ম গ্যালিয়ম অকজ্যালেট,** Na৩ [Ga (C২O৪)৩], ৩H_2O।

(৪) **এল-ষ্ট্রিক্‌নিন গ্যালিয়ম অক্‌জ্যালেট,** এল- [Ga ($C_২O_৪$)$_৩$] ($HC_{২১}H_{২২}O_২N_২$)$_৩$, ১২$H_২O$।

(৫) এই ৪ নং যৌগিক হইতে **এল-ষ্ট্রিক্‌নিন ডি-গ্যালিয়ম অকজ্যালেট** (l-strychnine-d-gallium oxalate) প্রস্তুত হইয়াছে।

(৬) তার পর ৫ নং যৌগিক হইতে **ডি-পোট্যাসিয়ম ও ডি-এমোনিয়ম গ্যালিয়ম অক্‌জ্যালেট** এই দুই আলোক-ক্রিয়াশীল গ্যালিয়ম যৌগিক প্রস্তুত হইয়াছে।* **ওয়াল** নামক এক জন রাসায়নিক ১৯২৬ সালে এলুমিনিয়মের এমোনিয়ম অক্‌জ্যালেটের আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৯৩৮ সালে গ্যালিয়মের এমোনিয়ম ও পোট্যাসিয়ম অক্‌জ্যালেটের আলোক-ক্রিয়াশীল যৌগিক প্রস্তুত হওয়াতে এলুমিনিয়ম ও মেণ্ডেলিয়েফের 'এক-এলুমিনিয়মে'র সাদৃশ্যের আর একটি উদাহরণ মিলিল।

গ্যালিয়ম ধাতুর অন্যান্য যৌগিক এখনও প্রস্তুত হইতেছে। যথাকালে উহাদের সংবাদ প্রকাশিত হইবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ
কলিকাতা।

---

* এগুলির প্রস্তুত-প্রণালী আমাদের New Compounds of Gallium প্রবন্ধের তৃতীয় ভাগে বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'

অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্ বিরচিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' বইখানি কতকগুলি কারণে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক অতি লক্ষণীয় পুস্তক। (১) ইহা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ; (২) কিঞ্চিদধিক দুই শত বৎসর পূর্বে রচিত বাঙ্গালা গদ্যের প্রাচীন নিদর্শন ইহাতে রক্ষিত হইয়া আছে—বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ইহা অন্যতম আদি পুস্তক; (৩) ইউরোপীয়দের মধ্যে বঙ্গভাষা চর্চার প্রথম যুগে ইহা রচিত—বিদেশীর হাতে বাঙ্গালা রচনার সম্ভবতঃ ইহা প্রাচীনতম নিদর্শন; (৪) বঙ্গভাষায় খ্রীষ্টান-ধর্মবিষয়ক সাহিত্যের ইহা এক আদি গ্রন্থ; (৫) দুই শত বৎসর পূর্বেকার পূর্ব-বঙ্গের (ঢাকা ভাওয়াল অঞ্চলের) প্রাদেশিক ভাষার সহিত অল্পাধিক মিশ্রিত বাঙ্গালা সাধু-ভাষার ইহা সুন্দর নিদর্শন; এবং (৬) রোমান বর্ণমালায় পোর্তুগীস ভাষার উচ্চারণ ধরিয়া লেখা বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক রূপভেদের (তথা পোর্তুগীস ভাষার) উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনায় এই বই অমূল্য।

পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্ দুই শত বৎসর পূর্বেকার লোক। এখন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য লইয়া আলোচনা করেন এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীকে পাদ্রি মানোএল্ ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার কৃতিত্ব সম্বন্ধে খবর রাখিতে হয়; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালী জন-সাধারণের পরিচয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে, পাদ্রি মানোএল্-এর নামও সাধারণ্যে প্রচারিত হইবে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান-সমাজে পাদ্রি মানোএল্-এর বইয়ের কিছু প্রচার ছিল, এবং তাঁহার নাম অন্ততঃ খ্রীষ্টান-সমাজে অনেকে জানিত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। উনবিংশ শতাব্দের চতুর্থ দশক পর্যন্ত পাদ্রি মানোএল্-এর নাম কতকটা সুপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা ১৮৩৬ সালে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ হইতে বুঝা যায়। তার পরে এই লেখক ও তাঁহার পুস্তকের কথা বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে ধীরে ধীরে চাপা পড়িয়া গেল। পাদ্রি মানোএল্ দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, একখানি হইতেছে খ্রীষ্টান ধর্মের ব্যাখ্যান বিষয়ক 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', ও অন্যখানি হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সমেত বাঙ্গালা ও পোর্তুগীস এবং পোর্তুগীস ও বাঙ্গালা শব্দ-সংগ্রহ। বই দুইখানিই এখন দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য হইয়া গিয়াছে বলিতে পারা যায়। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর দুইখানি মাত্র প্রতির অস্তিত্বের কথা জানা গিয়াছে—একখানি খণ্ডিত প্রতি কলিকাতায় রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ বেঙ্গল-এর পুস্তকাগারে আছে, আর একখানি আছে, পোর্তুগালে লিসবন শহরের জাতীয়

গ্রন্থাগারে। পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান বা শব্দ-সংগ্রহের একখানি প্রতি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকাগারে আছে, অন্যখানি আছে লিস্‌বনের জাতীয় গ্রন্থশালায়। এতদ্ভিন্ন, পোর্তুগালের এভোরা-নগরীর প্রাচীন গ্রন্থ-সংগ্রহে পাদ্রি মানোএল্-এর দুইখানি বইয়েরই কিয়দংশ করিয়া হস্ত-লিখিত পুথির আকারে মিলিতেছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন আমাদের জানাইয়াছেন যে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে "গোয়ার সন্নিহিত মারগাঁও সহরে" "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ তৃতীয় বার মুদ্রিত হয়" (পৃ. ১৷৵০, প্রস্তাবনা, 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৭)। এই তৃতীয় সংস্করণ তিনি দেখেন নাই—ইহা রোমান অক্ষরে কি বাঙ্গালা অক্ষরে তাহা আমরা জানি না; এই তৃতীয় সংস্করণের একখানি মাত্র প্রতি লিস্‌বনের জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। গোয়ায় ছাপা—অতএব রোমান অক্ষরে হইবারই সম্ভাবনা; এবং এই কারণে এই তৃতীয় সংস্করণ বঙ্গদেশে সম্ভবতঃ প্রচারলাভ করে নাই।

ধীরে ধীরে বাঙ্গালী পাঠক পাদ্রি মানোএল্-এর এই দুইখানি বইয়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ১৯০৩ সালে স্যর জার্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন তাঁহার নব-আরব্ধ *Linguistic Survey of India*-র বাঙ্গালা-ভাষা-বিষয়ক খণ্ডে পাদ্রি মানোএল্-এর অভিধান সম্বন্ধে উল্লেখ করেন (পৃ. ২৩, *Linguistic Survey of India*, Vol. V, Part I)। তৎপরে জেসুইট-সম্প্রদায়ের পণ্ডিত, কলিকাতার সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক Father Hosten পাদ্রি হস্টেন, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৯১১—১৯১৪ সালে) পাদ্রি মানোএল্-এর বই সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া, বাঙ্গালা দেশের ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পাঠক-সমাজের সমক্ষে বই দুইখানিকে পুনঃপরিচিত করিয়া দেন। কলিকাতার এশিয়াটিক-সোসাইটির পুস্তকাগারে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থখানির খণ্ডিত প্রতিটীর অবস্থানের কথা পাদ্রি হস্টেন সাহেব আমাদের প্রথম জানাইয়া দেন। তদনন্তর দুই একজন বাঙ্গালী সাহিত্যালোচকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়—ঢাকার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং বর্তমান লেখক কর্তৃক ১৩২৩ সালের (১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের) 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এই বই সম্বন্ধে দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—এশিয়াটিক-সোসাইটির প্রতি খানি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এই বইয়ের একটী সাহিত্যিক পরিচয় দেন, এবং আমি এই বইয়ের ভাষা ও ইহার রোমান বর্ণবিন্যাস ধরিয়া এই ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করি। ১৯১৯ সালে আমি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা-পোর্তুগীস শব্দ-কোষ ও ব্যাকরণ দেখি, এবং ১৯২২ সালে এই বইয়ের ব্যাকরণ-অংশের একটা পূরা অনুলিখন ও শব্দ-সংগ্রহের আংশিক অনুলিখন করিয়া আনি। এই অনুলিখন, শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়-কৃত বঙ্গানুবাদের সহিত এবং আমার লিখিত প্রবেশকের সহিত ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আমরা প্রকাশিত করি। ১৯১৯ সালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁহার *Bengali Literature in the Nineteenth Century* বইয়ে পাদ্রি মানোএল্-এর সাহিত্য-চেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার ১৯১৭ সালে প্রকাশিত

তাঁহার 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য' গ্রন্থে পাদ্রি মানোএল্-এর শব্দ-সংগ্রহের নামপত্রের একটী চিত্র দেন (প্রথম ভাগ, পৃ. ১৭)। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত মৎপ্রণীত *Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থে আমি বাঙ্গালা ধ্বনি-তত্ত্ব ও ব্যাকরণের আলোচনা সম্পর্কে আবশ্যক-মত পাদ্রি মানোএল্-এর বই দুইখানির উল্লেখ করি। এই ভাবে বলিতে পারা যায় যে, কুড়ির শতকের প্রথম পাদে পাদ্রি মানোএল্ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন।

পাদ্রি মানোএল্-এর আগমন ঘটিয়াছিল, বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস বণিক্ এবং সঙ্গে সঙ্গে পোর্তুগীস-জাতীয় রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকদের প্রতিষ্ঠার ফলে। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে পোর্তুগীসেরা প্রথম ভারতে পদার্পণ করে—আফ্রিকার দক্ষিণে উত্তমাশা-অন্তরীপ ঘুরিয়া, মালাবার বা কেরল দেশে কালিকট নগরে তাহারা জাহাজে করিয়া উপস্থিত হয়। ১৫১০ সালে তাহারা গোয়া দখল করিয়া সেই স্থানে ভারতে নিজেদের প্রধান কেন্দ্র গঠন করে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে তাহারা প্রথম দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙ্গালায় আগমন করে। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পোর্তুগীসেরা বঙ্গদেশে ও বঙ্গোপসাগরে বিশেষ দুর্ধর্ষতার সঙ্গে অবস্থান করিত—এবং ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতেই পোর্তুগীস ক্ষমতার বৃদ্ধি হইলে পরে, পোর্তুগীস পাদ্রিরা ধর্মপ্রচারের চেষ্টায় এদেশে আসিতে আরম্ভ করেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই পোর্তুগীস পাদ্রিরা বাঙ্গালা শিখিয়া পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-কাথলিক ধর্ম সংক্রান্ত বই অনুবাদ করিতে লাগিয়া যান। এই অনুবাদগ্রন্থগুলিকে বাঙ্গালা ভাষায় খ্রীষ্টান-সাহিত্যের ভিত্তি-স্বরূপ বলা যায়—কিন্তু এগুলি এখন অপ্রাপ্য, বোধ হয় চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সপ্তদশ শতক পোর্তুগীস ধর্মপ্রচারকদের বিশেষ প্রতিষ্ঠার যুগ ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে হুগলী ও ঢাকায় পোর্তুগীস পাদ্রিদের বড় বড় কেন্দ্র গঠিত হয়। ঢাকায় ভাওয়ালে বহু দেশীয় ও মিশ্র খ্রীষ্টানের বসতি হয়। যেখানে যেখানে সম্ভব হইয়াছে, পাদ্রিরা বড় বড় গির্জা তুলিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতকে এই পাদ্রিদের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারের যে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

উপস্থিত ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস বণিক্ সৈনিক ও পাদ্রিদের ক্রিয়া-কলাপ লইয়া আলোচনার আবশ্যকতা নাই। পাদ্রি হস্টেন সাহেবের প্রবন্ধে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন ও আমার সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রবেশকে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ'-এর প্রস্তাবনায়, এবং **J. J. A. Campos** কর্তৃক লিখিত ***History of the Portuguese in Bengal*** **(Calcutta 1919)** গ্রন্থে ও এতদ্বিষয়-সম্পৃক্ত প্রবন্ধ ও গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দোমিনিক-দে-সুজা Dominic de Souza নামে একজন পোর্তুগীস পাদ্রি ১৫৯৯ সালের পূর্বে দুই একখানি খ্রীষ্টানী বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। ইঁহার পূর্বে অন্য কোনও অনুবাদক বা পাদ্রি লেখকের কথা আমরা জানি না। তাহার পরের খবর যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেছে যে, দোম্ আন্তোনিও Dom Antonio নামে একজন দেশী (বাঙ্গালী) খ্রীষ্টান, হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্ট-ধর্ম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, 'ব্রাহ্মণ-রোমান-কাথলিক-সংবাদ' নামে একখানি বই রচনা করেন। এই দোম্ আন্তোনিও ভূষণার রাজকুমার ছিলেন, ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মগেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া আরাকানে লইয়া যায়, কিন্তু জনৈক পোর্তুগীস পাদ্রি টাকা দিয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনেন, ও পরে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা লয়েন। তিনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের শেষ পাদে খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের নির্দেশ অনুসারে বইখানি লিখিয়া থাকিবেন। দোম্ আন্তোনিও-র সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানা যায় তাহা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনের প্রস্তাবনায় পাওয়া যাইবে। দোম্ আন্তোনিও-র বই বাঙ্গালা দেশে পোর্তুগীস পাদ্রিদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৬৯৫ সালে ভূষণার অন্তঃপাতী কোষাভাঙ্গা হইতে ঢাকার ভাওয়াল পরগণার নাগরী গ্রামে পোর্তুগীস পাদ্রিদের কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময়ে দোম্ আন্তোনিও-র বইও ভাওয়ালে নীত হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ ১৭২৬ সালের পরে, দোম্ আন্তোনিও-র বই মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য পোর্তুগালে পাঠানো হইয়াছিল, মুদ্রণের উদ্দেশ্যে রোমান লিপিতে ঐ বইয়ের অক্ষরান্তর করা হইয়াছিল, পাদ্রি মানোএল্ তাহার আশয়ও পোর্তুগীস ভাষায় লিখেন, কিন্তু কোনও কারণে ঐ বই এতাবৎ মুদ্রিত হয় নাই, বইয়ের পাণ্ডুলিপি পোর্তুগালের এভোরা-নগরীর পুস্তকাগারে পড়িয়া ছিল,—অবশেষে ১৯৩৭ সালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সম্পাদনায় এই বইয়ের মূল বাঙ্গালা অংশ রোমান অক্ষরে বাঙ্গালা অক্ষরান্তরীকরণ সমেত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পোর্তুগীস রোমান-কাথলিক পাদ্রিদের দৃষ্টান্তে ও অনুপ্রাণনায় সৃষ্ট সাহিত্য-পরম্পরা-মধ্যে দোম্ আন্তোনিও-র এই বইয়ের পরে আমরা পাই পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম্-এর পুস্তকদ্বয়। তাঁহার ব্যাকরণ ও শব্দ-সংগ্রহ, প্রথম সংস্করণ ধরিয়া ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে (ব্যাকরণখানি সম্পূর্ণ, শব্দ-সংগ্রহ আংশিক ভাবে)। এক্ষণে তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তক, মূল প্রথম সংস্করণ অবলম্বন করিয়া, রোমান লিপিতে ও বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণে, এবং টীকা-টিপ্পনী সমেত, "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় পুনঃপ্রকাশিত হইল।

পাদ্রি মানোএল্ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই কথা বলিয়া, বইখানির অল্প-স্বল্প আলোচনা করিব। ইঁহার জীবনের কথা বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কোথায়, কবে, কোন্ বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, কবে, কি ভাবে তিনি ভারতে আসেন, এ-সব খবর কোথাও উল্লিখিত পাওয়া যায় নাই। ১৭৩৪ সালে তিনি ভাওয়ালে বসিয়া তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের

অর্থভেদ'-এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন; তখন তিনি (পূর্ব-ভারতের মণ্ডলীভুক্ত) অগস্তীনীয় সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন (Religioso Eremita de Santo Agostinho da Congregação [da India Oriental]), এবং বাঙ্গালা দেশে সিদ্ধা নিকোলাস-দে-তোলেন্তিনোর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রচার-কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। (Reitor da Missaō de S. Nicolao de Tolentino em Bengalla)। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার ব্যাণ্ডেল নগরে অবস্থিত অগস্তীনীয় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৭৩৪—১৭৫৭ এই দুই তারিখের পূর্বের ও পরের কোনও সংবাদ তাঁহার সম্বন্ধে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার জীবনের এইটুকু মাত্র আমরা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর বাঙ্গালা দেখিয়া, ও তাঁহার শব্দ-সংগ্রহের ভূমিকা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, তিনি বিদেশ হইতে—পোর্তুগাল হইতেই—বাঙ্গালা দেশে আসিয়া থাকিবেন।

রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ-বেঙ্গল-এ রক্ষিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকখানি খণ্ডিত; সোসাইটির এই পুস্তকে নিম্ন-লিখিত পত্রগুলি নাই: পৃ. ৩৩—৩৪, ৩৫—৩৬, ৩৭—৩৮, ৩৯—৪০, ৪১—৪২, ৪৩—৪৪, ৪৫—৪৬, ৪৭—৪৮; পৃ. ১৫৫—১৫৬, ১৫৭—১৫৮; পৃ. ৩২১—৩২২, ৩২৩—৩২৪, ৩২৫—৩২৬, ৩২৭—৩২৮, ৩২৯—৩৩০, ৩৩১—৩৩২, ৩৩৩—৩৩৪, ৩৩৫—৩৩৬, পৃ. ৩৭১—৩৭২, ৩৭৩—৩৭৪; ৩৮০ পৃষ্ঠায় সোসাইটির অসম্পূর্ণ পুস্তক সমাপ্ত। ইহার অতিরিক্ত মূল পুস্তকে আছে, পৃ. ৩৮১—৩৮২, পৃ. ৩৮৩ (এই পৃষ্ঠগুলির মধ্যে বিজোড় সংখ্যার পৃষ্ঠায় আছে পোর্তুগীস, জোড়-সংখ্যার পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা); ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বইখানির সমাপ্তি। তদনন্তর পৃ. ৩৮৪টী খালি পৃষ্ঠা, ও পৃ. ৩৮৫—৩৯১-এ কেবল পোর্তুগীস ভাষায় বইয়ের মধ্যে যে ৬১টী উপাখ্যান আছে, সেই উপাখ্যানগুলির সূচীপত্র মুদ্রিত হইয়াছে, সূচীতে এই উপাখ্যানগুলির পোর্তুগীস মূলের পৃষ্ঠসংখ্যার উল্লেখ আছে। সোসাইটির পুস্তকে যে পত্রগুলির অভাব আছে, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় বিশেষ অর্থব্যয় করিয়া এভোরার পুস্তকাগারে রক্ষিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্ণাঙ্গ প্রতিটী হইতে সেগুলিকে নকল করাইয়া আনান; এই নকল হইতে পূরণ করিয়া, সম্পূর্ণ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (কেবল বাঙ্গালা অংশ) "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"য় মুদ্রিত হইয়াছে।

মূল বইখানি ছোট আকারের—পৃষ্ঠাগুলির মুদ্রিত অংশের পরিমাপ ৫ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি। ৩৮৩ বা ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মূল বইখানি সমাপ্ত; ইহার অর্ধেক লইয়া বাঙ্গালা—১৯২ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালা অংশ। বইখানি দুই 'পুথি' বা দুই খণ্ডে বিভক্ত: 'পুথি' ১—পৃ. ৩১২ পর্যন্ত; 'পুথি' ২—বাকী অংশ লইয়া। প্রত্যেক 'পুথি' আবার কতকগুলি 'তাজেল' বা অধ্যায়ে বিভক্ত। 'পুথি' ও 'তাজেল'-এর বিষয়-বস্তু নিম্নে নির্দিষ্ট হইল—

পুথি ১—সকল (পড়)নের অর্থ, এবং পৃথক্ পৃথক্ বুঝান।

তাজেল ১—সিদ্ধি কুশের অর্থভেদ।

তাজেল ২—'পিতার পড়ন', এবং তাহার অর্থ।

তাজেল ৩—'প্রণাম মারিয়া' আর তাহার অর্থ, আর 'নিস্তার রাণী'।

তাজেল ৪—'মানি সত্য নিরঞ্জন', আত্মার চৌদ্দ ভেদ, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল ৫—দশ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল ৬—পাঁচ আজ্ঞা, এবং তাহাদিগের অর্থ।

তাজেল ৭—সাত সাক্রামেন্তোস্, এবং তাহাদিগের অর্থ।

পুথি ২—পড়ন শাস্ত্র সকল আর যে উচিত জানিতে, স্বর্গে যাইবার।

তাজেল ১—আত্মার ভেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার, শিখাইবার, উপায় তরিবার।

তাজেল ২—পড়ন-শাস্ত্র নিরালা।

এই বইয়ে মোটামুটি রোমান-কাথলিক ধর্মের ধর্মবীজ, মূল বিশ্বাস-সমূহ এবং অনুষ্ঠান-সমূহের ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যাকে বিশদ করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি (৬১টী) ধর্মমূলক উপাখ্যানও বইয়ে দেওয়া হইয়াছে।

মূল পোর্তুগীস বইখানি পাদ্রি মানোএল্-এর লিখিত কি না তাহা জানা যায় না। আমাদের মনে হয়, এই বই পোর্তুগালে বহুল প্রচারিত খ্রীষ্টান ধর্মবিষয়ক কোনও পুরাতন বই হইবে। বইটীর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা এক্ষেত্রে অবান্তর। তবে এইটুকু বলা যায় যে, যে ধর্মমত বা অনুষ্ঠানের সত্যতা বা ঔচিত্য সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে যে উপাখ্যানগুলি দেওয়া হইয়াছে, বহু স্থলে সেগুলিতে বিশ্বাস করা শিশুজনোচিত সরল মনোভাব না হইলে সম্ভব হয় না। বিশ্বাসী জনের উচিত জোর ভাষায় নিজ বিশ্বাস প্রকট করা ছাড়া, বিচার বা যুক্তির বিশেষ কিছু এইরূপ বইয়ে আশা করা যায় না। যাহারা খ্রীষ্টান পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বাস করে, তাহাদের নিজ বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বইখানি লিখিত।

আমাদের কাছে এখন 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' পুস্তকের উপযোগিতা হইতেছে বাঙ্গালা ভাষার পুরাতন গদ্যের নিদর্শন হিসাবে, এবং রোমান অক্ষরে লিখিত বলিয়া পুরাতন বাঙ্গালার উচ্চারণ-নির্দেশক পুস্তক হিসাবে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবন্ধে (১৩২৩ সাল, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ১৯৭—২১৭) এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি; এবং আমাদের সম্পাদিত পাদ্রি মানোএল্-এর ব্যাকরণে ও ব্যাকরণের ভূমিকাতেও এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে। সে বিষয়ের পুনরবতারণা করিব না; জিজ্ঞাসু পাঠকগণকে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র প্রবন্ধ এবং এই বইয়ের টীকা-টিপ্পনী অংশ দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা যে বিদেশীর রচিত বাঙ্গালা সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ তাঁহার রচনা-শৈলীর মধ্যেই বিদ্যমান। চারিটী কারণে তাঁহার বাঙ্গালা রচনা খুব ভাল হইতে পারে নাই: (১) তিনি বিদেশী, খুব ভাল করিয়া বাঙ্গালা ভাষা দখল করা তাঁহার হয় নাই; মনে হয়, তিনি মৌখিক ভাষাই বলিতে বেশী অভ্যস্ত ছিলেন, সাধু-ভাষা বা সাহিত্যের ভাষায় তাঁহার অধিকার তেমন ছিল না; (২) তখনকার দিনে

সাধু গদ্যের বই ছিল না বলিলেই হয়, সুতরাং গদ্য-রচনায় পাদ্রি মানোএল্‌কে অনেকটা নিজেই পথ কাটিয়া চলিতে হইয়াছিল। গদ্যের ভাল আদর্শ তাঁহার সমক্ষে না থাকায়, তাঁহাকে লাতীন ও পোর্তুগীসের (বিশেষতঃ মূল গ্রন্থের ভাষা পোর্তুগীসের) আদর্শ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার ভাষায় বহু স্থলে ফিরিঙ্গিয়ানা আসিয়া গিয়াছে—বিশেষ করিয়া বাক্য-রীতিতে। (৩) তখন সাধু গদ্যে বেশী বই লেখা না হইলেও, পত্রাদিতে এক রকম সাধু বাঙ্গালা গদ্যের শৈলী দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাদ্রি মানোএল্‌, ঢাকা ভাওয়াল-অঞ্চলের কথ্য ভাষা নিশ্চয়ই ভাল করিয়া জানিতেন, সেই জন্য তাঁহার রচনায় কথ্য ভাষার প্রভাব এত বেশী পড়িয়াছে যে তাঁহার ব্যবহৃত বাঙ্গালাকে ঢাকার কথ্য ভাষার সহিত মিশ্রিত সাধু গদ্য বলিতে হয়। ভূষণার রাজপুত্র দোম্‌ আন্তোনিও-র ভাষা সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। (৪) বহু স্থলে সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন বলিয়া, পাদ্রি মানোএল্‌-কে রোমান-কাথলিক ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে উপযুক্ত পরিভাষার জন্য বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি সাধু-ভাষা ও আনুষঙ্গিক ভাবে সংস্কৃতের শব্দাবলীর ও ধাতু-প্রত্যয়াদির সহিত তেমন পরিচিত ছিলেন না বলিয়া, পারিভাষিক শব্দের জন্য চল্‌তি বাঙ্গালা শব্দের সাহায্যই তাঁহাকে বেশীর ভাগ লইতে হইয়াছিল। Sancta Mater Ecclesia—সমস্ত খ্রীষ্টান সঙ্ঘ বা সম্প্রদায়, খ্রীষ্টান জনগণের আধ্যাত্মিক জীবনের রক্ষয়িত্রী মাতা রূপে কল্পিত হইয়া, লাতীনে এই নামে অভিহিত হয়—ইংরেজীতে Holy Mother Church, পোর্তুগীসে Santa Madre Igreja : পাদ্রি মানোএল্‌ (অথবা তাঁহার পূর্ব্বগামী অন্য কোনও পাদ্রি ?) ইহার বাঙ্গালা করিলেন –“সিদ্ধী মাতা ধর্ম্মঘর (সিদ্ধা —পুংলিঙ্গ শব্দ, স্ত্রীলিঙ্গে সিদ্ধী)”। এইরূপ অনুবাদের চেষ্টা লক্ষণীয় ; ভাষার পুঁজী যেটুকু তাঁহাদের হাতে আসিয়াছিল, তাহা লইয়া এই পাদ্রিরা যতটা সম্ভব খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত বাঙ্গালায় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান পরিভাষার পত্তন করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের পরিশ্রম সাধুবাদের যোগ্য। বাধ্য হইয়া, উপযুক্ত শব্দ না জানায় বা না পাওয়ায়, তাঁহারা দুই চারি স্থানে লাতীন বা পোর্তুগীস শব্দ রাখিয়াছেন ; যেমন “ইস্পিরিতো সান্তো, কন্‌ফেসার, ক্রুশ, বিস্‌পো” প্রভৃতি। কিন্তু মোটের উপর, বাঙ্গালী খ্রীষ্টানের ধর্ম্মকার্য্যে তাহার মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার কালে, সেই ভাষাকে যথাসাধ্য ‘স্বদেশী’ রাখিবার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল।

বাক্যরীতির অসঙ্গতি পাদ্রি মানোএল্‌-এর ভাষার প্রধান দোষ ; ইহা পদে পদে পাওয়া যাইবে। পোর্তুগীস পাদ্রিদের বাঙ্গালায় গোয়ার কোঙ্কণী ভাষার প্রভাবের কথা আমি ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’য় ১৩২৩ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু পুস্তকে ব্যবহৃত সাধারণ শব্দ বিষয়ে, পাদ্রি মানোএল্‌-এর বাঙ্গালায় যে তখনকার দিনের ঢাকা-অঞ্চলে প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার একটা সত্যকার প্রতিচ্ছায়া মিলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুসলমান শাসনের যুগে যাহা হওয়া

স্বাভাবিক—আরবী-ফারসী শব্দও বেশ আছে। সংস্কৃত সাধু-ভাষার প্রভাব কথ্য ভাষায় ততটা যায় নাই, সেই জন্য প্রচলিত খাঁটী বাঙ্গালা ও অর্ধতৎসম শব্দ এবং সমাস যথেষ্ট আছে।

পাদ্রি মানোএল্-এর বাঙ্গালা সবচেয়ে বেশী স্ফূর্ত হইয়াছে তাঁহার উপাখ্যানগুলিতে। এই উপাখ্যানগুলির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, মোটের উপরে বেশ প্রাঞ্জল প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সহজ-বোধ্য বাঙ্গালা তিনি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য-রীতিতে স্থলে স্থলে স্খলন হইলেও, এবং পোর্তুগীসের প্রভাব দেখা দিলেও, তিনি যে বেশ সাবলীল ভঙ্গীতে তাঁহার উপাখ্যানগুলি শুনাইয়া গিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কতকগুলি উপাখ্যান সরল বাঙ্গালা গদ্যের নমুনা হিসাবে ধরা যাইতে পারে—অবশ্য তখনকার দিনের শব্দাবলী সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হইতে হইবে।

20　　*Crepar Xaxtrer orth, bhed,*

X. Podarthoná zanilé.
C. Xú rupé manité que moté zanibeq?
X. Zanilé o manilé, o buzhilé axthar bhed xocol.
G. Carzió punió corite que moté zanibeq?
X. Dox Agguia, o pans Agguia zanilé; e bong tahandiguer palon corile, zemot uchit.
G. Ar qui zanibeq?
X. Muctir mulier tingun: *Axthá* manité; *Axá* manguité: *Corunć*, carzió punió corité.
G. Zanó ni podar thoná?
X. Hoé, zaní.
G. Cohó, deqhi;

Podar Thoná.

X. Pitá amardiguer,
Poromo xorgué alló;
Tomar xidhi nameré
Xeba houq:
Aixuq amardigueré
Tomar raizot:
Tomar zé icha,
Xei houq:
Zemon porthibité,
Temon xorgué:

Amar-

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

বাঙ্গালা ভাষার গদ্য-সাহিত্যের এক প্রধান ও লক্ষণীয় পুরাতন নিদর্শন বলিয়া এই বই হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর আদরের হওয়া উচিত। বাঙ্গালা গদ্যের উৎপত্তি ও বিকাশ চর্চা করিতে গেলে, পাদ্রি মানোএল্-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'কে বাদ দিতে পারা যায় না। এবং, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গদ্য-লেখকগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে পাদ্রি মানোএল্-দা-আস্সুম্প্সাম্ সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র।

এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গাক্ষরে ফরাসী পাদ্রি "জাকবছ্ ফ্রাঁছিসকস্ মারিয়া গেরেঁ" (Jacobus Franciscus Maria Guerin) ১৮৩৬ সালে শ্রীরামপুরে ছাপাইয়া চন্দননগর হইতে প্রকাশিত করেন। ফরাসীতে এই দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্র এইরূপ :—

CATECHISME | SUIVI | DE TROIS DIALOGUES | ET DE LA LISTE | DES ECLIPSES DE SOLEIL ET DE LUNE | CALCULEES POUR LE BENGALE | A PARTIR DE 1836 JUSQU'EN 1940 INCLUSIVEMENT. | NOUVELLE EDITION, REVUE ET CORRIGEE | কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ। | সূর্য্যের আর চন্দ্রের গহণ গণনার সহিত ১৪০ বৎসরের | আরম্ভ ১৮৩৬ সালঅবধি | সহর চন্দননগর | এবং সমস্তবাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে। | করিয়াছেন জাকবছ ফ্রাঁছিস্‌কস্‌ মারিয়া গেরেঁ | চন্দননগরের সর্ব্বগ্রাহ্যের পাদরী | নিয়োজিত প্রেরিতসম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভাস্থ। | দ্বিতীয় বার এবং শুদ্ধরূপে | শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | সন ১৮৩৬। |

এই সংস্করণের নামপত্র হইতেই ইহার ভাষার নমুনা দেখা যায়। ইহার লাতীন ভূমিকায় পাদ্রি মানোএল্‌ যে এই বই প্রথম ১৭৩৫ সালে রচনা করেন এবং লিস্‌বন হইতে এই বই যে প্রথম প্রকাশিত হয়—ভূমিকায় ভ্রম-ক্রমে ছাপার তারিখ ১৭৪৩ স্থলে ১৭৬৩ দেওয়া হইয়াছে—তাহার উল্লেখ আছে। কোনও কোনও স্থানে এই নূতন সংস্করণে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা আছে; লাতীন Sanctus, Sancta, Sanctum, পোর্তুগীস Santo, Santa এবং ইংরেজী Saint-এর অনুবাদ পাদ্রি মানোএল্‌-এর বইয়ে আছে "সিদ্ধা, সিদ্ধী"; পাদ্রি গেরঁ্যা তাহা কাটিয়া করিয়া দিয়াছেন "শুদ্ধ"। "অর্থভেদ" Orth bhed শব্দ শুদ্ধ করিয়া এই সংস্করণে "অর্থবেদ" করা হইয়াছে; "অর্থবেদ" মানে কি হয় জানি না; "অর্থভেদ" কিন্তু সার্থক শব্দ, "অর্থের ব্যাখ্যা" অর্থে। ১ হইতে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ"; মাত্র এই অংশকে পাদ্রি মানোএল্‌-এর বইয়ের সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্ত্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যায়। উপাখ্যানগুলির প্রায় সব কয়টী ইহা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। তদনন্তর ৫৮ হইতে ৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুসলমান মত খণ্ডন, ৬২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হিন্দু মত খণ্ডন, ৬৬ পৃষ্ঠা হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত খ্রীষ্টান গুরু-কর্তৃক খ্রীষ্টধর্মান্তরিত মুসলমান ও হিন্দু শিষ্যদ্বয়কে খ্রীষ্টান জগতের ইতিহাস কথন ও রোমান-কাথলিক ধর্মের প্রাধান্য ও মহিমা কীর্তন; পৃ. ৯৮-৯৯-তে এক হিন্দু দৈবজ্ঞের সহিত এই গুরুর বাদ, এবং ৯৯-১২৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণের গণনা। পাদ্রি গেরঁ্যা ৫৮ হইতে ৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যে অংশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ভাষা ও ভাব উভয় দিক্‌ দিয়া সেই অংশ সম্বন্ধে এক কথায় সমালোচনা করা যায়—'বর্বর'।

'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর তৃতীয় সংস্করণের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমরা কেহ দেখি নাই—এতৎসম্পর্কে কিছু বলা গেল না।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৫)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান হিসাবে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ প্রচার ব্যপদেশে উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ওয়েলেসলি-প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই কেরীর যথার্থ সাধনা সুরু হয়। কেশবচন্দ্রের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন তাঁহার সুবিখ্যাত *A Dictionary in English and Bengalee* (১৮৩৪) গ্রন্থের ভূমিকায় (পৃ. ১৪) এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee language was made imperative on young Civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta; a number of books were supplied by the Serampore Press, which set the example of printing works in this and other eastern languages. The College Pundits following up the plan produced many excellent works. Amongst them the late *Mrityunjoy Vidyalankar,* the head Pundit of the College, was the most eminent. I must acknowledge here that whatever has been done towards the revival of the Bengalee language, its improvement, and in fact the establishing it as a language must be attributed to that excellent man Dr. Carey and his colle[a]gues, by whose liberality and great exertions many works have been carried through the Press and the general tone of the language of this province so greatly raised.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, পরিণতি ও বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং বিশদ আলোচনা ইংরেজী ভাষায় যথেষ্ট আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত আলোচনাও কেহ করেন নাই। অথচ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের কাহিনীই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার কথা। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিবরণ অধুনা দিল্লীতে ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় "Home Miscellaneous" দপ্তরে (৫৫৯-৭৭ সংখ্যক) "Proceedings of the College of Fort William" নামে রক্ষিত আছে। এই "প্রোসিডিংসের" কয়েকটি ভালুমের সন্ধান এখন না মিলিলেও বাংলা-সরকারের রেকর্ড অফিসের জেনারাল ডিপার্টমেন্টের "প্রোসিডিংস" হইতে উক্ত বিলুপ্ত অধ্যায়গুলি পূরণ করিয়া লওয়াও সম্ভব। পরবর্ত্তী কালে এই সকল কাগজপত্রের সহায়তায় W. S. Seton-Karr, C. S., Lt.-Col. G. S. A. Ranking, M. A., M. D. এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন। সীটন-কারের প্রবন্ধ *Calcutta Review*-এ (Vol. V, No. 9) "The College of Fort William" নামে প্রকাশিত হয়; Lt.-Col. Ranking-এর সুবিস্তৃত ইতিহাস কয়েক বৎসর কাল ধরিয়া *Bengal : Past & Present* পত্রিকায়* প্রকাশিত হয় এবং ব্রজেন্দ্রবাবুর *Dawn of New India* (1927) পুস্তকের ৯২-১২৬ পৃষ্ঠায় "The College of Fort William" প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত ভাইস-প্রোভোষ্টরূপে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস্ বুকানন, ডি. ডি.-সঙ্কলিত *The College of Fort William in Bengal* (London : 1805) পুস্তকে প্রথম চারি বৎসরের এবং কাউন্সিল অব দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়মের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি টমাস রোবাক্-প্রণীত *The Annals of the College of Fort William* (Calcutta : 1819) পুস্তকে সূত্রপাত হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্‌ব্যতীত *Rules and Regulations of the College of Fort William* 1841, Martin's *Wellesley Despatches* প্রভৃতি পুস্তকেও অনেক মালমশলা আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature* (1919) পুস্তকের ১১৭-২২৭ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর ভাষাবৈশিষ্ট্য লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনের *Western Influence in Bengali Literature* (1932) পুস্তকের "The College of Fort William" অধ্যায় (পৃ. ৫৩-৬২) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে লর্ড মর্নিংটন (মারকুইস অব ওয়েলেসলি) ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারাল রূপে কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার তুল্য সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে অধিক আসেন নাই। তিনি এদেশে আসিয়াই অনুভব করিলেন যে, কোম্পানীর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভারপ্রাপ্ত হইয়া বিলাত হইতে যাহারা আসে, তাহারা অধিকাংশই চৌদ্দ হইতে আঠার বৎসরের নাবালক, স্বদেশের বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই তাহারা প্রেরিত হয় এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া কাজের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার কোনও বন্দোবস্তই এখানে হয় না। প্রাচীন কর্ম্মচারীদের অসৎ দৃষ্টান্তে এবং কুশিক্ষায় এই অপরিণতবয়স্ক যুবকেরা সহজেই বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হইয়া কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে, শাসিতদের মধ্যে উত্তরোত্তর অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লর্ড ওয়েলেসলি ইহার

* "History of the College of Fort William from its first Foundation," 1911—vol. vii, pp. 1-29; "History of the College of Fort William," 1920—vol. xxi, pp. 160-200; "The History of the College of Fort William II," 1921—vol. xxiii, pp. 1-27; "The History of the College of Fort William III," 1921—vol. xxii, pp. 120-158; "The College of Fort William IV," 1921—vol. xxiii, pp. 84-153; "The College of Fort William V," 1922—vol. xxiv, pp. 112-138.

প্রতীকার করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে[১] পাবলিক ডিপার্টমেণ্টের একটি ইস্তাহার জারি হইল—

. . . from and after the 1st January 1801, no servant will be deemed eligible to any of the offices hereinafter mentioned, unless he shall have passed an examination (the nature of which will be hereafter determined), in the laws and regulations and in the languages, a knowledge of which is hereby declared to be an indispensable qualification.

"Languages" বলিতে প্রারম্ভে ফার্সী, হিন্দুস্থানী এবং বাংলা* বুঝাইত। ইস্তাহার জারির সঙ্গে সঙ্গেই লর্ড ওয়েলেসলি ইহা কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। বাংলা ভাষায় তখন পর্য্যন্ত কোনও ইংরেজের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি প্রসার লাভ করে নাই; হিন্দুস্থানীতে মিঃ জন্ গিলক্রাইস্ট যথেষ্ট প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহাকে লইয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন। হিন্দুস্থানী শিক্ষা দিবার জন্য জন্ গিলক্রাইস্ট তখন কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় (seminary) স্থাপন করিয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলেসলি ১৭৯৯ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে এই মর্ম্মে একটি ইস্তাহার জারি করিলেন যে, জুনিয়র সিভিল সার্ভেণ্টদিগকে জন্ গিলক্রাইস্টের বিদ্যালয়ে নিয়মিত হিন্দুস্থানীর পাঠ লইতে হইবে। এই ব্যবস্থার বিশেষ ফলাফল লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বেই মাত্র চার দিনের মধ্যেই ওয়েলেসলিকে টিপু স্থলতানের বিরুদ্ধে দক্ষিণ-ভারতে যুদ্ধযাত্রা করিতে হয়। ৪ঠা মে তারিখে টিপুর রাজধানী সেরিঙ্গাপট্টম্ দখল করিয়া ওয়েলেসলি বিজয়গর্ব্বে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরেই (অক্টোবর মাসে) শ্রীরামপুর মিশনরীদের শুভাগমন ঘটে এবং তাহারও দুই মাস পরে কেরীও শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। কোম্পানীর কর্ম্মচারী-দিগের বাংলাশিক্ষাব্যবস্থার যে অসুবিধা ওয়েলেসলি অনুভব করিতেছিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতে কলিকাতার অনতিদূরেই তাহার প্রতীকারের আয়োজন চলিতেছিল!

কলিকাতায় ফিরিয়া ওয়েলেসলি জন্ গিলক্রাইস্টের ছাত্রেরা কিরূপ শিক্ষা পাইতেছে, তাহার পরীক্ষার জন্য জি. এইচ. বার্লো, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডব্লু. কার্কপ্যাট্রিক, এন. বি. এডমনস্টোন এবং ডব্লু. সি. ব্ল্যাকেয়ারকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি ২৯এ জুলাই ১৮০০ তারিখে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহারা গিলক্রাইস্টের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলেন, ছাত্রেরা আশাতীত রকম উন্নতি করিয়াছে। এই রিপোর্ট পাইয়া লর্ড ওয়েলেসলি তাঁহার কল্পনাকে অবিলম্বে বাস্তব রূপ দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি এই ব্যাপারে এমনই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বিলাতে কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই এই বিদ্যালয়

১ ইস্তাহারে "২১এ ডিসেম্বর ১৭৯৮" এই তারিখ দেওয়া ছিল।

* "Persian and Hindoostanee for the Office of Judge or Register (*sic.*) of any Court of Justice: Bengali, for the office of Collector of Revenue or of Customs or Commercial Resident or Salt Agent in the provinces of Bengal or Orissa."

স্থাপন ও কয়েক জন শিক্ষক নিয়োগ করিয়া বসিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি কর্ত্তৃপক্ষের দরবারে তাঁহার বিখ্যাত "মিনিট" উপস্থাপিত করেন। অনেকে এই কারণে ভুল করিয়া ঐ তারিখটিকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার তারিখ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আসলে কলেজের কাজ সুরু হয় ঐ সালের ২৪এ নবেম্বর তারিখ হইতে। ভারতীয় কাউন্সিলে তিনি ৯ই জুলাই তারিখে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার প্রস্তাব পেশ করেন; তাঁহার উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া সদস্যেরা সকলে ডিরেক্টরদের নিকট ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া পাঠান এবং সেই সভাতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইয়া যায়। দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের গর্ব্ব তখনও ওয়েলেসলির পূরামাত্রায় বজায় ছিল, তিনি ৪ঠা মে তারিখটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য ৪ঠা মে তারিখ হইতেই কলেজের কাজ সুরু হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস ৪ঠা মে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮ই আগস্ট তারিখের মিনিটের নিম্নোদ্ধৃত অংশ উল্লেখযোগ্য :—

36. . . . Their education must therefore be of a mixed nature, its foundation must be judiciously laid in England, and the superstructure systematically completed in India.

48. Under all these circumstances the most deliberate and assiduous examination of all the important questions considered in this paper, determined the Governor-General to found a collegiate institution at Fort William by the following regulations :—

I. . . . the Most Noble Richard, Marquis of Wellesley, Knight of the Illustrious Order of Saint Patrick, etc., etc., Governor-General in Council, deeming the establishment of such an institution, and system of discipline, education, and study, to be requisite for the gool government and stability of the British Empire in India, and for the maintenance of the interests and honour of the Honourable the East India Company, his Lordship in Council hath therefore enacted as follows :—

II. A College is hereby founded at Fort William in Bengal, for the better instruction of the Junior Civil Servants of the Company, in such branches of literature, science, and knowledge as may be deemed necessary to qualify them for the discharge of the duties of the different offices, constituted for the administration of the government of the British possessions in the East Indies.

XV. Professorships shall be established as soon as may be practicable, and regular courses of lecture commenced in the following branches of literature, science, and knowledge :—

Arabic,)
Persian,)
Sunskrit,)
Hindoostanee,)
Bengalee,) Languages.
Telinga,)
Muhratta,)
Tamool,)
Kunura,)

Moohummudan law.
Hindoo law.
Ethics, civil jurisprudence, and the law of nations.
English law.
The regulations and laws enacted by the Governor-General in Council, ...
Political economy, . . .
Modern languages of Europe.
Greek, Latin, and English classics.
General history, ancient and modern.
The history and antiquities of Hindoostan, and Dukhun.
Natural history.
Botany, chemistry, and astronomy.

এই মিনিট হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, লর্ড ওয়েলেসলি এই প্রতিষ্ঠানকে মাত্র একটি কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই, একটি বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ইহাকে গড়িয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ নবেম্বর, সোমবার হইতে ওয়েলেসলি-পরিকল্পিত কলেজের কাজ সুরু হইল। তৎপূর্ব্বেই রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন কলেজের প্রোভোষ্ট, রেভারেণ্ড ক্লডিয়াস্ বুকানন সহকারী প্রোভোষ্ট এবং মিঃ জর্জ্জ বার্লো (কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর) এই প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ পরিচালক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যাইতে পারে যে, বুকানন এবং বার্লোর অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রভূত সফলতা লাভ করিয়াছিল।

ঐ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটের প্রোভোষ্ট চেম্বার্স হইতে ডেভিড ব্রাউনের স্বাক্ষরে অধ্যাপনা-বিষয়ক প্রথম ইস্তাহার জারি হয়। এই ইস্তাহারে ২৪এ নবেম্বর হইতে আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা বিষয়ক বক্তৃতারম্ভের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। গার্ডেন-রীচে কলেজের নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইবার কথা চলিতেছিল, কিন্তু তত দিন কলিকাতার মধ্যভাগে রাইটার্স বিল্ডিংসে এবং তথায় স্থান সঙ্কুলান না হইলে কাছাকাছি প্রয়োজনমত বাড়ী ভাড়া লইয়া কলেজের কাজ চলিবে, ইহাই স্থির হইল। আরম্ভ হইতেই ইহা "রেসিডেন্শিয়াল" কলেজ হওয়াতে অধ্যাপনার স্থান ছাড়াও ছাত্রদের বাসোপযোগী স্থানেরও বন্দোবস্ত রাখিতে হইত। কলেজের বিল-বহি হইতে দেখা যায় যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মধ্যেই ছাত্রদের বাসের জন্য কলেজের কাছাকাছি অন্ততঃ ছয়টি বাড়ী ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এগুলির অধিকাংশই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের (ডালহৌসী স্কোয়ার) আশেপাশেই ম্যাঙ্গো লেন, রাণী মুদী গলি (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট) প্রভৃতি রাস্তায় অবস্থিত ছিল। বাড়ীওয়ালাদের মধ্যে প্রেমচাঁদ বাঁড়ুজ্জে, ডব্লু গেনার্ড প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। স্কোয়ারের ধারে বাঁড়ুজ্জের দুইখানি বাড়ী ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১এ মে পর্য্যন্ত কলেজের দখলে ছিল। ঐ সালের জুন মাস হইতে জন্ ম্যাকডোনাল্ড নামক এক জন নৃত্যশিক্ষকের একটি বৃহৎ বাড়ী মাসিক ছয় শত টাকায় ভাড়া লওয়া হয়।

প্রথমে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌কেই কলেজ-গৃহে পরিণত করিবার প্রস্তাব কোর্ট অব ডিরেক্টর্স সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু ওয়েলেসলি তাঁহাদের জানাইলেন যে, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট দামে বা বন্দোবস্তে ঐ সৌধ ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া সম্ভব নহে। গার্ডেন-রীচের তিন-চারটি উদ্যান খরিদ করিয়া সেখানেই কলেজ ও ছাত্রদের বাসভবন নির্ম্মাণের বাসনা তাঁহার নিজের ছিল এবং তিনি জমি খরিদ করিয়াও বসিয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানীর "গোঁয়ার" ডিরেক্টরগণ অনাবশ্যক পড়াশুনার পিছনে এত টাকা ব্যয় করিতে রাজি না হওয়াতে শেষ পর্য্যন্ত কিছু লোকসান দিয়া সেই জমি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয় এবং রাইটার্স বিল্ডিংসেই কলেজের কাজ চলিতে থাকে।

বস্তুতঃ কোর্ট অব ডিরেক্টর্স গোড়া হইতেই ওয়েলেসলির এই কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরি-

চালনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওয়েলেসলি সূত্রপাতেই তাঁহাদের অনুমতি লন নাই বলিয়া তাঁহারা ভিতরে ভিতরে বিরূপ ছিলেন, তাছাড়া তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন মনে প্রাণে "বাণিয়া"—ব্যবসায়লব্ধ অর্থই ছিল তাঁহাদের পরমার্থ। ওয়েলেসলির প্যাচে পড়িয়া সাময়িক দুর্ব্বলতা-বশতঃ হঠাৎ রাজি হইয়াও তাঁহাদের মনে সোয়াস্তি ছিল না। কয়েক জন "চ্যাংড়া"কে "নেটিভ" ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বাৎসরিক এই প্রভূত অর্থব্যয় তাঁহারা বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনেকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, যেখানে পাঁচ দশ টাকা বেতন দিয়া সহজেই দোভাষী পাওয়া যায়, সেখানে এই অর্থ ও সময় নষ্ট করার কোনই মানে হয় না। ডিরেক্টরদের প্রাণের এই গোপন জ্বালা একটি পত্ররূপে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারি বিলাত হইতে প্রেরিত হইয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে সহসা কলিকাতায় বোমার মত ফাটিয়া পড়ে। তাঁহারা গবর্ণর-জেনারালকে অবিলম্বে কলেজ বন্ধ করিবার আদেশ দেন। ঐ বৎসরের ৫ই আগস্ট তারিখে ডিরেক্টরদের চেয়ারম্যানের নিকট ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অস্তিত্বের একান্ত আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া যে "ঐতিহাসিক" পত্র প্রেরণ করেন, কেবল মাত্র তাহার যুক্তি ও উচ্ছ্বাসের জোরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইয়াছিল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রোবাকের *The Annals of the College of Fort William* পুস্তকের xxvii-liii পৃষ্ঠায় এই পত্রখানি দেখিতে পাইবেন।

কলেজের সূত্রপাতে ১৮ই আগস্ট, ১৮০০ অধ্যাপকদের তালিকা এইরূপ—

জি. এইচ. বার্লো—গবর্ণর-জেনারাল কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ ভারতীয় আইন

এইচ. টি. কোলব্রুক—হিন্দু আইন ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

জন্ গিলক্রাইস্ট—হিন্দুস্থানী

উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক,
এন. বি. এডমনস্টোন ও
ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন
} —ফার্সী ভাষা ও সাহিত্য

জন্ বেলী—আর্বী, ফার্সী ও মুসলমানী আইন

ক্লডিয়াস্ বুকানন—গ্রীক্, লাটিন ও ইংরেজী ক্লাসিক্স্

২৪এ নবেম্বরের পূর্ব্বে (১৮০০) কলেজের আনুষঙ্গিক একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঠাগারে পুথি ও পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না। টিপু সুলতানের বিখ্যাত পুথি-সংগ্রহ প্রথমে এই পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। কৌতুকের বিষয় এই যে, অল্প কিছু দিন পরে দেখা যায়, টিপু সুলতান-সংগ্রহের মাত্র একটি পুথি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পাঠাগারে আছে, বাকী সমস্তই ইংলণ্ডে চালান দেওয়া হইয়াছিল।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ মে বোর্ড অব ডিরেক্টর্স একটি পত্রে (Public letter) হার্টফোর্ডের সন্নিকটবর্ত্তী হেলিবেরিতে কোম্পানীর রাইটারদিগকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের

সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উল্লিখিত হয় যে, যেহেতু হেলিবেরিতে রাইটারদের প্রাচ্য ভাষা ও আইন জ্ঞান নানা কারণে সম্পূর্ণ হইবার বাধা ঘটিতে পারে, এই হেতু কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি মাত্র তাহাদের উক্ত শিক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্যই বজায় রাখা হইবে, তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে কম খরচে পরিচালিত হইবে। এই ঘোষণার ফলে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাধান্য অনেকখানি কমিয়া যায়। পরে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন হইতে লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ইহার আরও দুর্গতি ঘটে এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই একদা-প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বোর্ড অব একজামিনার্সের অঙ্গীভূত হইয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। এই কলেজের ইতিহাসের অন্তভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মচারী-হিসাবে ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই কাহিনীর অধিক বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

উইলিয়ম কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

বাংলা ভাষার উন্নতি বিষয়ে এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের দান অসামান্য, বস্তুতঃ আমাদের কাল পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি কেবল এই কারণেই। কোম্পানীর রাইটার-দিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজ কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন পর্য্যন্তও বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার কোনও বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা-বিভাগের ভার লইতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্ত্তৃপক্ষ অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি উইলিয়ম কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারই নির্দ্দেশ-মত কলেজের প্রোভোষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে বাংলা-বিভাগের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। অনেক চিন্তার পর কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন। ১৮০১ সালের ১লা মে হইতে তিনি নিযুক্ত হন এবং ৪ঠা মে হইতে কলেজে যোগদান করেন। *

বাংলা-বিভাগে কেরীর সহকর্ম্মিরূপে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা এইরূপ—

শিক্ষক (Teacher)	···	উইলিয়ম কেরী	···	মাসিক ৫০০৲
প্রধান পণ্ডিত	···	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	··	মাসিক ২০০৲
দ্বিতীয় পণ্ডিত	···	রামনাথ বাচস্পতি	···	মাসিক ১০০৲

সহকারী পণ্ডিতগণ—শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র রাজীবলোচন [মুখোপাধ্যায়], কাশীনাথ [তর্কালঙ্কার ?], পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু। প্রত্যেকে মাসিক ৪০৲।

* জন ক্লার্ক মার্শম্যানের মতে ১২ই মে।

ইহাদের সকলকেই ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখ হইতে বাহাল করা হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত একখানি পত্রে দেখিতে পাই, ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও সময়ে মরাঠী ভাষার শিক্ষকতার ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয় এবং তাঁহার বেতন দুই শত টাকা বৃদ্ধি পাইয়া মাসিক সাত শত হয়। ১৮০৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখের "পাবলিক ডিস্‌পিউটেশনে" তাঁহার ছাত্রদের কৃতিত্ব দৃষ্টে তাঁহাকে হাজার টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ দেওয়ার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তৎকালে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি হেলিবেরি (হার্টফোর্ড) কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যয়সংক্ষেপ করিবার জন্য প্রোভোষ্ট, সহকারী প্রোভোষ্ট প্রভৃতি কয়েকটি মোটা মাহিনার পদ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই সময়েই (জানুয়ারি, ১৮০৭) কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক ও মরাঠী ভাষার শিক্ষকরূপে মাসিক ১০০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। রোবাক্ তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় পরিশিষ্টে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে বাংলা-বিভাগের অধ্যাপক ও মুন্‌শীদের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, পুরাতন কয়েক জন পণ্ডিতের নাম (মৃত বিধায়) নাই এবং নূতন কয়েক জনের নাম যুক্ত হইয়াছে। সেই তালিকাটি উদ্ধৃত হইল—

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী, ডি. ডি.—অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক মরাঠী
লেপ্‌টেনেণ্ট উইলিয়ম প্রাইস—সহকারী অধ্যাপক বাংলা ও সংস্কৃত, শিক্ষক ব্রজভাষা

রামনাথ ন্যায়বাচস্পতি	হেডপণ্ডিত	বাংলা	মে	১৮০১
রামজয় তর্কালঙ্কার	দ্বিতীয় পণ্ডিত	,,	জুলাই	১৮১৬
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়	পণ্ডিত	,,	মে	১৮০১
কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
পদ্মলোচন চূড়ামণি	,,	,,	মে	১৮০১
শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	,,	,,	নবেম্বর	১৮০৫
রামকুমার শিরোমণি	,,	,,	সেপ্টেম্বর	১৮০১
গদাধর তর্কবাগীশ	,,	,,	নবেম্বর	১৮০৫
রামচন্দ্র রায়	,,	,,	মার্চ	১৮০৩
নরোত্তম বসু	,,	,,	মার্চ	১৮০৩
কালীকুমার রায়	হস্তলিপি-শিক্ষক ও সে[illegible]াদার		মার্চ	১৮০৩
মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	নেটিব গ্রন্থাগারিক		অক্টোবর	১৮০৭

এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সঙ্গেই বাংলা-গদ্যের সম্পর্ক; সুতরাং আমরা কেবল সেই আলোচনাই করিব। এই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষক উইলিয়ম কেরীর জীবনেতিহাস অনুধাবন করিতে গিয়া তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তির আমরা উল্লেখ করিব মাত্র।

কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি সরকারী বিজ্ঞাপন এই মর্ম্মে প্রচারিত হয় যে, কলিকাতায় লর্ড ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক যে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের পণ্ডিতসম্প্রদায়কে সাদর আহ্বান করা হইতেছে ; তাঁহারা শিক্ষকতাকার্য্যে যোগদান করিলে সরকার খুশী হইবেন। পঞ্চাশ জনেরও অধিক পণ্ডিত ও মুন্‌শী এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন। মিঃ সাট্‌ক্লিফের নিকট ৪ঠা ডিসেম্বর (১৮০০) তারিখে লিখিত একটি পত্রে সর্ব্বপ্রথম এই কলেজের উল্লেখ দেখি। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

There is a College erected at Fort William, of which the Rev. D. Brown is appointed provost, and C. Buchanan, classical tutor : all the eastern languages are to be taught in it.

১৮০১ সালের ৮ই এপ্রিল তিনি সাট্‌ক্লিফকে যে পত্র লেখেন, তাহাতেই সর্ব্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের সম্ভাবনা বিষয়ে উল্লেখ করেন ; কারণ, ঐ তারিখেই ডেভিড ব্রাউনের অনুরোধ-পত্র তাঁহার নিকট পৌঁছে। ঐ সালের ১৫ই জুন ডক্টর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত পত্রে তিনি পূর্ব্বোক্ত ইঙ্গিতকে বিশদ করিয়া লেখেন—

What I have last mentioned requires some explanation, though you will probably hear of it before this reaches you. You must know, then, that a College was founded, last year, in Fort William, for the instruction of the junior civil servants of the Company, who are obliged to study in it three years after their arrival. I always highly approved of the institution, but never entertained a thought that I should be called to fill a station in it. The Rev. D. Brown is provost, and the Rev. Claudius Buchanan, vice-provost ; and, to my great surprise, I was asked to undertake the Bengali professorship. One morning, a letter from Mr. Brown came, inviting me to cross the water, to have some conversation with him upon this subject. I had just time to call our brethren together, who were of opinion that, for several reasons, I ought to accept it, provided it did not interfere with the work of the mission. I also knew myself to be incapable of filling such a station with reputation and propriety. I, however, went over, and honestly proposed all my fears and objections. Both Mr. Brown and Mr. Buchanan were of opinion that the cause of the mission would be furthered by it; and I was not able to reply to their arguments. . . . I, therefore, consented, with fear and trembling. They proposed me that day, or the next, to the Governor-General, who is patron and visitor of the College. They told him that I had been a missionary in the country for seven years or more; and as a missionary, I was appointed to the office. . . . When the appointment was made, I saw that I had a very important charge committed to me, and no books or helps of any kind to assist me. I, therefore, set about compiling a grammar, which is now half printed. I got Ram Boshu to compose a history of one of their Kings, the first prose book ever written in he Bengali language; which we are also printing. Our Pundit * has, also, nearly translated the Sunscrit fables, one or two of which brother Thomas sent you, which we are going to publish. These, with Mr. Foster's [Forster's] vocabulary, will prepare the way to reading their poetical books; so that I hope this difficulty will be

* অনেকে ভ্রমক্রমে "our pundit" অর্থে মৃত্যুঞ্জয়কে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আসলে কেরী গোলোক শর্ম্মাকেই "আমাদের পণ্ডিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

gotten through. But my ignorance of the way of conducting collegiate exercises is a great weight upon my mind. I have thirteen students in my class; I lecture twice a week, and have nearly gone through one term, not quite two months. It began May 4th. Most of the students have gotten through the accidents, and some have begun to translate Bengali into English. The examination begins this week. I am also appointed teacher of the Sunscrit language; and though no students have yet entered in that class, yet I must prepare for it. I am, therefore, writing a grammar of that language, which I must also print, if I should be able to get through with it, and perhaps a dictionary, which I began some years ago.

এই পত্র হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা শিক্ষকের পদে নিয়োগের দুই মাসের মধ্যেই কেরীকে সংস্কৃত শিক্ষকের পদও দেওয়া হয়। ঠিক এই সময়েই শ্রীরামপুর ডেনিশদের হাত হইতে ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।*

এত দিন পর্য্যন্ত ভাড়াটে বাড়ীতেই মিশনের কাজ চলিতেছিল, কিন্তু কাজের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে সঙ্কীর্ণ গৃহে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। তা ছাড়া কেরীর চাকুরীগত উপার্জ্জন এবং ছাপাখানার আয় মিলিয়া মিশনরীদের হাতে অনেক টাকাও তখন মজুত ছিল; সুতরাং মিশনের নিজস্ব বাড়ীর সন্ধান হইতে লাগিল। ১৮০১ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে মার্শম্যানের জর্নালে দেখিতেছি—

We agreed to purchase the adjoining house for 10,340 rupees. The garden, etc., contains more than four acres of land. By this addition we have room not only for our two schools, encreasing family, printing and binding business, but also for a number of new missionaries. We therefore thought it an object of some importance to secure it while it was offered.

১২ই অক্টোবর তারিখে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দিয়া এই বাড়ী ও জমি খরিদ করা হয়।

আমরা পূর্ব্বে হেস্টিংস-জোন্‌স-কোলব্রুক-উইলকিন্স প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, যে-শ্রদ্ধা লইয়া তাঁহারা ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালের মিশনরীদের তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর মিশনরীদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুৎসিত বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব। পাদরিদের সম্বন্ধে জনসাধারণের বিরুদ্ধ মনোভাবের মূলেও তাঁহাদের এই উগ্র মতবাদ। কেরী যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে

* Ward's Journal—May 8, 1801, "This morning, when the inhabitants were in profound sleep the English from the other side [Barrackpore] of the river came and hoisted the English flag, and quietly took possession of Serampore, without a gun firing, or a drum beating. At ten O'clock we and others were desired to appear at the government house. In the governor's hall we found several British officers, and in an adjoining room the new English governor, with Col. Bie, etc., standing by his side. We presented ourselves."

প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন। ১৮০২ সালের ১৭ই মার্চ তিনি কলিকাতা হইতে মিঃ সাট্‌ক্লিফকে লিখিয়াছিলেন—

I have been much astonished lately at the malignity of some of the infidel opposers of the Gospel, to see how ready they are to pick every flaw they can in the inspired writings, while these very persons will labour to reconcile the grossest contradictions in the writings accounted sacred by the Hindoos, and will stop to the meanest artifices in order to apologize for the numerous glaring falsehoods, and horrid violations of all decency and decorum, which abound in almost every page. Anything, it seems, will do with these men, but the word of God. They ridicule the figurative language of scripture, but will run allegory-mad in support of the most worthless productions that ever were published. I should think it time lost to translate any of them. An idea, however, of the advantage which the friends of Christianity may obtain by having these mysterious sacred nothings (which have maintained their celebrity so long merely by being kept from the inspection of any but interested brahmans) exposed to view, has induced me, among other things, to write the Sangskrit Grammar, and to begin a dictionary of that language. I sincerely pity the poor people, who are held by the chains of an implicit faith in the grossest of lies; and can scarcely help despising the wretched infidel who pleads in their favour, and trys to vindicate them. I have long wished to obtain a copy of the vades; [footnote : The most sacred writings of the Hindoos.] and am now in hopes I shall be able to procure all that are extant.........If I succeed, I shall be strongly tempted to publish them with a translation, pro bono publico.

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কয়েক জন ছাত্রও কেরীর দ্বারা উৎসাহিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছিলেন এবং তাহাদের কেহ কেহ হিন্দুধর্ম্মের অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য *Oriental Star* প্রভৃতি সংবাদপত্রে রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে মিঃ ল্যাং, কানিংহাম, লিণ্ডেম্যান ও রোল্টের নাম উল্লেখযোগ্য। এই বিরুদ্ধতার ফলে এদেশীয়দের সহিত এই বৈদেশিকদের সত্যকার হৃদয়ের পরিচয় ঘটিবার সুযোগ হয় নাই সত্য, কিন্তু ইহারা আমাদের কয়েকটি বীভৎস কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিয়াছিলেন; গঙ্গাসাগরে সন্তানবিসর্জ্জন ও সতীদাহ-প্রথা প্রকৃতপক্ষে ইহাদের চেষ্টাতেই দূর হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই কোম্পানীর গবর্মেণ্ট হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত এই সকল সামাজিক হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে অবহিত হইয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনরী-সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে কিছু প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। অনুসন্ধানের ভার উইলিয়ম কেরীর উপর দেওয়া হয়। কেরী দেখান যে, বৎসরে প্রায় ২০০০০ প্রাণীকে এই ভাবে হত্যা করা হয়। অনেকের বিশ্বাস, রামমোহন রায়ের চেষ্টাতেই সতীদাহ নিবারিত হইয়াছিল, কিন্তু কেরীর জীবনের কার্য্যকলাপের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, মূলতঃ এদেশে তাঁহার চেষ্টাতেই এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রচারকার্য্যের ফলেই ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তারিখে গবর্ণর জেনারাল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ-প্রথা-নিবারণী আইনে সহি করেন এবং এই বিষয়ে কেরীর উদ্যম ও অধ্যবসায়

স্মরণ করিয়া বারাকপুর হইতে নৌকাযোগে সেই দিনই এক জন দূতের হাতে উক্ত আইনটি শ্রীরামপুরে বৃদ্ধ কেরীর নিকট বাংলায় অনুবাদার্থ প্রেরণ করেন। সেই দিন রবিবার থাকা সত্ত্বেও বৃদ্ধ পাদরি সমস্ত দিনব্যাপী পরিশ্রমে অনুবাদকার্য্য সমাপ্ত করিয়া স্বয়ং তাহা বেণ্টিঙ্কের হাতে পৌঁছাইয়া দেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারি তারিখে মিশনের হরফখানায় পঞ্চানন ও মনোহর কর্ত্তৃক নাগরী হরফের সাট সম্পূর্ণ হয়। কলেজের তরফে এই সময়ের মধ্যেই বাংলা পাঠ্য-পুস্তক কয়েকটি মিশনের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল। অতঃপর সংস্কৃত ও নাগরী পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ঐ সালের ১লা এপ্রিল তারিখের ওয়ার্ড-লিখিত জর্নালে লিখিত আছে—

Brother Carey brings word from Calcutta that at the public examination before the Governor, the Bengalee students came off with great honour. Mr. Colebrooke has offered to lend brother Carey all the Vades which he has been able to procure, if we will print them: and this we have promised to do.

এবং ২রা জুন কেরী ফুলারের নিকট একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

We have had many things to print for the college, and are now contemplating an edition of the Vedas, if government will indemnify us for a hundred copies; of this we have hopes. The work will make about twenty volumes octavo, of five hundred pages each. We are materially assisted in these expensive undertakings by our school, the printing business, and my official engagements in the college; and by these means we find some employment for our native brethren.

এই বেদ মুদ্রণের অন্তরালে কোন্ উদ্দেশ্য কার্য্য করিতেছিল, আমরা তাহা দেখিয়াছি, এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহায়তায় কেরী ও মার্শম্যান সম্মিলিত ভাবে সংস্কৃত রামায়ণের যে সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারও উদ্দেশ্য ছিল —ইউরোপে এই মহৎ গ্রন্থের অসারতা প্রমাণ করা। কিন্তু কেরীর এই মনোভাব খুব অধিক দিন স্থায়ী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে করিতে এবং এদেশীয় পণ্ডিতগণের সহিত ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে কলেজের "পাবলিক ডিস্‌পিউটেশনস্"-এর শেষে তিনি সংস্কৃতে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে দেখিতে পাই, তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

Considered as the source of the colloquial tongues, the utility of the Shanscrit Language is evident; but as containing numerous treatises on the religion, jurisprudence, arts and sciences of the Hindoos, its importance is yet greater; especially to those to whom is committed, by this government, the province of legislation for the Natives; in order that being conversant with the Hindoo writings, and capable of referring to the original authorities, may propose, from time to time, the requisite modifications and improvements, in just accordance with existing Law and ancient Institution.

Shanscrit learning, say the Brahmans, is like an extensive forest, abounding with a great variety of beautiful foliage, splendid blossoms, and delicious fruits; but surrounded by a strong and thorny fence, which prevents those who are desirous of plucking its fruits or flowers, from entering in .

The learned Jones, Wilkins, and others, broke down this opposing fence in several places; but by the College of Fort William, a high-way has been made into the midst of the wood. . . . .

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ও মাননীয় পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করিয়া কেরী সংস্কৃত ভাষায় বলেন—

যেয়ং প্রাচীনভাষা কুমারিকাখণ্ডীয়পূর্ব্বকালীনসর্ব্বাধ্যক্ষান্ প্রতি আত্মপ্রকাশং কর্ত্তুমসম্মতাসীৎ সেয়ং ভাষা তবাজ্ঞয়া স্বকীয়সকলভাণ্ডারদ্বারং মুক্ত্বা অতিপূর্ব্বকালীনবিবরণবিধিবিদ্যাভিঃ পৃথ্বীং ধনবতীং করোতি।

This ancient language, which refused to disclose itself to the former Governors of India, unlocks its treasures at your command, and enriches the world with the history, learning, and scence of a distant age.

অস্মাকং বিদ্যাস্থানীয়নিরূপণস্য বর্দ্ধমানকর্ম্মণ্যতায়াঃ প্রমাণং যথা সম্প্রতি কৃতমাসীৎ ততোধিকং কদাপি কৃতং নাসীৎ এবং দূরদেশস্থাঃ সহস্রশঃ পণ্ডিতলোকা বিদ্যায়া এতদ্বৃদ্ধতাজয়েনাহ্লাদং করিষ্যন্তি।

অস্মাকং সাক্ষাৎ যদাশ্চর্য্যকৌতুকং প্রকাশিতমভবৎ তৎ কিং কিমিত্যস্য বিশেষঃ কথঙ্কারং কথিতো ভবেৎ।

কুমারিকাখণ্ডীয়সর্ব্বাধ্যক্ষস্যাসিয়ীয়স্য য়ুরোপীয়স্যাতিবিদুষো মহিমশালিলোকানাঞ্চ সভা কৃতাসীৎ তস্যাং সভায়ামস্মাকং জম্মদেশীয়ভাষয়ৈকাপি কথা কথিতা কৃতা ন ভবেৎ কিন্ত্বাসিয়ীয়নানাবিধ-ভাষাভির্ম্মহাবিষয়ে বাধরহিতা কথাবার্ত্তা কৃতা ভবেৎ। কথোপকথনাৎহিন্দুস্থানীয়ালঙ্কৃতপারশ্যবাণিজ্যোপ-যুক্তবঙ্গীয়বিদ্যাযুক্তারবীয়প্রাচীনসংস্কৃতভাষাসু ইঙ্গলণ্ডীয়যুবভিরভ্যস্তাসু সতীষু অনায়াসেন কথিতা আসতে। য়ুরোপে কিম্বান্যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদ্দেশে কুত্রচিৎ কালে বা কোপি বিদ্যালয়সমূহঃ কিমেতদ্রূপং অপূর্ব্বদর্শনীয়ত্বং প্রকাশিতং কৃতবান্ এবং এতেষাং যূনাং বিষয়ঃ কঃ কস্তে স্বাভাবিকমেধাভিঃ কিম্বা যশশ্চেষ্টাভিঃ সোদ্যোগীকৃতা ভূত্বা নিশ্চিতাশয়েন মৃতরূপভাষাজ্ঞানান্বেষকাঃ শিষ্যান্ কিন্তু যস্মিন্ যস্মিন্ দেশ এতা এতা ভাষা কথিতা আসতে তদ্দেশস্য রাজকর্ম্মণি নিয়োজিতা ভূত্বা তে তস্মিন্নেব কালে তদ্দেশস্য করগ্রহণবাণিজ্যকরণরূপরাজকর্ম্মণি এবং স্বস্বপদোপযুক্তসর্ব্বপ্রকার আলাপঃ প্রত্যালাপ-শ্চৈতৎকালপর্য্যন্তং যথা দ্বিভাষাবেদিদ্বারা কৃত আসীৎ ইদানীং তথা ন কিন্তু তত্তদ্দেশীয়লোকচলিত-ভাষাভিরেতাসাং সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং তৈঃ সহ করণে তৎকাল এব স্বকীয়প্রাপ্তবিদ্যা লগন্তি তত্তদেশস্থ-নিবেদকলোকানাং কর্ত্তৃনিকটে গমনপৃথকরণে তথা অস্মাকং রাজব্যবস্থাভিপ্রায়স্য সম্মুখনির্গতবাক্যৈ-রেবং বিষয়ানুসারেণ প্রকারান্তরলিখিতার্থস্য চ প্রকাশকরণে চাস্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যামূল্যং জ্ঞাতং ভবেৎ।

যে আসিয়ীয়পণ্ডিতলোকা অস্যাং সভায়াং তিষ্ঠন্তি তেষাং মধ্যে কেপি কেপি দূরদেশাদাগতাঃ সন্তি তে সর্ব্বে নূতনীয়যুবভিস্তত্তদ্দেশীয়ভাষাভির্ব্বিচারিতস্য মহাবিষয়স্য নূতনগুরুতরকথিতবাক্যানাঞ্চ শ্রবণে ন বিস্মিতাঃ সন্তি তৈরস্মচ্ছিষ্যাণাং প্রাপ্তবিদ্যায়াঃ সীমাবিচার ইদানীং কৃতো জায়েত।

অদ্যাতনবিদ্যাবিষয়কক্রিয়া এতদ্বিদ্যালয়বিষয়কযদ্যচ্চিন্তনং শ্রমোঽর্থব্যয়শ্চাভুং তং সকলং প্রচুরতররূপেণ শুধ্যতি এতদ্বিদ্যালয়ায় ব্যয়ো যদ্যন্যং সহস্রগুণাধিকো ভবেৎ তদাপি নীতিমদ্রাজকর্ম্মণ্যং যদতিশয়মহাফলং ভবিষ্যতি তত্তুল্যঃ স ব্যয়ঃ কদাপি ন ভবেৎ।

ইদানীং বৃদ্ধোঽহং কুমারিকাখণ্ডস্থানমধ্যে বহুদিনং বাসমকার্ষং দিনে দিনে অনেকলোকান্ প্রতি হিতোপদেশকরণায় ব্রাহ্মণৈঃ সহ সর্ব্ববিষয়ককথোপকথনায় কুমারিকাখণ্ডীয়বালকানাং খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মশিক্ষাকরণনিমিত্তকসকলপাঠশালাকর্ত্তৃত্বকরণায় চ প্রবৃত্তোঽহমস্মি। বঙ্গীয়ভাষা স্বদেশীয়ভাষাবৎ প্রায়ো ময়া কথিতা আসতে অনৈ্যবৈলের্ৌকৈরেতেষাং বিষয়ে যদ্যজ্জ্ঞানং প্রাপ্তং বহুকালাবধি এতদ্রাজ্যীয়নানাদেশস্থলোকৈঃ সহ ধারাবাহিকপরিচয়েন মম তদন্যূনসর্ব্ববিষয়কজ্ঞানং প্রাপ্তং প্রাপ্তকালোঽভবৎ অহমন্যদপি কথয়ামি যদ্যস্মিন্ দেশে জাতো ভবেয়ং তদা যথা তেষাং ব্যবহার-ক্রিয়াধারা অনুভবঞ্চ ময়া জ্ঞাতো ভবেৎ তদ্বৎ ইদানীং তৎ সর্ব্বং প্রায়ো জ্ঞাতমাস্তে।

এই বক্তৃতার মধ্যেই তিনি বলিতেছেন, "হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি···বঙ্গীয় ভাষা আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ত হইয়াছে। এই সুদীর্ঘ কাল এদেশবাসীদের সহিত এখানে [বঙ্গদেশে] এবং এই সাম্রাজ্যের অন্যত্র ঘনিষ্ঠতার ফলে আমার এমন সকল বিষয় জানিবার সুযোগ হইয়াছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ কাহারও হইয়াছে কি না সন্দেহ। আমি এখন নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে, এদেশের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত আমি এমনই পরিচিত হইয়াছি যে, সময়ে সময়ে নিজেকেই এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।"

এবং এই কেরীই ১৮২৫ সালের ৯ই ডিসেম্বর মিঃ ডায়ারের নিকট লিখিত একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

. . . . my heart is wedded to India; and though I am of little use, I feel a pleasure in doing the little I can . . . .

শ্রীরামপুর-মিশনের পাদরি হিসাবে উইলিয়ম কেরীর মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া আমরা পীড়িত হই, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপনা করিতে করিতে তাঁহাকে ধীরে ধীরে সেই সঙ্কীর্ণতা-বিমুক্ত দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। বস্তুতঃ এই কলেজের জন্যই বাংলা দেশ কেরীকে নিবিড়ভাবে আপনার করিয়া পাইয়াছিল, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সেদিক্ দিয়াও কম সার্থক নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর যত্নে এবং উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা কেরীর মনোভাব পরিবর্ত্তন প্রসঙ্গ এমন বিস্তৃত ভাবে উপরে আলোচনা করিলাম।

উইলিয়ম কেরী স্বয়ং ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার ভগিনীদের নিকট কলিকাতা শহরের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি বলিয়াছেন—

The college is the next institution of public utility. There is no building erected for it, but a number of houses are rented by government for the purpose. It contains

a common hall, lecture rooms, where the Arabic, Persian, Sunscrit, Bengali, Hindusthani, Tamul, and the modern languages of Europe are taught; and lectures on philosophy, chemistry, and the arts are delivered. There are chambers for the different officers, and a good library, which will, no doubt, much increase, if the institution be continued. This bids fair to be of the most essential benefit to the country, by furnishing the Company's servants with a knowledge of the languages and manners of India. Their characters and abilities are also known to government, before they are appointed to any office.

যে সংস্কৃত রামায়ণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার কাজ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই সুরু হয়। ঐ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখে সাট্‌ক্লিফের নিকট লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

Some new sources of income are opening here. The Council of the College have petitioned government for an enlargement of my salary, and some of the gentlemen feel much interested therein. One of them told me that he had spoken personally to Lord Cornwallis about it. The College and the Asiatic Society have agreed to allow us a stipend of three hundred rupees per month, to assist us in translating and printing the Sunscrit writings, accounted sacred or scientific. We have begun the Ramayunu, the most ancient poem in the Sunscrit language. Sir John Anstruther showed me, to-day, a letter which he, as president of the Asiatic Society, and by desire of the College, intends to address to all the learned societies and bodies in Europe, to recommend the work. The three hundred rupees per month is independent of the sale of the books. The copy will be ours, and all profits on the sale. The Sunscrit text will be printed on one page, and the translation, with notes, on the other.

এই পত্রের শেষাংশে কেরীর তৎকালীন বিবিধ কার্য্যাবলীর একটি তালিকা আছে। কেরী কি পরিমাণ যত্ন ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কলেজের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় হিসাবে এই অংশ মূল্যবান্। তিনি লিখিতেছেন—

You may, perhaps, wonder that I write no more letters; but when you see what I am engaged in, you will cease to be surprised. I translate into Bengali, and from Sunscrit into English, *viz.*, the Ramayunu. I have also begun an attempt at translating the Veds. I must collate copies; every proof-sheet of the Bengali and Mahratta scriptures, the Sunscrit grammar, and the Ramayunu, must go three times, at least, through my hands. A dictionary of the Sunscrit, which is edited by Mr. Colebrooke, goes once, at least, through my hands. I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged; and a Mahratta grammar; and collected materials for a Mahratta dictionary.

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কেরী সাট্‌ক্লিফকে লিখিতেছেন—

Until lately I was teacher of three languages in the college, on a monthly salary of five hundred rupees per month; but, on the 1st of January past, I was, by the governor-general in council, appointed professor of the Sunscrit and Bengali languages, to which the Mahratta is added, though not specified in the official letter, with a salary of one thousand rupees per month.

১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট লিখিত পত্রে কেরীর ব্যাকরণ ও অভিধান রচনাবিষয়ক অনেক কথা আছে।

The necessity which lies upon me of acquiring so many languages, obliges me to study and write out the grammar of each of them, and to attend closely to all their irregularities and peculiarities. I have therefore published grammars of three of them, the Sunscrit, the Bengali, and Mahratta. I intend also to publish grammars of the others, and have now in the press a grammar of the Telinga language, and another of that of the Seeks, and have begun one of the Orissa language. To these I intend in time to add those of the Kurnata, the Kashmeera, and Nepala, and perhaps the Assam languages. I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to 256 pages quarto, and am not nearly through he first letter. That letter, however, begins more words than any two others. I am contemplating, and indeed have been long collecting materials for a universal dictionary of the oriental languages, derived from the Sunscrit, of which that language is to be the ground-work, and to give the corresponding Greek and Hebrew words. I wish much to do this, for the sake of assisting biblical students to correct the translation of the bible in the oriental languages, after we are dead, but which can scarcely be done without something of this kind; and perhaps another person may not, in the space of a century, have the advantages for a work of this nature than I now have.

অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী কেরী অমানুষিক চেষ্টায় এই শেষোক্ত "Universal Dictionary"খানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; গোড়ার উদ্দেশ্য অনুযায়ী হিব্রু ও গ্রীক প্রতিশব্দ যোজনা করিতে না পারিলেও এই অসাধারণ পুরুষ (১) সংস্কৃত, (২) কাশ্মীরভাষা, (৩) পঞ্জাবের অন্তর্গত জালন্ধর ভাষা, (৪) মধ্যদেশভাষা, (৫) পার্ব্বতী ভাষা, (৬) মিথিলা-ভাষা, (৭) বাঙ্গালা ভাষা, (৮) উৎকলভাষা, (৯) মহারাষ্ট্রভাষা, (১০) কর্ণাটক ভাষা, (১১) গুর্জ্জরভাষা, (১২) তৈলঙ্গভাষা ও (১৩) দ্রাবিড়ভাষা, মোট এই তেরটি ভারতীয় ভাষার এক বিরাট্ শব্দকোষ সম্পূর্ণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১২ সালের ১২ মার্চ তারিখে শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানায় আগুন লাগিয়া অন্যান্য বহু মূল্যবান্ পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এই শব্দকোষের অর্দ্ধেকাংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। এই পাণ্ডুলিপি ধ্বংস হওয়ায় কেরী বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজের বোর্ডরুমে কাচের শো-কেসে এ শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ 'পলিগ্লট ভোকাবুলারি' নামে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। আমরা কেরীর বিচিত্র কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় পাঠককে দিবার জন্য উক্ত শব্দকোষের একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এখানে প্রকাশ করিলাম। সমস্ত পৃষ্ঠার একটানা ফোটো লওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়া উহা দুই অংশে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল, দুটি মিলাইলেই এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি হইবে।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নৈহাটীস্থ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কার

'বন্দে মাতরম্'এর ঋষি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বসিয়া সাহিত্য-সাধনা করিতেন, সেই বৈঠকখানা বাটী ও তলস্থ জমি এখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে ন্যাস-রূপে অর্পিত। ঐ সম্পত্তি বাঙ্গালার একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ্। বাটীটি কিন্তু অতি জীর্ণ হইয়াছে। ইহার আমূল সংস্কার ও সংরক্ষণ অচিরেই করিতে হইবে, নচেৎ এই বর্ষায় বাটী ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। সংস্কারকার্য্যের জন্য ২০০০৲ টাকার প্রয়োজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিমধ্যেই সংস্কারের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং তিন শত টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। আরও ১৭০০৲ টাকা চাই।

আমরা বঙ্গভাষানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির রক্ষাকল্পে সাহায্য করিতে অনুনয় করিতেছি। যাঁহার যাহা সাধ্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে সত্বর পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি

সুলভে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

আগামী ১৩৪৬ আষাঢ় পর্য্যন্ত পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট সর্ব্বসাধারণকে বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ গ্রহণ করিতে হইলে উহাদের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদস্যপক্ষে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধারণের পক্ষে উহাদের মূল্য স্বতন্ত্র।

১ নং সেট—পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১৶০ স্থলে ॥৶০

২ নং সেট—কৌলমার্গরহস্য ১।০, কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ৸০, ধর্ম্মপূজাবিধান ॥০, গোরক্ষ-বিজয় ॥০, মৃগলুব্ধ ৶০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০। মোট ৩।৶০ স্থলে ৭।০

৩ নং সেট—সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, সংকীর্ত্তনামৃত ॥৶০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয় ।০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০, মনোবিজ্ঞান ১৲। মোট ৫৸০ স্থলে ২॥০

৪ নং সেট—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১।০, গ্রহগণিত ২৲, উদ্ভিদজ্ঞান (১ম ও ২য়) ১।০, নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ৷৶০, লেখমালানুক্রমণী ॥০। মোট ৫৸৶০ স্থলে ২৷০

৫ নং সেট—মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ ১৶০, তীর্থমঙ্গল ।৶০, কবি হেমচন্দ্র ॥৶০। মোট ৪৶০ স্থলে ৭।০

৬ নং সেট—সংকীর্ত্তনামৃত ॥৶০, শ্রীকৃষ্ণবিলাস ॥৶০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ।০, সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, মৃগলুব্ধ ৶০, মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, মনোবিজ্ঞান ১৲, তীর্থমঙ্গল ।৶০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০। মোট ৯৲ স্থলে ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

ইহাতে থাকিবে—বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ—বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সকল গ্রন্থ—সাময়িক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্রাদি—সমসাময়িক গ্রন্থে বঙ্কিম-রচিত ভূমিকা।

বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল, তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইবে, পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ থাকিবে এবং যেখানে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইবে।

সম্পাদন-বিভাগ।—সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মূল্য দুই কিস্তিতে দেয়। প্রথম কিস্তির ১২৷৷০ টাকা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হইবে, বারখানি গ্রন্থ পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১২৷৷০ টাকা দিতে হইবে। ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৲ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ (১৫৲ করিয়া দুই কিস্তিতে দেয়) দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী দশ-এগারটি খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। বাঁধানো পাঁচ খণ্ড পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১৫৲ টাকা দিতে হইবে। এই সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, ইংরেজী-বাংলা হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি প্রভৃতি থাকিবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ দশ-এগারটি খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—ইহা ছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে :—**কপালকুণ্ডলা**—১৷০, **সাম্য**—৸০, **বিজ্ঞান-রহস্য**—৸০, **আনন্দমঠ**—১৸০, **কমলাকান্ত**—১৷০, **দুর্গেশনন্দিনী**—২৲, এবং **মৃণালিনী**—২৲

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল

সহকারী সভাপতিগণ

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্
মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ
রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর
শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, সি-আই-ই
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ
শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল
শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস
কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস
পুথিশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর-এ
শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়

পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, ২। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ৩। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ৪। শ্রীযুক্ত অমল হোম, ৫। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্‌সি, ৭। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ৮। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৯। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দৌস্তেন, জি-এস্, ১০। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, এম-এ, ১১। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই, ১৩। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৪। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৫। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি, ১৬। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার, ১৭। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৯। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত, এম-এস্‌সি, বি-এল, ২০। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, বি-এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল ২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৬শ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

= বঙ্গীয়-সাহিত্য গ্রন্থাবলী

(মূল্যতালিকা ঃ পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ৩৲, ৪৲

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ,
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ৫৲, ৬৷৹

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬৷৹, ৮৷৹

চণ্ডীদাস-পদাবলী ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২৷৹, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩৷৹, ৪৷৹

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩৷৹, ৪৷৹
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩৷৹
৩য় খণ্ড— ২৷৹, ৩৷৹

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২৷৹

দেশীয় সাময়িক-পত্রের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৷৹, ৸৹

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাসের
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ৷৶৹

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ১৲, ১৷৹

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১৷৹

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১৷৹

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১৷৹

জ্যোতিষদর্পণ
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১৷৹

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২৷৹

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in
the Museum of the Bangiya
Sahitya Parishad—
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩ খণ্ড)
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু ১৷৹, ২৷৹

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত ৸৹, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১৷৹

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত ৷৹, ৸৹

কুরল
শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত ১৸৹, ২৷৹

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬৷৹

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৷৹, ২৲

বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া (যন্ত্রস্থ)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত ২৲

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের

গ্রন্থাবলী

বাংলা দেশে সতীদাহের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বাংলা দেশে বেদান্ত-চর্চ্চার পুনরুদ্ধার যাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, বাংলা-গদ্যের যিনি প্রথম সক্ষম শিল্পী, সেই মহাপুরুষের সমগ্র রচনাবলী।

মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা

*　　*　　*

শ্রীসজনীকান্ত দাস-সম্পাদিত

কৃপার শাস্ত্রের অর্থ-ভেদ

(১৭৪৩ সনে প্রকাশিত রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ)

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত

ভূমিকা ও টীকা সম্বলিত

বাংলা ও রোমান উভয় হরফেই

মূল্য পাঁচ টাকা।

দশভুজা

[illegible]৪ সনে প্রকাশিত 'গৌরীবিলাস' পুস্তকে মুদ্রিত লাইন এনগ্রেভিং হইতে

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৪৬

মুসলমান-যুগের ভারতের ঐতিহাসিকগণ

শ্রীযদুনাথ সরকার, এম. এ, ডি. লিট্

(তৃতীয় স্তবক)

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফার্সী ইতিহাসের বিশেষত্ব

মুঘল বাদশাহদের প্রাধান্যের সময় যে দুইটি বিশেষ শ্রেণীর ইতিহাস রচিত হয়, তাহার কথা দ্বিতীয় ব্যাখ্যানে বলিয়াছি। প্রথমটি 'আকবর-নামা'র দৃষ্টান্তে রচিত বাদশাহের সরকারী ইতিহাস-গ্রন্থ; দ্বিতীয়টি 'পত্র ও সংবাদ-পত্র', যাহাকে ইংরাজীতে ডেস্প্যাচ এবং নিউস্-লেটার বলে, সেই শ্রেণীর উপাদান। কিন্তু ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরংজীবের মৃত্যুর পর হইতে মুঘল বাদশাহদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল, সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিল। তাঁহার পুত্র বাহাদুর শাহের পাঁচ বৎসর রাজত্ব (১৭০৭—১৭১২) পর্য্যন্ত রাজার ক্ষমতা ও ঠাট কোন রকমে বজায় ছিল, কিন্তু বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর হইতে যে অবিরত ঘরোয়া যুদ্ধ, মন্ত্রীদের আধিপত্য লইয়া বিবাদ ও পরস্পরের গলাকাটাকাটি, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের বিদ্রোহ, সর্ব্বত্র লুঠতরাজ ডাকাতি ও খাজনা দেওয়া বন্ধ আরম্ভ হইল,—তাহা কিছুতেই নিবারিত হইল না। যা-ও বা একটু বাকী ছিল, তাহা নাদির শাহ ও আবদালীর আক্রমণ মারাঠাদের উত্তর-ভারতে ঘন ঘন অভিযান এবং প্রদেশ-দখল, এবং জাঠ ও শিখ অভ্যুত্থানের ফলে একেবারে শেষ হইয়া গেল। অর্থাৎ বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর ৭০ বৎসরের মধ্যেই হিন্দুস্থানের বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে পুতুলের মতই নির্জ্জীব হইয়া পড়িলেন; তাঁহার সাম্রাজ্য-সীমা কয়েকটি গ্রামে আসিয়া ঠেকিল; রাজকোষ শূন্য হইল, রাজসৈন্য লোপ পাইল, বাদশাহ বেগম নবাব সকলেই অনাহারে শুকাইতে লাগিলেন, দেশময় দৈন্য ও অশান্তি ছড়াইয়া পড়িল।

এরূপ অবস্থায় আকবর-শাহজাহানী যুগের ধরণের ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বাহাদুর শাহ যদিও একটা 'বাহাদুর শাহ-নামা' লিখাইতে আরম্ভ করিয়া দেন, (দানিশমন্দ খাঁ আলীর দ্বারা), দেড় বৎসরের ঘটনা বর্ণিত হইবার পর তাহার রচনা অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার পরে আর কোন বাদশাহের যথার্থ "নামা" লেখা হয় নাই। সত্য বটে, সেই সব পরবর্ত্তী বাদশাহের নামের

সঙ্গে "নামা" এই শব্দ যোগ দেওয়া কতকগুলি ফার্সী ইতিহাস-গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি আবুল-ফজলের 'আকবর-নামা'র সহিত তুলনার অযোগ্য, তাহাদের রচনার সময় অতি অল্প পরিমাণেই সরকারী দলিলের সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের আকারও নিতান্ত ছোট। তথাপি, আগেকার সেই বিখ্যাত মুঘল বাদশাহদের গৌরবান্বিত যুগের ঐতিহাসিক ধারা রক্ষা করিবার জন্য অতি ক্ষুদ্র আকারের এই সব ক্ষুদ্র চেষ্টা আমাদের অবহেলার জিনিষ নহে; তবে আমরা এগুলিকে "নামা" শ্রেণীর লেখার মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না। তাকিয়ায় ঠেস দিয়া লক্ষ্ণৌর সুবাসিত তামাক গুড়গুড়ির দীর্ঘ নল দিয়া সেবন করা, আর পয়সায় পঁচিশটা বিড়ি কিনিয়া পথের ধারে দোকানের আগুনে তাহা জ্বালাইয়া ফুঁকিতে থাকা—এ দুটাই যেমন ধূমপান বটে, কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ফলতঃ এই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভগ্ন "নামা"গুলিতে আছে তারিখ ও কিছু কিছু ছোটখাট ঘটনা, যেমন বাজারে চলিত ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের সংক্ষিপ্তসারে দেখিতে পাই; নাই শুধু সেই আকবরী শাহজাহানী "নামা"গুলির চিন্তা, বর্ণনা এবং পূর্ণ অবয়ব। তথাপি এই সব অকুলীন নবীন "নামা" আমাদের পক্ষে অন্ধকারে ডিব্‌বীর আলো, ইহাদের ছাড়িলে কোন কোন রাজত্বকাল-বিষয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী একেবারে নিঃসম্বল অসহায় হইয়া পড়িবেন।

আগেই বলিয়াছি যে, বাদশাহদের গৌরবের যুগে নানা স্থান হইতে সংবাদ ও সরকারী চিঠি তাঁহাদের দরবারে আসিয়া পৌছিত, অসংখ্য বিভাগ ও কারখানার হিসাবপত্র ও রিপোর্ট রাজধানীস্থ রেকর্ড অফিসে জমা হইত; এবং যখন বাদশাহ নিজ রাজত্বকালের ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন বিখ্যাত ফার্সী লেখককে নিযুক্ত করিতেন, সেই লেখকের সম্মুখে এই সমস্ত দপ্তর খুলিয়া দেওয়া হইত, তিনি তাহা ঘাঁটিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেন, এবং দরকার-মত দেওয়ান বখ্‌শীদের জিজ্ঞাসা করিয়া আরও সংবাদ লইতেন। কিন্তু ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অর্থের অভাবে, শান্তির অভাবে, লোকের অভাবে, এই সব শ্রেণীর সরকারী কাগজপত্র লেখা ও একত্র করা প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, অতি সামান্য পরিমাণে অত্যাবশ্যক হিসাবপত্র মাত্র লেখা হইতে থাকিল। সুতরাং "নামা"গুলি এবং "নামা"র প্রধান উপকরণ একসঙ্গে লোপ পাইল।

কিন্তু তাহার পর আরও ১৮ বৎসর ধরিয়া বাদশাহী দরবারের রিপোর্ট—নাম 'আখবারাৎ-ই-দরবার্‌-ই-মুয়া'লা' পূর্ণ জোরে লেখা হইতে লাগিল। এগুলি করদ রাজাদের জন্য তাঁহাদের ওয়াকেয়া-নবিসেরা বাদশাহী দরবার হইতে লিখিয়া পাঠাইত, এগুলি বাদশাহের গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি নহে এবং সরকারী দপ্তরখানাতে রক্ষিত হইত না। কিন্তু করদ রাজাদের মধ্যে তখন হইতে সিপাহী-বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এত বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে যে, একমাত্র জয়পুর ভিন্ন আর সব রাজা নবাবদের রাজধানী হইতে এই আখ্‌বারাৎগুলি লোপ পাইয়াছে। এবং জয়পুরেও এগুলি একেবারে সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক শ্রেণীতে নাই, তাহাদের মধ্যে অনেক মাস, এমন কি, বৎসর পর্য্যন্ত ফাঁক দেখা যাইতেছে। লক্ষ্ণৌ দিল্লী

ঝঝ্‌ঝর প্রভৃতি রাজধানী সিপাই-বিদ্রোহের সময় ধ্বংস হয়। নিজাম মাত্র ১৭২৪ সালে স্বাধীন হন, এবং তাহার পর প্রায় ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি নানা স্থানে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহার দপ্তরদারগণ প্রথমে আওরঙ্গাবাদে বাস করে, সেখানে তাঁহার অধিকাংশ রেকর্ড নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর ছোট ছোট সামন্তদের ত কথাই নাই। তাই আজ জয়পুর রাজদপ্তরই আমাদের একমাত্র সম্বল। সৌভাগ্যবশতঃ ১৯২৩ সাল হইতে অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এগুলি গোছান, বাঁচান এবং ঐতিহাসিকের চোখের সামনে আনান হইয়াছে।

১৭৩০ সালে মালব প্রদেশ মারাঠাদের হাতে গেল, দক্ষিণ হইতে দিল্লী আগ্রা যাইবার পথ শত্রুর পক্ষে খোলা হইল, এবং মারাঠারা পঞ্জাব বাঙ্গলা পর্য্যন্ত লুঠ ও দখল করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। প্রকৃত প্রস্তাবে মুঘল সাম্রাজ্য গেল, সুতরাং এ সাম্রাজ্যের রীতিমত ইতিহাস রচনা একটি অর্থহীন ব্যঙ্গ মাত্র, অনাবশ্যক কাজ মাত্র হইয়া দাঁড়াইল। তবে প্রধান প্রধান ধাক্কার, বিপ্লবের খণ্ড ইতিহাস রচিত হইতে থাকিল; আমি তাহাদের "সত্যঘটনামূলক ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক" বলিতে চাই। এই সময়ে একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় এই যে, ১৭৩৬ হইতে অল্প অল্প এবং ১৭৫০ হইতে পূর্ণবেগে মারাঠাদের লিখিত সরকারী রেকর্ড হইতে উত্তর-ভারতের উপর ঐতিহাসিক আলোক পড়িতে থাকিল। অর্থাৎ এক দিকে জয়পুরের রাজদপ্তর, অপর দিকে পেশোয়াদের দপ্তর গবেষণাকারীর জ্ঞানপিপাসা পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

ইংরাজদের পৃষ্ঠপোষকতা

তাহার পর চল্লিশ বৎসর কাটিয়া গেল, আন্দাজ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে দেখা গেল যে, ইংরাজ উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে স্বাধীন শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; নবাব শূজা-উদ্‌-দৌলার মৃত্যুর পর তাঁহারাই অযোধ্যা-রাজ্যের রক্ষকরূপে সেই সঙ্কীর্ণ মুঘল-সাম্রাজ্যের সীমানায়, দিল্লী-আগ্রার সামনে যমুনার পূর্ব্বপারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কানপুর ফরাক্কাবাদ এলাহাবাদে তাঁহাদের সৈন্য-ছাউনি। সুতরাং দিল্লী-সাম্রাজ্যের উপর অন্য দিক্ হইতে যে ঝড় আসিয়া পড়ে, তাহার ধাক্কা ইংরাজ কোম্পানীর গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ অনুভব করেন। আত্মরক্ষার্থ ইংরাজ সরকার এখন হইতে পশ্চিমের দক্ষিণের সব দেশী রাজ্যে সংবাদ-লেখক রাখিয়া দিলেন; তাহাদের রিপোর্ট এবং দেশী রাজাদের লিখিত কোম্পানীর নামে চিঠি,—অধিকাংশই সাহায্যভিক্ষা—কলিকাতার রেকর্ড অফিসে জমিতে লাগিল। এগুলি সব ফার্সীতে লেখা, ইহাদের ইংরাজী সারসংগ্রহ এখন ছাপা হইয়াছে, ছয় ভলুমে ১৭৫৮ হইতে ১৭৮৫ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে (তাহার মধ্যে প্রথম দশ বৎসর বড় ফাঁকা ফাঁকা এবং অকেজো)। এই গ্রন্থের নাম *Calendar of Persian Correspondence* (Imperial Records, New Delhi.)

আর ১৭৬৫ হইতে এলাহাবাদে এবং ১৭৭৫ হইতে লক্ষ্ণৌ, ফররুকাবাদে—সময়ে সময়ে আগ্রাতেও—সাহেব কর্ম্মচারীরা অজস্র টাকা ও প্রতিপত্তির জোরে ঐতিহাসিক বা সুচিত্রিত সুলিখিত অন্যান্য ফার্সী হস্তলিপি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য ফার্সীনবিস উমেদারগণ ফার্সী ভাষায় ইতিহাস লিখিয়া (অথবা বাড়ী হইতে পূর্ব্বে রচিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া) তাঁহাদের উপহার দিয়া নিজের চাকরির পথ সুগম করিয়া দিল। বিশেষতঃ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে পাঠান ঘুলাম কাদির কর্ত্তৃক দিল্লী দখল, বাদশাহ শাহ্ আলমের চক্ষু উৎপাটন, রাজপরিবারে লুঠ ও রাজপরিজনের অবমাননার লোমহর্ষক কাহিনী ভারতে ও ভারতের বাহিরে সাহেব-মহলে অতীব চাঞ্চল্য ও কৌতূহল সৃষ্টি করিল। এ ধারে ঠিক পর-বৎসরেই বিলাতে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হইল। সেখানেও রাজপরিবার লাঞ্ছিত নিহত হইল, আমীর-ওমরা লুণ্ঠিত বন্দী নিহত বা নির্যাতিত হইল। এজন্য ভারতে ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মুনশীদিগকে ঐ মুঘল সম্রাট্দের শেষ অবস্থার ইতিহাস লিখিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বিদেশী উৎসাহে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর করুণ যুগের কয়েকখানি অমূল্য ইতিহাস পাইয়াছি। তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম করিব—

(১) সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের দুধ-ভাই (অর্থাৎ ধাত্রীপুত্র) মুহম্মদ বখ্শ (ছদ্মনাম "আশোব্")-কৃত ঐ সম্রাটের ইতিহাস, নাদির শাহের আক্রমণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবরণ ইহাতে আছে। জগতে একমাত্র হস্তলিপি রক্ষা পাইয়াছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে।

(২) ইউসুফ আলী-রচিত আলিবর্দ্দী খাঁর কাহিনী।

(৩) ফকীর খয়ের-উদ্দীন-রচিত 'ইবরৎনামা'—মাহাদজী সিন্ধিয়া, ঘুলাম কাদির, ডি বয়ে প্রভৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান ও অতুলনীয় উপাদান। হস্তলিপি।

(৪) ঘুলাম আলী-রচিত 'ইমাদ-উস্-সাদাৎ', প্রধানতঃ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদের লইয়া, কিন্তু দিল্লী, মারাঠা, জাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু সংবাদ আছে। লিথো হইয়াছে।

(৫) পাণিপথ-যুদ্ধ বিষয়ে কাশীরাজের ফার্সী বিবরণ, ফার্সীতে অমূল্য গ্রন্থ; মারাঠী সরকারী কাগজপত্রে ইহার শতাংশ সংবাদও পাওয়া যায় না।

(৬) সুবিখ্যাত 'সিয়ার-উল্-মুতাখ্খরীণ,' বঙ্গ বিহার সম্বন্ধে অমূল্য উপকরণ।

(৭) মালদহে উড্নী (Udney) সাহেবের জন্য লিখিত বাঙ্গলার সম্পূর্ণ ইতিহাস 'রিয়াজ্-উস্-সালাতীন'—যাহার ইংরেজী চুম্বক ষ্টুয়ার্ট-কৃত *History of Bengal* এত দিন পর্য্যন্ত আমাদের একমাত্র সম্বল ছিল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের পোষ্যরূপে বাদশাহ শাহ্ আলম এলাহাবাদ-দুর্গে আশ্রয় লইলেন, এই দুর্গ ও শহর ইংরাজের শাসনে ও রক্ষায় থাকিল। ১৭৭১ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ছয় বৎসর বাদশাহ ওখানে থাকায় ভারতীয় রাজন্যগণের দৃষ্টি এলাহাবাদের দিকে নিবিষ্ট ছিল, কত দূত ও লেখক, পণ্ডিত ও সেনানী সেখানে আসিতে লাগিল। আবার ১৭৬১ সাল অবধি প্রথমে নাদির শাহ্, পরে আবদালীর ঘন ঘন আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দিল্লী আগ্রা

অঞ্চল হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক প্রাণ মান বাঁচাইবার জন্য ইংরাজ-আশ্রয়ে পাটনা শহরে পার হইয়া আসিলেন; কারণ, পাটনার ভাষা, খাদ্য, মুসলিম সভ্যতা ও জলবায়ুতে তাঁহারা আগ্রা হইতে বেশী পার্থক্য বুঝিতে পারিলেন না। এই কারণে অনেক সুন্দর হস্তলিপি ও মুঘল চিত্র পাটনায় স্থান পাইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘুলাম হুসেন, মুনীর-উদ্-দৌলা (ভিখ্‌নাপাহাড়ীর নবাব-বংশ) এবং শাকির (পাণিপথের আন্‌সারি-বংশজ) এই শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত।

ফার্সী ইতিহাস রচনা ও গ্রন্থসংগ্রহের পৃষ্ঠপোষক ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যে নাম করিব—ওয়ারেন হেষ্টিংস, ডো, জনসন্, মেজর জেমস্ ব্রাউন, ষ্টুয়ার্ট, বেলী, স্কট, নীল্ বেঞ্জামিন এড্‌মনষ্টন্, উড্‌নী, ভ্যান্‌সিটার্ট্, গ্লাড্‌উইন প্রভৃতি। ইঁহাদের সংগ্রহগুলি বিলাতে রক্ষা পাইয়াছে, আর ইঁহাদের মধ্যে অনেকে ফার্সীতে পণ্ডিত ছিলেন, অনুবাদ করিয়াছেন।

খণ্ড ইতিহাসের দৃষ্টান্ত

আওরংজীবের মৃত্যুর পরই তাঁহার ছেলেদের মধ্যে যে-সকল যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এবং তাহার পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার পৌত্রগণের মধ্যে যে-সব যুদ্ধ চলিল, তাহার বর্ণনা করিয়া কতকগুলি সমসাময়িক এবং বিস্তৃত ফার্সী ইতিহাস রচিত হইয়াছে। তাহার পর, বাদশাহ ফর্‌রুখ্‌শিয়র ও মুহম্মদ শাহের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, যদিও সেগুলি সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া রচিত নহে। কিন্তু মুহম্মদ শাহের ঠিক পরবর্ত্তী দুই জন বাদশাহের (অর্থাৎ আহমদ শাহ্ এবং দ্বিতীয় আলমগীরের, ১৭৪৮-৫৪, ১৭৫৪-১৭৫৯) যে দুইখানি ইতিহাস পাওয়া যায়—দুইখানিই সর্ হেনরি এলিয়টের সংগ্রহ—সে দুইখানি "নামা" শ্রেণীর মত সরকারী দপ্তরে রক্ষিত দিনলিপি অবলম্বনে রচিত, তবে তাহাতে আখ্‌বারাৎ ব্যবহৃত হয় নাই। শাহ্ আলম সম্বন্ধে মুনালাল এবং সৈয়দ রাজি খাঁ-লিখিত ইতিহাস তারিখ-অনুযায়ী সাজান হইলেও, এই দুখানি গ্রন্থ "অকুলীন নবীন নামা" অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট; আমার মনে হয়, সেই শেষ যুগের রাষ্ট্র-বিপ্লবই এই অপকর্ষের কারণ। অতএব বলিতে হইবে যে, 'তারিখ্-ই-আলমগীর সানী'ই শেষ "নামা"।

"নামা"র অভাব আংশিক ভাবে পূরণ করে কয়েকখানি জীবনী। এই শ্রেণীর দুইখানি পুথি হইতে আমি অত্যন্ত উপকার পাইয়াছি, এবং তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছি—প্রথম নজীব্-উদ্-দৌলার জীবনী (সৈয়দ নুরুদ্দীন হুসেন-কৃত), দ্বিতীয় তহ্‌মাস্প খাঁ (ছদ্মনাম "মিসকিন")-এর আত্মচরিত; এ দুটিই সত্য ঘটনায় পূর্ণ এবং নাটকের মত মনোরঞ্জক। 'ইব্‌রৎনামা'ও অনেক স্থলে লেখক খয়ের-উদ্দীনের আত্মজীবনকাহিনী, যেমন 'সিয়র্-উল্-মুতাখ্‌খরীণ'। এই সব গ্রন্থে সে যুগের দেশের অবস্থা ও লোকদের জীবনযাত্রা যেন চোখের সামনে দেখিতে পাই।

প্রাদেশিক ইতিহাস

দিল্লীর সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ায় বহু খণ্ডরাজ্যে দেশ ছাইয়া পড়িল। সুতরাং এখন হইতে আমরা খণ্ড-ইতিহাস বা প্রাদেশিক ইতিহাস অনেক পাই, ঠিক যেমন মুঘল-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে ভারত-ইতিহাসের অবস্থা ছিল। তবে ১৭৫০ সালের পরবর্ত্তী এই সব খণ্ড ইতিহাস অতি তুচ্ছ, যেহেতু তাহাদের বর্ণিত রাজ্যগুলিও নগণ্য; কিন্তু ১৫২৬ সালের পূর্ব্বকালের প্রাদেশিক ইতিহাসগুলি অনেক স্থলে অমূল্য এবং শিক্ষাপ্রদ। এই খণ্ড-রাজ্যগুলির মধ্যে অযোধ্যা, নিজাম-রাজ্য, শিখ জাতি, এবং বাঙ্গলার মাত্র ফার্সী ইতিহাস পাওয়া যায়। জাঠ রাজপুত বুন্দেলা প্রভৃতির ঐ ভাষায় ইতিহাস রচিত হয় নাই।

ফার্সী ভিন্ন অপর ভাষায় লিখিত ইতিহাস

এ পর্য্যন্ত শুধু ফার্সী ভাষায় রচিত অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের কথাই বলিলাম। মারাঠী ভাষায় যে অমূল্য এবং সমুদ্র-প্রমাণ বৃহৎ উপাদান আছে, তাহার বর্ণনা "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" বক্তৃতার প্রথম বর্ষে করিয়াছি; এবং তাহা এই 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ৪৩শ ভাগ ১-২২ পৃষ্ঠায় ছাপা হইয়াছে।

ফরাসী পোর্তুগীজ ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক উপাদান—ঐতিহাসিক সাহিত্য-গ্রন্থ নহে—এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব; কিন্তু ১৭৭৫ সালের পর হইতে এই সব বিলাতী ভাষার দলিলগুলি ক্রমে প্রথম শ্রেণীতে স্থান অধিকার করিয়াছে।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮২৪ সনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যে-সকল খ্যাতনামা পণ্ডিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করিতেন, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি কুমারহট্ট (হালিশহর)-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি এম. এন্‌স্‌লি ও অন্যান্য সিবিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন।

১০ অক্টোবর ১৮২৫ তারিখে পণ্ডিত কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্নের মৃত্যু হইলে, সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। পরবর্ত্তী ১৭ই নবেম্বর তারিখে গঙ্গাধর এই পদে মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃত কলেজে তৃতীয় ব্যাকরণ-শ্রেণীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রথমে তাঁহার শ্রেণীতেই প্রবেশ করেন ও তথায় তিন বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের অধ্যাপনা বিষয়ে বিদ্যাসাগর এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন :—

> কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোনও ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদানকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।—'শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির কথা সংক্ষেপে বলিতেছি :—

(১) সেতুসংগ্রহ। ১৮৩৫।

'সেতুসংগ্রহ' মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা। এ-সম্বন্ধে ৭ জুলাই ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' গঙ্গাধর নিম্নোদ্ধৃত পত্রটি প্রকাশ করেন :—

> সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেণ তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেণ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির পত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে।···কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, পৃ.১১৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় 'সেতুসংগ্রহে'র একখানি পুথি আছে; ইহার পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাঠে জানা যায়, ইহার রচনাকাল ১৭৫৭ শক (১৮৩৫)।

১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে গিরিশ তর্করত্ন সটীক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্'. প্রকাশ করেন; ইহাতে অন্যান্য টীকার সহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) **খোসগল্পসার। ১৮৩৯।**

এই গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, ১৪ মার্চ ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নাংশ মুদ্রিত হয়:—

> খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে।—হরকরা, ১২ মার্চ্চ।

'খোসগল্পসার' যে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের রচনা, পাদরি লঙের মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৭৫) তাহার উল্লেখ আছে; তিনি লিখিয়াছেন:—

> TALES. — *Khos Galpa Sar*, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar.

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন এবং তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ৫০ টাকা।

সংশোধন

১৩৪৪ বঙ্গাব্দের ৪র্থ সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত "কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন" শীর্ষক প্রবন্ধে কিছু কিছু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে; স্থানাভাবে গত সংখ্যায় সংশোধন করা সম্ভব হয় নাই।

(১) সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন ১৮১৩ সনে। ১৮০১ সনে যে-"কাশীনাথ" ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত ছিলেন, তিনি "কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন" না হওয়াই সম্ভব; কারণ, এই সময় তর্কপঞ্চাননের বয়ঃক্রম ১৩ বৎসরের অধিক ছিল না।

(২) 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' পুস্তিকাখানি কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের রচনা না হওয়াই সম্ভব। 'ফ্রেণ্ড-অব-ইণ্ডিয়া'র মতে উহা কালাচাঁদ বসুর আদেশে "কাশীনাথ তর্কবাগীশ" কর্ত্তৃক রচিত। কলিকাতার ঘোষালবাগানে কাশীনাথ তর্কবাগীশের চতুষ্পাঠী ছিল; এই চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন প্রধানতঃ গুরুপ্রসাদ বসু—কালাচাঁদ বসুর পিতা ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৪২৩ দ্রষ্টব্য)।

(৩) "কলিকাতা শিমুল্যা-নিবাসী কাশীনাথ শর্ম্মণঃ" রচিত ও ১৮২১ সনে প্রকাশিত 'মুগ্ধবোধ কৌমুদী'ও কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-কৃত নহে বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ, এই বৎসরে (১৮২১) প্রকাশিত কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পদার্থ কৌমুদী' গ্রন্থে প্রকাশ, তর্কপঞ্চানন "আরিয়াদহ গ্রাম-নিবাসি" ছিলেন।

দুর্গা দেবী

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন

কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (খিল) দশম প্রপাঠকের নাম নারায়ণ-উপনিষদ্। ঐ উপনিষদের প্রথম অনুবাকে গায়ত্রী মন্ত্রের অনুকরণে এই দুর্গা-গায়ত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—'কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারি ধীমহি তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ'। (পাঠান্তরে 'দুর্গি' শব্দের স্থলে 'দুর্গা' পদ দৃষ্ট হয়)। এই মন্ত্রে আমরা দুর্গা দেবীর স্পষ্ট উল্লেখ পাইলাম। ঐ উপনিষদের দ্বিতীয় অনুবাকে এই মন্ত্রটি আছে—

তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি ! তরসে নমঃ।

[তরসে = তারিণ্যৈ নমঃ ; সুতরসি ! হে সুষ্ঠু সংসারতরণহেতো !]

তারিণী দুর্গা দেবীর এই প্রণাম-মন্ত্র একটু ভিন্ন আকারে দেবী-উপনিষদেও পাওয়া যায়।

তাম্ অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরাং নাশয় মে তমঃ।

"অগ্নিবর্ণা, তপোদ্যুতিময়ী, দীপ্তিমতী কর্ম-ফলবিধাত্রী দুর্গা দেবী আমার শরণ—তিনি আমার অজ্ঞানতমঃ নিঃশেষে নাশ করুন।"

দেবী-উপনিষদ্ ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের দশম অনুবাক হইতে অম্ভৃণ মহর্ষির ব্রহ্মবিদুষী দুহিতার রচিত প্রসিদ্ধ দেবীসূক্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ সূক্তে দেবী নিজের পরিচয়ে বলিতেছেন—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি
অহম্ আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি
অহম্ ইন্দ্রাগ্নী অহম্ অশ্বিনোভা।

"আমি রুদ্রগণ ও বসুগণ, আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ—সকলের সহিত বিহরণ করি। মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমিই বিধারণ করি। আমিই ত্বষ্টাকে, সোমকে, পূষাকে, ভগকে পোষণ করি"—

অহং সোমম্ আহনসং বিভর্মি
অহং ত্বষ্টারম্ উত পূষণং ভগম্।
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং
চিকীতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।

"আমি রাষ্ট্রী (সর্ব্বস্য জগতঃ ঈশ্বরী), চিকীতুষী—সর্ব্বজ্ঞানবতী—সমস্ত বস্তুর প্রদাত্রী, নিখিল যজ্ঞফলের প্রথমা যোজয়িত্রী। আমি যাহাকে বরণ করি, সে-ই বীর হয়, ব্রহ্মা হয়, ঋষি হয়, সুপ্রজ্ঞ হয়।"

যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং করোমি

তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম্।

অন্য দিকে,—"আমিই জনগণের বিজয়বর্ধনকারিণী—অহং জনায় সমদং কৃণোমি।" আমি কে? আমি—'দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ'—আমি বিশ্বভুবনে অনুস্যূত আছি।

অহং সুবে পিতরম্ অস্য মূর্দ্ধন্,

মম যোনিরপ্সু অন্তঃ সমুদ্রে।

'এই বিশ্বপ্রপঞ্চের আমিই মূর্দ্ধা—ইহার জনক যিনি ঈশ্বর, তিনিও আমার সৃষ্ট'।

এই দুর্গা দেবী কে? শাক্ত উপনিষদে দেখিতে পাই, দেবতারা প্রশ্ন করিতেছেন, 'কাসি ত্বং মহাদেবি!' উত্তরে দেবী বলিতেছেন,—'অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ'। সেই জন্য পুরাণকার বলেন,—'যতঃ প্রধানপুরুষৌ'। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেখি, মেধস ঋষি তাঁহাকে 'অক্ষরা, নিত্যা এবং সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি' বলিয়াছেন। অর্থাৎ, শুধু সৃষ্টি নয়, স্থিতি ও লয়ও তাঁহার কৃত।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।

তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।

এক কথায় তিনি 'তজ্জলান্—জন্মাদি অস্য যতঃ'—এই বিশ্বের কর্ত্রী, ধর্ত্রী ও হর্ত্রী।

আমরা দেখিলাম, দেবী-উপনিষদ্ তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিলেন। আমরা জানি, পরাৎপর পরব্রহ্মের দ্বিবিধ বিভাব। একটি নির্বিশেষ নিরুপাধি নির্গুণ ভাব (যাহা static) এবং অন্যটি সবিশেষ সোপাধি সগুণ ভাব (যাহা kinetic)। এই kinetic বিভাবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন—'সর্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি মহামায়ঞ্চ ব্রহ্ম' অর্থাৎ, নির্গুণ ব্রহ্ম যখন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করিয়া শক্তিযুক্ত হন, তখনই তিনি 'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তঃ প্রভবতি' (kinetic হন)—নচেৎ তিনি নিঃস্পন্দ, নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, নির্বিশেষ, নিরঞ্জন, নির্গুণ (static)। তন্ত্রের ভাষায় নির্গুণ ব্রহ্ম শিব এবং সগুণ ব্রহ্ম শক্তি। শিব-শক্তি সদা সম্মিলিত—শক্তি অন্তর্মুখী হইলে শিব হন, এবং শিব বহির্মুখ হইলে শক্তি হন। এ সম্পর্কে এক জন অভিজ্ঞ লেখক লিখিয়াছেন,—

"শিবতত্ত্বে শক্তিভাব গৌণ এবং শিবভাব প্রধান—শক্তিতত্ত্বে শিবভাব গৌণ এবং শক্তিভাব প্রধান—কিন্তু যেখানে শিব ও শক্তি একরস, সেখানে না শিবের প্রাধান্য—না শক্তির। ইহাই সাম্যাবস্থা বা নিত্যাবস্থা।"

অতএব শক্তিখচিত ব্রহ্মই দুর্গা দেবী। তিনি মহেশ্বরী, পরমেশ্বরী—তিনি মহামায়া, মহাবিদ্যা। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—'সর্ব্বোপেতাচ তদ্দর্শনাৎ' (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩০)।

সর্বোপেতা সর্বশক্তিযুক্তা চ পরমদেবতা। কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ—শঙ্কর।

ঐ শক্তি অনন্ত—'অনন্তশক্তিখচিতং ব্রহ্ম সর্বেশ্বরেশ্বরম্'। তথাপি বোধ-সৌকর্যের জন্য বলা হয়—সেই মহাদেবী ত্রিবিধা—

সা দেবী ত্রিবিধা ভবতি শক্ত্যাত্মনা—ইচ্ছাশক্তিঃ, ক্রিয়াশক্তিঃ, সাক্ষাৎশক্তিঃ ইতি (সীতোপনিষদ্, ১১)। (সাক্ষাৎশক্তির্নাম জ্ঞানশক্তিঃ)।

সেই শ্বেতাশ্বতরের কথা—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ।

অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি, বল-(ইচ্ছা) শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। সেই জন্য দেবীর সার্থক নাম—ঈশানী। কেন তাঁহার নাম ঈশানী?

অথ কস্মাদ্ উচ্যতে ঈশানঃ? যঃ সর্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ জননীভিঃ পরমশক্তিভিঃ—অথর্বশির উপনিষদ্, ৫৬।

স সর্বান্ লোকান্ ঈশতে নিয়ময়তি। কাভিঃ নিয়ময়তি ইত্যত্র ঈশনীভিঃ অজড়-ক্রিয়াশক্তি-বৃত্তিভিঃ তথা জননীভিঃ অজড়-জ্ঞানশক্তি-বৃত্তিভিঃ তথা পরম-শক্তিভিঃ অজড়েচ্ছাশক্তি-বৃত্তিভিশ্চ য ইমান্ লোকান্ ঈশতে—উপনিষদ্-ব্রহ্মযোগিকৃত ব্যাখ্যা।

আমরা বলিলাম, দুর্গা দেবী মহাবিদ্যা। মহাবিদ্যা অর্থে পরাবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা। কেন-উপনিষদে দেবীর এই ভাব লক্ষ্য করিয়া ইঁহাকে 'উমা হৈমবতী' বলা হইয়াছে। কেন-উপনিষদের আখ্যায়িকাটি এইরূপ :—'ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিজ্ঞে'—ব্রহ্মণ্যদেব দেবতাদিগকে অসুর-যুদ্ধে বিজয়ী করিয়াছিলেন। ইহাতে দেবতারা অভিমানে স্ফীত হইয়া ভাবিলেন—এ বিজয় আমাদেরই মহিমা—'অস্মাকম্ এবায়ং মহিমা'। ব্রহ্মণ্যদেব দেবতাদিগের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য অপূর্ব্ব রূপে তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন—দেবতারা বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'কিমিদং যক্ষম্ ইতি'। ঐ অদ্ভুত বস্তুটি কি, জানিবার জন্য তাঁহারা অগ্নিকে প্রেরণ করিলেন—'জাতবেদ এতদ্ বিজানীহি কিমিদং যক্ষম্ ইতি'? ব্রহ্মণ্যদেব অগ্নিকে বলিলেন, কে তুমি? 'কোঽসি? ত্বয়ি কিং বীর্য্যম্?' অগ্নি বলিলেন—জান না? আমি অগ্নি,—'জাতিবেদা বা অহমস্মি'। আমার এমন বীর্য্য যে, যাহা কিছু সমস্তই দহন করিতে পারি। ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন,—তাই নাকি! বেশ, এই তৃণগাছটি দগ্ধ কর ত দেখি। অগ্নি সর্বভাবে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 'তন্ন শশাক দগ্ধুং'।

এইবার দেবতারা বায়ুকে পাঠাইলেন—'বায়ো! এতদ্ বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি'। ব্রহ্মণ্যদেব বায়ুকে বলিলেন—'কোসি? ত্বয়ি কিং বীর্য্যং?' বায়ু বলিলেন—জান না? আমি বায়ু—'মাতরিশ্বা বা অহমস্মি'। আমার এমন বীর্য্য যে, যাহা কিছু সমস্তই আদান করিতে পারি। ব্রহ্মণ্যদেব বলিলেন—তাই নাকি? বেশ, এই তৃণগাছটি আদান কর দেখি। বায়ু সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 'তন্ন শশাক আদাতুং'। তখন দেবতারা দেবরাজ ইন্দ্রকে পাঠাইলেন—'মঘবন্! এতদ্ বিজানীহি কিম্ এতদ্ যক্ষমিতি'। ইন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেই অদ্ভুত 'যক্ষ' তিরোহিত হইলেন—'তৎ তস্মাৎ তিরোদধে'।

ইন্দ্র কিন্তু সেই বিমানে এক বহুশোভমানা স্ত্রী-মূর্তি দর্শন করিলেন—'স্ত্রিয়মাজগাম বহু-শোভমানাম্ উমাং হৈমবতীম্'। ইন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কিম্ এতদ্ যক্ষমিতি ?' উমা বলিলেন,—জান না ? ইনিই ব্রহ্মণ্যদেব—'সা ব্রহ্মেতি হোবাচ'—তাঁহারই বিজয়ে তোমরা জয়ী হইয়াছিলে, এ তাঁহারই মহিমা! তখন দেবতাদিগের ভ্রম অপনীত হইল। এই 'উমা' হৈমবতী কে ?

শঙ্করাচার্য বলেন, ইনি স্বয়ং বিদ্যা—'বিদ্যৈব উমা'। 'সঃ (ইন্দ্রঃ) তাং স্ত্রিয়ং ব্রহ্মবিদ্যাং মূর্তিমতীং দদর্শ' (শঙ্করানন্দ)। 'রুদ্রপত্নী উমা হৈমবতীব সা শোভমানা বিদ্যৈব' (শঙ্কর)।

এই মহেশ্বরী মহামায়ার মহিমা অনুত্তর। সেই জন্য ঋগ্বেদ দেবীসূক্তে বলিতেছেন—

পরো দিবঃ পর এনা পৃথিব্যা।

এতাবতী মহিমা সংবভূব ।—১০।১২৫।৮

'ভূলোক ও দ্যুলোকের পরাৎপর তিনি—তাঁহার মহিমা অতিশয় মহীয়ান্।'

আগামী নবরাত্র উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র যে মার্কণ্ডেয়চণ্ডী পঠিত হইবে, তাহার পুরাণোক্ত নাম দেবীমাহাত্ম্য। ঐ চণ্ডীকে দেবীমাহাত্ম্য বলে এই জন্য যে, উহাতে দুর্গা দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। সকলেই বোধ হয় জানেন, মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীপ্রোক্ত দেবীমাহাত্ম্য মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—এই খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত। মধুকৈটভ বধের বৃত্তান্ত এই—

কল্পের প্রারম্ভে বিষ্ণু যখন কারণার্ণবে শেষ-শয্যায় নিদ্রিত ছিলেন, তখন তাঁহার নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মা সৃষ্টিব্যাপারে উদ্‌যুক্ত হইলে মধু ও কৈটভনামক দুই ঘোর অসুর সৃষ্টির প্রতিরোধ জন্য ব্রহ্মাকে হনন করিতে উদ্যত হইল। তখন ব্রহ্মা 'বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং সৃষ্টিসংহারকারিণীং' দেবীকে স্তব করিলেন এবং দেবীর প্রেরণায় বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি তুমুল যুদ্ধ করিয়া অসুরদ্বয়ের বধসাধন করিলেন। ইহাই মার্কণ্ডেয়চণ্ডী-বর্ণিত দেবীর প্রথম মাহাত্ম্য।

তৃতীয় মাহাত্ম্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ। ঐ শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধকালে নানা উগ্র শক্তি নিঃসারিত হইয়া বিভিন্ন মূর্তি গ্রহণ করতঃ অসুরসৈন্য বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইহাতে শুম্ভ উপহাস করিয়া দেবীকে বলিল—'মা দুর্গে গর্বমাবহ। অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতি-মানিনী'—'পর-বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছ—দুর্গা! তোমায় ধিক্।' উত্তরে দেবী বলিলেন (ইহাই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়)—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

পশ্যৈতা দুষ্ট! ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।

'ঐ সমস্তই আমার বিভূতি—আমা হইতে ভিন্ন নয়—আমি একা, অদ্বিতীয়া। দেখ, দুষ্ট, ঐ আমার অংশ-কলা আমাতে প্রবেশ করিতেছে।'

ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যঃ ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।

তস্যা দেব্যাঃ তনৌ জগ্মুঃ একৈবাসীৎ তদাম্বিকা।

'বস্তুতঃ দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মাণী প্রভৃতি খণ্ডশক্তিচয় দেবীর শরীরে লীন হইলেন—জগদম্বা একাই বিরাজ করিতে লাগিলেন।'

মধ্যখণ্ডে মহিষাসুর-বধ প্রসঙ্গে মহিষমর্দিনীর আবির্ভাব যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও এই তত্ত্বই প্রতিপন্ন হয়। দেবতারা মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎখাত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিলে, ঐ ত্রিমূর্তির শরীর হইতে এক সুমহৎ তেজঃ বিনির্গত হইল—সমবেত ইন্দ্রাদি দেবগণের তেজঃ, ঐ তেজে সম্ভৃত হইয়া, একীভূত, পিণ্ডীকৃত হইয়া এক অপূর্ব নারীমূর্তি রচনা করিল।

এতচ্চ কথিতং সর্বম্ অমরারিবিচেষ্টিতম্।
* * ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটিকুটিলাননম্॥
ততোতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাং চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ॥
নির্গতং সুমহৎ তেজঃ তৎ চৈক্যং সমগচ্ছত।
* * অতুলং তত্র তৎ তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূৎ নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥—২।৯-১৩

ঐ নারীমূর্তিই সিংহবাহিনী দুর্গা—দেবতারা স্ব স্ব বিচিত্র আয়ুধ অর্পণ করতঃ তাঁহাকে নানা প্রহরণে ভূষিতা করিলেন। ইনিই দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী। মহাদর্পী মহিষাসুর সেই অতুল প্রভাবময়ীর প্রভায় অচিরে ভস্মীভূত হইল। ইন্দ্রাদি স্তব করিতে লাগিলেন।

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবান্ অনন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তুম্ অলং বলঞ্চ।—৪।৪

"হে জগদম্বে! তোমার বল ও প্রভাব অতুল্য—শিব, ব্রহ্মা, অনন্তদেব যাঁহার লাগ পান না, আমরা ক্ষুদ্র মুখে তাহার কি বর্ণনা করিব?"

ইহাই দেবীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয়চণ্ডী।

দুর্গাদেবীর আরও কত কত মহিমা কালে কালে প্রকটিত হইয়াছিল, আমরা তাহার কি সংবাদ রাখি? তবে দেবীভাগবত-পুরাণের তৃতীয় স্কন্ধে চতুর্দশ হইতে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে আর এক 'দেবীমাহাত্ম্যে'র বিবরণ আছে। সতের বৎসর পূর্বে আমি ঐ বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকের গোচর করিয়াছিলাম। কিন্তু নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী ঐ বিবরণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করেন নাই। আজ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পাঠকের অবগতির জন্য ঐ বিবরণের সংক্ষিপ্তসার এ প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিব।

পূর্বকালে কোশল দেশে ধ্রুবসন্ধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই রাণী—জ্যেষ্ঠা মনোরমা ও কনিষ্ঠা লীলাবতী। কালক্রমে জ্যেষ্ঠা মহিষী এক পুত্ররত্ন প্রসব

করিলেন। তাহার নাম হইল সুদর্শন। পরে কনিষ্ঠা মহিষীর এক পুত্র জন্মিল—রাজা তাহার নামকরণ করিলেন শত্রুজিৎ।

রাজা এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া এক কুপিত সিংহের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার দুই পুত্রই নাবালক। জ্যেষ্ঠ বিধায় সুদর্শনেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কনিষ্ঠ শত্রুজিতের মাতামহ যুধাজিৎ বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া বলপূর্বক শত্রুজিৎকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া জ্যেষ্ঠা মহিষী মনোরমা, শিশু পুত্রকে লইয়া ত্রিকূট পর্বতে ভারদ্বাজ ঋষির আশ্রমে গোপনে পলায়ন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যুধাজিৎ ঋষির তপঃপ্রভাবে ভীত হইয়া সে আশ্রমে সুদর্শনকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইলেন না।

দিনে দিনে সুদর্শন চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এক দিন এক বৃদ্ধ ঐ বনে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ তাহাকে সুদর্শনের সমক্ষে 'ক্লীব ক্লীব' বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। সুদর্শন তাহা হইতে 'ক্লীং' এই শক্তিশালী বীজ মন্ত্রটি বাছিয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল—

বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা।
জজাপ বালকোঽত্যর্থং ধৃত্বা চেতসি সাদরম্।

কি ক্রীড়াকালে, কি শয়নকালে, সুদর্শন সর্বদাই ঐ মন্ত্র জপ করিত। এইরূপ ঐকান্তিক মন্ত্রজপের ফলে দুর্গা দেবী এক দিন তাহাকে দর্শন দিলেন এবং সুদর্শনকে শরাসন, শর, তূণীর ও কবচ প্রদান করিলেন। সুদর্শন ধন্য হইল।

কদাচিৎ সোপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ।
রক্তাম্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্বাঙ্গভূষণম্।
গরুড়ে বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্ভুতাম্।

ক্রমে সুদর্শন যৌবনে পদার্পণ করিলেন। ঐ সময় কাশীনগরে রাজসুতা অলোক-সামান্যা সুন্দরী শশিকলা বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি লোকপরম্পরায় সুদর্শনের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইলেন। এক দিন রাত্রিযোগে শশিকলা স্বপ্ন দেখিলেন, জগদম্বা তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছেন—'সুদর্শন আমার ভক্ত—সে তোমার কামনা পূর্ণ করিবে।' এইরূপ আশ্বাসে শশিকলার আর আনন্দের সীমা রহিল না। দিন দিন সুদর্শনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ উপচিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার সমস্ত দেহে এক নবতর চারুতা ও শ্রীর সমাবেশ হইল।

কন্যার বিবাহের বয়স দেখিয়া পিতা মাতা তাহার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শশিকলা দুঃখিতা হইয়া সখীর দ্বারা মাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন—

ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুব-সন্ধি-সুতোঽস্তি যঃ।
স মে ভর্তা বৃতশ্চিত্তে নান্যং ভূপং বৃণোম্যহম্।

"ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্রই আমার বর—অন্য বরকে আমি বরণ করিব না।" পিতামাতা

পুত্রীকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক ভৎর্সনা করিলেন। শশিকলা দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—

মচ্চিত্তভিত্তৌ লিখিতো ভগবত্যা সুদর্শনঃ।
তং বিহায় প্রিয়ং কান্তং বরিষ্যেঽহং ন চাপরম্॥

"দেবী ভগবতী সুদর্শনকে আমার চিত্তভিত্তিতে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। তিনিই আমার কান্ত—আমি দ্বিচারিণী হইতে পারিব না।"

কিন্তু কন্যার আপত্তি সত্ত্বেও পিতা (রাজা সুবাহু) স্বয়ম্বরের দিন স্থির করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত প্রতাপী রাজা ও রাজপুত্রদিগকে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। অবশ্য সুদর্শনের নিকট নিমন্ত্রণ গেল না। কিন্তু সে ত্রুটি শশিকলা নিজে পূরণ করিলেন। তিনি গোপনে সুদর্শনকে পত্র দিলেন—

বিষমদ্মি হুতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে।
বরয়ে ত্বদৃতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা॥

"আমি বিষ ভক্ষণ করিব অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিব,—কিন্তু পিতামাতার আদেশেও অন্য কাহাকেও বরণ করিব না।"

সুদর্শন এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার জননী মনোরমা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। সুদর্শন জননীকে বুঝাইলেন—'মা! আমি ভগবতীর আদেশে যখন এই স্বয়ম্বরে চলিয়াছি, তখন আমার বিপদ্ হইতে পারে না।' তখন মনোরমা পুত্রের সর্বদেহে ভগবতীর রক্ষাকবচ জপ করিয়া দিলেন—

সর্বদা সর্বদেশেষু পাতু ত্বাং ভুবনেশ্বরী।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী॥

—এবং পুত্রের সহিত কাশীনগরে চলিলেন। ইতিমধ্যে অনেক রাজাই বারাণসীতে উপনীত হইয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে দৌহিত্র শত্রুজিতের সহিত যুধাজিৎও উপস্থিত। সুদর্শনকে দেখিয়া রাজারা কানাকানি করিতে লাগিল—'সহায়-সম্পদ্‌হীন সুদর্শন বিবাহের জন্যই কি এখানে আগমন করিয়াছে? এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত রাজপুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকুমারী তাহাকে বরণ করিবেন না কি?' যুধাজিৎ দম্ভ করিয়া বলিলেন,—'কন্যার নিমিত্ত আমি ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।' সুদর্শন বিনীত ভাবে বলিলেন—

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ।
ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন কৃপা রক্ষকা মম॥

'সত্যই আমার সৈন্য, সামন্ত, সহায়, সম্পদ্, দুর্গ, কোশ, বন্ধুবান্ধব কেহই নাই—তথাপি আমি স্বয়ম্বরে আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি? দেবী ভগবতীর আদেশে আসিয়াছি। তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহাই ঘটিবে। অতএব আমার চিন্তার কারণ কি?

তদাজ্ঞয়া নৃপাদ্যেব সংপ্রাপ্তোস্মি স্বয়ম্বরে।
সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যাং মম কিং চিন্তনেন বৈ॥
তাম্বতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ॥

সেই ভগবতী পরমাশক্তিরূপিণী। তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রও একপদ নড়িতে সমর্থ হন না। তথাপি আমি ভয় করিব ?'

পরদিন স্বয়ম্বর-সভা সজ্জিত হইলে রাজারা সাজসজ্জা করিয়া সুরচিত মঞ্চোপরি স্ব স্ব আসনে গর্বভরে উপবেশন করিয়া রাজবালার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতা কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে বলিলেন,—'বৎসে, রাজগণ স্বয়ম্বর-সভায় সমবেত হইয়াছেন,—তুমি হস্তে শুভ মাল্য ধারণ করিয়া মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ কর এবং যাহাকে অভিরুচি, তাহাকে বরণ কর।' শশিকলা বলিলেন,—'বাবা! আমি কামুক নৃপতিগণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না,—আমি সুদর্শনকে পূর্বেই বরণ করিয়াছি, তিনিই আমার বর।'

সুদর্শনো ময়া পূর্বং বৃতঃ সর্বাত্মনা পিতঃ।
তমৃতে নান্যথা কর্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম॥

রাজা মহা বিপন্ন হইলেন এবং কন্যা যখন কিছুতেই স্বয়ম্বর-সভায় পদার্পণ করিল না, তখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া রাজাদিগের নিকট অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। রাজারা ত, বিশেষতঃ যুধাজিৎ চটিয়া লাল। সুবাহু তাঁহাদিগকে কোন রকমে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—'আপনারা স্ব স্ব শিবিরে ফিরিয়া যান। আমার কন্যা আজ এই সভামণ্ডপে কিছুতেই আসিল না। কাল আমি তাহাকে বুঝাইয়া স্বয়ম্বর-সভায় আনয়ন করিব।' রাজারা তাহাই করিলেন। এ দিকে সুবাহু প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিয়া সেই রাত্রেই গোপনে সুদর্শনের সহিত শশিকলার বেদোক্ত বিধানে বিবাহ-কার্য সম্পন্ন করিলেন এবং বর-বধূকে বিবিধ উপহার প্রদান করিলেন। এইরূপে প্রেম ও ঐকান্তিকতার জয় হইল।

এই গোপন বিবাহ রাজাদিগের অবিদিত রহিল না—বিশেষতঃ যখন তাঁহারা দেখিলেন, দ্বিতীয় স্বয়ম্বর-সভার কোনই উদ্যোগ নাই। নৃপতিগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল,—'আমরা বরবধূর গমনমার্গ অবরোধপূর্বক সুদর্শনকে বিনাশ করিব এবং বলপূর্বক কন্যা গ্রহণ করিব।'

এক সপ্তাহ রাজা সুবাহু জামাতাকে গৃহে রাখিলেন। সপ্তম দিবসে সুদর্শন বধূর সহিত এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুবাহু দূতমুখে শুনিলেন, নৃপতিরা বিপুল বাহিনী লইয়া সুদর্শনের পথ রোধ করিবে বলিয়া সজ্জিত হইয়াছে। তখন তিনিও সৈন্য সামন্ত লইয়া সুদর্শনের অনুসরণ করিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই শত্রুপক্ষের রণসজ্জা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহা দেখিয়া রাজা সুবাহু বিশেষ চিন্তিত হইলেন, কিন্তু সুদর্শন নিঃশঙ্ক চিত্তে ভগবতী ভবানীকে স্মরণ করিয়া সেই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন—

বিধিবৎ স শিবাং চিত্তে জগাম শরণং মুদা।
জজাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্॥

অল্প ক্ষণেই চতুর্দিকে শঙ্খ, ভেরী ও রণঢক্কা বাজিয়া উঠিল। শত্রুজিৎ ভ্রাতার সংহার

বাসনায় মাতামহ যুধাজিতের সহিত অগ্রসর হইলেন। তখন রণস্থলে সর্বত্র ঘোর সমর-তরঙ্গ উত্থিত হইল।

এইরূপে দারুণ যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে হঠাৎ সিংহারূঢ়া দেবী ভগবতী তথায় আবির্ভূতা হইলেন!

প্রাদুর্বভূব সহসা দেবী সিংহোপরিস্থিতা।
নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা।
দিব্যাম্বরপরীধানা মন্দারস্রক্‌সুসংযুতা॥

'দেবীর মনোহর দেহকান্তি বর ভূষণে ভূষিত এবং বিবিধ আয়ুধে শোভিত। তাঁহার পরিধানে দিব্যাম্বর, গলদেশে মোহন মন্দারমালা।'

রাজারা সেই সিংহারূঢ়া রমণীমূর্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। হঠাৎ দেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া উঠিল, প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল এবং দিক্‌সকল সুদারুণ ভাব ধারণ করিল। ইহাতে মিত্রপক্ষে সংরম্ভ দর্শন করিয়া যুধাজিৎ মহীপালগণকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন,—'আপনারা কি একটি সিংহারূঢ়া কামিনীকে দেখিয়া ভীত হইলেন? অগ্রসর হউন—কন্যাহারী সুদর্শনকে বধ করুন। এই শৃগালকে সিংহের কাঙ্ক্ষিত স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিতে দিবেন না।' এই বলিয়া যুধাজিৎ শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম-স্থলে অগ্রসর হইলেন এবং সুদর্শনের উপর সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুদর্শন সেই প্রচণ্ড বাণবৃষ্টি অনায়াসে বারণ করিলেন। এইরূপে তুমুল যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে জগদম্বা দুর্গা দেবী কুপিতা হইয়া রণাঙ্গনে স্বয়ং অবতীর্ণা হইলেন এবং শত্রুদিগের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, সেই ভীষণ যুদ্ধে শত্রুজিৎ ও যুধাজিৎ উভয়েই নিহত হইল। তাহারা দুই জনে রথ হইতে নিপতিত হইলে সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ উত্থিত হইল এবং রাজা সুবাহু তাহাদের মৃত্যুতে পরম প্রীত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন—

নমো দেব্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
দুর্গায়ৈ ভগবত্যৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ॥
নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে নমঃ।
বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতঃ জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ শিবে॥

দেবী সুবাহুর স্তবে প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। সুবাহু বলিলেন,—'আপনার দর্শন পাইয়াছি—আর কি বর চাহিব? তবে যদি প্রসন্না হইয়া থাকেন, এই বর দিন যে, যত দিন কাশীপুরী পৃথিবীতে থাকিবে, তত দিন আপনি দুর্গারূপে এই পুরীতে অধিষ্ঠিতা থাকিবেন।' দেবী 'তথাস্তু' বলিয়া সুবাহুকে বর দিলেন এবং সুদর্শনকে অনুমতি করিলেন,—'তুমি অযোধ্যায় আমার প্রতিমা স্থাপন কর।'

অর্চ্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্বয়ানঘ!

—বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্রবিধানমতে ভক্তিভাবে আমার মহাপূজার ব্যবস্থা কর।

শরৎকালে মহাপূজা কর্তব্যা মম সর্বদা।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন।

রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া সুদর্শনের প্রথম কার্য হইল দেবীর প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা। তিনি মনে মনে বলিলেন,—'ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষদায়িনী দুর্গা দেবীকে অগ্রে স্বর্ণ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করি—পশ্চাৎ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপতিগণের অনুকরণে রাজ্য পালন করিব।' সুদর্শন তাহাই করিলেন। তিনি নিপুণ শিল্পীদ্বারা এক মনোহর মন্দির নির্মাণ করিলেন এবং সেই মন্দিরে দুর্গা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার অনুকরণে রাজ্যের সর্বত্র দেবীর পূজা প্রবর্তিত হইল। এইরূপে ধরাতলে দুর্গাদেবী প্রখ্যাতা হইলেন—

বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গাদেবী ধরাতলে।

ইহাই দেবীভাগবতের দেবীমাহাত্ম্য। দুর্গা দেবী কে? তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী মহেশ্বরী পরমেশ্বরী—তিনি 'ব্রহ্ম-স্বরূপিণী'।

সৃজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে।
সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥

মন্দিরের অন্তর

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

উড়িষ্যায় চারি প্রকার মন্দির আছে,—রেখ, ভদ্র, খাখরা এবং গৌড়ীয়।[১] উড়িষ্যায় যাহার নাম রেখ, তাহার অন্তরের (section) বিষয় আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। উড়িষ্যা বলিতে আমরা উপস্থিত কটক, পুরী, বালেশ্বর, সম্বলপুর, গঞ্জাম ও করাপুট জেলা এবং বড়ম্বা, বৌদ, ময়ূরভঞ্জ, পাটনা প্রভৃতি করদ রাজ্যের সমষ্টি বুঝিব। তাহা ছাড়া ঠিক উড়িষ্যার উত্তরে মানভূম জেলা এবং দক্ষিণে ভিজাগাপটম জেলায় অবস্থিত কোন কোন মন্দিরের সম্বন্ধেও আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে।

রেখ দেউলের মোটামুটি চারি ভাগ—বাড়, গণ্ডী, বিসম ও মস্তক।[২] মন্দিরের বাড় খাড়াভাবে নির্ম্মিত হয়। তাহার পর গণ্ডী; ইহা প্রথমে অল্প দূর খাড়া উঠিয়া ক্রমশঃ ভিতরের দিকে বাঁকিতে আরম্ভ করে। গণ্ডী শেষ হইলে, তাহার সহিত মিলাইয়া একটি ক্ষুদ্র অংশ থাকে, তাহাকে বিসম বলে। বাড় হইতে বিসম পর্য্যন্ত সকল অংশের আসন (plan) অথবা ক্ষিতিজক্ষেত্রে অন্তর চতুষ্কোণ। তাহার উপর মস্তক। মস্তকে বেকি, আঁলা, খপুরি ও কলস থাকে। ইহার প্রত্যেকের ক্ষিতিজ-অন্তর বৃত্তাকার। বর্ত্তমান প্রবন্ধে মস্তকের বিষয় আমরা আলোচনা করিব না।

উড়িষ্যায় মন্দিরের গাঁথনি করিবার জন্য মশলা ব্যবহৃত হয় না। বড় বড় পাথরের খণ্ড খুব পরিষ্কার ভাবে চাঁছিয়া-ছুলিয়া পাশাপাশি বসান হয়। তাহার পর এইরূপ দুইটি পার্শ্ববর্ত্তী পাথরের গায়ে গর্ত্ত কাটিয়া একটি লোহার বাগিয়া (dowel or cramp) আঁটিয়া দেওয়া হয়।[৩] বুন্দেলখণ্ডে খাজরাহার মন্দিরে তামার বাগিয়া ব্যবহার করা হইত এবং সেটি যে-গর্ত্তে বসান তাহার মধ্যে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত।

যাহাই হউক, মন্দিরের বাড় খাড়া উঠিয়া তাহার পর গণ্ডী ঈষৎ বাঁকিতে আরম্ভ করে। এইখানে মন্দির-নির্ম্মাণে নানা রকম তারতম্য দেখা যায়। আমরা একে একে সেগুলির বর্ণনা করিব।

প্রথম শ্রেণী—গণ্ডী বাড়েরই মত কিছু দূর খাড়া ওঠে। তাহার পর ক্রমে ভিতরে বাঁকিয়া যায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।[৪] যেখান হইতে বাঁকে, সেখানে উপরের পাথরের

১ Bose : *Canons of Orissan Architecture* (1932) pp. 78-82, 187-93.

২ *Ibid,* pp. 91-2. Plate opposite p. 126.

৩ বসু; 'কণারকের বিবরণ,' পৃ. ৪৮।

৪ Bose : *ibid,* pp. 111-4.

স্তরকে ভিতর দিকে একটু আগাইয়া দেওয়া হয়। সামান্য একটু আগান হয় বলিয়া পাথরগুলি গর্ভগৃহে পড়িয়া যায় না, তাহাদের ভারকেন্দ্র বিচ্যুত হয় না। তাহার উচ্চতর স্তরের বা সমতলের পাথরগুলি চারি দেওয়াল হইতেই আরও একটু ভিতরে আগাইয়া আসে। এই ভাবে গণ্ডীর শেষ পর্য্যন্ত অল্প অল্প আগানর কাজ চলে। ইংরেজীতে এইরূপ গঠনকে করবেল (corbel) করা বলে। উড়িষ্যায় ইহার নাম লহড়া। সম্ভবতঃ লহরী শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। প্রতি উচ্চতর সমতলের পাথর একটু আগাইতে আগাইতে যখন গণ্ডীর শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তখন মধ্যের চতুষ্কোণ ছিদ্রটি বন্ধ করিবার প্রয়োজন হয়। বিসমভূমিতে যে-সকল পাথর থাকে, সেগুলিকে বিস্তৃত করিলেই গর্ভের উপরিস্থ ছিদ্র মুদ্রিত হইয়া যায়। মন্দিরের বাহিরে গণ্ডী ও বিসমের মধ্যে আকারগত খুব বেশী প্রভেদ নাই, কেবল গণ্ডী সকল ক্ষেত্রে পগ-বিভক্ত হয়, বিসম কোথাও পগ-বিভক্ত হয়, কোথাও হয় না।[৫] ইহা কিন্তু গুরুতর প্রভেদ নহে। কাজের দিক্ দিয়াই গণ্ডী এবং বিসমের মধ্যে আসল প্রভেদ। গণ্ডী দেওয়ালের মত, বিসম ছাতের মত। উহা চারি পাশের দেওয়ালের উপর হইতে গর্ভগৃহকে আচ্ছাদিত করে। বিসমের উপরে মস্তক রচিত হয়। তাহার ভার বহন করাও বিসমের একটি প্রধান কাজ।
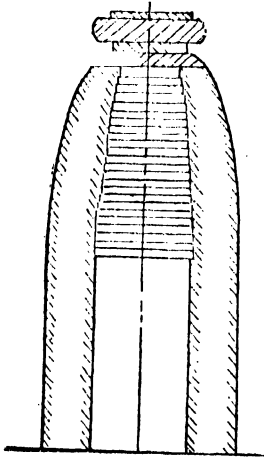
প্রথম শ্রেণীর অন্তর

এইরূপ মন্দিরের গর্ভগৃহে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে তাকাইলে মনে হয়, যেন চারি দিকের দেওয়াল উলটান সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে পরস্পরের নিকটে ঘেঁষিয়া আসিতেছে। অবশেষে একেবারে উপরে, যখন চারি দেওয়ালের মধ্যে ব্যবধান ক্ষুদ্র হইয়া আসে, তখন ছোট কয়েক খণ্ড পাথরের পাটের সাহায্যে তাহা আচ্ছাদিত হইয়াছে, এইরূপ দেখা যায়। ইহাকে আমরা প্রথম শ্রেণীর অন্তর বলিব।

এইখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি পাথরে তৈয়ারী, অতএব প্রতি দেওয়ালের ওজন অনেক। যে দেওয়ালে গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার দরজা থাকে, তাহার গঠন অন্যান্য দেওয়াল হইতে স্বতন্ত্র। দরজার লক্ষ্মীপাটের (lintel) উপরে একটি সুদীর্ঘ লহড়ার শ্রেণী দিয়া খিলান (corbelled arch) রচিত হয়, তাহাতে উপরের ভার লক্ষ্মীপাটে না পড়িয়া দুই পাশের খাড়া বাজুর (jamb) উপরে পড়ে। পাথরের তৈয়ারী মন্দিরে লক্ষ্মীপাটের উপরিস্থ লহড়াযুক্ত খিলান মন্দিরের বাহির হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু ইটের তৈয়ারী মন্দিরে দেখা যায়।[৬] পাথরের

৫ Bose : *ibid*, p. 81.

৬ Bose : *ibid.*, p. 121, plates facing pp. 110, 112.

তেলকুপি গ্রামের মন্দিরের অন্তর

(চতুর্থ শ্রেণী—গ)
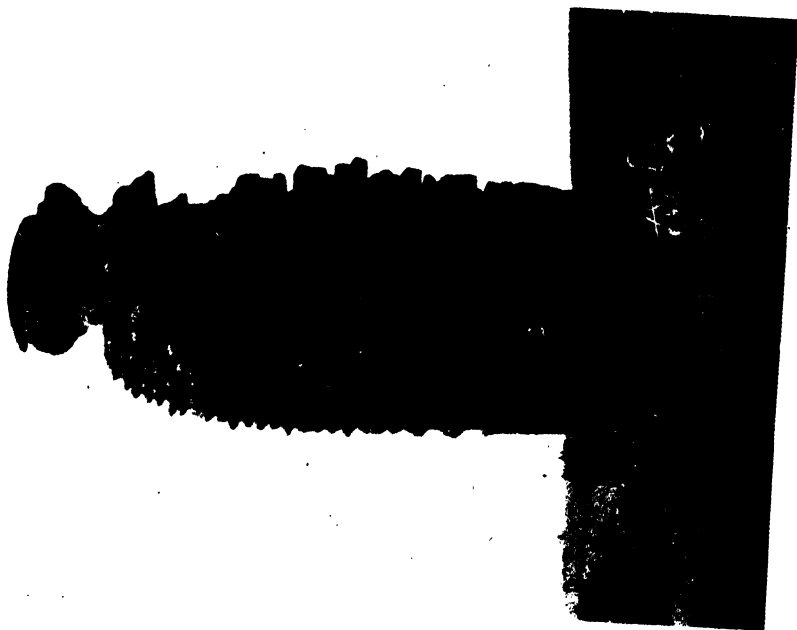
মোখলিঙ্গমের প্রধান মন্দির ঈশ্বরকোভিন

তৈয়ারী মন্দিরে ইহাকে ভিতর হইতে উর্দ্ধমুখী সুড়ঙ্গের মত দেখায়। ইহাকে শিল্পীদের ভাষায় 'ডাকিনী পোল' বলে। কোন কোন বিদ্বানী বা শিল্পী ইহাকে 'গমা' বলিয়া থাকেন। কিন্তু শিল্পশাস্ত্রে গমা সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না সন্দেহ। অতএব ডাকিনী পোল নামটিই আমরা ব্যবহার করিব।

ভিজাগাপটম জেলায় বংশধারা নদীর কূলে মোখলিঙ্গম নামে এক গ্রাম আছে।[৭] ইহা অতি প্রাচীন তীর্থ ও এখানে চারি পাঁচটি ভাল মন্দির আছে। তাহার মধ্যে ভীমেশ্বর মন্দিরের অন্তর প্রথম শ্রেণীর। মোখলিঙ্গমের প্রধান মন্দির অর্থাৎ ঈশ্বরকোভিলের অন্তর কিরূপ, তাহা বলিতে পারি না। আমি যে-সময়ে মোখলিঙ্গমে যাই, তখন পুরোহিতদের মধ্যে কলহের জন্য মন্দিরের দরজায় চাবি ও শীলমোহর পড়িয়াছিল, অতএব গর্ভগৃহে প্রবেশ করা সম্ভব হয় নাই। তবে ঈশ্বরকোভিলের প্রাঙ্গণে অগ্নিকোণে একটি ছোট রেখ দেউল আছে, তাহার অন্তর প্রথম শ্রেণীর। করাপুট জেলায় মহেন্দ্রগিরি পর্ব্বতের শিখরে যুধিষ্ঠির দেউল নামে একটি মন্দির আছে। ইহার অন্তরও প্রথম শ্রেণীর। তবে ইহার বিশেষত্ব হইল, লক্ষ্মীপাটের উপরে ডাকিনী পোল নাই। যে-পাথরে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত, তাহা খুব কঠিন এবং পাটগুলিও খুব প্রশস্ত ও স্থূল; এই কারণে বোধ হয়, লক্ষ্মীপাটের উপরে ভার কমাইবার জন্য খিলানের প্রয়োজন হয় নাই। কটক জেলায় যাজপুর নগরে বরাহনাথ, জগন্নাথ ও ত্রিলোচন মহাদেবের তিনটি মন্দিরেরই অন্তর প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। বড়ম্বা রাজ্যে সিংহনাথ মন্দিরও এইরূপ। তাহার গর্ভগৃহের উপরের দিকের দৃশ্যের একটি ফটোগ্রাফ দেওয়া হইল। কিন্তু সিংহনাথের প্রাঙ্গণে যে ক্ষুদ্র রেখ দেউল আছে, তাহার অন্তর চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভুবনেশ্বরে বা পুরী জেলার অন্যত্র প্রথম শ্রেণীর অন্তর-বিশিষ্ট মন্দির আদৌ নাই। যে-কয়টি মন্দিরের নাম করিলাম, তদ্ভিন্ন ঐরূপ অন্তর-বিশিষ্ট মন্দির উড়িষ্যায় আর দেখি নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণী—উপরে মন্দিরের অন্তর গঠনের যে কৌশল বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি দোষ আছে। এরূপ মন্দির হয়ত খুব দৃঢ় হয় না; কারণ, চারি দিকের দেওয়ালের মধ্যে কোণে কোণে জোড় ভিন্ন আর কোনও যোগ নাই, অথচ দেওয়ালগুলি লহড়ার জন্য পরস্পরের দিকে ঈষৎ বাঁকিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যদি দুই বিরুদ্ধ দেওয়ালের মধ্যে কড়ির মত পাথরের পাটের সাহায্যে কোনও বাঁধন দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত গাঁথনিটি আরও মজবুত হইবার কথা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। ভুবনেশ্বরে রামেশ্বর নামে এক মন্দির আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে তিনটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে, এগুলিকে স্থানীয় লোকে লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নেশ্বর বলে। তিনটি মন্দিরই পশ্চিমাস্য। ইহাদের

৭ Bhabaraj V. Krishnarao: "The Identification of Kalinganagara," *JBORS*, Vol. XV. P 105. এবং 'প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ "প্রাচীন কলিঙ্গের একটি গ্রাম"।
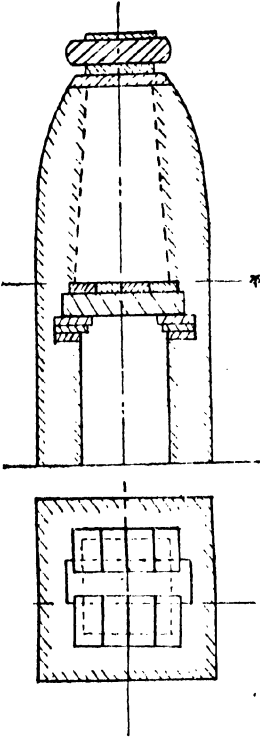
দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর (খখ স্থানে)
নীচে কক ক্ষেত্রের আসন

গর্ভে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, গণ্ডীর মধ্যে খানিক উপরে উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের মধ্যে বিস্তৃত একটি মোটা ও চওড়া পাথরের পাট কড়ির মত বসান আছে। ইহার ভার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দুই দেওয়ালে ঠিক কড়ির প্রান্তে নীচে সামান্য দুই তিনটি লহড়া ব্র্যাকেটের মত স্থাপিত হইয়াছে। কড়িকাঠের মত পাটটি চওড়া হইলেও গর্ভগৃহকে একেবারে মুদ্রিত করে নাই। সেই জন্য ঠিক তাহার উপরে আরও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং ছোট পাট বিছাইয়া দুই দিকের ফাঁক সম্পূর্ণ বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির এক প্রান্ত দেওয়ালের মধ্যে, অপর প্রান্ত নিম্নস্থ পাটের উপরে ন্যস্ত। কড়িকাঠটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা, উপরের বরগার পাটগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। এইরূপ গঠনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গঠন বলা যাইতে পারে। পাথরের পাটগুলির দ্বারা গর্ভগৃহ মুদ্রিত হয় বলিয়া উপরের পাটের সমষ্টিকে গর্ভমুদ (ceiling) বলে।

লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে উপরোক্ত যে-তিনটি মন্দিরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের কড়ির সংখ্যা এক। একটি মন্দিরে কড়ির এক পাশে বরগার সংখ্যা পাঁচ, অপর দিকে ছয়। একখানি বরগার পাট পড়িয়া গিয়াছে, সেই ফাঁক দিয়া দেখা যায় যে, গর্ভমুদের উপরিভাগে দেওয়ালের গঠন প্রথম শ্রেণীর মত। বিসমের দ্বারাই বোধ হয়, শেষে ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ব্যবধানটি মুদ্রিত হইয়াছে।

উল্লিখিত তিনটি মন্দির ভিন্ন উড়িষ্যায় আর একটি মাত্র মন্দিরে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর দেখা যায়। ভুবনেশ্বরে কোটিতীর্থের উত্তর দিকে একটি ভাঙা ও গাছপালায় আচ্ছন্ন মন্দির আছে। ইহার কারুকার্য্য চমৎকার, কিন্তু আর অল্প দিনের মধ্যে ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার গঠনও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কেবল একটির জায়গায় দুইটি কড়ি আছে। বরগার বিন্যাস শত্রুঘ্নেশ্বরের মত। কিন্তু শত্রুঘ্নেশ্বরের মন্দিরে বরগার পাট আগাইয়া আসিয়া ডাকিনী পোলকে আচ্ছাদিত করিয়াছে, এখানে সেরূপ নহে। ডাকিনী পোল ধরিয়া গর্ভমুদের উপরিস্থ কুটুরিতে যাওয়া যায়।

তৃতীয় শ্রেণী—দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ অল্প। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কড়ি এবং বরগার পাটগুলি দুই ভিন্ন সমতলে বিন্যস্ত, কিন্তু তৃতীয়ে উভয়ে একই সমতলে বিরাজ

করে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বরগার পাটের এক প্রান্ত দেওয়ালে গাঁথা, অপর প্রান্ত কড়ির উপরে স্থাপিত। কিন্তু তৃতীয়ে তাহার এক প্রান্ত কড়ির গায়ে কি করিয়া আটকান থাকে, বলিতে পারি না; নীচে হইতে মনে হয়, যেন শুধু গায়ে ঠেকিয়া আছে। হয়ত কড়ির গায়ে কোনও খাঁজ কাটিয়া উপরের দিকে ইহার কিয়দংশ জোড়া থাকে। নীচে হইতে দেখা যায় যে, কড়ি এবং বরগার পাটগুলি একই সমতলে বিন্যস্ত।
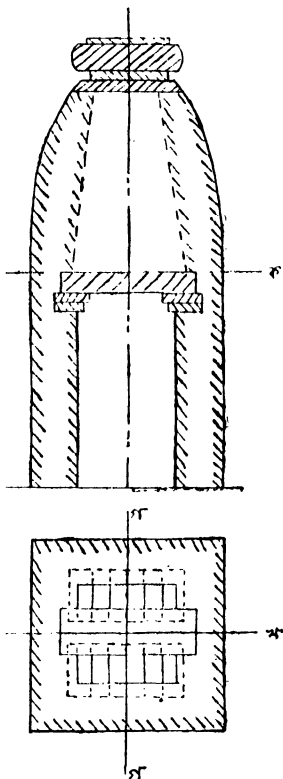
তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর (খখ-স্থানে
নীচে কক ক্ষেত্রের আসন
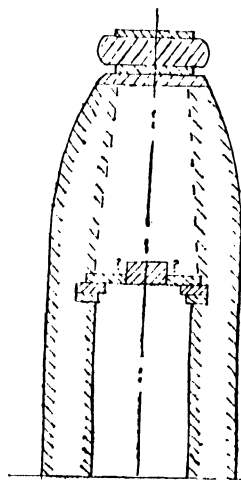
তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর (গগ-স্থানে)

যাহাই হউক, কড়ি ও বরগার বিন্যাসে এক বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর সহিত দ্বিতীয়ের মিল আছে। কড়ি যে-দিকে লম্বা, বরগার পাটগুলি তাহার সমকোণে লম্বা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আরও একটি বিষয়ে সামান্য প্রভেদ আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে কড়ির নীচে দুই দেওয়ালে অল্প লহড়া দেওয়া থাকে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে চারি দেওয়াল হইতেই সামান্য লহড়া নির্গত হইয়া কড়ি এবং বরগার নীচে ব্র্যাকেটের মত ভার ধারণ করে।

ভুবনেশ্বরে পরশুরামেশ্বর ও উত্তরেশ্বরের মন্দির তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর-বিশিষ্ট, উড়িষ্যায় এরূপ আর কোনও মন্দির দেখি নাই।

চতুর্থ শ্রেণী—চতুর্থ শ্রেণীর গঠন অন্যরূপ। ইহাতে গর্ভমুদ আছে বটে, তবে তাহার রচনা তৃতীয় শ্রেণীর মত নহে। তৃতীয় শ্রেণীতে গর্ভমুদ সমতল, কিন্তু তাহার কিয়দংশে পাট যে-দিকে লম্বা, অপরাংশের পাট তাহার সমকোণে লম্বা। চতুর্থ শ্রেণীতে পাটগুলি সবই একই দিকে লম্বা এবং তাহাদের মধ্যে কড়ি ও বরগার মত আকারে বা দৈর্ঘ্যে তারতম্য নাই, সকলগুলিই আনুমানিক একই আকারের হইয়া থাকে। চতুর্থ শ্রেণীতে গর্ভমুদের নীচে অল্প লহড়া থাকে, এবং সে-লহড়া চারি দেওয়াল হইতেই নির্গত হয়। এই হিসাবে তৃতীয়ের সহিত চতুর্থের মিল আছে।

গর্ভমুদের উপরিভাগের গঠন তিন বা চারি রকম হইতে পারে, এবং তাহা কতকটা গর্ভের অনুপাতে মন্দিরের উচ্চতার উপরে নির্ভর করে। (ক) শোণপুর রাজ্যে সালেভাটার মন্দিরে দেখা যায়, গর্ভমুদের উপরের গঠন কতকটা প্রথম শ্রেণীর মত। চারি দিকের দেওয়াল মস্তকের নিকট কাছাকাছি ঘেঁষিয়া আসিয়াছে এবং বিসমের পাটের দ্বারা তাহা আবৃত হইয়াছে। (খ) কিন্তু পাটনা রাজ্যে রাণীপুর-ঝরিয়াল গ্রামে দেখা যায় যে, বিসমের কাছে পৌঁছিয়াও দুই বিরুদ্ধ দেওয়ালের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং গর্ভমুদের মতই বিস্তৃত পাটের দ্বারা বিসমভূমিতে সেই ব্যবধান আবৃত করা হয়। (গ) মানভূম জেলায় তেলকুপি গ্রামে ইহার আরও একটি প্রকারভেদ দৃষ্ট হয়। গর্ভের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে মানভূমের রেখ দেউল উচ্চতায় উড়িষ্যার তুলনায় বেশী মনে হয়। সেখানে গর্ভমুদ এবং বিসমের মধ্যে আরও একবার বিরুদ্ধ দেওয়ালকে পাটের সাহায্যে বাঁধিতে হইয়াছে। শিল্পিগণ এই আচ্ছাদনকে রত্নমুদ বলিয়া থাকেন।
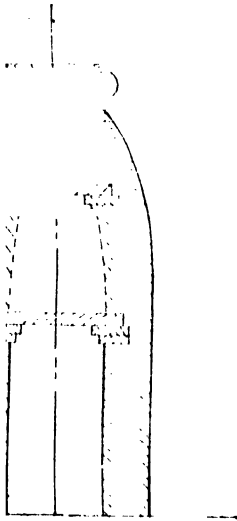
চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর

চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে আরও একটি বিশেষত্ব আছে। গর্ভমুদের জন্য যে পাটগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদের সংযোগস্থলে ঠিক নীচে প্রায়ই একটি করিয়া লোহার কড়ি স্থাপিত হয়।

উড়িষ্যার বহু মন্দির চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্গত। ভুবনেশ্বরে মুক্তেশ্বর, কোটিতীর্থ, চিত্রেশ্বর, বরুণেশ্বর, মেঘেশ্বর, রামেশ্বর, অলাবুকেশ্বর এইরূপ। বাণেশ্বর ও মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও বিশ্বেশ্বর এইরূপ বটে, তবে তাহাদের পাটের সংযোগস্থলে লোহার কড়ি ব্যবহৃত হয় নাই। বৌদ রাজ্যে রমানাথ মন্দির ও গন্ধরাড়ির যুগল মন্দিরের অন্তর বর্ত্তমান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সম্বলপুর জেলায় নরসিংহনাথের মন্দির এবং পাটনা রাজ্যে রাণীপুর-ঝরিয়ালের সোমেশ্বর মন্দিরের অন্তরও চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে এই সকল মন্দিরে গর্ভমুদের উপরিভাগের গঠন সালেভাটার মত, না রাণীপুর-ঝরিয়ালের প্রদর্শিত চিত্রটির মত, না মানভূমের তেলকুপির মত, তাহা বলা সম্ভব নয়।

(ঘ) ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ ও হয়ত পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে গর্ভমুদের উপরে রত্নমুদের দ্বারা আচ্ছাদিত আরও একটি কুটুরি আছে। কিন্তু লিঙ্গরাজে গর্ভমুদ এবং রত্নমুদ রচনা করিতে প্রথমে পাঁচ ও পরে ছয় লহড়ার খিলান গাঁথিয়া পরে পাট বসান হইয়াছে। তথাপি পাটের ব্যবহার রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। ইহা প্রায় চতুর্থের (গ) উপশ্রেণীর মত, প্রভেদ লহড়ার আতিশয্যে।

পঞ্চম শ্রেণী—চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যে গর্ভমুদের গঠনে মূলগত প্রভেদ আছে। মন্দিরের চারিটি কোণ। সেই সকল কোণে যদি আড়াআড়ি এক-একখানি পাথরের পাট বসান হয়, তবে অবশিষ্ট ছিদ্র হয় অষ্টকোণ হইবে, নয়ত চতুষ্কোণ হইবে। আড়াআড়ি পাথরের পাটগুলির নাম পরাসপাট। ইহার আকারের উপরে অবশিষ্ট ছিদ্রের আকার নির্ভর করে। যদি তাহা চতুষ্কোণ হয়, তখন আবার সেই চতুষ্কোণের চারি কোণে চারিটি পরাসপাট বসাইয়া তাহাকে আরও ছোট করা চলে। তখন উপরে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। সেই ছিদ্রকে একখানি বা দুইখানি পাট দিয়া মুদ্রিত করিয়া দিলেই চলে। পঞ্চম শ্রেণীর ইহাই বিশেষ লক্ষণ। মহেন্দ্রগিরি পর্ব্বতে গোকর্ণেশ্বরের গর্ভমুদ এবং শোণপুর রাজ্যে তেল নদীর কূলে অবস্থিত বৈদ্যনাথ-মন্দিরের গর্ভমুদ এইরূপে রচিত। পাটনা রাজ্যে রাণীপুর-ঝরিয়ালে অবস্থিত ইঁটের মন্দিরে পাথরের পরাসপাট দিয়া এইরূপ গর্ভমুদ রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার উপরের ঘরটি প্রথম শ্রেণীর মত রচিত। সেখানে ভাঙা দেওয়াল বাহিয়া প্রবেশ করা যায়।

পঞ্চম শ্রেণীর অন্তর (খখ-স্থানে নীচে কক ক্ষেত্রের আসন
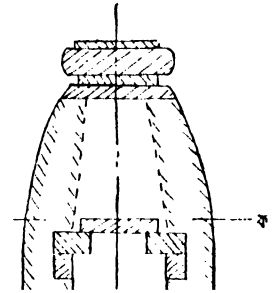
ষষ্ঠ শ্রেণী—দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীতে দুই বিরুদ্ধ দেওয়ালকে বাঁধিবার জন্য, অথবা গর্ভকে মুদ্রিত করিবার জন্য বিস্তৃত পাটের আবশ্যকতা হয়। কিন্তু

ষষ্ঠ শ্রেণীতে অত বিস্তৃত পাথরের পাটের প্রয়োজন হয় না, অপেক্ষাকৃত ছোট পাথরের সাহায্যেই সব কাজ চলিয়া যায়।
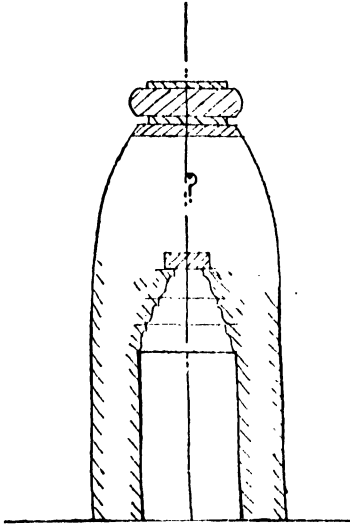
ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের সিংহদ্বারের কিছু পূর্ব্বে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন একটি মন্দির আছে। তাহার অন্তরের গঠন দেখিলে বুঝা যায়, শিল্পিগণ দীর্ঘ পাটের বদলে শুধু লহড়াযুক্ত খিলানের দ্বারাই গর্ভমুদ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে চতুর্থ শ্রেণীর মত লোহার কড়ির আর প্রয়োজন হয় না।

ঠিক এরূপ অন্তর অপর কোনও পাথরের মন্দিরে দেখি নাই বটে, তবে ভুবনেশ্বরের কোনও কোনও মন্দিরে গর্ভমুদ ছোট করিবার জন্য হয়ত অনেকগুলি লহড়ার পরে গর্ভমুদের পাট বসান হইয়াছে, এরূপ দেখিয়াছি। সেরূপ অন্তর চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিতে হইবে। শুধু লহড়ার সাহায্যে, অর্থাৎ ছোট পাথরের দ্বারা, গর্ভমুদ রচনার দৃষ্টান্ত বিরল।

পুরী জেলায় বাণপুরের উত্তরে পাটপুরে ইঁটের তৈয়ারী নীলকণ্ঠেশ্বরের দেউল ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত ধরা যাইতে পারে।

সাধারণ কথা—এইরূপে উড়িষ্যা এবং পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম ও ভিজাগাপটম জেলার মধ্যে আমরা ছয় প্রকার অন্তরের পরিচয় পাই, তাহার মধ্যে চতুর্থ শ্রেণীর ভিতর আবার চারিটি প্রকারভেদ আছে। সকল শ্রেণীর অন্তর গঠনের রীতি যে একই কালে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। কালের গতির সহিত শিল্পিগণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁহারা নানাবিধ অন্তর গড়িতে থাকেন। ঠিক কি ভাবে মন্দির গঠনের বিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহা আবিষ্কার করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। ক্রমবিবর্ত্তনের ধারাটি প্রমাণ সহ ধরিতে পারিলে আমাদের কার্য্য সমাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার এখনও বিলম্ব আছে, উপস্থিত আমাদিগকে অন্তরের শ্রেণী-বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে হইবে।

পাঁচুঠাকুরের পাঁচালি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম্ এ

পশ্চিম-বঙ্গের স্ত্রীসমাজে পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ বা পাঁচু ঠাকুরের পূজা সমধিক প্রচলিত। শিশুদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শিবের এই লৌকিক রূপের আরাধনা করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গের প্রায় পল্লীতেই পঞ্চাননপূজার নির্দিষ্ট স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চাননের স্মৃতিপূত পঞ্চাননতলা নামে বহু স্থান পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই বহুলপ্রচলিত দেবতার সম্বন্ধে প্রচলিত সাহিত্যের পরিমাণ নিতান্ত কম।

রেভারেণ্ড ওয়ার্ড[১] ও লালবিহারী দে[২] মহাশয় এই দেবতার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহার আকর মনে হয় জনশ্রুতি। বিশ্বকোষে[৩] প্রদত্ত নাতিসংক্ষিপ্ত বিবরণে মনোহর ব্যাসকৃত এই দেবতার একখানি মঙ্গলকাব্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে এইরূপ আরও গ্রন্থ প্রচলিত আছে। ব্যাসকৃত গ্রন্থের উপাখ্যান এইরূপ—

হস্তিনাপুরের সুরথ নামক রাজা পঞ্চাননের বরে পুত্র লাভ করেন। পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজদম্পতী দেবতার কথা একরূপ ভুলিয়াই যান। ফলে ক্রুদ্ধ দেবতা ডাইনীদের দ্বারা বালককে অপহরণ করান। পরে রাজার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও আড়ম্বরের সহিত দেবতার পূজা করেন, একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবতার মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও পূজার প্রচার করেন।

ব্যাসের গ্রন্থের কোনও পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বিশ্বকোষে অন্য কোনও গ্রন্থের নাম বা পরিচয় পাওয়া যায় না।

তবে কলিকাতার রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় বৃহদ্রুদ্রযামল নামক যে অজ্ঞাতপূর্ব তান্ত্রিক গ্রন্থের তিনখানি পুথি আছে, এই দেবতার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করাই তাহার অংশবিশেষের উদ্দেশ্য। এই সকল অংশে বাংলা মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে জনসাধারণের নিগ্রহানুগ্রহ বিষয়ে এই দেবতার অলৌকিক শক্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের দেবতার মত ইনিও সন্তুষ্ট হইলে ভক্তদের ইষ্ট সাধন করেন এবং অসন্তুষ্ট হইলে অবজ্ঞাকারীর অশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া থাকেন। হইতে পারে, এই

১। *A View of the History, Literature, and Mythology of the Hindoos* (Serampur 1815), ২য় খণ্ড।

২। *Bengal Peasant Life*, পৃ. ৬২-৫ (১৯২৬ সালের সংস্করণ)।

৩। বিশ্বকোষকারের মতে পঞ্চানন ও তাঞ্জোরের নিকটবর্ত্তী স্থানের তিরুবয়র নামক দেবতা অভিন্ন। কিন্তু তাঁহার এই মত যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তাঞ্জোরের দেবতার নাম পঞ্চনদীশ্বর এবং তাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনাপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পঞ্চনদমাহাত্ম্য।

গ্রন্থও কোন বাংলা মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে রচিত—কিন্তু ইহার উপাখ্যান বিশ্বকোষে উদ্ধৃত উপাখ্যান হইতে স্বতন্ত্র। লৌকিক দেবতার বিবরণ সংস্কৃতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত না হইলেও দুর্লভ—তাই এই গ্রন্থখানির কিছু মূল্য আছে। অবশ্য এই গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য সন্দেহাত্মক। 'বৃহৎ' এই বিশেষণটি ইহার অর্বাচীনতার সাক্ষ্য দান করে, এরূপ সংশয় অসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ পঞ্চাননের পূজার গৌরববৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের সহিত ইহার উপাখ্যানের সংযোগসাধনের প্রয়াস অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। মনে হয়, ইহা বাংলা দেশে রচিত বাংলার লৌকিক দেবতাবিষয়ক এক অর্বাচীন গ্রন্থ। ইহার যে তিনখানি পুথির কথা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহা সকলই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহার কোনও উল্লেখ কোনও প্রচলিত নিবন্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় না। তন্ত্রের যে সমস্ত প্রচলিত তালিকা আছে, তাহার মধ্যে এই গ্রন্থের নাম নাই। কিন্তু বাংলার অতিপরিচিত দেবতার বিস্তৃত কাহিনী বর্ণনা করে বলিয়া প্রাচীন হউক বা অর্বাচীন হউক, এই গ্রন্থের মূল্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

গ্রন্থের পুথি তিনখানি দীর্ঘকাল যাবৎ সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত হইলেও ইহাদের বিশেষ কোনও আলোচনা এ পর্য্যন্ত হয় নাই। রামচন্দ্র বা রামানন্দের টীকা-সহিত খণ্ডচতুষ্টয়াত্মক সমগ্র গ্রন্থের পুথিখানি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিঅম কলেজ কর্ত্তৃক প্রথম সংগৃহীত হয়, পরে ইহা ঐ কলেজের অন্যান্য পুথির সহিত সোসাইটীতে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় পুথিতে গ্রন্থের সটীক দ্বিতীয় খণ্ডটি মাত্র রক্ষিত হইয়াছে।[৪] ইহা ১৮৯০-১ সালে সংগৃহীত হয়। টীকাহীন মূলমাত্র চতুর্থখণ্ডযুক্ত তৃতীয় পুথিখানি ১৯১৪ সালে সংগৃহীত।

রামানন্দের মতে আলোচ্য পুথিতে গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার মাত্র সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের পুষ্পিকার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া রামানন্দ স্পষ্ট বলিয়াছেন—বৃহদ্‌রুদ্রযামল নামক গ্রন্থ বাইশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে গণপতির উপাসনার বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে পঞ্চাননের জন্ম ও কর্মের বিবরণ, দ্বিতীয় তৃতীয়ে বন্ধ্যালক্ষণ, চতুর্থে ব্রহ্মচর্যনিরূপণ। নারদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষ্ণু দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডের সার বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই গ্রন্থের নাম বৃহদ্‌রুদ্রযামলীয় অর্থাৎ বৃহদ্‌রুদ্রযামল হইতে উদ্ধৃত। প্রাপ্ত পুথির আলোচ্য বিষয়ও অনেকাংশে রামানন্দের বর্ণনানুরূপ। ইহাতে তিন অধ্যায়ে সমাপ্ত প্রথম খণ্ডে গণেশের উপাসনা, দ্বিতীয় খণ্ডে ত্রিশ অধ্যায়ে পঞ্চাননের বিস্তৃত উপাখ্যান, তৃতীয় খণ্ডে বাইশ অধ্যায়ে বন্ধ্যার লক্ষণ ও পঞ্চাননের পূজাদি সাহায্যে তাহার প্রতীকারের উপায়বর্ণনা, চতুর্থ খণ্ডে পাঁচ অধ্যায়ে পূজার বিভিন্ন পদ্ধতি, বর্ণবিভাগ,

---

৪। সম্ভবতঃ এই পুথিখানিরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্বর্গগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল (*Notices of Sanskrit MSS.*—১।২৫০)।

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজের কিছু পূর্বে অবস্থিত ভাঙা মন্দিরের অন্তর

(ষষ্ঠ শ্রেণী)
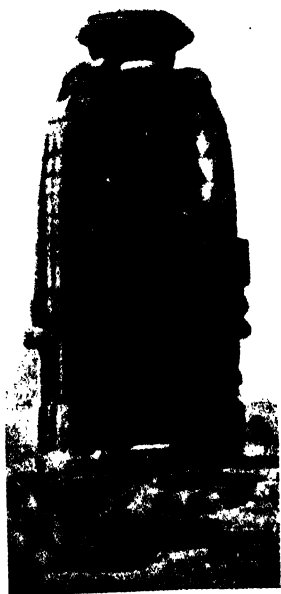
রাণীপুর ঝরিয়ালের একটি
মন্দিরের অন্তর

(চতুর্থ শ্রেণী - খ)

সিংহনাথ মন্দিরে গর্ভগৃহের উপরের দিকের দৃশ্য

(প্রথম শ্রেণী)

প্রভৃতি সাধারণ কথা এবং পঞ্চম খণ্ডে[৫] কালীর উপাসনা দ্বিতীয় খণ্ডের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বর্ণিত উপাখ্যানের অনুরূপ উপাখ্যান লোকমুখে কোথাও প্রচলিত আছে কি না অথবা পঞ্চাননের উপাসকদিগের নিকট পরিচিত কোনও বাংলা গ্রন্থে পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা দরকার।

এই খণ্ডের প্রারম্ভে দেবতাদের এক মন্ত্রণাসভার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। দেবতারা স্থির করিলেন, নিজেদের শক্তির সমবায়ে এক নূতন দেবতার সৃষ্টি করিতে হইবে (অধ্যায় ১)। শিবের দেহ, বিষ্ণুর মস্তক ও অন্যান্য সকল দেবতাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া এই দেবতা আবির্ভূত হইলেন (অধ্যায় ২)। শিব তাঁহাকে চারি জন দূত দিলেন। ইহাদের লইয়া দেবতা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন এবং কাঞ্চননগর নামক স্থানে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই গাছের তলায় পাথরের উপরে তাঁহার উদ্দেশ্যে পূজা করিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে, পঞ্চানন এইরূপ প্রচার করিয়া দিলেন। (অধ্যায় ৩)।

এই সময় সমীপবর্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সদাচারভ্রষ্ট জনসমূহের মঙ্গলের জন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন— দূতেরা এই কথা বলিলে তাঁহারা উপহাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে দেবতা স্বভাবতই অপমানিত বোধ করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। (অধ্যায় ৪)। দূতেরা ব্রাহ্মণদের বাড়ী যাইয়া তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে এক অভিনব ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত করিলেন। ফলে তাহাদের সমস্ত দেহ শুষ্ক হইয়া গেল। চিকিৎসকেরা রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলেন (অধ্যায় ৫)। যথানিয়মে ব্রাহ্মণেরা পঞ্চাননের পূজা করিলে রোগ বিদূরিত হইল (অধ্যায় ৭)।

এক মালী এই অপরিচিত দেবতাকে মালা যোগাইতে অস্বীকৃত হইলে তাহাকেও এইরূপ ভাবে দণ্ড দিয়া, পরে ক্ষমা করা হইল (অধ্যায় ৮)। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতীর দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত পুত্রকে পঞ্চাননের পূজার বলে পুনরুজ্জীবিত করিয়া দূতেরা এই দেবতার অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিল (অধ্যায় ৯)।

কাঞ্চননগরের রাজা নরধ্বজ অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার আট রাণী লইয়া দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন। পূর্বোল্লিখিত নিগৃহীত ব্রাহ্মণচতুষ্টয়ের উপদেশানুসারে পঞ্চাননের পূজা করিয়া রাজা প্রত্যেক রাণীর গর্ভে একটি করিয়া পুত্র লাভ করিলেন (অধ্যায় ১০-১২)। তিনি প্রতিদিন দেবতার পূজা করিতেন। কালে দেবতার উদ্দেশে একটি স্বর্ণমন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি উৎসুক হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা লঙ্কা হইতে স্বর্ণ আনয়ন করিতে

৫। উল্লিখিত প্রথম পুথিতেই এই খণ্ড আছে। পুষ্পিকায় ইহা চতুর্থ খণ্ড বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু খণ্ড-প্রারম্ভে ইহাকে পঞ্চম খণ্ড বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—'তত্র হ পঞ্চমে খণ্ডে কালীধর্মো নিরূপিতঃ' (পৃঃ ১০৪)।

সম্মত হইলেন। এই লঙ্কানগরী বড় ভীষণ, মন্ত্রীরাও কেহ এখানে যাইতে সাহস করেন নাই। তাঁহাদের ভীতি অকারণ নয়। রাজপুত্রেরা সাহস করিয়া যাত্রা করিলেন সত্য; কিন্তু পথে নানা বাধাবিঘ্ন তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তবে পঞ্চাননের অনুগ্রহে তাঁহারা সকল বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পথে রাজা কীর্ত্তিধ্বজের অনুচরেরা তাঁহাদিগকে বাধা দেয়, নূতন দেবতার নাম শুনিয়া ঠাট্টা করে এবং দেবতার চক্রান্তে নিহত হয় (অধ্যায় ১৫)। তখন কীর্ত্তিধ্বজের পুত্র বীরসেন আসিয়া আট ভাইকে পরাস্ত করে। তাঁহারা পঞ্চাননের সাহায্য প্রার্থনা করিলে দূতেরা আসিয়া তাঁহাদের রক্ষা করে এবং বীরসেনকে বধ করে (অধ্যায় ১৬)। কীর্ত্তিধ্বজের ইষ্টদেবতা বিষ্ণু সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া পঞ্চাননের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ শক্তিশালী দেবতার ভক্ত-দিগের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য কীর্ত্তিধ্বজকে তিরস্কার করিলেন। কীর্ত্তিধ্বজও নরধ্বজের পুত্রদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং অধিকতর অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন (অধ্যায় ১৭)। রাজকুমারগণ আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তপস্যারত এক ব্রাহ্মণের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আশ্চযের বিষয়, তাঁহারা অন্ধ হইয়া গেলেন। পঞ্চাননকে স্মরণ করায় তিনি আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন— এই ব্রাহ্মণের সমস্ত জিনিষপত্র চুরি হইয়া যাওয়ায় ইনি এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আশ্রমের এক ক্রোশের মধ্যে যে মানুষ আসিবে, সে-ই অন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু পঞ্চাননের এই বিষয়ে প্রতীকারের কোন হাত ছিল না। রাজকুমারেরা তাঁহার পরামর্শ মত ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করিয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলেন (অধ্যায় ১৮-৯)।

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। জলপানের উদ্দেশ্যে তাহার মধ্যে নামিলে এক কুমীর ও তাহার স্ত্রী তাঁহাদিগকে গিলিয়া ফেলিল। কুমারেরা তাহাদের উদরের অভ্যন্তর হইতেই পঞ্চাননকে ডাকিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের চেষ্টার ফলে কুম্ভীরদম্পতী রাজকুমারদিগকে উগরাইয়া দিল (অধ্যায় ২১)।

অতঃপর তাঁহারা এক চন্দনবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা দেখিলেন—এক রৌপ্যমন্দির, আর তাহার প্রাচীর সোনার তৈয়ারী। মন্দিরের অধিপতি শিব তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরে হনুমান্‌কে আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহাদের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া হনুমান্ তাঁহার বিশাল লাঙ্গুলের দ্বারা শিলাময় সেতুর ভগ্নস্থান[৬] পার হইতে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিলেন এবং তাঁহারা নির্বিঘ্নে লঙ্কানগরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন (অধ্যায় ২২)। হনুমানের সুপারিসে লঙ্কার রাজা বিভীষণ তাঁহাদিগকে সোনা দিলেন (অধ্যায় ২৩)।

তার পর তাঁহারা সোনায়-ভরা নৌকা লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। দেশে ফিরিলে পিতামাতা, প্রজা, আত্মীয়স্বজন, সকলে সানন্দে তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিলেন।

৬। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ যখন লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসেন, তখন লক্ষ্মণ সেতুর এক অংশ ভাঙ্গিয়া দেন।

(অধ্যায় ২৪)। বিশ্বকর্মার সাহায্যে তখন নরধ্বজ এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিলেন। যথানিয়মে আড়ম্বরের সহিত এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল। এই সময়ে পঞ্চানন ও অনুচর-বর্গের যথোচিত পূজা করা হয়। এই প্রসঙ্গে ইঁহাদের সকলেরই বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, পঞ্চানন শুভ্রবর্ণ, পঞ্চমুখযুক্ত এবং বলীবর্দ তাঁহার বাহন। আর তাঁহার ত্রিবিধ অনুচরের মধ্যে একদল হরিদ্রাভ, গজারোহী ও ধনুর্ধারী, আর একদল রক্তাভ, অশ্বারোহী ও ত্রিশূলধারী এবং তৃতীয় দল কৃষ্ণবর্ণ, উষ্ট্রারোহী ও অসিধারী (অধ্যায় ২৫)।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চানন তাঁহার পূজাপ্রচারের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাও দেবতার অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিয়া এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। দেবতার পূজা প্রচারিত হইল। রাজা জরাসন্ধ ঘোষণাপত্রের অবমাননা করিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফলে পঞ্চাননের ক্রোধ তাঁহার উপর নিপতিত হইল। তাঁহার পুত্রেরা মরিয়া গেল—তিনি নিজে আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। এই সময়ে নারদ তাঁহার মঙ্গলের জন্য পঞ্চাননের পূজা করিলে জরাসন্ধের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া আসিল এবং তিনি পঞ্চাননের একজন প্রধান ভক্ত হইয়া পড়িলেন (অধ্যায় ২৬)। পঞ্চানন তখন এই নিয়ম করিয়া দিলেন, যে সমস্ত লোক, বিশেষতঃ যে সকল স্ত্রীলোক ও শিশু, প্রচলিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করিবে, তাহাদের উপর তাঁহার অনুচর ও ভূতপ্রেতবর্গের পূর্ণ অধিকার থাকিবে (অধ্যায় ২৮)। তার পর, রাজপুত্র ও রাণীদিগের সহিত রাজাকে লইয়া পঞ্চানন রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গে গেলেন। সুমেরু-শিখরে অবস্থিত একবিংশতি স্বর্গের অন্যতম নির্মল নামক স্বর্গে সপরিবার রাজার স্থান হইল। (অধ্যায় ৩০)।

এইখানেই জন্মখণ্ড বা পঞ্চাননের উৎপত্তি ও প্রচারের বিবরণ শেষ হইল। এই দেবতার বিস্তৃত পূজা-পদ্ধতিযুক্ত অন্য খণ্ড ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তন্ত্রগ্রন্থে দেবতার পূজাপদ্ধতিরই প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয়, এই দেবতারও সেইরূপ পদ্ধতি গ্রন্থের অপর অজ্ঞাত খণ্ডবিশেষে বিবৃত হইয়াছে।

গুপ্তযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, এম-এ, ডি লিট্

প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গুণাইঘর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজ শ্রীবৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনের পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।[১] গুণাইঘর গ্রাম কুমিল্লা শহরের প্রায় ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং দেবীদ্বার থানার প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের তাম্রশাসন-প্রদত্ত নাম গুণিকাগ্রহার। ১৮৮ গুপ্তাব্দে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫০৭ অব্দে উৎকীর্ণ এবং ক্রীপুর (? ত্রিপুর) নাম জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হয়। শাসন-প্রদাতা মহারাজ শ্রীবৈন্যগুপ্ত 'মহাদেবপাদানুধ্যাতো', অর্থাৎ পরম-শৈব, বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার 'পাদদাস' বা অনুগত নৃপতি মহারাজ রুদ্রদত্তের প্রার্থনানুসারেই উক্ত তাম্রশাসন দ্বারা শাসনোল্লিখিত ভূমিদান মঞ্জুর করা হয়। ভূমিদান বিষয়ে দূতের কার্য্য করিয়াছিলেন মহাসামন্ত মহারাজ শ্রীবিজয়সেন[২]। শাসনের বর্ণনানুসারে গুণিকাগ্রহার গ্রাম উত্তর মণ্ডলে, অর্থাৎ ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। সেই সময়ে তথায় মহাযানপন্থী শাক্যভিক্ষু আচার্য্য শান্তিদেবকে উদ্দেশ করিয়া তৎপ্রতিপাদিত মহাযানী অবৈবর্ত্তিক ভিক্ষুসংঘের বাসের জন্য অবলোকিতেশ্বর-আশ্রম-বিহার নামে একটি নূতন বিহার নির্ম্মিত হইতেছিল মহারাজ রুদ্রদত্তের অর্থে। তিনিই পুনঃ ঐ বিহারে ভগবান্ বুদ্ধের, অর্থাৎ স্থাপিত বুদ্ধ-প্রতিমার চিরদিন যথাবিহিত পূজার ব্যবস্থা এবং বিহারস্থ ভিক্ষুসঙ্ঘের নিত্য-ব্যবহার্য্য অষ্টবস্তু সরবরাহের জন্য ভূমি দান করিয়াছিলেন। প্রদত্ত ভূমিগুলির সীমায় অপর দুইটি বিহার ও একটি প্রদ্যুম্নেশ্বর বা অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত ছিল। অপর দুই বিহারের মধ্যে একটির নাম ছিল রাজবিহার এবং অপরটির নাম ছিল শাক্যভিক্ষু আচার্য্য জিতসেনের বিহার। ঐ সকল ভূমির চৌহদ্দীতে যে সকল ব্যক্তির জমি ছিল, তাঁহাদের নামগুলিও উল্লেখযোগ্য, যথা : বিষ্ণু (বৈষ্ণব নাম) আদিত্য-বন্ধু (অর্দ্ধ বৌদ্ধ নাম), বুদ্ধক (বৌদ্ধ নাম), সূর্য্য (সৌর নাম), মণিভদ্র (হিন্দুর প্রাচীন উপাস্য যক্ষের নাম), যজ্ঞরাত (যাজ্ঞিক নাম)।

অপর দুই বিহারস্থ ভিক্ষুসঙ্ঘের পূর্ব্বে 'মাহাযানিক' বা মহাযানী আখ্যা সংযোজিত হয় নাই দেখিয়া অবশ্যই মনে করিতে হইবে যে, ঐগুলি হীনযান সম্প্রদায়ের ছিল। অবলোকিতেশ্বর-আশ্রম-বিহারের উপাস্য ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ছিলেন অবলোকিতেশ্বর। প্রায়

১ *I. H. Q.*, 1930, p. 45 *f*.

২ মল্লসারুল গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনোক্ত বিজয়সেন ও এই বিজয়সেন অভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একই সময়ে এবং একই গুণাইঘর গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি হইতেও তাম্রশাসনের উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। ঐ গ্রামে বহু বর্ষ পূর্ব্বে কাল পাথরে খোদিত একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হয়। অদ্যাপি ঐ স্থানে এক পুরাতন বিষ্ণুমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং চূড়ার পাড় নামে একটি ছোট মৃত্তিকাস্তূপ আছে। অসম্ভব নহে যে, এই স্তূপের মধ্যে শাসন-বর্ণিত প্রত্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের স্মৃতি লুক্কায়িত আছে।

তাম্রশাসন সম্পর্কে এই কয়টি প্রশ্নের সুমীমাংসা করিতে হয়, যথা :—

(১) শাসনোক্ত মহাযানী শাক্যভিক্ষু আচার্য্য শান্তিদেব এবং বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষাসমুচ্চয় ও সূত্রসমুচ্চয় নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থত্রয়ের খ্যাতনামা রচয়িতা আচার্য্য শান্তিদেব একই ব্যক্তি কি না ?

(২) শাসনোক্ত আচার্য্য শান্তিদেব-প্রবর্ত্তিত মহাযানী (অ)বৈবর্ত্তিক ভিক্ষুসঙ্ঘের বিশেষত্ব কি ছিল ?

(৩) অবলোকিতেশ্বরকে উক্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ আদর্শ বোধিসত্ত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন কেন ?

(৪) গুণাইঘরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি তাম্রশাসনের সমকালবর্ত্তী কি না ?

(৫) ত্রিপুরা অঞ্চলে ঐ যুগে হীনযান ও মহাযানের মধ্যে ধর্ম্মমত ও আদর্শের কতটা ব্যবধান ছিল ?

শাসন-সম্পাদক মহাশয় প্রথম প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, শাসনোক্ত আচার্য্য শান্তিদেব এবং গ্রন্থকার শান্তিদেব এক ব্যক্তি হইতে পারেন না ; কারণ, প্রথম শান্তিদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, আর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে দ্বিতীয় শান্তিদেবের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে নহে। তাঁহার এই মন্তব্যের অনুকূলে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলিও বিবেচিত হইতে পারে :—

(১) তাম্রশাসনে শান্তিদেব কোনও গ্রন্থের গ্রন্থকাররূপে বর্ণিত হন নাই।

(২) শাসনোক্ত শান্তিদেব মহাযানপন্থী হইলেও মাত্র অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের আদর্শানুবর্ত্তী ভিক্ষুসঙ্ঘেরই প্রবর্ত্তক, মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের আদর্শ ঐ সঙ্ঘের অনুকরণীয় ছিল মনে হয় না। পক্ষান্তরে, গ্রন্থকার শান্তিদেবের শিক্ষা-সমুচ্চয়াদি গ্রন্থে গৃহী এবং ভিক্ষু-বোধিসত্ত্বের, মঞ্জুশ্রী এবং অবলোকিতেশ্বর উভয় বোধিসত্ত্ব-আদর্শের সমাবেশ ও সমন্বয় দেখি। শান্তিদেবের সংস্কৃত জীবনী অনুসারে মঞ্জুশ্রীই তাঁহার প্রধান আরাধ্য বোধিসত্ত্ব[৩] বা ইষ্টদেবতা।

(৩) চৈনিক ত্রিপিটক-তালিকায় গ্রন্থকার শান্তিদেবের উদ্ধৃত এমন কতগুলি গ্রন্থের

৩। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-সঙ্কলিত *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection.* Vol. I, pp. 52-53.

নামোল্লেখ আছে, যেগুলি শাসনোক্ত শান্তিদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলা চলে না।

(৪) আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গ্রন্থকার শান্তিদেবের কোনও গ্রন্থ চীনভাষায় অনূদিত হয় নাই, অথচ তিব্বতীয় জ্ঞানকোষ ত্যেঙ্গুরে অনূদিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে প্রথমে বিচার করিতে হয়, শাসন-বর্ণিত ভিক্ষুসঙ্ঘের নাম 'বৈবর্ত্তিক' কি না। ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, শাসন-লক্ষিত সঙ্ঘের নাম 'বৈবর্ত্তিক' না হইয়া 'অবৈবর্ত্তিক' হইবে। সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, শিক্ষাসমুচ্চয়, দশভূমিকসূত্র এবং মহাব্যুৎপত্তি প্রভৃতি গ্রন্থে অবৈবর্ত্তিক বোধিসত্ত্ব, অবৈবর্ত্ত-চক্র, অবৈবর্ত্তিক-ভূমি, অবৈবর্ত্ত-নাম সমাধি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়[৪]। দত্ত মহাশয় ঠিক কোন্ গ্রন্থে 'অবৈবর্ত্তিক ভিক্ষুসঙ্ঘ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছেন, তাহা তিনি নির্দ্দেশ করেন নাই, এবং আমিও তাহা অদ্যাপি খুঁজিয়া পাই নাই। তবে শিক্ষাসমুচ্চয়ের ২৯৪ পৃষ্ঠায় (বেণ্ডল-সম্পাদিত) 'অবৈবর্ত্তিক-চক্র-সমারূঢ়-বোধিসত্ত্বচর্য্যাচরণায়' উক্তি দৃষ্ট হয়। তিনি যথার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'অবৈবর্ত্তিক' শব্দের অর্থ—যাহা হইতে বিবর্ত্তন, প্রত্যাবর্ত্তন বা অধঃপতন নাই। বোধিসত্ত্বগণের শিক্ষা বা সাধনমার্গে অবৈবর্ত্তিক বা অচলা ভূমি এমন এক স্তর, যাহাতে উন্নীত হইলে বুদ্ধত্ব লাভ যথাসময়ে হইবেই।

তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান এই যে, তৎকালে অবলোকিতেশ্বরই এক শ্রেণীর বোধিসত্ত্বগণের অনুকরণীয় আদর্শস্থল ছিলেন। অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে পর্য্যন্ত চরাচরে সামান্য জীবটি পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ না করিতেছে, সেই পর্য্যন্ত তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভে বিরত থাকিবেন। শিক্ষাসমুচ্চয়-উদ্ধৃত অবলোকিতেশ্বর-বিমোক্ষ নামক গ্রন্থের মতে অবলোকিতেশ্বর-আদর্শে অনুপ্রাণিত বোধিসত্ত্ব নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্য স্বোপার্জ্জিত কুশলমূল অর্পণ করিবেন: সর্ব্বজীবের প্রপাতপতন-ভয় দূরীকরণ, নর্দ্দমায় পতন-ভয় প্রশমন, সম্মোহভয়-বিনিবর্ত্তন, বন্ধন-ভয় সমুচ্ছেদ, ইত্যাদি[৫]।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র বলা চলে যে, শাসনোক্ত অবলোকিতেশ্বর ব্যতীত অপর কোনও অবলোকিতেশ্বর-বিগ্রহ স্থাপনের বিষয় আমরা জানি না। গুণাইঘরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তির পাদপীঠে 'যে ধর্ম্মা হেতুপ্রভবাঃ' ইত্যাদি বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদ-সূচক শ্লোকটি খোদিত আছে। দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি বিরল হইলেও অপ্রাপ্য নহে। 'কারণ্ডব্যূহ' নামক মহাযান গ্রন্থে দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থটি ললিতবিস্তর, গণ্ডব্যূহ ইত্যাদি মহাবৈপুল্যশ্রেণীর গ্রন্থসমূহের পরবর্ত্তী। ঢাকা বিক্রমপুর সোনারং গ্রামে লোকনাথজাতীয় দ্বাদশভুজ যে একটি ক্ষুদ্রায়তন অবলোকিতেশ্বর-

---

২। *I. H. Q.*, 1930, p. 572. ৩। শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃঃ ৮৯-৯০।

মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।[৬] উপরোক্ত মূর্ত্তির সহিত তুলনা করিলে এই মূর্ত্তিটি পরবর্ত্তী কালের প্রতীয়মান হইবে। মুর্শিদাবাদ এবং রাজশাহী জেলা হইতেও এই জাতীয় আরও দুইটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখা আবশ্যক যে, শাসনোক্ত আচার্য্য শান্তিদেবের শিষ্যগণ ভিক্ষুব্রতী এবং মহাযানপন্থী। ধ্যানী বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের ব্রতই তাঁহাদের জীবনের ব্রত। মহাযানে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও অক্ষোভ্য, এই তিনের নামে তিনটি স্বতন্ত্র সাধনমার্গ স্বীকৃত হইয়াছিল। এতন্মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞা' সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে পর্য্যন্ত যাবতীয় জীব সর্ব্বপ্রকার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ না পাইতেছে এবং সম্যক্ সম্বোধিতে প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত তিনি নির্ব্বাণ লাভে বিরত থাকিবেন।[৭] মঞ্জুশ্রী অচিরে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না; কারণ, তাঁহার অভিপ্রায়—তিনি সকল জীবের উদ্ধারের জন্য শেষ পর্য্যন্ত জগতে থাকিবেন। অক্ষোভ্য ধ্যানী বুদ্ধের উক্তি হইতেছে যে, সকল জীবকে প্রব্রজিত বা ভিক্ষু না করিতে পারিলে বুদ্ধগণের মধ্যে বিরোধ দেখা যাইবে; অতএব তাঁহার উপদেশ এই যে, জগতে বুদ্ধ বর্ত্তমান থাকুন বা না থাকুন, ভিক্ষু হওয়া গৃহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

তাম্রশাসনের প্রমাণ, তখন ত্রিপুরা অঞ্চলে একই স্থানে স্থবির ও মহাযানপন্থী ভিক্ষুগণ পাশাপাশি বিহারে বাস করিতেছিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কারণ, উভয়পন্থী ভিক্ষুগণ প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং নির্ব্বাণকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের মুখ্য তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, উভয় সম্প্রদায়ের বিনয়-বিধানও একই। তবে নব মহাযানসঙ্ঘের শিক্ষা-

৬। মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত *Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad*, pp. 32-33.

৭। কারণ্ডব্যূহ হইতে উদ্ধৃত: যাবৎ অবলোকিতেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ন পরিপূরিতা ভবতি, সর্ব্বসত্ত্বাঃ সর্ব্বদুঃখেভ্যঃ পরিমোক্ষিতাঃ যাবৎ অনুত্তরায়াং সম্যক্-সম্বোধৌ ন প্রতিষ্ঠাপিতা ভবন্তি। ইত্যাদি Cf. *Ep. Ind.*, XXI, p. 101, foot-note 3.

১। মঞ্জুশ্রী-বুদ্ধক্ষেত্র-গুণব্যূহ হইতে উদ্ধৃত:

"I do not wish to become a Buddha quickly, because I wish to remain to the last in this world to save its beings."—Poussin, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 8., p. 405 and note 2;

বেণ্ডল-সম্পাদিত 'শিক্ষাসমুচ্চয়', পৃঃ ১২-১৩:—

যাবতো প্রথমা কোটিঃ সংসারস্যান্তবর্জিতা।

তাবৎ সত্ত্বহিতার্থায় চরিষ্যাম্যমিতাং চরিম্।

২। শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃঃ ১৪:—

বিসংবাদিতা মে বুদ্ধা ভগবন্তো ভবেয়ুর্যদি সর্বস্যাং জাতৌ ন প্রব্রজেয়মিতি।

প্রণালী এবং বিনয়-বিধান একটা উন্নত ও উদার ভাবের দ্বারা সিঞ্চিত এবং অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।[৮] তাম্রশাসনের মধ্যে দুইটি কথাই বিশেষ অর্থাবহ, (১) বিহারের নাম 'আশ্রম-বিহার', অতএব উহা একটা বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র; (২) সঙ্ঘের নাম 'অবৈবর্ত্তিক সঙ্ঘ'; কাজেই সেইখানে তাঁহাদের সাধনার দৃঢ়তা সূচিত হয়। স্থবির বা প্রাচীন ধর্ম্ম ও বিনয়-বিধানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে এই সঙ্ঘের সাফল্য সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে, বোধিসত্ত্ব-আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে, বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ সতেজ ও শক্তিশালী হইত কি না সন্দেহ। শাসনোক্ত শান্তিদেব ও গ্রন্থকার শান্তিদেব অভিন্ন ব্যক্তি না হইলেও, তাঁহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ও আদর্শের ধারাতে কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

চৈনিক পর্য্যটক হিউয়েন সাঙ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতকের দ্বিতীয় ভাগে পুণ্ড্রবর্দ্ধন জনপদের রাজধানীর সন্নিকটে একটি অবলোকিতেশ্বর-মহাযান-বিহার দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন এই সঙ্ঘারামে পূর্ব্বভারত হইতে সমাগত বহু খ্যাতনামা ভিক্ষু বাস করিতেন। অসম্ভব নহে যে, উত্তরকালে ত্রিপুরার অবলোকিতেশ্বর-আশ্রম-বিহারের প্রভাব উত্তরবঙ্গেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। উক্ত চৈনিক পরিব্রাজকের সময়ে ত্রিপুরা জেলা সমতটের অন্তর্গত ছিল বলা চলে না, যেহেতু তাঁহার বিবরণ অনুসারে সমতটে মহাযানের নামগন্ধ কিছুই ছিল না, তন্মধ্যে যতগুলি সঙ্ঘারাম ছিল, সমস্তই স্থবিরবাদ-সম্প্রদায়ের বা হীনযানের। ত্রিপুরা অঞ্চল পরিদর্শন করিলে তিনি কদাচ এইরূপ বিবরণ দিতেন না।

৮। এই বিষয়টি ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয় তাঁহার *Aspects of Mahayana and its relation to Hinayana* নামক গ্রন্থে ব্যাপকভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শাহজাদা দারা শুকোর পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম. এ., পিএইচ. ডি.

সম্রাট্ শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ দারা শুকো ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ মার্চ সোমবার রাত্রে আজমীর শরিফে জন্মগ্রহণ করেন। শাহজাহান স্বয়ং বিদ্বোৎসাহী ও পাকা মুসলমান ছিলেন; পুত্র-চতুষ্টয়ের সুশিক্ষা ও শরিয়ৎ-অনুযায়ী নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠনের জন্য তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান্ মোল্লাদিগকে তাঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মোল্লা আবদুল লতিফ সুলতানপুরীর নিকট শাহজাদা দারার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ এবং সম্ভবতঃ তাঁহার কাছেই সমাপ্ত হইয়াছিল,—অন্ততঃ তাঁহার অন্য কোন শিক্ষকের নামোল্লেখ দরবারী ইতিহাসে নাই। দারা অসাধারণ মেধাবী ও মনীষাসম্পন্ন ছিলেন এবং জ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও অসীম উৎসাহ ছিল। খেলাধূলা, কবুতরবাজী, শিকার কিংবা বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আয়েশ ও শরাব তাঁহার মনের উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; লেখাপড়ার নেশা ও তত্ত্বজ্ঞানের তৃষ্ণা বরং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি মুসলমানের অবশ্যপঠিতব্য বিষয়গুলি, যথা—কোরান্ হদিস্ তফ্‌সীর বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও মুসলমানী আইন (ফেকা) অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলিয়া মনে হয় না; গণিত অপেক্ষা ফলিত জ্যোতিষে তাঁহার আগ্রহ ছিল অধিক। তর্কশাস্ত্র হয়ত তিনি পড়িয়াছিলেন; আরিস্ত (অ্যারিষ্টটল ও আফ্‌লাতুনের (প্লেটোর) সহিত তাঁহার মোটামুটি পরিচয় ছিল। বিধি-নির্দ্দিষ্ট সুনিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, পিতার অপার স্নেহ, মোগল দরবারে তৎকালীন বিবিধ-বিদ্যাপারগ হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিতমণ্ডলীর অপূর্ব্ব সমাবেশ ও তাঁহাদের সাহচর্য্য এবং নিজের সুদীর্ঘ অখণ্ড অবসর দারার জ্ঞানচর্চ্চার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। মুসলমান রাজাদের মধ্যে বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আব্বাসী খলিফা মামুন ও তৈমুর-বংশে শাহজাদা দারা ব্যতীত অন্য কেহ প্রকৃত পণ্ডিত ও দার্শনিক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই।

জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে মামুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—আরিস্ত-প্রমুখ যবন-মনীষিগণের লুপ্তপ্রায় দর্শন ও তর্ক-শাস্ত্রসমূহের সংগ্রহ ও আরবী ভাষায় অনুবাদ। কিন্তু শাহজাদা দারাই সর্ব্বপ্রথমে উপনিষদের অনুবাদ করাইয়া সভ্য জগৎকে হিন্দুর ব্রহ্মবিদ্যার সন্ধান দিয়াছিলেন। খলিফা মনসুর, হারুণ ও মামুনের সময় ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ, পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যোতিষ, পশুচিকিৎসা ও রসায়ন-গ্রন্থের অনুবাদ ও আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার পর খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অল্-বেরুণী তাঁহার তহকিক্-ই-হিন্দ গ্রন্থে ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার সহিত মুসলমান-সমাজকে পরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ষোড়শ

শতাব্দীর পূর্ব্বে দিল্লী-সম্রাট্‌গণ হিন্দুর জ্ঞানভাণ্ডার ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না; বরং উহা নিশ্চিহ্ন করিয়া হিন্দুজাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্ব ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের যুগ। হিন্দুর ধর্ম্মসাহিত্য ও গণিত-সম্বন্ধীয় পুস্তকসমূহ সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় অনুবাদ কিংবা ঐগুলির সারসঙ্কলন করিয়া মুসলমানের জ্ঞানভাণ্ডার স্থায়ী ভাবে সুসমৃদ্ধ করিবার আয়োজন তিনিই করিয়াছিলেন।

আকবরের রাজত্বে মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ব্ববেদ, লীলাবতী (বীজগণিত), দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা (বত্রিশ সিংহাসন) ইত্যাদির ভাবমূলক অনুবাদ হইয়াছিল। হিন্দুর ষড়্দর্শন, জ্যোতিষ, পুরাণ ইত্যাদির অনুবাদ কিংবা সংক্ষিপ্তসারের সহায়তা ব্যতীত আবুল-ফজলের পক্ষে 'আইন-ই-আকবরী' পুস্তকে উক্ত বিষয়সমূহের আলোচনা নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু শেষোক্ত পুস্তকগুলির ফার্সী অনুবাদের অস্তিত্ব এখন অনুমানের বিষয় হইয়াছে। পুণ্যশ্লোক সম্রাট্ আকবরের রাজনীতি, ধর্ম্মমীমাংসা, শিক্ষানীতি, সমাজ-সংস্কার এবং জ্ঞানচর্চ্চায় উৎসাহ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারের একটি প্রশংসনীয় মূলনীতি ছিল—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরস্পরের ধর্ম্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি সুলতানী আমলের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ভাব দূর করিয়া অভিনব সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির প্রয়াস। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বে রাজনীতিক্ষেত্রে আকবরের নীতি কথঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও ইসলাম ও আর্য্য-সংস্কৃতির ভাবধারাপুষ্ট যথার্থ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার নবরোপিত অক্ষয়বট তাঁহাদের সযত্ন-সিঞ্চিত দাক্ষিণ্য-বারি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল। শাহজাহানের পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে দারা শুকো প্রপিতামহ আকবরের স্বপ্ন সফল করিবার মহান্ উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দারার পারিবারিক জীবনের সহিত তাঁহার শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মজীবন ও জ্ঞানচর্চ্চার এবং ধর্ম্মমতের সহিত তাঁহার রাজনীতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই জন্য প্রথমে উহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার শাহজাদা দারার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রী নাদিরা বেগমের বিবাহ হইয়াছিল। ইহার এক বৎসর পরে তাঁহার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল (১৯ জানুয়ারি, ১৬৩৪ খ্রীঃ); কিন্তু মাত্র তিন মাস পরে ঐ বৎসর দিল্লী হইতে লাহোরে যাইবার সময় রমজানের ঈদের (ঈদ্-উল-ফিত্‌র) দিন মহাকাল নাদিরার ক্রোড় শূন্য করিয়া দারার প্রথম সন্তানকে হরণ করিল। উনিশ বৎসর বয়সে এই নিদারুণ শোকে শাহজাদার দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি প্রবল জ্বর ও হৃদ্‌কম্পে আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে শাহজাদা পিতার সহিত লাহোর যাইতেছিলেন। সম্রাট্ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া লাহোর হইতে হেকিম উজীর খাঁকে আনাইলেন এবং শাহজাদার শুশ্রূষার সুবিধার জন্য জাহানারা বেগমের তাঁবু দারার তাঁবুর কাছে খাটাইবার হুকুম দিলেন।

জননীর প্রতিনিধি ভগ্নী জাহানারার স্নেহে তাঁহার ছোট ভাই-বোনেরা মায়ের

শোক ভুলিয়াছিল। সকলের প্রতি সমান স্নেহশীলা হইলেও দারার প্রতি তাঁহার টান একটু বেশী ছিল। যৌবনে পদার্পণ করিলেও ভাই-বোন যাহাতে নিঃসঙ্কোচে মিলামিশা করিতে পারে, সেজন্য সম্রাট্ শাহজাহান দারাকে জাহানারার স্তন-ধোয়া জল (স্তন্যের অভাবে) পান করাইয়া উভয়ের মধ্যে সে যুগের প্রথানুযায়ী ধর্ম্মের মাতা-পুত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। জাহানারার সান্ত্বনা-বাক্যে দারা শোকে শান্তি ও স্নেহস্পর্শে বৌ হইলেন। মৃত্যু ও শোকের মহাশিক্ষায় উভয়ের জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল; চিত্ত ভোগবিমুখ হইয়া বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিল। সম্রাট্ শাহজাহান লাহোরে পৌছিয়া ৭ই এপ্রিল ও ৯ই এপ্রিল (১৬৩৪ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ সূফী-সাধক মিয়াঁ মীরের আস্তানায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মিয়াঁ মীরের প্রতি শাহজাদা ও জাহানারা অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদের শ্মশান-বৈরাগ্য মোহমুক্ত সন্ন্যাসে পরিণত হইল। অসামান্যা রূপবতী বিদুষী জাহানারা যৌবনে যোগিনী সাজিয়া সেবাধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন; দারার চক্ষে বাদশাহী অপেক্ষা ফকীরিই স্থায়ী সম্পদ্ বলিয়া প্রতিভাত হইল। কাশ্মীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া শাহজাহান ১৮ই ডিসেম্বর তৃতীয় বার মিয়াঁ মীরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। পর-বৎসর শীতকালে দারা সম্রাটের সঙ্গে লাহোরে ছিলেন; এই সময়ে (১৬৩৫ খ্রীঃ) মিয়াঁ মীর ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায়ের সহিত দারার ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায়। মিয়াঁ মীরের নিকট হইতে দারা ও জাহানারার দীক্ষা লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। দারার পত্নী নাদিরা বেগমও মিয়াঁ মীরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বোধ হয়, মনে মনে তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন; স্বামীর কাছে তাঁহার শেষ প্রার্থনা ছিল, যেন মিয়াঁ মীরের কবরের পার্শ্বে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মিয়াঁ মীর দেহরক্ষা করেন। শাহজাদা দারার আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে তিনি অনেকগুলি পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত ও সাধন-পদ্ধতি তাঁহার রচনাবলী হইতেই সঠিক জানা যায়। অতঃপর আমরা এগুলির আলোচনা করিব।

সফিনাৎ-উল-আউলিয়া।—ইহা দারা শুকোর প্রথম পুস্তক। ইহার পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের অনেক প্রসিদ্ধ পুস্তাকাগারে রক্ষিত আছে, এবং নবল-কিশোর প্রেস হইতে এই পুস্তকের একটি লিথো-সংস্করণ বহু বৎসর পূর্ব্বে ছাপা হইয়াছিল। Ethe-সঙ্কলিত তালিকায় (*Catalogue of Persian Manuscripts*, Vol. 1, p. 274; No. 647) উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে শাহজাদার ২৫ বৎসর বয়সে ১০৪৯ হিজরীর ২৭এ রমজান তারিখে (২১ জানুয়ারি, ১৬৪০ খ্রীঃ) এই পুস্তক রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল।*

* আমার ইংরেজী *Dara Shukoh* পুস্তকে (পৃ. ১৪০) 'সফিনাৎ-উল-আউলিয়া'র সমাপ্তিকাল ১৬৩৯ খ্রীঃ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমার পুস্তকের অন্যত্র (পৃ. ১০৩) 'সফিনাৎ'-রচনার তারিখ ১১ই জানুয়ারি ১৬৪০ খ্রীঃ দেওয়া হইয়াছে। মুসলমানী তারিখ ২৭শে রমজান

হজরৎ মহম্মদ, চারি খলিফা এবং দ্বাদশ ইমাম হইতে আরম্ভ করিয়া শাহজাদার সমকালীন মিয়াঁ মীর পর্য্যন্ত ৪১১ জন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগুরু ও সূফী সাধক-সাধিকার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়—অধিকাংশ স্থলে কেবল জন্ম-মৃত্যুর তারিখ—এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ফরিদ-উদ্দীন আত্তর-রচিত **তজকিরাৎ-উল-আউলিয়া** এবং অন্যান্য আউলিয়া জীবনী-সংগ্রহ এবং হজরৎ ও খলিফাগণের সমকালীন ইতিহাস হইতে শাহজাদা তাঁহার পুস্তকের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা একাধারে দারা শুকোর ঐতিহাসিক গবেষণা এবং নিজের অধ্যাত্ম জীবনের প্রাথমিক ইতিবৃত্ত। তারিখ-অনুসারে জীবনীসমূহ পর পর সাজান হইয়াছে। এই পুস্তকের বিশেষ সার্থকতা ও বৈশিষ্ট্য—যেখানে তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, সেখানে মতান্তরে অমুক তারিখ যথারীতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। হজরতের জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ উল্লেখ করিয়া তিনি সাহস ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। সূফী-সাধিকাগণের জীবনী আলোচনায় তাঁহাদের কৃচ্ছ্র সাধনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মিশরের এক জন নারী উপাসিকা নাকি এক জায়গায় শীতগ্রীষ্মে অবিচলিত ভাবে এক স্থানে ত্রিশ বৎসর দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার সময় মিয়াঁ মীরের ভগ্নী বিবি জামাল খাতুন সিবিস্তানে (সিন্ধুনদের পশ্চিমে) এক জন পুণ্যশীলা সাধিকা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর। 'সফিনাৎ-উল-আউলিয়া'র ভূমিকাই* ইহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ও মনোরম অংশ। শাহজাদা লিখিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যখন তিনি সূফী মহাপুরুষগণের জীবনী-ধ্যানে তন্ময় ছিলেন, তখন এক দিন তাঁহার স্বপ্নপ্রয়াণ হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, এক উচ্চ স্থানে হজরৎ রসুলাল্লা দাঁড়াইয়া আছেন ; ঠিক তাঁহার নীচে প্রথম চারি খলিফা—আবু-বকর, ওমর, ওসমান্ ও আলী সমব্যবধানে দণ্ডায়মান। 'সফিনাৎ-উল-আউলিয়া' রচনার সময় পর্য্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিক ভাবে সূফী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই ; সত্যানুসন্ধানের পরিশ্রম ও কষ্টের মধ্যে এ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ; তখনও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নাই। সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য, ফকীরদের বিভিন্ন সাধনার ধারা, আদর্শ ও উপদেশ, কোন্ অবস্থায় এবং কি ভাবে মহাপুরুষগণকে চেনা যায় এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে কথোপকথনের সময় কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত—এ সমস্ত বিষয়ের চমৎকার আলোচনা এই পুস্তকের ভূমিকায় আমরা দেখিতে পাই। এই ভূমিকায় মুসলমান সাধকগণের যে সমস্ত উপদেশ শাহজাদা সংগ্রহ করিয়াছেন উহার প্রভাব তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। দারা পাগল খুঁজিয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহাদের

১০৬৯ হিজরী। নিউ ষ্টাইল এবং ওল্ড ষ্টাইলে ইংরেজী তারিখ গণনা করিলে কিছু তফাৎ হয়। স্যর যদুনাথের *History of Aurangzib* (i. 271*n*, 2nd ed.) পুস্তকে ২১ স্থলে ১১ই জানুয়ারি লিখিত হইয়াছে।

* ইহার কিয়দংশ রায় বাহাদুর শ্রীশচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক অনূদিত (পাণিনি আপিস হইতে প্রকাশিত) দারা শুকোর 'রিসালা-ই-হক্‌নুমা'র পরিশিষ্ট হিসাবে ইংরেজীতে মোটামুটি অনুবাদ করা হইয়াছে।

সাহচর্য্য ভালবাসিতেন—এইগুলি অবশ্য ভাবের পাগল; কেন না, মহাপুরুষেরা অনেক সময় স্বেচ্ছায় পাগল সাজিয়া জনসমাজে আত্মগোপন করিয়া থাকেন। তিনি প্রার্থী ও ভিক্ষুককে কোন দিন বিমুখ করেন নাই; কারণ, কৃপণ কোন দিন নির্ম্মল ভগবৎপ্রেম কিংবা তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে অত্যন্ত দীনবেশে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় যখন শোভাযাত্রা সহকারে দিল্লীর রাজপথ দিয়া তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইতেছিল, ফকিরদের চীৎকারে স্থির থাকিতে না পারিয়া শাহজাদা নিজের ছেঁড়া ময়লা শালখানা তাহাদিগকে দান করিয়াছিলেন। দুনিয়াদারি কাহাকে বলে, এ সম্বন্ধে তিনি একটি চমৎকার কথা এই পুস্তকের ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Chist duniyā az Khudā ghāfil shudan ;
Ne lebas wa naqrā wa farzand wa zan.

—সংসারাসক্তি কি? পোষাক, ধনদৌলত কিংবা স্ত্রীপুত্র নয়; খোদার এবাদতে গাফেলী করাই দুনিয়াদারী।

এখানে ফকিরি ও আমীরির সামঞ্জস্য-সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। অবশিষ্ট জীবনে শাহজাদা এই পন্থাই অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সকিনাৎ-উল্‌-আউলিয়া।—এই পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ, শাহজাদা দারা শুকো পঁচিশ বৎসর বয়সে (অর্থাৎ যে-বৎসর তিনি প্রথমোক্ত গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন) পরলোকগত পীর মিয়াঁ মীরের অন্যতম শিষ্য মহম্মদ শাহ লিসান্‌-উল্লার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কাদেরিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। দারার গুরু সাধারণতঃ মৌলানা বদখ্‌শী (বদখ্‌শান-নিবাসী) নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল 'লিসান্‌-উল্লা' অর্থাৎ খোদাতালার জিহ্বা—পণ্ডিতদের 'সরস্বতী' উপাধির তুল্য। মৌলানা শাহ কাশ্মীরেই তাঁহার খান্‌কা বা মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। দরবারী ইতিহাস 'বাদ্‌শা-নামা' হইতে আমরা জানিতে পারি, সম্রাটের সঙ্গে শাহজাদা ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত লাহোরে এবং ২২এ মার্চ হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর (১৬৪০ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত কাশ্মীরে ছিলেন। সুতরাং লাহোরেই তাঁহার প্রথম পুস্তক সমাপ্ত হয় এবং কাশ্মীরে অবস্থানকালে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভূমিকায় শাহজাদা লিখিয়াছেন, ক্ষমতা ও অতুল পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও গুরুর কৃপায় তাঁহার মন ও মেজাজ খাঁটি দরবেশের মত হইয়াছে। ১০৫২ হিজরী, অর্থাৎ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন।

'সকিনাৎ-উল্‌-আউলিয়া'র হস্তলিখিত পুথি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি (Ethe, Vol. I, No. Or. 223) এবং খুদা বখ্‌শ ওরিয়েণ্টাল পাবলিক লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। এই পুস্তকের এ যাবৎ কোন ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদ হয় নাই। শাহজাদা দারা শুকোর দাদা-পীর (গুরুর গুরু) মিয়াঁ মীরের জীবন-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার মুরীদ (শিষ্য)-গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকার প্রথমে তাঁহার স্ব-সম্প্রদায়

কাদেরিয়া-পন্থীদের "সিলসিলা" (গুরুপরম্পরা কুলজী), চিশ্তিয়া নকশ্বন্দীয়া ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সিলসিলা হইতে যে শ্রেষ্ঠতর, ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মিয়াঁ মীরের আসল নাম মীর মহম্মদ; তিনি ৯৩৮ হিজরীতে সিন্ধুদেশের অন্তর্গত সিবিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কাজী সৈঁন্দতা (স্বামীদত্ত ?), প্রপিতামহ কাজী কালন্দর। শাহজাদা ইতিহাসকে জবাই করিয়া স্বামীদত্তের পুত্র মিয়াঁ মীরের কুলজী একেবারে খলিফা ওমর পর্য্যন্ত টানিয়া তুলিয়াছেন! আমাদের মনে হয়, তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত কোন হিন্দু পরিবারের সন্তান; নামের শেষে "ফরুকী" থাকিলেই ওমরের আওলাদ্ হয় না। বেচারাম কিংবা ছেদিলালের বংশধরেরাও উদার ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্দিকী (প্রথম খলিফা আবু-বকর সিদ্দিক) কিংবা ফরুকী হইতে পারে; শেখ সৈয়দের ত কথাই উঠে না। মিয়াঁ মীরের শিষ্যদিগকে গ্রন্থকার দুই ভাগে (ফিরকা) বিভক্ত করিয়াছেন,—যাঁহারা 'সকিনাৎ-উল্-আউলিয়া' রচনার পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন এবং যাঁহারা সমাপ্তির তারিখ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। প্রথম ফির্কার সর্ব্বপ্রথম স্থান সূফী নিয়ামৎ-উল্লা সরহিন্দীকে (সরহিন্দ-শহরবাসী) দেওয়া হইয়াছে; দ্বিতীয় ফির্কার প্রথম স্থানে আছেন মৌলানা শাহ লিসান্-উল্লা।

'সকিনাৎ-উল্-আউলিয়া' পুস্তকে তাঁহার নিজ গুরু-সম্প্রদায় অর্থাৎ কাদেরিয়া শেখদের অলৌকিক কার্য্যাবলী, তাঁহাদের ধ্যানধারণা, সাধনার বিভিন্ন স্তর বা মোকামের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানির কোন ইংরেজী, উর্দু কিংবা বাংলা অনুবাদ হয় নাই। বাংলা দেশে কাদেরিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দারার এই পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ হইলে 'খোদা-প্রাপ্তি-তত্ত্ব' ইত্যাদি পুস্তকের ন্যায় মুসলমান-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে।

রিসালা-ই-হক্নুমা (The Compass of Truth.) শাহজাদা দারা ধর্ম্মজীবনের দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করিবার পর এই পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—১০৫৫ হিজরীর ১৭ই* রজব শুক্রবার রাত্রিকালে তিনি এই পুস্তক লিখিবার জন্য খোদার হুকুম পাইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা তিনি পুস্তকের সমাপ্তি এবং পুস্তক-রচনায় তাঁহার নিজ অভিপ্রায় নিবেদন করিয়াছেন :—

ঈঁ | রিসালা-ই-হক্নুমা | বাশদ্ | তামাম্;
দর্ | হাজার ওয়া পঞ্জা ওয়া যশ্ | শুদ্ | তামাম্।
হস্ত | আজ্ | কাদের | মর্দাঁ | আজ্ | কাদেরী;
আঁচে | মা | গোপ্তেম্ | ফাফেহেম্ | ওয়া | আস্ সালাম্।

—১০৫৬ হিজরীতে সত্য-স্বরূপ খোদাতালার পথে দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্রস্বরূপ এই পুস্তিকা—রিসালা-ই-হক্নুমা রচনা সমাপ্ত হইল। ইহার রচয়িতা এক জন সামান্য **কাদেরী** বলিয়া মনে করিও না;

---

* নবলকিশোর প্রেস হইতে প্রকাশিত সংস্করণে ৮ই রজব লেখা আছে। কিন্তু ঐ তারিখ বুধবার ছিল; সুতরাং সম্ভবতঃ ১৭ই রজব হইবে।

বস্তুতপক্ষে স্বয়ং যিনি কাদের, সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লা, এই পুস্তককে তাঁহারই অনুপ্রেরিত বাণী (এল্‌হাম) বলিয়া জানিবে।

কাদেরিয়া তরিকা বা সাধনা-পদ্ধতিকে শাহজাদা কেন সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। কাদেরিয়ার রাস্তা "বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির" পথ নয়; এই পথে কঠোর সন্ন্যাসের অগ্নিপরীক্ষা নাই; প্রেম-প্রীতি, দিলদারি ও আয়েশ, অনাবিল ও অখণ্ড আনন্দ এই মার্গাবলম্বীর নিত্যসম্পদ্। মৌলানা জালাল-উদ্দীন রূমী বলিয়াছেন—খোদাতালা তোমাকে এই পথ দিয়া আনিয়াছেন, অপরাধীর মত তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়; পরন্তু অতিথির মত তোমার উপর মেহেমানীর মেহেরবাণী বর্ষণ করাই তাঁহার অভিপ্রায়। এই পুস্তকের চারি অধ্যায়ে সুফীদিগের কল্পিত নাসুৎ [স্থূল], মালাকুৎ [স্বপ্নময়], জাবরুৎ বা স্থির নির্ব্বিকল্প, এই তিন আলম্ বা জগৎ এবং সাধকের অবস্থাত্রয়, মুসলমানী প্রাণায়াম (রেচক-পূরক), শরীরস্থ ত্রিচক্র (ষট্‌চক্র নয়) ইত্যাদি আলোচনা করিয়াছেন।

বস্তুতপক্ষে শাহ্‌জাদা দারার জীবনাদর্শ, মন ও চিন্তাধারা, সংস্কার ও বিশ্বাসপ্রবণতা, অসংযত উৎসাহ ও আশাবাদিতা (optimism), সদ্য যোগরহস্য-প্রাপ্তিতে বালকের নূতন জামা কিংবা সুন্দর খেলনা প্রাপ্তির মত অধীরতা ও আনন্দের আতিশয্য, ইত্যাদি দোষগুণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সঠিক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তিনি মহম্মদের সশরীরে নিমেষের মধ্যে সপ্তম স্বর্গে আরোহণ, খোদাতালার সহিত সাক্ষাৎ এবং পুনরায় নিজের গরম লেপের ভিতর প্রবেশ—যাহাকে মুসলমানেরা "মিহ্‌রাজ-ই-জিস্‌মানী" বলে, উহার এক অভিনব ব্যাখ্যা 'রিসালা-ই-হক্‌নুমা' পুস্তকে দিয়াছেন। হজরৎ স্থূল শরীরে, কি সূক্ষ্ম শরীরে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া মুসলমান শাস্ত্রে বিস্তর তর্কবিতর্ক আছে। মোল্লাদের মতে "মিহ্‌রাজ-ই-জিস্‌মানী" অক্ষরে অক্ষরে সত্য; ইহা মানিয়া চলা ইমানের অঙ্গস্বরূপ; যাহারা অন্যরূপ বিশ্বাস করে, তাহারা নাস্তিক তার্কিক (জিন্দিক্) কিংবা ধর্ম্মদ্রোহী স্বাধীনচিন্তা-পন্থী মোতাজেলা। এক দিন আকবরের দরবারে এই লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা তর্ক চলিতেছিল; এমন সময় বাদ্‌শা এক পায়ের উপর খাড়া হইয়া বলিলেন, এ অবস্থায় আমি আমার অন্য পা-খানি মাটি হইতে উঠাইতে পারি না; তবে কেমন করিয়া হজরৎ বেমালুম নিজের দেহখানি হাওয়ায় উড়াইয়া মিহ্‌রাজ করিলেন। বাদ্‌শা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুস্থানের মালিক হইলেও হজরৎ রসুলাল্লার সমপর্য্যায়ে উঠিতে পারেন নাই। সেই জন্য তাঁহারই প্রপৌত্র হজরতের পক্ষে এ কাজ করা যে সম্ভব ছিল, সে-কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দারা লিখিয়াছেন, হজরৎ হীরার গুহায় বসিয়া যোগাভ্যাস ও প্রাণায়াম করার দরুন তাঁহার শরীরের ধর্ম্মই অন্য রকম হইয়াছিল; প্রমাণ—হজরৎ রসুলাল্লার দেহের উপর কখনও মাছি বসে নাই কিংবা মাটিতে তাঁহার ছায়া পড়ে নাই। ইহার কারণ—মাটি, জল, আগুন ও হাওয়া (মুসলমানেরা আকাশকে স্বীকার করে না), এই চারি উপাদানে প্রত্যেক জীবের দেহ গঠিত হইলেও যোগাভ্যাসের দ্বারা

মহাপুরুষগণ স্থূল দেহকে পরিবর্ত্তিত করিয়া বায়ুধর্ম্মী অথচ পরিদৃশ্যমান শরীর লাভ করিতে পারেন। দারাকে অনেকে পাগল মনে করিবেন, কিন্তু সেকালের পক্ষে দারার যুক্তি আজকালকার একাদশী কিংবা টিকির বৈজ্ঞানিক ভাষ্যকারগণের যুক্তি অপেক্ষা দৃঢ়তর বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য।

এই পুস্তিকায় দারা এক রকম ধ্যান-যোগের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাকে সুলতান-উল্‌-আজাকের অর্থাৎ "জেকেরের সুলতান" বা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এই যোগের দ্বারা মানুষ অলৌকিক শক্তি লাভ করে; সে অনাহত ধ্বনি শুনিতে পায়; বাজারের গোলমালের মধ্যেও সাধকের কানে ইহা ভ্রমরগুঞ্জন কিংবা পিপীলিকাশ্রেণীর চলাচলের শব্দের ন্যায় ধ্বনিত হয়। শাহজাদা লিখিয়াছেন, মিয়াঁজী (মিয়াঁ মীর) খোলাখুলি ভাবে এই যোগের রহস্য তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ মুরীদ্‌ (শিষ্য)গণের কাছেও ব্যক্ত করেন নাই। হজরৎ আখুন্দ (দারার গুরু মৌলানা শাহ লিসানুল্লা), মিঁয়া মীরের নিকট হইতে ইহার ইশারা পাইয়া এক বৎসর অভ্যাসের পর সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুরুও দারাকে উপদেশমূলক গল্পচ্ছলে এই যোগের রহস্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শাহজাদা ছয় মাসের মধ্যেই ইহার গুপ্ত তত্ত্ব আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি [আমার গুরু অপেক্ষা] ইহা অধিকতর সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়াছি; এমন কি, যাহাদের কাছে আমি ইহার কথা বলিয়াছি, তাহারা তিন চারি দিনের মধ্যেই ফল পাইয়াছে। ইহার কারণ, আমার পীর এবং দাদাপীর যাহা গল্প কিংবা ইশারার ছলে শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাহা পরিষ্কার ভাবে কোন প্রকার অস্পষ্টতার পর্দ্দায় কিছু গোপন না করিয়া বলিয়াছি।

আমরা শাহজাদার সত্য ও সরলতা এবং প্রাপ্ত বিদ্যা অকুণ্ঠিতভাবে মনুষ্য-সমাজকে দান করিবার প্রশংসা করিলেও তাঁহার লোকচরিত্রজ্ঞান ও সহজাত সাংসারিক বুদ্ধি, এবং অধিকারী-অনধিকারী বিচারের উপেক্ষাকে প্রশংসা করিতে পারি না। উদ্দেশ্য সাধু হইলেও তিনি বুদ্ধিমানের মত কাজ করেন নাই।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

(৩) যজুর্বেদের কাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কৃষ্ণ-যজুর্বেদে কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ইত্যাদিক্রমে ২৭টি নক্ষত্রের নাম আছে। 'কৃত্তিকাঃ', এইরূপ বহুবচনান্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব 'কৃত্তিকাঃ' অর্থে তারাসমন্বিত দৃশ্য নক্ষত্র বুঝিতে হইতেছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছয়টি তারা আছে। এইরূপ মঘাঃ, ধনিষ্ঠাঃ প্রভৃতি যে যে নক্ষত্রে দুয়ের অধিক তারা আছে, সেগুলির নাম বহুবচনান্ত। যে নক্ষত্রে দুইটি তারা আছে, তাহার নাম দ্বিবচনান্ত, যেমন বিশাখে। দুইটি তারা লইয়া বিশাখা। যে নক্ষত্রে একটি তারা আছে, তাহার নাম একবচনান্ত, যেমন চিত্রা। অতএব ২৭টি নক্ষত্র দৃশ্য নক্ষত্র, কাল্পনিক বিভাগ নয়।

প্রথমে প্রশ্ন আসে, কৃত্তিকা নক্ষত্রকে কেন প্রথম গণ্য করা হইল। অয়ন-পথ অর্থাৎ রবিপথ চারি সমান পাদে বিভক্ত, নাম বিষ্ণুপাদ। দুই বিষুবপাত ও দুই অয়নান্ত, এই চারি পাদ। নিশ্চয় এক পাদ হইতে নক্ষত্র সংখ্যা করা হইয়াছিল। কৃত্তিকা এক পাদে ছিল। গত চারি পাঁচ সহস্র বৎসর স্মরণ করিলে কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুবপাত হইতে পারিত, অপর কোন পাদ থাকিতে পারিত না। অতএব উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই, যে কালে দৃশ্য কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুবপাত হইত, কৃষ্ণ-যজুর্বেদ সে কালে প্রণীত হইয়াছিল। গণিত দ্বারা জানিতেছি, ইহা প্রায় খ্রি-পূ ২২০০ অব্দে ঘটিয়াছিল।

পশ্চিমদেশীয় বেদপাঠী স্থির করিলেন, বৈদিক কৃষ্টির পূর্ব সীমা খ্রি-পূ ১৫০০ অব্দ। দৃশ্য কৃত্তিকা-নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবপাত স্বীকার করিলে যজুর্বেদের নিমিত্ত ৭০০ বৎসর পিছাইতে হয়। ঋগ্বেদের নিমিত্ত আরও কয়েক শত বৎসর না পিছাইলে চলে না। তাহা অসম্ভব। অতএব কৃত্তিকাদি নক্ষত্রচক্র ভারতে উদ্ভাবিত নয়। খ্রি-পূ ১৫০০ অব্দের পাঁচ সাত শত বৎসর পরে বিদেশ হইতে আসিয়াছে, যজুর্বেদ আত্মসাৎ করিয়াছেন।

তাঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি, বৈদিক গ্রন্থে বিষুবপাতের উল্লেখ নাই। অতএব কৃত্তিকায় বিষুবপাত, ইহা যজুর্বেদের কালে অজ্ঞাত ছিল।

"কৃত্তিকাই পূর্ব দিকে উদিত হয়," এই নামের প্রবন্ধে শুক্ল-যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণ হইতে দেখাইয়াছি, তাঁহাদের দুইটা তর্কই মিথ্যাপ্রবন্ধ। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণেও (৩৷৫৷২) আছে, "কৃত্তিকা হইতে বিশাখা, দেব-নক্ষত্র। অনুরাধা হইতে ভরণী, যম-নক্ষত্র। সূর্য দেব-নক্ষত্র পার হইয়া দক্ষিণে গমন করেন, যম-নক্ষত্র পার হইয়া উত্তরে গমন করেন।" অয়নবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত, এই দুয়ের ছেদস্থানে দক্ষিণে ও উত্তরে

গমন ঘটে। একটি ছেদস্থান কৃত্তিকার আদিতে, অপরটি বিশাখায়। দুইটি স্থানের নাম নাই। কিন্তু বিষয়টি স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এই বিভাগ কৃষ্ণ-যজুর্বেদেও (৬।৫।৩) সংক্ষেপে আছে।

যদি কৃত্তিকায় সূর্য থাকে, আর পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলে সে পূর্ণিমা নিশ্চয় বিশাখায় হইবে। সে পূর্ণিমার নাম বৈশাখী পূর্ণিমা। বৈশাখী পূর্ণিমায় যে মাস পূর্ণ হয়, তাহার নাম বৈশাখ। অতএব পাইতেছি, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের কালে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৎসর পূর্ণ হইত। আর (চান্দ্র) বৈশাখ, বৎসরের প্রথম মাস ছিল।

সূর্য ২।০ নক্ষত্রভাগ অতিক্রম করিলে ১ মাস পূর্ণ হয়। কৃত্তিকায় অয়নবৃত্ত আরম্ভ। ইহার পূর্বে অশ্বিনী হইতে ভরণী ও ভরণী হইতে কৃত্তিকা, দুই নক্ষত্রভাগ পাইলাম। কৃত্তিকাভাগের প্রথম পাদান্তে না আসিলে ২।০ নক্ষত্রভাগ পাওয়া যায় না। অতএব যে সময়ে কৃত্তিকার প্রথম পাদান্তে বাসন্ত বিষুব হইত, সে সময়ে যাইতে হইতেছে। স্থূলগণিতে খ্রি-পূ ২২০০ অব্দে এবং সূক্ষ্মগণিতে খ্রি-পূ ২২২৪ অব্দে কৃত্তিকায় বিষুবপাত হইত। এক পাদ পিছাইতে তৎকালে ২৪২ বৎসর লাগিত। অতএব খ্রি-পূ ২২২৪+২৪২=২৪৬৬ অব্দ হইতে খ্রি-পূ ২২০০+২৪২=২৪৪২ অব্দের মধ্যে কোন এক বৈশাখী পূর্ণিমা লক্ষ্য হইয়াছিল। কৃত্তিকা-নক্ষত্রে ছয়টি তারা, ইহাই অনিশ্চিতের কারণ।

সৌভাগ্যক্রমে উদ্দিষ্ট বৎসরটি পাওয়া গিয়াছে। এক কালে যুধিষ্ঠিরাব্দ নামে এক অব্দ প্রচলিত ছিল, বৃহৎসংহিতায় বরাহমিহির ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। পরে আরও কেহ কেহ করিয়াছেন। খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে ইহার আরম্ভ। দেখিতেছি, এই অব্দে বাসন্ত বিষুবৎদিনে বৈশাখী পূর্ণিমা হইয়াছিল। আর উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে মাঘী কৃষ্ণাষ্টমী হইয়াছিল।

খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দটি অশ্বিনী ও কৃত্তিকা-তারা দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। সে বৎসর অশ্বিনী-তারা ৩২৯°২২′ অংশাদিতে ছিল। ইহা ৩৩০° অংশ ধরা হইত। ইহার পর ৩০° অংশ চাই। কিন্তু কৃত্তিকা-তারা ৩৬০° অংশে ছিল না, ৩৫৬°৫৫′ অংশাদিতে ছিল। অতএব অন্তর ৩°৫′ অংশাদি। এক নক্ষত্রপাদ ৩°২০′। অতএব ১৫′ কলার অন্তর ঘটিতেছে। এই অন্তর অগ্রাহ্য।

অতএব পাইলাম, খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দে যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল। তৎকালে বিষুবৎ-দিনে বৈশাখী পূর্ণিমায় বৎসর পূর্ণ হইত। আর, উক্ত অব্দের বিষুবৎদিন ও পূর্ণিমা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল। কারণ, পরবর্তী কালের জ্যোতির্বিদেরা উক্ত অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমা ও হয়ত বিষুবৎদিন গণিতে পারিতেন। কিন্তু দৃশ্য কৃত্তিকা-নক্ষত্রের প্রথম পাদান্তে বিষুবৎদিন গণিতে পারিতেন না। অব্দটি প্রত্যক্ষানুভূত। সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে যজুর্বেদ দুইখানি। শুক্ল-যজুর্বেদ গ্রন্থ ছোট। ইহাতে কৃত্তিকাদি নক্ষত্র-চক্রের উল্লেখ নাই। কিন্তু না থাকিলেও জ্যোতিষিক বিষয়ে ঐক্য দেখিলে উভয় যজুর্বেদকেই সমকালীন বোধ হয়। পুরাণ-মতে শুক্ল-যজুর্বেদ প্রথমে প্রণীত হইয়াছিল। এ

বিষয়ে পুরাণ প্রামাণ্য। সামবেদের প্রায় সমুদয় অংশ ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত। ইহার স্বল্প অংশ হইতে কাল অনুমান করিবার কোন জ্যোতিষিক উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু যে কারণে যজুর্বেদের উৎপত্তি, সামবেদে তাহার পরিসমাপ্তি। অতএব মনে হয়, যজুর্বেদের কালে সামবেদ প্রণীত হইয়াছিল। অর্থাৎ খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দ যজুর্বেদ ও সামবেদের কাল। ইহার পূর্বে ঋগ্‌বেদের কাল। তাহা পাঁচ শত হইতে পাঁচ সহস্র বৎসর। কেহ কেহ আট নয় সহস্র বৎসর শুনিলে চমকিত হন। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে। আর্যগণ এক দিন অকস্মাৎ আকাশ হইতে ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হন নাই। ভারতে প্রবেশের পূর্বে ভূখণ্ডে বাস করিতেছিলেন। কত সহস্র বৎসর, কত লক্ষ বৎসর? তৎপরে যদি ভারতখণ্ডে কেহ কেহ দশ সহস্র বৎসর যাপন করিয়া থাকেন, আর বেদে তাহার স্মৃতি রক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। আমরা সাত আট সহস্র বৎসরের স্মৃতি পালন করিতেছি। দোলপূর্ণিমা দশহরা মহালয়া কোজাগরী তাহার সাক্ষী। ভারতভূমিতে দীর্ঘকাল বাসের প্রমাণ যজুর্বেদেই আছে। তাহার উল্লেখ করিতেছি।

সম্বৎসরের মুখ

পূর্বকালে বৈদিক যজমান সম্বৎসরব্যাপী সত্র অনুষ্ঠান করিতেন। গবাম্-অয়ন এইরূপ সম্বৎসর-সত্র।

বৎসরের কোন্ দিন সম্বৎসর-সত্র আরম্ভ করা হইবে? এ বিষয়ে কৃষ্ণ-যজুর্বেদে (৭।৪।৮) একটি মহার্ঘ প্রস্তাব আছে। তিলক তাঁহার 'ওরায়ন' গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে তিনি বৈদিক কৃষ্টির যে যে কালের প্রমাণ পাইয়াছেন, প্রোফেসর যাকোবিও তাহাই পাইয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা যজুর্বেদের কাল নির্ণয় করেন নাই। আমরা বৎসরটি জানিতে পারিয়াছি। এই কারণে দিন গণিয়া প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারি।

কবে সম্বৎসর-সত্র আরম্ভ করা হইবে? যজুর্বেদ বলিতেছেন,

[১] "যাঁহারা সম্বৎসর-সত্রে দীক্ষিত হইতে চান, তাঁহারা একাষ্টকায় দীক্ষিত হইবেন। কারণ, একাষ্টকা বৎসরের পত্নী। বৎসর সে রাত্রে তাঁহার সহিত বাস করে। অতএব তাঁহাদের সত্র সম্বৎসর-সত্রই হয়।

কিন্তু এই দিনের তিনটি দোষ আছে। (ক) এই দিন বৎসরের 'আর্ত'ভাগে, (খ) এই দিন বৎসরের 'ব্যস্ত'ভাগে, (গ) এই দিন যে ঋতুতে, সে ঋতুর নাম শেষে আসে।

[২] তাঁহারা ফল্গুনী-পূর্ণিমায় দীক্ষিত হইবেন। কারণ, ফল্গুনী-পূর্ণিমা বৎসরের মুখ। অতএব তাঁহাদের সত্র সম্বৎসর-সত্রই হয়। কিন্তু এই দিনের একটি দোষ আছে। সম্যক্-মেঘের কালে বিষুবান্ পড়ে।

[৩] তাঁহারা চিত্রা-পূর্ণিমায় দীক্ষিত হইবেন। কারণ, চিত্রা-পূর্ণিমা বৎসরের মুখ। অতএব তাঁহাদের সত্র সম্বৎসর-সত্রই হয়। এই দিনের কোন দোষ নাই।

[৪] তাঁহারা পূর্ণিমার চারি দিন পূর্বে দীক্ষিত হইবেন। তাঁহাদের সোম-ক্রয়ের দিন একাষ্টকায় পড়ে। তদ্দারা একাষ্টকার গৌরব রক্ষিত হয়।"

তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেও (৪।৯) প্রায় এইরূপ বচন আছে। অথর্ববেদে (৩।৪) একাষ্টকার দীর্ঘ বিবরণ আছে।

এখন যজুর্বেদের বাক্য বুঝা যাউক। [১] মাঘী পূর্ণিমার পর অষ্টম রাত্রির নাম একাষ্টকা। বেদ বলিতেছেন, সেই রাত্রিতে নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। বৎসরের কোন্ সময়ে? সে সময় 'আর্ত'কাল, অত্যন্ত শীত। আর কি? বৎসরের 'ব্যস্ত'ভাগ। সূর্য দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন করেন। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ লিখিয়াছেন, তখন বৎসর 'বিচ্ছিন্ন', খণ্ডিত হয়। আর কি? দিনটি শেষের ঋতুতে। বসন্ত প্রথম, শিশির ষষ্ঠ। অর্থাৎ দিনটি শিশির ঋতুতে। এই সকল বিবরণ হইতে জানিতেছি, শিশির ঋতুতে মাঘী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণাষ্টমীতে রবির উত্তরায়ণ ও নূতন বৎসর আরম্ভ হইত।

অবশ্য প্রতি বৎসর এই তিথিতে রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতে পারিত না, প্রতি বৎসর সম্বৎসর-সত্রও হইত না। বিংশ বর্ষে হইত। কোন কোন বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। যেমন খ্রি-পূ ২৪৪৭ অব্দে। তবে কেন সে রাত্রি হইতে নূতন বৎসর ধরা হইল না? ইহার কারণ অক্লেশে বুঝিতে পারা যায়। উত্তরায়ণ-আরম্ভ দিন হইতে পূর্ববর্তী বাসন্ত বিষুব পর্য্যন্ত ২৭০° অংশ। এত অংশ সূর্যের অতিক্রম করিতে ২৭৮ তিথি লাগে অর্থাৎ ৯ মাস ৮ দিন। অতএব একাষ্টকা হইতে পশ্চাৎ দিকে গণিয়া গেলে বিশাখা-পূর্ণিমায় আসিয়া পড়ি। অর্থাৎ বৈশাখী পূর্ণিমায় বিষুবদ্দিন হইয়াছিল। পূর্বে দেখিয়াছি, এইরূপ খ্রি-পূ ২৪৪৯ অব্দেও হইয়াছিল। বৎসরের দুইটি মুখ স্বীকৃত হইয়াছে। একটি মুখ উত্তরায়ণ-আরম্ভ দিনে, অপরটি বাসন্ত বিষুবদ্দিনে। চান্দ্র গণনায় বাসন্ত বিষুবদ্দিনের ৩০ অংশ পূর্বে চিত্রা-পূর্ণিমায়। আদ্যকালে প্রথমটি ছিল, পরে অপরটি আসিয়াছিল। আরও দেখিতেছি, যাজ্ঞিকেরা বিষুব-দিন ও অয়ন-দিন ঠিক গণিতে পারিতেন, একটি দিনেরও ভুল করিতেন না।

যজুর্বেদের কালে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ইত্যাদি নক্ষত্রের বিশেষণ নাম প্রচলিত ছিল না। মঘা-পূর্ণিমা, ফল্গুনী-পূর্ণিমা, চিত্রা-পূর্ণিমা, বিশাখা-পূর্ণিমা, এইরূপ শব্দ দ্বারা মাস বুঝাইত। পূর্ণিমায় মাস পূর্ণ হইত। সে রাত্রির নাম পৌর্ণমাসী। অর্থাৎ পূর্ণিমান্ত মাস গণ্য হইত। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্রাদি মাসনাম ধরিলে ঋতু-বিভাগ এইরূপ পাইতেছি। পৌষ

পূর্ণিমা হইতে ফাল্গুন-পূর্ণিমা শিশির, ফাল্গুন-পূর্ণিমা হইতে বৈশাখ-পূর্ণিমা বসন্ত। অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ, যজুর্বেদীয় নাম মধু মাধব, বসন্ত।

[২] লিখিত আছে, ফাল্গুনী পূর্ণিমাও বৎসরের মুখ। ইহা কিরূপে ঘটিতে পারে, তাহা পরে দেখা যাইবে। এই ব্যবস্থায় একাষ্টকার ২২ দিন পরে আসিতে হইতেছে। ২২ ডিসেম্বর রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে। অতএব ফাল্গুনী পূর্ণিমা ১২ জানুআরি হইয়াছিল।

সত্রের আরম্ভের ছয় মাস পরে সত্রের মধ্যদিন। সে দিনের নাম 'বিষুবান্' ছিল। (বিষু সাম্যে অব্যয়, যে দিনে সত্র দুই সমান ভাগে বিভক্ত হয়।) ১২ জানুআরি সত্র আরম্ভ করিলে ১২ জুলাই বিষুবান্ পড়ে। এই দিন তখন এবং এখনও সম্যক্ মেঘের কাল, প্রথম বর্ষা। অতএব ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সত্র আরম্ভের যে দোষ লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য।

[৩] লিখিত আছে, চৈত্রী পূর্ণিমাও বৎসরের মুখ। এই দিন সত্র আরম্ভ করিলে কোন দোষ নাই। মিলাইয়া দেখি। একাষ্টকা হইতে চৈত্রী পূর্ণিমা ২৩+৩০=৫২ দিন। অতএব এই দিন ১২ ফেব্রুআরি পড়িত। ছয় মাস গতে ১২ আগষ্ট বিষুবান্ পড়িত। ইহাতে বোধ হইতেছে, কৃষ্ণ-যজুর্বেদের দেশে বৃষ্টিপাত কম হইত, ১২ আগষ্টের পূর্বেই বর্ষাকাল প্রায় সমাপ্ত হইত। এই বেদেও (৩।৪।৮) দেখিতেছি, দেশটি মরুভূমির সন্নিহিত ছিল।

[৪] একাষ্টকার ৮ দিন পূর্বে মাঘী পূর্ণিমা। ইহার চারি দিন অর্থাৎ একাষ্টকা হইতে ১২ দিন পূর্বে সত্রের আরম্ভের আর একটি দিন। এইটি ১০ ডিসেম্বর। অতএব বিষুবান্ ১০ জুন পড়িত। তখন বর্ষা আরম্ভ হয় নাই।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে এই বেদের কাল নির্ণয় করা যাইতে পারে। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, পূর্ব ও উত্তর। দুই ফল্গুনীর মধ্যবিন্দু লইয়া গণিত দ্বারা দেখিতেছি, ইদানী (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে) ১২ মার্চ সে বিন্দুতে পূর্ণিমা হয়। যজুর্বেদের কালে ১২ জানুআরি হইত। ঠিক দুই মাস পূর্বে। পূর্ণিমার দিন ৭২ বৎসরে ১ দিন অগ্রগত হয়। অতএব তদবধি ৬০ × ৭২ = ৪৩২০ বৎসর গত হইয়াছে। ইহা হইতে ১৯২৪ বাদ দিলে খ্রি-পূ ২৪০০ অব্দ পাই।

এখন দেখা যাউক, সত্র-আরম্ভের নিমিত্ত কেন ফাল্গুন-পূর্ণিমা ও চৈত্র-পূর্ণিমা বিকল্প-দিন হইল। লিখিত আছে, দুইটিই সম্বৎসরের মুখ। একাষ্টকাও বৎসরের মুখ। সে দিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ। অতএব মনে হয়, ফাল্গুন-ও চৈত্র-পূর্ণিমাও সেইরূপ এক এক কালে, সে সে দিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত এবং সে সে দিন নূতন বৎসর আরম্ভ হইত। বৎসরের এই দুই মুখ পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তদনুসারে যজুর্বেদ সে দুই মুখ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, গবাম্-অয়ন নামক সত্র সম্বৎসর-সত্রের এক প্রসিদ্ধ উদাহরণ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই সত্র একরাত্রে আরম্ভ হইত। সেই রাত্রির নাম 'অতিরাত্র' ছিল। বোধ হয়, এই নামের অর্থ দীর্ঘতম রাত্রি। সত্রের বিবরণ হইতেও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ রাত্রির নাম অতিরাত্র ছিল, এবং সে দিন গবাম্-অয়ন সত্র আরম্ভ হইত। অতএব বিষুবান্, রবির দক্ষিণায়ন-

আরম্ভ দিন। একাষ্টকা রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ রাত্রি। ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও চৈত্রী পূর্ণিমাও সেইরূপ রাত্রি। তিলক ও যাকোবিও এই অর্থ করিয়াছেন।

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ও চৈত্রী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, ইহার অন্য প্রমাণ না থাকিলে যজুর্বেদে সে অর্থ নিঃসংশয়ে আনিতে পারা যাইত না। তখন তিনটি রাত্রিকে সমজাতীয় মনে না করিয়া বিষমজাতীয় মনে করিতে হইত। যথা। একাষ্টকা বৎসরের উত্তরায়ণ-দিন, অতএব এক মুখ। পূর্ণিমান্ত বৈশাখ বৎসরের প্রথম মাস। অতএব চৈত্রী পূর্ণিমাও এক মুখ। ফাল্গুনী পূর্ণিমাটি কোন্ বৎসরের মুখ? ইহার কোন সঙ্গত উত্তর পাওয়া যায় না। অতএব তিনটি দিন সমজাতীয় মনে করিতে হইতেছে। তিনটি দিন তিন কালের তিন উত্তরায়ণ-আরম্ভ দিন।

ফল্গুনী-পূর্ণিমা ও চিত্রা-পূর্ণিমা হইতে বৈদিক কৃষ্টির কাল জানিতে পারা যায়। এক কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমা ২২ ডিসেম্বর হইত, এখন ১২ মার্চ হইতেছে। অতএব পূর্ণিমাটি ৮১ দিন অগ্রবর্তী হইয়াছে। ৭২ বৎসরে এক দিন। ৭২ × ৮১ = ৫৮৩২ বৎসর পূর্বে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। সেই কালের স্মৃতি অনুসারে যজুর্বেদে সে দিনকে বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় মুখ হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রায় ৮০০০ বৎসর পূর্বে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

পশ্চিমদেশীয় বেদ-বিদ্বানেরা খ্রি-পূ ১৫০০ অব্দে বৈদিক কৃষ্টির পূর্বসীমারেখা টানিয়াছেন। তাঁহারা ফাল্গুন ও চৈত্র-পূর্ণিমায় রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ কিছুতে স্বীকার করিতে পারেন না। এমন কি, খ্রি-পূ ২৫০০ বৎসরও পারেন না। কিন্তু একাষ্টকা দিক্‌শূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডক্টর থিব. 'মায়া' দ্বারা অপসারিত করিয়াছেন। প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ তাঁহাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১]

ডক্টর থিব. বেদের বাক্য ও ভাষ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন, একাষ্টকায় রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে একাষ্টকা ভুল।

তিনি বলেন, "বসন্তের প্রথম মাস ফাল্গুন।" বুঝা যাইতেছে, অমান্ত মাস ধরিয়াছেন। অতএব তাঁহার মতে অমান্ত পৌষ মাঘ শিশির, ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত। অর্থাৎ পৌষ অমায় রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ, মাঘ ফাল্গুন চৈত্র গতে বৎসর পূর্ণ। যজুর্বেদের সহিত কিছুমাত্র ঐক্য নাই। যথা,

যজুর্বেদ	ডক্টর থিব.
মাস পূর্ণিমান্ত	মাস অমান্ত
মধু মাধব অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখ বসন্ত	ফাল্গুন চৈত্র বসন্ত
মাঘী পূর্ণিমার অষ্টম রাত্রিতে উত্তরায়ণ-আরম্ভ	পৌষ অমায় উত্তরায়ণ-আরম্ভ

তাঁহার ভাষ্যও নূতন। যথা,

১) *Vedic Index* : **Nakshatra.**

[১] একাষ্টকাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইয়াছে? ডক্টর থিব. বলিতেছেন,—"যেহেতু এই দিন পুরাতন বৎসরের ক্ষয়ী অর্ধের শেষ পাদে, সেহেতু এই দিনকে বৎসরের অন্ত মনে করা যাইতে পারিত।" আশ্চর্য কথা! তাঁহারই গণনায় তখনও বৎসরের ৬৭ দিন অবশিষ্ট, কিন্তু যাজ্ঞিকেরা মনে করিলেন, বৎসর পূর্ণ হইয়াছে!

[২] ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইয়াছে? প্রোফেসর মেকডোনেল বলিতেছেন,—"যেহেতু অমুক অমুক গ্রন্থে বসন্ত প্রথম ঋতু এবং ফাল্গুন-পূর্ণিমাকে বসন্তের এবং বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে।" কিন্তু ইহা যুক্তি নয়, প্রশ্নের পুনরুক্তিমাত্র। বর্ত্তমান স্থলে ইহার সার্থকতাও নাই। কারণ, কল্পিত ব্যাখ্যায় মাঘ অমায় বসন্তের আরম্ভ, ইহার ১৫ দিন পরে ফাল্গুন-পূর্ণিমা।

[৩] চৈত্র-পূর্ণিমাকে বৎসরের মুখ কেন বলা হইয়াছে? ডক্টর থিব. বলিতেছেন,—"দিনটি বসন্ত ঋতুর ভালরূপ মাঝে ফেলিবার অভিপ্রায়ে বোধ হয় এই দিন ধরা হইয়াছে।" কিন্তু বৎসরের মুখ কেমনে হয়? তাঁহার মতে বৎসর পূর্ণ হইতে তখনও ১৫ দিন বাকি!

এই কল্পিত ব্যাখ্যায় বিষয়টি ইতঃ নষ্টঃ ততঃ ভ্রষ্টঃ হইয়াছে। প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ গোটা কয়েক 'মোটা' কথা স্মরণ করিলে ভাল করিতেন। (১) যদি বসন্ত ঋতুতে সম্বৎসর-সত্র আরম্ভ হইতে পারিত, তাহা হইলে নির্দোষ চৈত্র-পূর্ণিমা নির্দেশ করিলেই চলিত, একাষ্টকার দোষগুণ বিচারের প্রয়োজন থাকিত না। (২) ডক্টর থিব. সাহেবের মতে একাষ্টকা হইতে দুই মাস সাত দিন পরে বৎসর পূর্ণ। এই ৬৭ দিনের মধ্যে একই বৎসরের চারি মুখ কল্পনা অসম্ভব। (৩) যজুর্বেদে মাস পূর্ণিমান্ত, অমান্ত নয়। (৪) একাষ্টকা বৎসরের উত্তরায়ণ দিন। শুধু যজুর্বেদ নয়। অথর্ব বেদেও সেই কথা। সাম-বেদের ব্রাহ্মণ, তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ, অপর নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণেও সেই কথা।

ডক্টর থিব. বলিতেছেন, এটা ভুল। সে দিন উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত না, পৌষ অমায় হইত, একাষ্টকা 'অসাবধানে পরিবৃত্তি' (Careless Variant)।

আমি তাঁহার যুক্তির সারমর্ম লিখিতেছি।[২]

কৌষীতকি ব্রাহ্মণ নামে একখানি ব্রাহ্মণ আছে। এটি ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণ। ইহাতে (১৯।৩) সম্বৎসর-সত্রের আরম্ভ দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে দিন রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ হইত। সে দিন মাঘ অমার পূর্বদিন। কিন্তু পৌষ অমার পূর্বদিনে সত্র আরম্ভ করা হইত। আমার মতে ব্রাহ্মণটি খ্রি-পূ অষ্টাদশ শতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল।

ষড়ঙ্গবেদের এক অঙ্গ, জ্যোতিষ। ইহা বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ বা জ্যোতিষ বেদাঙ্গ নামে খ্যাত। ইহাতে যজ্ঞকর্মের নিমিত্ত দিন গণিবার সূত্র আছে। ইহাতে পৌষ অমার পর দিন,

২) G. Thibaut : On some recent attempts to determine the antiquity of Vedic civilization. *Indian Antiquary,* Vol. XXIII. April, 1895.

অর্থাৎ মাঘী শুক্ল প্রতিপদে রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ হইত। আমার মতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ খ্রি-পূ চতুর্দশ শতাব্দে প্রণীত।

ডক্টর থিব. বলিতেছেন, এই ত কৌষীতকি ব্রাহ্মণে পৌষ অমার পূর্বদিন উত্তরায়ণ-আরম্ভ হইয়াছে। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও প্রায় তাই। অতএব পৌষ অমাই ঠিক, যজুর্বেদ ভুল করিয়াছেন!

এই যুক্তির অর্থ এই, যজুর্বেদের যাজ্ঞিকেরা রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভদিন জানিতেন না। আর একাষ্টকা সে দিন হইতে পারিত না! যেহেতু কৌষীতকি ব্রাহ্মণে ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে হয় নাই। এমন আশ্চর্য হেতু আর শুনা যায় নাই।

কিন্তু প্রোফেসর কীথ এই আশ্চর্য হেতুর সম্যক্ উপযোগ করিয়াছেন।[৩] তাঁহার বিবেচনায় কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল একই। তিনি লিখিয়াছেন, "কেহ কেহ বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল খ্রি-পূ ১৩৯১—১১৮১ অব্দ গণিয়াছেন বটে, কিন্তু সে গণনার কোন 'বৈজ্ঞানিক মূল্য' নাই। তাহাতে ৫০০ বৎসরের ভুল থাকা সম্ভব।"

অর্থাৎ বেদাঙ্গ-জ্যোতিষকাল খ্রি-পূ ৮০০ অব্দ দাঁড়াইল, নচেৎ কৌষীতকি ব্রাহ্মণের সহিত অপর যাবতীয় ব্রাহ্মণরচনার কাল খ্রি-পূ ৮০০ অব্দ পাওয়া যায় না! যেহেতু ঋগ্‌বেদের সংস্কৃতি খ্রি-পূ ১২০০ অব্দের পূর্বে হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা এই প্রতিজ্ঞা না করিলে এত বিসম্বাদে পড়িতেন না।

ভ্রম-সংশোধন

পরিষৎ-পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় "কৃত্তিকাই পূর্ব দিকে উদিত হয়", নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভুল ছাপা হইয়াছে।

৪ পৃঃ ২৫ পং	আছে (১০।৫।২)	হইবে	আছে (১০।৮৫।২)
৭ পৃঃ ২৭ ,,	ত্রিপদ	,,	ত্রিপদক্ষেপ
৭ ,, ৩০ ,,	(৩২।১।২)	,,	(২।১।২)

৩) A. B. Keith ; *The Cambridge History of India*, Vol I. Ch.V. Page 148.

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৬)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরীর পরবর্ত্তী জীবন ও কীর্ত্তি

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক মধ্য-ইংলণ্ডের পলার্স পিউরি গ্রামের তন্তুবায়-পুত্র উইলিয়ম কেরীর জীবনাখ্যান অনুসরণ করিয়া আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত তাঁহার সম্পর্কের পরিচয় দিয়াছি। এই শুভ যোগাযোগের পর হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস শ্রীরামপুর মিশনের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাসিক পত্রিকা 'দিগ্দর্শন' ও ২৩এ মে শনিবার দিবসে প্রথম সাপ্তাহিক পত্র 'সমাচার দর্পণে'র আবির্ভাব-কাল পর্য্যন্ত মূলতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। (১৮০১ সালের ৪ঠা মে হইতে ১৮১৮ সালের ২৩এ মে পর্য্যন্ত এই সপ্তদশ বর্ষকালের বাল্য-ইতিহাস ভবিষ্যতের বৃহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ পরিণতির পক্ষে সকল দিক্ দিয়াই সাফল্যের ইতিহাস; ব্যাকরণ-অভিধান এবং মূল ও অনুবাদ গ্রন্থের সাহায্যে ভাষার প্রাণ-ধর্ম্ম এই যুগেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই প্রস্তুতিকালের প্রথম চৌদ্দ বৎসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রধান; শ্রীরামপুর মিশন এই কালে মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করিয়াই সার্থক; ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভিন্ন লোক ও ভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৮১৫ সালে কলিকাতায় রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় এবং ১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে যথাক্রমে ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি (১লা জুলাই ১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি (১লা সেপ্টেম্বর, ১৮১৮) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ১৮১৮ সালের এপ্রিল-মে হইতে সাময়িক-পত্র মারফৎ বিস্তার ও প্রসারের কাজও আরম্ভ হইয়াছে; ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজ এক রকম শেষ হইয়া শ্রীরামপুর মিশনের কাজ আবার সুরু হইয়াছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই যুগের বিবরণ ও কেরীর জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হইলেও আমরা কেরী-প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র ও সংক্ষেপ করিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়েই শেষ করিতেছি। পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে আমরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ, পাঠ্য ও সাহায্য পুস্তক এবং তাহাদের রচয়িতা পণ্ডিত ও মুন্শীদের বিষয় আলোচনা করিব।)

কেরী ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন বাংলা দেশে আসিবার জন্য জাহাজে চাপিয়াই বাংলা শিখিতে সুরু করেন; ১১ই নবেম্বর (১৭৯৩) কলিকাতা পৌছিবার পূর্ব্বেই দেখিতে পাই, তিনি ভাষা শিক্ষা শেষ করিয়া 'বুক অব জেনেসিস' অনুবাদ করিতেছেন। কলিকাতায় পদার্পণের তারিখ হইতেই মুন্শী হিসাবে রামরাম বসু তাঁহার সহিত যুক্ত হন ও ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত যুক্ত থাকেন এবং প্রায় চারি বৎসর অনুপস্থিত থাকিয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের

মে মাস হইতে ১৮১৩ সালের ৭ই আগষ্ট মৃত্যু পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের পণ্ডিত হিসাবে কেরীর অধীনে কাজ করেন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ সালের মধ্যে কেরী রামরাম বসুর শিক্ষকতায় বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া তাঁহার ও ফাউণ্টেনের সাহায্যে সমগ্র নিউ টেষ্টামেণ্ট ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অধিকাংশ অনুবাদ শেষ করেন, বাংলা ভাষায় কথা বলা এবং বক্তৃতা দেওয়া আয়ত্ত করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ প্রণয়ন করেন। ১৭৯৫ সাল হইতে সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং গোলোকনাথ শর্ম্মা নামক (মালদহের মদনাবাটীতে) দুই জন পণ্ডিত রাখিয়া সংস্কৃত শিখিতে থাকেন। ১৭৯৬ সালের শেষের দিকে তিনি হিন্দুস্থানী ভাষাও শিখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত ভাষার প্রতি তাঁহার একটা অদ্ভুত বিরাগ ছিল বলিয়া তিনি বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ১৭৯৭ সালের মাঝামাঝি তিনি সংস্কৃত ভাষায় এরূপ দক্ষতা লাভ করেন যে, মহাভারতের পাঠ সাঙ্গ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করিতে থাকেন। ১৭৯৯ সালের ২৫এ ডিসেম্বর তিনি উত্তর-বঙ্গ পরিত্যাগ করেন ও ১০ই জানুয়ারি ১৮০০ শ্রীরামপুরে উপস্থিত হন। ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৯ সালের মধ্যে তিনি কয়েকটি বিস্তৃত পত্রে (ব্যাপটিস্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' মুদ্রিত) বাংলা দেশের—বিশেষ করিয়া উত্তর-বঙ্গের জীবজন্তু, গাছপালা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মাচরণ এবং বাসনকোসন তৈজসপত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে তিনি বাংলায় কয়েকটি সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সালের গোড়াতেই তিনি মদনাবাটীতে স্থানীয় বালক-বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জন টমাস, রামরাম বসু ও উইলিয়ম কেরীর সমবেত চেষ্টা ও যত্নে অনূদিত 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।* ঐ মাসেই স্যামুয়েল পীয়ার্সের *A Letter to the Lascars* পুস্তকের কেরী-কৃত বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়, ইহাই একান্ত ভাবে কেরীর লিখিত প্রথম পুস্তিকা। এই ধরণের পুস্তিকা তিনি আরও লিখিয়াছিলেন, সেগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক।†

১৮০১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি (৭ই ফেব্রুয়ারি ছাপা শেষ হয়) টমাস-বসু-কেরী-ফাউণ্টেন অনূদিত এবং কেরী-সম্পাদিত সমগ্র নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

* এই পুস্তকের কোনও মলাট বা আখ্যা-পত্র দেখি নাই। প্রথম পৃষ্ঠায় 'মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত' এই নাম লেখা আছে।

† John Murdoch তাঁহার তালিকায় এই কয়খানির নাম করিয়াছেন—ওয়ার্ড-প্রণীত *The Missionaries' Address to the Hindus*এর অনুবাদ; A short summary of the Gospel; The Best Gift; On Repentance। বইগুলির বাংলা নাম জানিবার উপায় নাই।

ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | বিশেষত | যাহা মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে প্রকাশ করিয়াছেন।— | তাহাই ধর্ম্ম পুস্তক | তাহার অন্ত ভাগ।— । তাহা আমারদের প্রভু ও ত্রাণকর্ত্তা যিশু খ্রীষ্টের। মঙ্গল সমাচার | গ্রীক ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল। | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১

কেরীর জীবদ্দশায় এই পুস্তকের আটটি সংশোধিত সংস্করণ হইয়াছিল।

নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রথম সংস্করণ ছাপা হইবার অব্যবহিত পরেই (মে, ১৮০১) কেরীকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তকাদি লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ মুদ্রিত হইতে হইতেই কলেজের জন্য দুইখানি পুস্তক তিনি সঙ্কলন করিয়া ফেলেন। রাইল্যাণ্ডকে লিখিত ১৮০১ সালের ১৫ই জুনের পত্রে (গত সংখ্যায় উদ্ধৃত) আমরা দেখিয়াছি যে, কেরীর বাংলা ব্যাকরণটি সেই সময়েই সঙ্কলিত এবং অর্দ্ধেক মুদ্রিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক ও পুস্তিকা বাদ দিলে বাংলাভাষাবিষয়ক ইহাই কেরীর প্রথম পুস্তক; ইহার মুদ্রণকার্য্য শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ১৮০১ সালেই সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্যাকরণটি হালহেডের ব্যাকরণের আদর্শে সম্পূর্ণ ইংরেজীতেই লেখা। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল—

A/ Grammar/ of the/ Bengalee Language./ Serampore./ Printed at the Mission Press./ 1801./

প্রথম সংস্করণের পুস্তক আমরা দেখি নাই। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির ইংরেজী-পুস্তকসংগ্রহের তালিকার প্রথম ভল্যুমে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ) ৩৯৫ পৃষ্ঠায় সেখানে ইহার অস্তিত্বের উল্লেখ আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেওয়া নাই। ইউষ্টেস কেরী-সঙ্কলিত *Memoir of William Carey, D. D.* (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ) পুস্তকের পরিশিষ্টে ৫৮৭ হইতে ৬১০ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন "Remarks on the Character and Labours of Dr. Carey, as an Oriental Scholar and Translator" নামক যে নিবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কেরীর ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে তিনি লিখিয়াছেন—

I have made some distinctions and observations not noticed by him [Halhed], particularly on the declension of nouns and verbs, and the use of participles.

উইলসন, গ্রীয়ারসন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, কিন্তু *Primitiae Orientales* পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮০৩) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্ত্তৃক এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকের যে তালিকা ছাপা আছে (XLVI—LIV), তাহার ৩০ সংখ্যক নামটি এইরূপ—"Grammar of the Bengal Language; 2d Edition, with large additions." ইহা কেরীরই ব্যাকরণ। প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম ছিল না। সুতরাং *Primitiae Orientales*-এর মত মানিতে হইলে

কেরীর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দেই বাহির হইয়াছিল বলা চলে। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের আখ্যা-পত্রে উহা ১৮০৫ সালে মুদ্রিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

Grammar | of the | Bengalee Language. | — | The Second Edition, with Additions. | — | By W. Carey, | Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta | Languages, in the College of Fort William. | — | Serampore, | Printed at the Mission Press. | 1805 |

পৃষ্ঠা-সংখ্যা—আখ্যা-পত্র ও ভূমিকাংশ ৭, শুদ্ধিপত্র ১, ব্যাকরণাংশ ১৮৪ পৃষ্ঠা, গোড়ার দিক্‌কার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত। ইহাতে দশটি অধ্যায় ছিল; ১। Of letters, ২। Of compounding letters, ৩। Of words, ৪। Of patronyms, gentiles, derivatives etc., ৫। Of adjectives, ৬। Of pronouns, ৭। Of verbs, ৮। Of indeclinable participles, ৯। Of compound words, ১০। Of syntax। ১৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৮৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত—Of numerals, Of money, weights and measures, time, the days of the week, Hindoo months, contractions.

উইলসনের মতে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের প্রায় দ্বিগুণ আকার লইয়াছিল।*

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

Since the first edition of this work was published, the writer has had an opportunity of obtaining a more accurate knowledge of this language. The result of his application to it he has endeavoured to give in the following pages, which [on account of the variations from the former edition,] may be esteemed a new work.

তৃতীয় সংস্করণের উল্লেখ গ্রীয়ারসন বা উইলসন কেহই করেন নাই, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকাতেও উহা নাই, একমাত্র কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ১৮১৫ সালে মুদ্রিত তৃতীয় সংস্করণের এক খণ্ড পুস্তক আছে। তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণেরই প্রায় পুনর্মুদ্রণ; একটি অতিরিক্ত অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে এবং ভূমিকাও সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণ তৃতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ, ১৮১৮ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণের আখ্যা-পত্রে দেখিতেছি—"The Fourth Edition, with additions" লিখিত আছে। ভিতরে সম্ভবতঃ ভ্রমক্রমে "Preface to the third Edition" ছাপা হইয়াছে—ভূমিকার তারিখ "Serampore, March, 1818"।

* ১৮০৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর সাটক্লিফের নিকট লিখিত পত্রে কেরী স্বয়ং বলিতেছেন, "I am reprinting my Bengali grammar, with many alterations and additions." সাটক্লিফের নিকট লিখিত ১৮০৫ সালের ২২এ আগষ্ট তারিখের পত্রে আছে—"I have written and printed a second edition of my Bengali grammar, wholly new worked over, and greatly enlarged...."

সুতরাং ইহা চতুর্থ সংস্করণেরই ভূমিকা, অবশ্য ৩য় সংস্করণেরই হুবহু পুনর্মুদ্রণ। চতুর্থ সংস্করণের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ১৮১৮ সালে প্রকাশিত *Dialogues*...পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণটিও ইহার সহিত একত্র মুদ্রিত ও বাঁধাই হইয়া একই পুস্তকের আকার লইয়াছে। চতুর্থ সংস্করণে ব্যাকরণটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১০০, পরবর্তী কালে প্রস্তুত ছোট হরফে মুদ্রিত। পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয় ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, * পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১১৬। ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের পুস্তক ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে; ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ সংস্করণের পুস্তক কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে, ৩য় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে এবং ৫ম সংস্করণের পুস্তক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারে ও এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। ৫ম সংস্করণেও ৩য় সংস্করণের ভূমিকা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৪৬ সালে জে. রবিনসন কেরীর ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই ব্যাকরণ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেরী তাঁহার ভূমিকায় (৪র্থ সংস্করণ, ১৮১৮) বলিয়াছেন—

Bengal, as the seat of the British government in India, and the centre of a great part of the commerce of the East, must be viewed as a country of very great importance. Its soil is fertile, its population great, and the necessary intercourse subsisting between its inhabitants and those of other countries who visit its ports, is rapidly increasing. A knowledge of the language of this country must therefore be a very desirable object.

The pleasure which a person feels in being able to converse upon any subject with those who have occasion to visit him, is very great. Many of the natives of this country, who are conversant with Europeans, are men of great respectability, well informed upon a variety of subjects both commercial and literary, and able to mix in conversation with pleasure and advantage. Indeed, husbandmen, labourers, and people in the lowest stations, are often able to give that information on local affairs which every friend of science would be proud to obtain . . . . .

An ability to transact business . . . . . without the intervention of an interpreter . . . . .

. . . . . pleasure in making enquiries into, and relieving the distresses, of others. But in a foreign country he must be unable to do this, to his own satisfaction, so long as he is unacquainted with the current language of the country; . . . . .

The advantages of being able to communicate useful knowledge to the heathens, with whom we have a daily intercourse; to point out their mistakes ; . . .

* ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির তালিকায় ভ্রমক্রমে "১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ" দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযারসন সাহেবও এই ভুল করিয়াছেন।

সুতরাং বাংলা ভাষা শিক্ষা ইউরোপীয়ানদের পক্ষে একান্ত ভাবে আবশ্যক। তা ছাড়া, বাংলা ভাষার নিজস্ব মহিমার কথা উল্লেখ করিতেও কেরী ভুলেন নাই।

. . . . . Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countries of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other; . . . . . *

The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India; . . . . four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. WORDS MAY BE COMPOUNDED WITH SUCH FACILITY. AND TO SO GREAT AN EXTENT IN BENGALEE, AS TO CONVEY IDEAS WITH THE UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT LANGUAGES OF THE EAST.

কেরীর ব্যাকরণ এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ১। বর্ণপরিচয়, ২। যুক্তবর্ণ, ৩। শব্দ ও তাহার বিভিন্ন রূপ (বিশেষ্য), ৪। গুণবাচক শব্দ (বিশেষণ), ৫। সর্ব্বনাম, ৬। ক্রিয়াপদ, ৭। শব্দ গঠন, ৮। সমাস, ৯। অব্যয় ও উপসর্গ, ১০। সন্ধিপ্রকরণ এবং ১১। অন্বয় (syntax)।

এই ব্যাকরণের অধিকাংশ দৃষ্টান্ত-বাক্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক হইতে, প্রধানতঃ মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকের শেষে একাদশ অধ্যায়ের পর সংখ্যাবাচক শব্দ, ওজন ও মাপের বিভাগ, টাকাকড়ির বিভাগ, সময়ের বিভাগ, বার, মাস ও তিথির হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

কেরীর ব্যাকরণ বাংলা ভাষার একটি ক্রান্তিকারী পুস্তক হওয়া সত্ত্বেও গত দীর্ঘ দেড় শত বৎসর কালের মধ্যে এক উইলসন সাহেব ব্যতীত অন্য কেহ ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে যে দুই এক জনের পুস্তকে এ বিষয়ে আলোচনা দেখা যায়, তাঁহারাও নির্ব্বিবাদে উইলসনের আলোচনাই আত্মসাৎ করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মেরিডিথ টাউনসেণ্ড এই ব্যাকরণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

* দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রভাষার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে আন্দোলন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতেই সুরু হইয়াছে।

It is the one Grammar we have ever seen made for men ignorant of the language to be studied, divested of all rigmarole about the structure of inflexions, and reduced to the half-dozen arbitrary formulas by which, and not by philosophical discussion, children learn their mother tongue.

পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন লিখিয়াছেন—

The Bengali grammar of Dr. Carey explains the peculiarities of the Bengali alphabet, and the combination of its letters; the declension of substantives, and formation of derivative nouns; the inflexions of adjectives and pronouns; and the conjugations of the verbs: it gives copious lists and descriptions of the indeclinable verbs, adverbs, prepositions, etc., and closes with the syntax, and an appendix of numerals, and tables of weights and measures. The rules are comprehensive, though expressed with brevity and simplicity; and the examples are sufficiently numerous and well chosen. The syntax is the least satisfactorily illustrated; but this defect was fully remedied by a separate publication, printed also in 1801, of Dialogues in Bengali, with a translation into English . . . . .

কেরীর এই *Dialogues*···পুস্তকখানি *Colloquies* নামেও প্রসিদ্ধ। পুস্তক আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে একটি "ফ্লাই লীফে" ঐ নাম দেওয়া আছে বলিয়া পুস্তকেরও ঐ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে। বাংলায় উহা কেরীর 'কথোপকথন' নামে পরিচিত। পুস্তকারম্ভে কেরী স্বয়ং ঐ নাম দিয়াছেন। পুস্তকটির যথার্থ সম্পূর্ণ নাম এই—

Dialogues,| intended| to facilitate the acquiring| of| The Bengalee Language.| Serampore,| Printed at the Mission Press.| 1801

এই পুস্তক ১৮০১ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয়; ভূমিকায় ৪ঠা আগষ্ট, এই তারিখ দেওয়া আছে। বাঙালী-রচিত প্রথম বাংলা গদ্যপুস্তক রামরাম বসু-প্রণীত 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' মুদ্রণ-গৌরবে ইহা অপেক্ষা মাত্র এক মাসের বড়।

প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৮+২১৭। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে সকল পরবর্ত্তী সংস্করণে কেরী কথোপকথনের ভাষাকে স্থানে স্থানে সংস্কৃত-ঘেঁষা করিয়া উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮+২১১। তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণ ব্যাকরণের সহিত যুক্ত হইয়া, ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় সামান্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ভূমিকার তারিখ, "Serampore, June 1, 1818" পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭+১১৩। পরবর্ত্তী কালে ইহার আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণের পুস্তক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি ও লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি; দ্বিতীয় সংস্করণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি এবং তৃতীয় সংস্করণ শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

Dialogues ··পুস্তকখানি নানা দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য, অনেকে এই পুস্তক সম্বন্ধে

আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, কেরীর ব্যাকরণ হইতেও ইহার গুরুত্ব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া অধিক। উইলসন বলিয়াছেন, এই পুস্তক বাংলা ফ্রেজ ও ইডিয়মের বৈচিত্র্যে পূর্ণ। মৌখিক ভাষা শিখিবার পক্ষে সে যুগে ইহার উপযোগিতা অনুমেয়। ৫৮ বৎসর পূর্ব্বে (১৭৪৩ খ্রীঃ) লিসবনে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'* পুস্তকে যদিও ভাওয়াল পরগণার প্রাদেশিক মৌখিক ভাষা সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার বিষয়বস্তু ছিল সঙ্কীর্ণ—মাত্র খ্রীষ্টধর্ম্মের মহিমা প্রচার; লেখকের শব্দকোষ ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কেরী-সঙ্কলিত কথোপকথনগুলি তৎকালে কলিকাতা-শ্রীরামপুর অঞ্চলের সকল স্তরের স্ত্রীপুরুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার লইয়া রচিত হইয়াছিল। রচনা হইলেও ইহার আদর্শ ছিল—ঐ অঞ্চলের মৌখিক ভাষা এবং এই ভাষাই পরবর্ত্তী কালে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক চলতি ভাষার আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনের কাজে এই পুস্তক মহামূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সে যুগের সামাজিক ও ব্যবহারিক রীতিনীতির পরিচয় হিসাবেও এগুলি কম মূল্যবান্ নয়।† ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁহার *History of Bengali Literature* (১৯১৯) পুস্তকের ১৩৬-১৪৭ পৃষ্ঠায় এই পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

ব্যাকরণের মত *Dialogues*···পুস্তকেরও প্রথম সংস্করণে কেরীর নাম আখ্যা-পত্রে ছিল না। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

That the work might be as compleat as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers. I believe the imitation to be so exact, that they will not only assist the student, but furnish a considerable idea of the domestic economy of the country.

The great want of books to assist in acquiring this language, which is current through an extent of country nearly equal to Great Britain, and which, when properly cultivated will be inferior to none, in elegance and perspicuity, has induced me to compile this small work; and to undertake the publishing of two or three more, principally Translations from the Sangskrito. These will form a regular series of books in the Bengalee, gradually becoming more and more difficult, till the student is introduced to the higher classical works in the language.

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা ১২ নং। এই পুস্তকখানি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত ভূমিকা ও টীকা সহ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

†"...it presents in many respects a curious and lively picture of the manners, feelings, and notions of the natives of Bengal."—H. H. Wilson,

১০৮

আমারদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের দণ্ট সুকতনি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

কে রান্ধেছিল বড় বৌ না মেজো বৌ।

বড় বৌই রান্ধিয়াছিল তিনি কুটনা বাটনা করে দিয়াছেন।

তোদের বৌ কেমন। রান্ধিতে বাড়িতে পারে।

হাঁ বুন সেই বৈ আর কে রান্ধে মেয়েরা কেহ এখনে নাই আপনি কাঁচা বাচা নিয়া লড়িতে পারি না। সকল কাযি বড় বৌ করে ছোট বৌডা বড় হিজল দাগুড়া অঙ্গ লাড়ে না আর সদায় ভার ঝকড়া কি করিব বুন সহিতে হয় যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন কালা হাঁড়ি পানে চেয়ে বড় বৌটি অতি ভাল এই সংসারের কায কাম করে আর ছেলে পিলে খাওয়াইয়া আচিয়া দেয় আর আমারদের সেবা সুস্থ করে তাহার জন্যে আমার কোন ব্যামহ নাহি।

প্রথম সংস্করণ *Dialogues*…এর একটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

এই পুস্তক সম্পর্কে কেরীর কৃতিত্ব সঙ্কলনের ও সম্পাদনের এবং এই কার্য্যে তিনি যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, সেকালের এক জন মিশনরীর পক্ষে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না। কেরীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার একজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'এশিয়াটিক জর্ণালে' লিখিয়াছিলেন—

As evincing the practical tendency of his works, we may notice a very useful performance, his Bengali and English Colloquies. These were composed in the original Bengali, probably by a clever native, and may be compared, in respect of the graphic power they discover of showing life as it is,—in its rustic and familiar, as well as more polite forms,—to the detached scenes of a good play, exhibiting correct transcripts of nature.

সে যুগের পণ্ডিতদের রচনার সহিত তাঁহাদের লিখিত ও অনূদিত পুস্তক মারফৎ আমাদের যে পরিচয় আছে, তাহাতে আমরা মনে করিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারই এই সকল কথোপকথন রচনার জন্য সম্ভবতঃ দায়ী। অন্য কেহই তাঁহার মত মৌখিক ভাষা এবং প্রচলিত "ইডিয়ম" সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাঁহার কথোপকথন-পারদর্শিতার পরিচয় আমরা তাঁহার 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় যথেষ্টপরিমাণে পাইয়াছি। তথাপি, কেরীর নামে যখন পুস্তকটি বাহির হইয়াছে, আজ সকল প্রশংসাই তাঁহার প্রাপ্য।

Dialogues......পুস্তকখানিতে চাকর ভাড়া করণ, সাহেবের হুকুম, সাহেব ও মুনসি, পরামর্শ, ভোজনের কথা, যাত্রা, পরিচয়, ভূমির কথা, মহাজন আসামি, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রলোক ভদ্রলোক প্রাচীন প্রাচীন, গুপারিস, মজুরের কথা বার্ত্তা, খাতক মহাজনি, সাধু খাতকি, ঘটকালি, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রিয়া* কথা, ইজারার পরামর্শ, ভিক্ষুকের কথা, কায চেষ্টার কথা, কন্দল, স্ত্রীলোকের হাট করণ, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা, মাইয়া কন্দল, যজমান যাজকের কথা, জমিদার রাইয়ত এবং কথোপকথন—মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে। মূল বাংলা বাম পৃষ্ঠায় ও কেরীর ইংরেজী অনুবাদ দক্ষিণ পৃষ্ঠায় ছাপা। "জমিদার রাইয়ত" বৃহত্তম অধ্যায়, জমিদার ও প্রজার মধ্যে যতদূর সম্ভব, প্রায় সকল বাস্তব আলোচনাই দেওয়া হইয়াছে। শেষ অধ্যায় "কথোপকথনে" সাধারণভাবে বিবাহ, ঘটকালি, পণ, বিবাহরাত্রির খাওয়াদাওয়া ও রোসনাইয়ের কথা, বাকী সকল অধ্যায়েরই বিষয় শিরোনামায় দেওয়া আছে। তন্মধ্যে তিয়রিয়া কথা, ভিক্ষুকের কথা, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, মজুরের কথাবার্ত্তা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন প্রভৃতি অধ্যায় এমনই সহজ এবং বাস্তব ভঙ্গীতে রচিত যে, এগুলির কথা বিবেচনা করিলে টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম ও দীনবন্ধু মিত্রের পরবর্ত্তী কালের কৃতিত্ব অনেকখানি লঘু হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক পাদরি

* তিয়রিয়া – জেলে, fisherman।

এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়া কেরী যে তাঁহার সঙ্কলনে "কন্দল" ও "মাইয়া কন্দল" অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিতে দ্বিধা করেন নাই, ইহাতে তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাই। অনেকে এই কারণে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে বসিয়া কেরী বাক্যদুষ্টির জন্য নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সকল ছাত্রের এই 'কথোপকথন' বইখানির সহিত পরিচিত হওয়া উচিত।* আমরা কৌতূহলী পাঠকের জন্য নীচে সামান্য দুই একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।†

মজুরের কথা বার্ত্তা

ফলনা কায়েতের বাড়ী মুই কায করিতে গিয়াছিনু তার বাড়ী অনেক কায আছে। তুই যাবি।

না ভাই। মুই সে বাড়ীতে কায করিতে যাব না তারা বড় ঠেঁটা। মুই আর বছর তার বাড়ী কায করিয়াছিলাম মোর দুদিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়া দিলে না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব না।

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মানুষ বড় খারা মোকে আগু এক টাকা দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নিয়া আসিস মুই আগাম টাকা দিব তাকে।

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়া যাবি তবে মুই তোর ঠাঁই মোব খাটুনি নিব।

ভাল ভাই। তুই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব।

স্ত্রিলোকের হাট করা

আয়টে সকাল করে চল সূতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পাতি হবে না।

ওটে বুন সে দিন কলাঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি সুতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আট পণ করে সূতাখান। সে সকল সূতা আমি এক কাহন বেচেচিটে।

সে দিন দেখে আর হাটপানে যুয়াতে ইচ্ছা করে না। চল দিকি যাই না গেলে তো হবে না ঘরে বেসাতি পাতি কিছু নাই ছেলেরা ভাত খাবে কি দিয়া আর আধ সেরটাইক কাপাইস আনিতে হবে।

ওগো দিদি সূতা আছে। বাহির কর দিকি দেখি।

নারে তোরে আর সূতা দিব না আর দিন তুই যে সূতা হাটকিয়াছিলি তাহাতে আমার সূতা নষ্ট হইয়াছে।

ওটে পাগল বুন। দেতো দেখি গোচের হয়তো নিব।

* দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার ১৩ সংখ্যক পুস্তক হিসাবে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

† ১৮০১ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে।

কন্দল

আর শুনেছিসড়ে নির্ম্মলের মা। এই যে বেণে মাগী অহঙ্কারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যাদ্যাখ। কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়াছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলের মা করিলে কি ভরন্ত কলসিডা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেইহইতে যাইটের বাছা জ্বরে ঝাঁউরে পড়েছে। এমন গরবাগুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতারখাগি সর্ব্বনাশির পুতটা মরুক তিন দিনে উহার তিনডা বেটার মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

হাঁলো ঝি জামাই খাগি কি বলছিস। তোরা শুনছিস গো এ আঁটকুড়ি রাঁড়ির কথা। তুই আমার কি অহঙ্কার দেখিলি তিন কুলখাগি আমি কি দেখে তোর ছেলের মাথার উপর দিয়া কলসি নিয়া গিয়াছিলাম যে তুই ভাতার পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিস। তোর ভালডার মাথা খাই হালো ভালডা খাগি তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।

থাকলো ছারকপালি গিদেরি থাক। তোর গিদেরে ছাই পল প্রায়। যদি আমার ছেলের কিছু ভাল মন্দ হয় তবে কি তোর ইটা ভিটা কিছু থাকিবে যা মনে আছে তা করিব। তখন তোমার কোন বাপে রাখে তাই দেখিব। হে ঠাকুর তুমি যদি থাক তবে উহার তিন বেটা যেন সাপের কামড়ে আজি রাত্রে মরে। ও যে কালি প্রাতঃকালে বাছা২ করে কান্দে তবেই ও অঙ্কারির অঙ্কারে ছাই পড়ে। হা বউরাঁড়ি তোর সর্ব্বনাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।

ওলো। তোর শাপে আমার বাঁ পার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝি পুত কেটে দি আমার ঝি পুতের পায়। যালো যা বারোদুয়ারি ভাড়ানি হাট বাজার কুড়ানি খানকি যা। তোর গালাগালিতে আমার কি হবে লো কুন্দলি।

আই২। এমন কর্ম্ম কি ও দেখে করেছে তা নহে। ওয় পোয়াতি বটে। যা বুন। তুইও যা। ও যাউক। আর ঝকড়া কন্দলে কাজ নাই। পাড়াপড়সি রাতি পোয়াইলেই দেখা হবে এত বাড়াবাড়ি কেন।

টমাস, রামরাম বসু, মার্শম্যান ও ফাউণ্টেনের আংশিক সহায়তায় অনূদিত কেরীর ওল্‌ড টেষ্টামেণ্টের চারি খণ্ড ১৮০২ হইতে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে আখ্যা-পত্রে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয়। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> ধর্ম্মপুস্তক | তাহা ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে — | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারিবর্গ — | মোশার ব্যবস্থা।--। ম্রিশরালের বিবরণ।— | গীতাদি— | ভবিষ্যত বাক্য।—। মোশার ব্যবস্থা — | তর্জ্জমা হইল ঙেব্রি ভাষা হইতে।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।—।১৮০১

The Pentateuch বা মোশার ব্যবস্থা অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেণ্টের প্রথম খণ্ড যে ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ, কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের ১৮০১, ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের একটি চিঠিতে পাই। তাঁহারা লিখিতেছেন—

The first volume of the Old Testament is nearly half printed; viz., to the thirty-third chapter of Exodus.

১৮০২ সালের ১৬ই জুলাইয়ের চিঠিতে দেখিতেছি—

The last sheet of the pentateuch will be printed next week; and we are about to print the last volume but one of the testament, including Job and Solomon's song. One hundred copies of the Psalms and Isaiah have been ordered by the College at Calcutta.

অর্থাৎ ওল্ড টেষ্টামেণ্ট প্রথম খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাইয়ের শেষে বাহির হইয়াছিল। ঠিক এই সময়ে কেরী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরও কিছু কাজ করিতে বা করাইতে মনস্থ করিতেছিলেন, ডক্টর রাইল্যাণ্ডের নিকট ৩১এ আগষ্ট তারিখে লিখিত তাঁহার পত্রে তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

I have some time past been contriving the plan of a work, which I propose to write in Bengalee. The design is to prove to the natives of this country, that the gospel is necessary blessing to them . . . . . AND THE INSUFFICIENCY AND CONTRADICTION OF THE BOOKS BY THEM ACCOUNTED SACRED. I intend that it should occupy about two hundred pages . . . .

বাহির হইয়া থাকিলে এই পুস্তকের সন্ধান আমরা পাই নাই। এই সময়ে কেরী কলিকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবারের ছেলেদের সহিত মেলামেশা করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র লালাবাবু নামে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কেরীর লক্ষ্য ছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ প্রদর্শন করিলে কেরী তাঁহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বই বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল কি না জানা যায় না। কেরীর পত্রে (৩১এ আগষ্ট ১৮০২) আছে—

One of the first persons in Bengal in point of property, a grandson of the late GUNGA GOBIND SING, has been several times to see me, and I have closely pressed upon him the importance of a Saviour. He accounts himself inconvertible; but has a strong desire to be made acquainted with the sciences, particularly astronomy. I have pusuaded him to get some of our best books on science translated into the Bengalee language; have offered him all my assistance in correcting the copy, and put him in the way of procuring subscribers to the work among the rich natives. He went from me today full of this scheme. I recommended him to begin with Bonnycastle's Astronomy. Should he undertake it, I shall esteem this to be the dawn of science in this dark quarter of the world.

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী কর্ত্তৃক কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারতের সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মহাভারতের ছাপা সুরু হয় আগে, ইহা চারি খণ্ডে

সমাপ্ত হইয়াছিল। রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে আমরা বাজারে যে সকল রামায়ণ-মহাভারতের সংস্করণ দেখি তাহার প্রায় প্রত্যেকটিই শ্রীরামপুর মিশন প্রেসের আদর্শে মুদ্রিত। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার পরবর্ত্তী সংস্করণে কৃত্তিবাস কাশীদাসের উপর কলম চালাইয়া "অবিশুদ্ধ" মূলকে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের তৃতীয় খণ্ড দ্বিতীয় খণ্ডের আগেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

দাউদের গীত। –। এবং। যিশ ঊঁহার ভবিষ্যৎ বাক্য।—। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল ।— ১৮০৩ ।—

এই পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছিল এবং ইহার এক শত খণ্ড ৬৵০ হিসাবে কলেজ কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছিল। ইংরেজী আখ্যা-পত্রে প্রকাশকাল ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ ভুল।

কেরীর বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা অভিধান, সংস্কৃত ব্যাকরণ, সংস্কৃত অভিধান রচনার ও বাইবেল অনুবাদের কাজ ১৭৯৩ হইতে ১৭৯৬ সালের মধ্যেই আরব্ধ হইয়াছিল, পূর্ব্বে যথাস্থানে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কেরী বিশেষ করিয়া তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজে হস্তক্ষেপ করেন; সংস্কৃত ও বাংলা অভিধানের কাজও অনেকখানি অগ্রসর হয়। নিউ টেষ্টামেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ও ওল্ড টেষ্টামেণ্টের বাকী অংশের অনুবাদের কাজেও তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধেও তিনি অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠেন। ১৮০৩ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে সাট্‌ক্লিফকে তিনি লিখিয়াছেন—

My time is much occupied with the second edition of the new testament, and the remaining part of the old . . . . . and my mind has acquired so much bias towards seeking out words, phrases, and idioms of speech, that it is nearly unprepared for any other undertaking; . . . . . The alterations in the second edition are great and numerous; not so much however, in what relates to meaning as construction. I hope it will be tolerably correct, ... subjected to the opinion and animadversions of several Pundits, and some of it translated by a native into a collateral language, of which we can form some idea, before it be printed off.

ঐ সালের ১৪ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে কেরী লিখিয়াছিলেন—আমি মহারাষ্ট্রভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ সুরু করিয়াছি। হিন্দুস্থানীতেও করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মিঃ বুকাননের কাছে শুনিলাম এক জন সামরিক ভদ্রলোক হিন্দুস্থানী ও ফার্সী ভাষায় গসপেল অনুবাদ করিয়া কলেজকে তাহা উপহার দিয়াছেন⋯মেজর কোলব্রুক এই কাজ করিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি।

বালক কেরীর কৃষি, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা এবং প্রাণিবিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল ও ও উৎসাহ, ধর্ম্মোন্মাদনা ও ভাষাতত্ত্ব আলোচনার নীচে মাঝে মাঝে চাপা পড়িলেও একেবারেই যে বিনষ্ট হয় নাই 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউন্টসে' প্রকাশিত জর্নাল ও পত্রগুলিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮০৩ সালের শেষ ভাগ হইতে এই উৎসাহ আবার প্রবল ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে। কলিকাতার কোম্পানীর বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডব্লিউ রক্সবার্গের সহিত সংসর্গ ও ঘনিষ্ঠতা তাঁহাকে এই দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৮০৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁহাকে লিখিতে দেখি (রাইল্যাণ্ডকে)—

I have long wished to employ a person to paint the natural history of India, the vegetable productions excepted, which Dr. Roxburg has been about for several years.

১৮০৪ সালের গোড়াতেই তিনি কলিকাতায় একটি কৃষিবিষয়ক সমাজ স্থাপন করিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ও দ্বিতীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ও রামনাথের সহায়তায় তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণের কাজ দ্রুত চলিতেছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁহার ব্যাকরণের প্রথম তিন অধ্যায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। কোলব্রুকের সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হইয়াছিল, পরবর্ত্তী অংশ আর বাহির হয় নাই।

১৮০৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত কোলব্রুক মারফৎ বন্দোবস্ত করিয়া কেরী বেদ অনুবাদ করিতে স্বীকৃত হন কিন্তু কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখেন, উহাতে এত সময় ব্যয় হয় যে বাইবেল অনুবাদে যথেষ্ট পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রচেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়, কেরী সংস্কৃত হিতোপদেশ প্রকাশ করেন। অমরকোষ অভিধানের সম্পাদনকার্য্যেও কেরী এই সময় হইতে কোলব্রুককে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই পুস্তক ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর তারিখে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাবলিক ডিসপিউটেশনে কেরী গবর্ণর জেনারাল ওয়েলেসলি এবং তদীয় ভ্রাতা প্রসিদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটনের উপস্থিতিতে কলেজের ছাত্রদের এবং সর্ব্বাধ্যক্ষ ওয়েলেসলিকে সম্বোধন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহার কিয়দংশ আমরা গত সংখ্যায় উদ্ধৃত করিয়াছি।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মরাঠা ব্যাকরণ * প্রকাশ করিয়া কেরী চিরদিনের জন্য সমগ্র মরাঠী-ভাষাভাষীদের স্মরণীয় হইয়াছেন।† ১৮০৫ সালেই এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট সার জন আন্সট্রথারের প্ররোচনায় এবং এশিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আর্থিক সাহায্যে (দেড় শত হিসাবে মাসিক তিন শত টাকা)

* A Grammar of the Mahratta Language. Serampore: 1805.

† "To Dr. Carey, however, belongs the merit of having set the example and of having . . . first rendered the language attainable by European students."—H. H. Wilson.

উইলিয়ম কেরী ও জোশুয়া মার্শম্যান ভারতীয় মহাকাব্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করিতে উদ্যত হন। ১৮০৫ সালে সাংখ্যদর্শন ও রামায়ণ লইয়া অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়। সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হয় নাই। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে মূল সংস্কৃত রামায়ণের ১ম খণ্ড ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্র এইরূপ—

The/ Ramayuna/ of Valmeeki,/ in the/ original Sungskrit./ With a prose translation,/ And explanatory notes,/ by William Carey and Joshua Marshman./ Vol. 1./ containing/ the First. Book./ Serampore,/ 1806.

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VI+৬৫৬, গবর্ণর জেনারাল সার জর্জ্জ হিলারো বার্লোকে উৎসর্গীকৃত।

কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়া ১৮০৬ সালের ৩০এ আগষ্ট বাহির হয়। ইহাই বিদেশীদের লেখা সর্ব্বপ্রথম সম্পূর্ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

A Grammar/ of the/ Sungskrit Language,/ composed/ from the works of the most esteemed grammarians./ To which are added,/ Examples for the exercise of the student,/ and/a complete list of the Dhatoos, or Roots./ By W. Carey./ Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort-William./ Serampore, Printed at the Mission Press./ 1806.

পৃষ্ঠা-সংখ্যা VII (ভূমিকা)+8+906+108 (An Appendix, containing a list of the Dhatoos, or Roots)+24 (Index) +9 (Errata)। রিচার্ড মারকুইস ওয়েলেসলিকে উৎসর্গীকৃত।

ভূমিকায় বিশেষ ভাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও রামনাথ বাচস্পতির ঋণ স্বীকৃত হইয়াছে।* এই ব্যাকরণের Syntax অধ্যায়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতের এক অধ্যায় ইংরেজী অনুবাদসহ, গসপেল অব সেণ্ট ম্যাথু তিন অধ্যায়ের সংস্কৃত অনুবাদ ও বাজসনেয় সংহিতা বা ঈশোপনিষৎ ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হইয়াছে। কেরী মৃত্যুঞ্জয়-রামনাথের সাহায্যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই যে বাংলা দেশে উপনিষৎ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

মুদ্রণের সুবিধার জন্য কেরী এই সালেই মনোহর কর্ম্মকারকে দিয়া এক সাট ছোট দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করান, এই হরফ খুব সুদৃশ্য হইয়াছিল। এই সালেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। ১৮৩৪ সালে মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সোসাইটির সদস্য ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল উক্ত সোসাইটির কমিটি অব পেপার্স-এর খুব উৎসাহী সভ্যও ছিলেন।

* "He wishes here also to acknowledge the great assistance he has received . . . from Mrityoonjuyu Vidyalunkaru, and Ramunathu Vasuspati, the first and second Pundits in the College of Fort William, who have been always ready to contribute to this work, and to whose zeal and abilities he is happy to bear this testimony."

১৮০৭ সালের ৮ই মার্চ তারিখে আমেরিকার ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় কেরীকে 'ডক্টর অব ডিভিনিটি' উপাধি প্রদান করেন। ঐ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার পত্নী ডরোথি দীর্ঘ বারো বৎসর কাল উন্মাদরোগগ্রস্ত থাকিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সালে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের চতুর্থ বা শেষ খণ্ড (ঈশায়া—মালাচি) প্রকাশিত হয়। আখ্যা-পত্রে ভ্রমক্রমে ১৮০৫ সাল মুদ্রিত হইয়াছে। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ—

> ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য।— | মানুষের ত্রাণ ও কার্য্যশোধনার্থে | যাহা প্রকাশ করিয়াছেন।— | তাহাই | ধর্ম্মপুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ যাহাতে চারি বর্গ।— | মোশাকরণক ব্যবস্থা। | য়িশরালের বিবরণ।— | গীতাদি।— | ভবিষ্যদ্বাক্য। | তাহার চতুর্থ বর্গ ভবিষ্যদ্বাক্য এই।— | এব্রি ভাষা হইতে তর্জ্জমা হইল।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৫

কেরীর বিভিন্ন ভাষায় বাইবেল অনুবাদ এবং বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান রচনার বহর দেখিয়া অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন, মিশনে এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান হওয়ার দরুন অপরের কৃতিত্ব তিনি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কিন্তু সমসাময়িক বিবরণ হইতে যাঁহারা তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনুধাবন করিবেন তাঁহারা এই বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এই সময়ে তাঁহার দৈনন্দিন কাজের একটি তালিকা এক জন মিশনরীর ব্যক্তিগত পত্রে পাই। তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন পৌনে ছটায়, হিব্রু বাইবেলের এক অধ্যায় পাঠ ও উপাসনা করিতে সাতটা বাজিয়া যাইত। তার পর পরিবারস্থ সকলকে লইয়া বাংলায় উপাসনা করিতেন। প্রাতরাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফার্সী মুনশীর সহিত ফার্সী পড়িতেন। প্রাতরাশের পর পণ্ডিতকে লইয়া রামায়ণ অনুবাদের কাজ চলিত, তার পর কলেজে গিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ী ফিরিয়া সমস্ত দিনের সঞ্চিত বিভিন্ন পুস্তকের প্রুফ দেখিতে হইত, তাহার পরিমাণ বড় কম ছিল না। সান্ধ্য আহার সারিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয় পণ্ডিতের সহায়তায় সংস্কৃতে বাইবেল অনুবাদ করিতেন। এক অধ্যায় শেষ হইলেই তেলিঙ্গা পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইতেন। রাত্রি নটার সময় তিনি একাকী বাংলা অনুবাদে বসিতেন। রাত্রি এগারটার সময় গ্রীক বাইবেল এক অধ্যায় পড়িয়া তিনি শয়ন করিতেন। নিতান্ত অসুস্থ না হইলে তিনি এই ধরণের পরিশ্রম হইতে কখনও বিরত হইতেন না এবং অসুখেও তিনি খুব কম পড়িয়াছেন।

১৮০৮ সালে রামায়ণের দ্বিতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের প্রথমার্দ্ধ) প্রকাশিত হয়। ৮ই মে তারিখে তিনি মিস শালট রুমর (Miss Charlotte Rumohr) নামক এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয়া জার্ম্মান মহিলাকে বিবাহ করেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত *Asiatick Researches or Transactions of the Society,*…র দশম খণ্ডের ১-২৬ পৃষ্ঠায় কেরী-লিখিত "*Remarks on the state of* Agriculture, *in the District* of Dinajpur"

নামক প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়; ইহাতে উত্তর-বঙ্গের ঋতু অনুযায়ী চাষের, উৎপন্ন বিবিধ শস্যের এবং লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্রাদির বিষয়ে যে গবেষণালব্ধ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়কর এবং এদেশে সম্পূর্ণ নূতনও বলা চলে। লাঙ্গল, কোদাল, মই, ডোঙা, কাস্তে প্রভৃতি যন্ত্রের সচিত্র পরিচয় এই প্রবন্ধ হইতে পাওয়া যায়। শুধু দিনাজপুর জেলা নয়, ইহাতে সমগ্র বাংলা দেশের তৎকালীন কৃষিকর্ম্মের ইতিহাস আছে।* এই প্রবন্ধের শেষে (১৩০ বৎসর পূর্ব্বে) কেরী বলিয়াছিলেন—

The improvement of livestock, and introduction of dairies, the fencing and manuring of land, the introduction of wheel carriages, and a number of improvements of a similar kind, have not been hinted at, because the present state of society seems to render them to a great degree impracticable. Yet the rapid progress of agricultural improvements in ENGLAND, encourages the hope, that a gradual improvement may also be effected in HINDOOSTAN.

বাংলা দেশের কৃষি সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা আছে, এই প্রবন্ধটি তাঁহাদের পড়িতে অনুরোধ করি।

১৮০৯ সালের ১লা জানুয়ারি কেরী কলিকাতার লালবাজার চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৪ নং বউবাজারে বাসা ভাড়া করিয়া কলিকাতাতে একটি পাকাপাকি রকমের আশ্রম স্থাপন করেন। জুন মাসের ২৪এ তারিখে ওল্ড টেষ্টামেণ্টের শেষাংশ অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়া বাইবেল সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

> ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য। | বিশেষতঃ | মনুষ্যের ত্রাণ ও কার্য্যসাধনার্থ তিনি যাহা প্রকাশ | করিয়াছেন।— | অর্থাৎ | ধর্ম্মপুস্তক। | তাহার প্রথম ভাগ—যাহাতে চারিবর্গ | মোশার ব্যবস্থা।— | যিশরালের বিবরণ।— | গীতাদি।— | ভবিষ্যদ্বাক্য।— | তাহার দ্বিতীয় বর্গ অর্থাৎ যিশরালের বিবরণ এই।— | এব্রি ভাষা-হইতে তর্জ্জমা হইল। | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০৯ | —

বাইবেল সম্পূর্ণ প্রকাশ করিয়া কেরীর মানসিক উত্তেজনা এত অধিক হয় যে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন। জীবনের একমাত্র কাম্য বহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং প্রতিবন্ধকের মধ্য দিয়া অধিগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রবল জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন এবং দুই মাস কাল শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁহার জীবনের আশা একেবারেই ছিল না। এই সময়ে ডক্টর মার্শম্যান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার প্রতিভূস্বরূপ কাজ করিয়াছিলেন। ১৮০৯ সালেই উড়িয়া নিউ টেষ্টামেণ্টের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। ১৮০৯ সালের শেষে শ্রীরামপুরের মিশনরীরা বিলাতে মূল সোসাইটির নিকট যে বিবৃতি প্রেরণ করেন তাহাতে

* "Though these remarks relate chiefly to the district of *Dinajpur*, yet it is obvious that many of them will equally apply to the other parts of *Bengal.*"

সংস্কৃত ভাষায় (মৃত্যুঞ্জয়ের সহায়তায়) নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশের উল্লেখ আছে। এই সমস্ত কৃতিত্বের প্রধান অংশ তাঁহারা কেরীকেই দিয়াছেন।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণের তৃতীয় খণ্ড (অযোধ্যা কাণ্ডের শেষাংশ) প্রকাশিত হয় এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মরাঠী হেডপণ্ডিত বৈদ্যনাথের সহায়তায় প্রস্তুত কেরীর মরাঠী অভিধানও বাহির হয়। এই পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা VII + ৬৫২।

১৮১১ সালে উড়িয়া ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেরীর পঞ্জাবী (শিখ) ব্যাকরণ এবং মার্চ মাসে কেরী-সম্পাদিত 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। কেরীর বাংলা এবং অন্যান্য ভাষার রচনা লইয়া পণ্ডিত উইলসন প্রভৃতি সমসাময়িক পণ্ডিতেরা যে সকল আলোচনা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে যে সকল আলোচনা হইয়াছে তাহার কোনটিতেই এই পুস্তক সম্বন্ধে উল্লেখ মাত্র নাই। ১৮০১ সাল হইতে ১৮৫২ সালের মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে বা অন্যত্র বাংলা গদ্যে এবং ইংরেজীতে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে (ব্যাকরণ-অভিধান ইত্যাদি) যাহা কিছুই ছাপা হইয়াছে, মায় বাইবেল এবং আইনের বহি পর্য্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য তাহার প্রায় সকলগুলির একাধিক কপি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক শত কপি) কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ খরিদ করিয়াছেন এবং কলেজের জন্য মুদ্রিত ও ক্রীত পুস্তকের তালিকা কলেজের প্রোসিডীংসে সময়ে সময়ে বাহির হইয়াছে। রোবাক্ ১৮১৮ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পরম আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কুত্রাপি কেরী-সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা'র নাম নাই। লংও তাঁহার তালিকায় এই পুস্তকের নামোল্লেখ করেন নাই। শ্রীরামপুর মেময়ের্স-এ (দশটি) মিশন প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকের তালিকা হইতেও 'ইতিহাসমালা' বাদ পড়িয়াছে।* ইহার একটি মাত্র কারণ এই হইতে পারে যে, ১১ই মার্চের অগ্নিকাণ্ডে 'ইতিহাসমালা'র অধিকাংশ কপি পুড়িয়া যায়, সুতরাং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পুস্তক পাঠ্যহিসাবে দেওয়া সম্ভব হয় নাই। পুস্তকের আখ্যা-পত্র এইরূপ—

ইতিহাসমালা। |or| A collection| of| Stories| in| the Bengalee Language.| Collected from various sources.| By W. Carey, D. D.| Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages,| in the College of Fort William| Serampore :| Printed at the Mission Press.| 1812.

পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা আখ্যা-পত্র ধরিয়া ৩২০। কোনও ভূমিকা নাই। কেরীর প্রত্যেক পুস্তকেই ভূমিকা আছে, এটিতে না থাকাটাও বিস্ময়কর। এই পুস্তকের এক এক খণ্ড বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার ও কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে।

দীনেশবাবুর বাংলা-সাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাসে ও সুশীলবাবুর পুস্তকে 'ইতিহাসমালা' সম্বন্ধে সামান্য উল্লেখ আছে। 'ইতিহাসমালা' বিবিধ বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সমষ্টি,

---

* গ্রীয়ার্সন তাঁহার *The Early Publications of the Serampore Missionaries* পুস্তকের শেষে এই দশটি মেময়ের্স-এর একটি সংক্ষিপ্তসার তালিকা করিয়াছেন।

গল্পগুলি বহু বিভিন্ন স্থান হইতে আহৃত, সকলগুলিই অনুবাদ। কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সঙ্কলন-কর্ত্তা।

'ইতিহাসমালা'র ভাষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্যরচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুক্‌রা টুক্‌রা গল্পের মত। কেরী যদি স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল-অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জ্জন করিয়াছেন—অবশ্য 'কথোপকথনে'র সবেগ সাবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরসও নয়। সামান্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি—

৪০ চত্বারিংশ কথা।—

এক রাজার অতিসুন্দরী কন্যা কিন্তু সে হরিণীবদনা জন্মিয়াছিল রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি ক্রমে বিবাহ হইবেক স্বীকার কেহ করে না এই মতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভামধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন রাত্রি প্রভাতে প্রথমে যাহার মুখ দর্শন করিব তাহার সহিত কল্যাই কন্যার বিবাহ দিব। পর দিন প্রথম এক জন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র এক দিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন তোমার হরিণীবদনের বিবরণ কি কন্যা কহিল তবে কহি শুন যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক শুন আমি জাতিস্মরা পূর্ব্ব জন্মে হরিণী ছিলাম চিত্রকূট পর্ব্বতের মধ্যে একটা অতিবড় কূপ আছে তন্মধ্যে যে যে মানস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে তাহার জন্মান্তরে তাহাই সিদ্ধ হয় অতএব আমি রাজকন্যা হইব এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল সর্ব্বাঙ্গ জল মধ্যে এ কারণ আমার এ দশা তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয় মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া সেই মত করিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতিতুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি।—

রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' হইতে মাত্র বার বৎসরের মধ্যে বাংলা ভাষার এই উন্নতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহা বুঝিতে হইলে পণ্ডিত-মুন্‌শীগণের সমবেত চেষ্টা ও কেরীর বৈজ্ঞানিক নির্দ্দেশের কথা স্মরণ করিতে হইবে। Syntax বা ভাষার অন্বয় বস্তুটা কেরী বেশ ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও তিনি কড়া নজর রাখিয়াছিলেন। ফার্সী মিশ্রণের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন এবং 'ইতিহাসমালা'য় সেরূপ ভাষাসঙ্করের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। 'ইতিহাসমালা'র আর একটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

১৩৪ চতুস্ত্রিংশদধিক শততম কথা ।—

সাধু স্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে মৎস্যসকল আহারার্থ আসিয়া আপন২ প্রাণ দিতেছে ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য্য দেখিলাম সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল কি তিনি কহিলেন দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণ ত্যাগ করিতেছে তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল এমত হয় না কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয় এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণ নাশ হয় না এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকের পাপ ভোগ করিতে হয় অতএব এমন দাতার অবশ্য নরক প্রাপ্তি হইতে পারে এবং ঐ মাংস আহারলোভি যে মৎস্যাদি তাহারও অবশ্য প্রাণ নাশ হইতে পারে এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ মৃত্যু সত্য বটে ইতি ।—

'ইতিহাসমালা'য় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ গল্পই আছে এবং হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত উৎস ছাড়াও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধনপতি-খুল্লনা-লহনা, রূপ গোস্বামি-সনাতন গোস্বামি-কথা দেওয়া হইয়াছে ; প্রসিদ্ধ চোরচক্রবর্ত্তী এবং আকবরের ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী বীরবরের কথাও বাদ যায় নাই। অনুবাদ কি পরিমাণ প্রাঞ্জল হইতে পারে, 'ইতিহাসমালা'র গল্পগুলি তাহার দৃষ্টান্ত ।

'ইতিহাসমালা'র শেষ গল্পের শেষে একটি ছড়া-জাতীয় গদ্যাংশ সন্নিবিষ্ট আছে ; সেটি এমনই অপরূপ যে, উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা চিলে নিলে দুগণ্ডা বাঁকী রহিল যোল তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল তবে থাকিল আট দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট তবে থাকিল ছয় প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয় তবে থাকিল দুই তার একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই তবে থাকিল এক ঐ পাত পানে চাহিয়া দেখ এখন হইস যদি মানুষের পো তবে কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো আমি যেঁই মেয়ে তৈঁই হিসাব দিলাম কয়ে···।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'-এর ১১শ খণ্ডের ১৫৩-১৯৬ পৃষ্ঠায় জন ফ্লেমিং এম. ডি.-লিখিত "A catalogue of Indian medicinal plants and drugs, with their names in the Hindustani and Sanscrit languages" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই মহামূল্যবান্ প্রবন্ধটি কেরীর একটি বেনামী রচনা। কেরীর মৃত্যুর পর *The Gentleman's Magazine*এ তাঁহার সম্বন্ধে যে বিস্তৃত প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার এক স্থলে আছে—

Dr. Carey has also left behind him . . . . . a catalogue of Indian medicinal plants and drugs in the eleventh volume [of the ASIATICK RESEARCHES], under the name of Dr. Fleming.

এই বৎসর শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষে সাংঘাতিক দুর্ব্বৎসর। ১১ই মার্চ, বুধবার তারিখ রাত্রিতে (কেরী সেদিন কলিকাতায়) শ্রীরামপুর মিশন ভবনে আগুন লাগিয়া টাইপ, কাগজ, মুদ্রিত পুস্তক প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া মিশনের ৭০,০০০ টাকার অধিক ক্ষতি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি হয় কেরীর, তৎসম্পাদিত বিভিন্ন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়া। পরদিন প্রাতে ডক্টর মার্শম্যানের মুখে এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া কেরী মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বড় সাধের সংস্কৃত অভিধান প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা "the parent of nearly all the colloquial dialects of India"* —কেরীর প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছিল এবং তিনি অনন্যচিত্ত হইয়া এই ভাষা শিখিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। ১৭৯৫ সাল হইতে মদনাবাটীতে যে কাজ আরব্ধ হয়, দীর্ঘ ১৭ বৎসরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমে যাহা সম্পূর্ণপ্রায় হইয়াছিল, সেই অভিধানের পাণ্ডুলিপি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। মাত্র পাঁচটি খাতা কোনও রকমে রক্ষা পাইয়াছিল—শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরির বোর্ড-রুমে তাহা কেরীর অসামান্য অধ্যবসায়ের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান আছে। এই সঙ্গে কেরী কর্ত্তৃক প্রস্তুত ত্রয়োদশটি ভারতীয় ভাষার বহুভাষা-শব্দকোষের (polyglot vocabulary) পাণ্ডুলিপিরও অধিকাংশ বিনষ্ট হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে রামায়ণের যে সংস্করণ কেরী-মার্শম্যানের সম্পাদনায় ইতিমধ্যেই তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, এই অগ্নিকাণ্ডে তাহার শেষাংশ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়। কর্ণাট ভাষায় অনূদিত নিউ টেষ্টামেণ্ট, সংস্কৃত ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং বাংলা অভিধানের কিয়দংশ এবং তেলিঙ্গা ব্যাকরণের সম্পূর্ণ খসড়াটিও রক্ষা পায় নাই।

এই ভয়াবহ ক্ষতি সামলাইয়া লইতে মিশনের যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ নয় মাস এবং পূরা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর বা শ্রীরামপুর মিশনের কোনও উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা এই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং শ্রীরামপুরের হরফ-কারখানা দিবারাত্রি চালাইয়া ছাপার কাজ নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার চেষ্টায় ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহাদের কার্য্য পুনরায় সুরু হয়।

১৮১৪ সালে কেরীর তেলিঙ্গা ব্যাকরণ এবং উড়িয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্টের পেণ্টাটিউক ও গীতাংশ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এইখানে তাঁহার আর একটি কীর্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডক্টর রক্সবার্গ সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত হইয়া ১৮১৪ সালে যখন হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন, কেরী তখন তাঁহার নিজের ছাপাখানায় রক্সবার্গের সুবিখ্যাত

* সংস্কৃত ব্যাকরণের ভূমিকা।

Hortus Bengalensis, or a Catalogue of the Plants of the Honourable East India Company's Garden in Calcutta নামক পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের কেরী-লিখিত বারো পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা জর্জ্জ স্মিথ "his most characteristic writing on a scientific subject" বলিয়াছেন। ১৮১৪ সালের শেষে মাগধী ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্ট অনুবাদ সুরু হয়।

উড়িয়া ভাষায় ওল্ড টেষ্টামেণ্ট সম্পূর্ণ হয় ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে, মুদ্রিত হইয়া বাহির হইতে অবশ্য আরও চারি বৎসর (১৮১৯ খ্রীঃ) সময় লাগে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দেই কেরী-অনূদিত পঞ্জাবী নিউ টেষ্টামেণ্ট প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। কেরীর যুগান্তকারী বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ এই বৎসর বাহির হয়। কিন্তু গোড়ার দিকের বড় হরফে ছাপাতে এই অভিধান এমন অতিকায় আকার ধারণ করে যে, কেরী অভিধানের বাকী অংশ সেই বড় হরফে ছাপা বন্ধ করিয়া বিশেষভাবে অভিধানের জন্য প্রস্তুত ছোট হরফে আবার গোড়া হইতে ছাপিতে সুরু করেন,* ফলে কেরীর বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের বিক্রয় ও প্রচার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮১১ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাইল্যাণ্ডকে লিখিত কেরীর একটি পত্রে দেখিতে পাই—

I am now printing a dictionary of the Bengali, which will be pretty large, for I have got to page 256, quarto, and am not near through the first letter. That letter, however, begins more words than any two others.

কেরীর মৃত্যুর পরেই 'এশিয়াটিক জর্নালে' এই অভিধান-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছিল—

It was the opinion of his son, the late Felix Carey [d. in 1822], at the earliest stage of this work, as he told us at Serampore, that the first letter of the alphabet, forming the Sanscrit and Greek privative prefix, had been injudiciously multiplied by examples, the positive forms of which were to be found in the subsequent pages. The Doctor, however, acted from the best motive,—an anxiety to supply his pupils with a ready resolution of primary difficulties.

প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণের অভিধান আমরা কুত্রাপি দেখি নাই, কোনও পুরাতন ক্যাটালগেও এই সংস্করণের উল্লেখ পাওয়া যায় না।† কেরীর অভিধানের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে (১৭ই এপ্রিল) এবং দ্বিতীয় খণ্ড দুই ভাগে সম্পূর্ণ

* "The first volume was printed in 1815; but the typographical form adopted being found likely to extend the work to an inconvenient size, it was subsequently reprinted . . ."—H. H. Wilson.

† কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-বিভাগের রামতনু লাহিড়ী বৃত্তিভোগী গবেষক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত তাঁহার "প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ পরিচয়" প্রবন্ধে (অগ্রহায়ণ ১৩৪৪,

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে (৭ই জুন) প্রকাশিত হয়। যথাকালে এই অভিধান সম্পর্কে আলোচনা করিব।

১৮১৬ সালে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটে নাই।

১৮১৭ সালে মূল সোসাইটির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনরীদের ঘোরতর মনোমালিন্য সুরু হয়, দীর্ঘ এগার বৎসর ধরিয়া ভিতরে ভিতরে বিবাদ চলিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর-পাদরি-সম্প্রদায় মূল সমিতির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মিশনরীদের অর্জ্জিত অর্থ এবং অর্থে ক্রীত আসবাব-আদি (ব্যক্তিগত ভাবে চাকুরি করিয়া) একান্ত ভাবে মিশনের সম্পত্তি কি না, ইহাই ছিল বিবাদের বিষয়। পরে এই প্রসঙ্গে কুৎসিৎ কাদা-ছোঁড়া-ছুঁড়িও চলিয়াছিল।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাট ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির পক্ষে ১৮১৭ সালে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, ১লা জুলাই তারিখে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। কেরী গোড়া হইতেই সভ্যরূপে এই সমিতির সহিত যুক্ত হন। ১৮১৪ হইতে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু পর্য্যন্ত কেরীর জীবন ও কীর্ত্তি আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিব।

পৃ. ২০৬) লিখিয়াছেন—"ইহার এক খণ্ড শ্রীরামপুরে রক্ষিত আছে।" এই উক্তি ঠিক নহে। যতীন্দ্র বাবুর গবেষণা-কার্য্যের শ্লথতা দেখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকই তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার মানসে উপরোক্ত ভ্রান্ত সংবাদ প্রদান করেন। যতীন্দ্র বাবু যৎশুনিতং তৎলিখিতং পদ্ধতিতে অনুসন্ধান না করিয়াই শ্রীরামপুরে ১৮১৫ সালে মুদ্রিত কেরীর অভিধানের অস্তিত্ব-সংবাদ দিয়াছেন। ওরিজিন্যালিটির লোভে যতীন্দ্র বাবু প্রবন্ধ-লেখকের নাম না করিলেও এই সর্ব্বৈব ভ্রান্ত ধারণা প্রচারে তাঁহার কিছু দায়িত্ব আছে বিবেচনায় অপরে পাছে অনুরূপ ভ্রান্তিতে পড়েন এই ভয়ে এই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ লিখিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি যতীন্দ্র বাবু তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিবেন।— লেখক

খোদাই-চিত্রে বাঙালী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন কাঠ-খোদাই

ইতিহাস বারংবার পুনরাবর্ত্তিত হয়, খোদাই-চিত্র সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ করিয়া খাটে। আধুনিক যুগে কাঠ-খোদাই, ষ্টীল ও কপার এনগ্রেভিং, লিনোকাট প্রভৃতি চিত্রপদ্ধতির বহুল

মহাদেব —'নূতন পঞ্জিকা', ১২৪৩

প্রসার দেখিয়া মনে হয়, প্রভূত উন্নত বিজ্ঞানের সহায়তায় ফটোগ্রাফিক "প্রোসেস" পদ্ধতি অনুযায়ী হাফটোন এবং কোলোটাইপ ছবি মূলের সম্পূর্ণ অনুরূপ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করা সত্ত্বেও মানুষ প্রাণহীন ক্যামেরার সাহায্যে এই যান্ত্রিক প্রতিকৃতিতে তৃপ্ত হইতে পারে নাই; পুরাতন প্রাক্‌বিজ্ঞান-যুগের খোদাই শিল্প-পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করিয়াও সে আবার গ্রহণ করিয়াছে। বহু শিল্পী-মনের রসধারা সিঞ্চনে এই শিল্প উত্তরোত্তর নয়নাভিরাম হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপে খোদাই-শিল্পের নবজাগরণে বিস্ময়কর শিল্পসমৃদ্ধি ঘটিয়াছে;

লক্ষ্মী —'নূতন পঞ্জিকা', ১২৪৩

আমাদের বাংলা দেশেও নন্দলাল বসু, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, বিশ্বরূপ বসু, বাসুদেব রায়, রাণী চন্দ, সুধাংশু রায় প্রভৃতির সাধনায় এক সম্পূর্ণ নূতন সৌন্দর্য্যলোক আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে ; অনেক সময় মনে হইয়াছে ইউরোপ হইতে আমরা খুব বেশী পিছাইয়া নাই।

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীসজনীকান্ত দাস ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী' পত্রিকায় "আধুনিক কাঠ-খোদাই-চিত্র" সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কাঠ-খোদাই শিল্পের ইতিহাসটুকু উদ্ধৃত করিতেছি—

কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির ইতিহাস বহু দিনের। প্রাচ্য চীন দেশেই কাঠ-খোদাইয়ের প্রাচীনতম নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের একটি কাঠ-খোদাই-চিত্র স্যার অরেল ষ্টাইন্

হরগৌরী —'অন্নদামঙ্গল', ১৮৫৭

তুন-হুয়াঙ-এ আবিষ্কার করিয়াছেন। শিল্পবিদেরা অনুমান করেন সম্ভবতঃ এই চিত্রটি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত। ইয়োরোপের কাঠ-খোদাইয়ের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে ইহা ইয়োরোপে প্রবর্ত্তিত হয়। চীনা শিল্পীরা এ-বিষয়ে ইয়োরোপীয় শিল্পীদের গুরু কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে কাঠ-খোদাই-চিত্র-পদ্ধতির

দুর্গা —'নূতন পঞ্জিকা', ১২৪৩

ক্রমপরিণতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই পৃথক্ ভূখণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের পূর্ব্বসীমান্তে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই শিল্পের অস্তিত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া জাপানের চমৎকার রঙীন-ছাপচিত্রে (Colour Print) পর্য্যবসিত হইয়া প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা দেশে এই পদ্ধতিতে শিল্পসুষমার দিক্ দিয়া বিশেষ কিছু সৃষ্টিকার্য্য না হইলেও এক ধরণের স্থূল কাজ অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন

গণপতি —'কালী কৈবল্যদায়িনী', ১৮৩৬

তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুই শত বৎসরের পুরাতন রঙীন কাঠ-খোদাই ছবির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এত পুরাতন ছাপা ছবি দেখি নাই, তবে খোদাই করা কাঠে ছাপা বহু পুরাতন বৃন্দাবনী কাপড় দেখিয়াছি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা দেশে যখন মুদ্রিত পুস্তকের ব্যাপকভাবে প্রচলন সুরু হইল তখন স্বভাবতই কোনও কোনও পুস্তক চিত্রশোভিত করিয়া বাহির করিবার বাসনা উদ্যোগী দুই-চারি জন প্রকাশকের হইয়াছিল। চিত্র-প্রতিলিপি প্রকাশের বিশেষ সুবিধা তখন বাংলা দেশে ছিল না। ষ্টীল বা কপার-প্লেট এনগ্রেভিং ইউরোপে সেকালে বহুল প্রচারিত ছিল। এদেশের শিল্পীরাও অপেক্ষাকৃত সহজ ধাতু ও কাঠ খোদাই শিল্পেরই আশ্রয় লইয়াছিলেন। আমি গত কয়েক বৎসর যাবৎ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশ ও বাংলা-সাহিত্য লইয়া কাজ করিতে করিতে সেকালের কতকগুলি চিত্রিত পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। এগুলিতে কাঠ এবং ধাতু উভয় ধরণের খোদাই-চিত্রই আছে। ধাতু-খোদাই-চিত্রের একটি নমুনা পাঠকেরা মুখপাতে "দশভুজা"র ছবিতে দেখিতে পাইবেন। অন্যান্য ধাতু-খোদাই-চিত্রের পরিচয় পরবর্ত্তী কোনও সংখ্যায় প্রকাশের জন্য রাখিয়া আমি সে-যুগের কয়েকটি কাঠ-খোদাই ছবির নমুনা বর্ত্তমান সংখ্যায় উপস্থিত করিতেছি। এই চিত্র এবং চিত্রিত পুস্তকগুলি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এগুলি দেখিবার সুযোগ সকলের ঘটিবে না; এই প্রতিলিপিগুলি হইতে পাঠক সে যুগে বাঙালী শিল্পীদের শিল্পকর্ম্মের কিছু পরিচয় পাইবেন।

প্রসঙ্গত এ কথাও বলা আবশ্যক যে, সূত্রপাতে কাঠ-খোদাই-চিত্রের প্রচলন বেশী থাকিলেও ক্রমশঃ উক্ত পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয় এবং লাইন-এনগ্রেভিং ব্যাপকভাবে চলিতে থাকে। আরও বলা আবশ্যক যে, শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবেও এগুলির মূল্য খুব অধিক নয়। কিন্তু ইতিহাসের দিক্ দিয়া এগুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

অন্নপূর্ণা —'অন্নদামঙ্গল', ১৮১৬

পাদরি লসন (Lawson) সে যুগের এক জন খ্যাতনামা খোদাই-শিল্পী ছিলেন। বাঙালী শিল্পীদের কেহ কেহ তাঁহার নিকট হইতেই এই শিল্প-বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা আজ কঠিন। বৈদেশিকদের শিল্প-কর্ম্মের সহিত আমাদের এই প্রবন্ধের সম্পর্ক নাই। যাঁহারা লসনের কাজের নমুনা দেখিতে চান, তাঁহাদিগকে ১৮২২ সনে প্রকাশিত 'পশ্বাবলী' (১ম পর্য্যায়) নামক মাসিক পুস্তক দেখিতে বলি। 'পশ্বাবলী'র প্রত্যেক সংখ্যায় লসন কর্ত্তৃক খোদিত একটি করিয়া পশুর চিত্রের ছাপ থাকিত।

সে-যুগের দেশীয় কাঠ-খোদাই-শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে রামচাঁদ রায় ও রামধন স্বর্ণকারের নাম পাওয়া যায়। ধাতুর উপর লাইন-এনগ্রেভিং কার্য্যেও তাঁহারা দক্ষ ছিলেন।

সে-যুগের পঞ্জিকাগুলিতে এই সকল খোদাই-ছবি বহুল পরিমাণে মুদ্রিত হইত। দেব-দেবী এবং পূজাপার্ব্বণের যে-সকল চিত্র আমরা আধুনিক পঞ্জিকাগুলিতে দেখিতে পাই, সেগুলি সেই পুরাতন ধারারই অনুবর্ত্তন মাত্র। শিল্পের দিক্ দিয়াও সেগুলির বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।
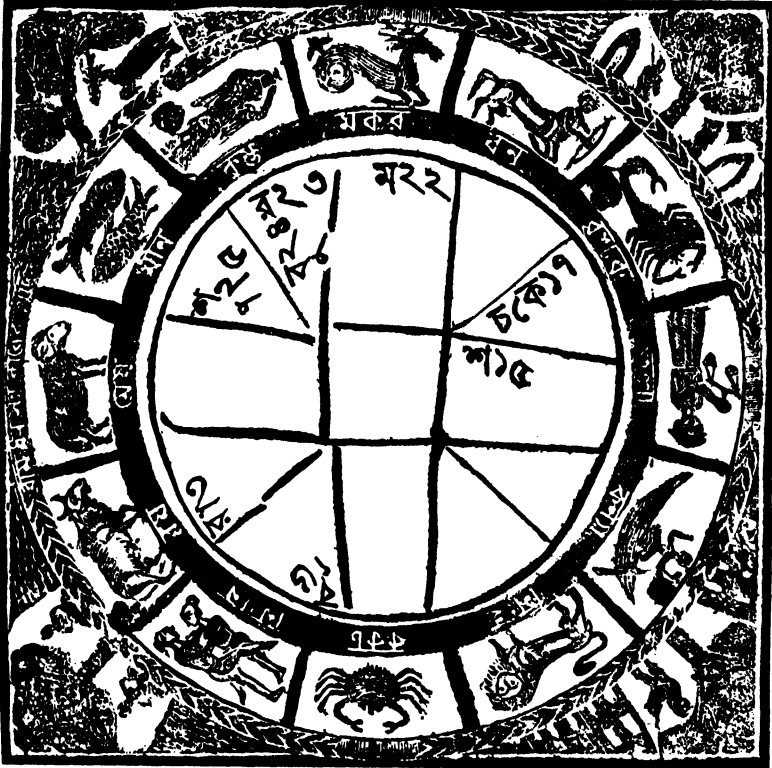
রাশিচক্র —'নূতন পঞ্জিকা', ১২৪২

দেশীয় শিল্পীর হস্তাঙ্কিত চিত্রশোভিত প্রাচীনতম যে পুস্তকের সন্ধান আমরা পাইয়াছি তাহা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য-প্রকাশিত সংস্করণ। এই পুস্তক ১৮১৬ সনে মুদ্রিত হয়। ইহাতে কাঠ এবং ধাতু খোদিত ছয়খানি চিত্র আছে।

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে এইটিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা সচিত্র পুস্তক। ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখের 'গবর্মেণ্ট গেজেটে' গঙ্গাকিশোর পুস্তকখানির যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—
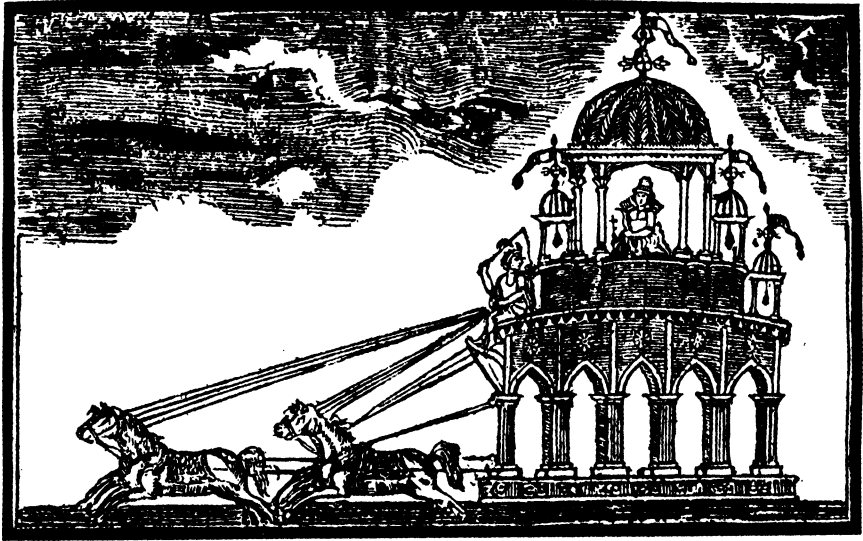
কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণার্জ্জুন —'ভগবদ্গীতা', ১৮৩৬

মেং ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
ছাপাখানায় সিত্র প্রকাষ হইবেক
অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক
অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত
পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাস
য়ের দ্বারা বর্ন্ন সুদ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা
অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি
উপক্ষণে এক২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
ইচ্ছা হয় আপন নাম ঐ ছাপাখানায়
কিম্বা এই আপিষে শ্রীযুত গঙ্গাকিশোর
ভট্টাচার্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

সে-যুগের কাঠ-খোদাই-চিত্রে অশিক্ষিত-পটুত্বের পরিচয় থাকিলেও চিত্রগুলির পিছনে যথার্থ শিল্পী-মনের পরিচয় নাই ; আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মিস্ত্রীরা যে ভাবে নিতান্ত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্পকার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, এগুলি ঠিক সেই ভাবেই নিষ্পন্ন হইয়াছে ; প্রাণের কোনও স্পর্শই এগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ, এগুলির কোনটিই স্বাধীন কল্পনাশ্রিত ছবি নয়, অধিকাংশই নির্দ্দিষ্ট চিরাচরিত সংস্কারানুবর্ত্তী দেবদেবীর চিত্র।

বকুলতলায় সুন্দর —'অন্নদামঙ্গল', ১৮১৬

এই প্রবন্ধে গঙ্গাকিশোরের 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

১। গৌরীবিলাস :—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার-রচিত। ইহা ১৮১৯ সনে রচিত এবং ১৮২৪ (?) সনে প্রকাশিত। ৬ খানি চিত্র (২ খানি কাঠ-খোদাই, ৪ খানি লাইন-এনগ্রেভিং) সমেত।

২। কালী কৈবল্যদায়িনী :—নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য-কৃত। ১৮৩৬ সনে প্রকাশিত।

৩। ভগবদ্গীতা :—১৮৩৬ সনে শিবাদহ-নিবাসী পীতাম্বর সেনের সিন্দুযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত। মূল ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ।

৪। নূতন পঞ্জিকা, ১২৪২ ও ১২৪৩ সাল। নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত।

৫। হরপার্ব্বতীমঙ্গল :—হরিনাভি-নিবাসী রামচন্দ্র তর্কলঙ্কার কবিকেশরী ভট্টাচার্য্য-রচিত। ১৮৫১ সনে প্রকাশিত।

৬। অন্নদামঙ্গল :—১২৬৪ সালে (১৮৫৭ ?) 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

৭। পঞ্চদশী :—১৮৬২ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে।

এই প্রবন্ধের চিত্র-সংগ্রহকার্য্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগারের সাহায্য বিশেষভাবে গৃহীত হইয়াছে।

—'গৌরীবিলাস', ১৮২৪

—'গৌরীবিলাস', ১৮২৪

"সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ" —'অন্নদামঙ্গল', ১৮৫৭

"মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি" —'অন্নদামঙ্গল', ১৮৫৭

"সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদর্শন" —'অন্নদামঙ্গল', ১৮৫৭
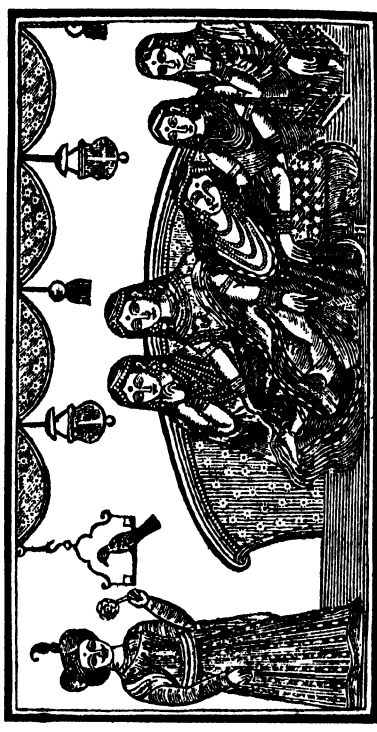
"বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিত" —'অন্নদামঙ্গল', ১৮৫৭

আচার্য্য —'পঞ্চদশী', ১৮৬২

সতীর বিবাহ —'হরপার্ব্বতীমঙ্গল', ১৮৫১

নৈহাটীস্থ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা-বাটীর সংস্কার

'বন্দে মাতরম্'এর ঋষি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে বসিয়া সাহিত্য-সাধনা করিতেন, সেই বৈঠকখানা বাটী ও তলস্থ জমি এখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে ন্যাস-রূপে অর্পিত। ঐ সম্পত্তি বাঙ্গালার একটি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ্। বাটীটি কিন্তু অতি জীর্ণ হইয়াছে। ইহার আমূল সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, সংস্কারকার্য্যের জন্য ২৫০০৲ টাকার প্রয়োজন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিমধ্যেই সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং সাড়ে পাঁচ শত টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন। আরও ১৯৫০৲ টাকা চাই।

আমরা বঙ্গভাষানুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির রক্ষাকল্পে সাহায্য করিতে অনুনয় করিতেছি। যাঁহার যাহা সাধ্য, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকের নামে সত্বর পাঠাইলে বাধিত হইব। ইতি

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সভাপতি

সুলভে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

আগামী ১৩৪৬ আষাঢ় পর্য্যন্ত পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট সর্ব্বসাধারণকে বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ গ্রহণ করিতে হইলে উহাদের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদস্যপক্ষে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধারণের পক্ষে উহাদের মূল্য স্বতন্ত্র।

১ নং সেট—পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১৵০ স্থলে ৷৷৵০

২ নং সেট—কৌলমার্গরহস্য ১৷০, কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ৸০, ধর্ম্মপূজাবিধান ৷৷০, গোরক্ষ-বিজয় ৷৷০, মৃগলুব্ধ ৵০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৵০। মোট ৩৷৵০ স্থলে ১৷০

৩ নং সেট—সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, সংকীর্ত্তনামৃত ৷৷৵০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয় ৷০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৵০, মনোবিজ্ঞান ১৲। মোট ৫৸৵০ স্থলে ২৷৷০

৪ নং সেট—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১৷০, গ্রহগণিত ২৲, উদ্ভিজ্জান (১ম ও ২য়) ১৷০, নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ৷৵০, লেখমালানুক্রমণী ৷৷০। মোট ৫৸৵০ স্থলে ২৷০

৫ নং সেট—মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ ১৵০, তীর্থমঙ্গল ৷৵০, কবি হেমচন্দ্র ৷৷৵০। মোট ৪৵০ স্থলে ১৷৷০

৬ নং সেট—সংকীর্ত্তনামৃত ৷৷৵০, শ্রীকৃষ্ণবিলাস ৷৷৵০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ৷০, সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, মৃগলুব্ধ ৵০, মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, মনোবিজ্ঞান ১৲, তীর্থমঙ্গল ৷৵০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৵০। মোট ৯৲ স্থলে ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

ইহাতে থাকিবে—বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ—বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সকল গ্রন্থ—সাময়িক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্রাদি সমসাময়িক গ্রন্থে বঙ্কিম-রচিত ভূমিকা।

বৈশিষ্ট্য—বঙ্কিমের জীবিতকালে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের যতগুলি সংস্করণ হইয়াছিল, তাহার শেষেরটিকেই প্রামাণিক বলিয়া ধরা হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণে যেখানে যেখানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষিত হইবে, পরিশিষ্টে তাহার উল্লেখ থাকিবে এবং যেখানে পরবর্ত্তী সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণও পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইবে।

সম্পাদন-বিভাগ।—সাধারণ ভূমিকা লিখিবেন—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, **ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিবেন**—শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং **গ্রন্থ সম্পাদন করিবেন**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মূল্য দুই কিস্তিতে দেয়। প্রথম কিস্তির ১২৷৷০ টাকা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হইবে, বারখানি গ্রন্থ পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১২৷৷০ টাকা দিতে হইবে। ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৲ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ (১৫৲ করিয়া দুই কিস্তিতে দেয়) দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী দশ-এগারটি খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। বাঁধানো পাঁচ খণ্ড পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১৫৲ টাকা দিতে হইবে। এই সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, ইংরেজী-বাংলা হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি প্রভৃতি থাকিবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ দশ-এগারটি খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—ইহা ছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—**কপালকুণ্ডলা**—১।০, **সাম্য**—৸০, **বিজ্ঞান-রহস্য**—৸০, **আনন্দমঠ**—১৸০, **কমলাকান্ত**—১।০, **দুর্গেশনন্দিনী**—২৲, **মৃণালিনী**—২৲ **দেবী চৌধুরাণী**—১৲, **বিবিধ প্রবন্ধ** (১ম ও ২য় ভাগ) ২৲, **লোকরহস্য**—৸০, **গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক**—৸০ এবং **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত**—।০ আনা।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল

সহকারী সভাপতিগণ

স্তর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, সি-আই-ই

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস

পুথিশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এসসি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ২। ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এচডি ৩। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীযুক্ত অমল হোম, ৫। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম এস্‌সি, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৮। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, ৯। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ১০। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁতেন, জি-এস্, ১১। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, এম-এ, ১২। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই, ১৭। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৯। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ ২০। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু, সরস্বতী, এম-এ, বি এল ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৬শ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল

সহকারী সভাপতিগণ

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, সি-আই-ই

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস

পুথিশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ২। ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এচডি ৩। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীযুক্ত অমল হোম, ৫। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এস্‌সি, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৮। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, ৯। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ১০। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁত্তেন, জি-এস্, ১১। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, এম-এ, ১২। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই, ১৭। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৯। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ২০। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু, সরস্বতী, এম-এ, বি এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা ঃ পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ৩৲, ৪৲

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ,
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ৫৲, ৬॥০

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥০, ৮॥০

চণ্ডীদাস-পদাবলী ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২॥০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩॥০, ৪॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩া০, ৪॥০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩॥০
৩য় খণ্ড— ২॥০, ৩া০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২॥

দেশীয় সাময়িক-পত্রের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩৯)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাসের
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ॥৵০

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ১৲, ১া০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১॥০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১॥০

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১া০

জ্যোতিষদর্পণ
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত ১৲, ১া০

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত ২৲, ২॥০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in
the Museum of the Bangiya
Sahitya Parishad—
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩ খণ্ড)
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ৫৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু ১॥০, ২া০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত ॥০, ৸০

কুরল
শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত ১৸০, ২॥০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬া০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১॥০, ২৲

বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া (যন্ত্রস্থ)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
শ্রীসজনীকান্ত দাস প্রণীত ২৲

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-গ্রন্থাবলী

পঞ্চভূত	১।০	জীবনস্মৃতি	২৲
চারিত্রপূজা	॥০	ছিন্নপত্র	২৲
বিচিত্র প্রবন্ধ	১৲	পাঠসঞ্চয়	১৲
প্রাচীন সাহিত্য	॥৵০	পরিচয়	১৲
লোকসাহিত্য	॥৵০	সঞ্চয়	৸০
সাহিত্য	১৲	কর্তার ইচ্ছায় কর্ম	।০
আধুনিক সাহিত্য	৸৵০	যাত্রী	২৲
রাজাপ্রজা	১।০	ভানুসিংহের পত্রাবলী	১৲
সমূহ	॥০	রাশিয়ার চিঠি	১৸০, ২।০
স্বদেশ	১৲	ছন্দ	১৲
সমাজ	১॥০	পাশ্চাত্য ভ্রমণ	১৲
শিক্ষা	১॥০	জাপানে-পারস্যে	১॥০
শব্দতত্ত্ব	১৲	সাহিত্যের পথে	১৲
ধর্ম	১৲	কালান্তর	১৲
শান্তিনিকেতন ১ম	১॥০	বিশ্ব-পরিচয়	১৲
শান্তিনিকেতন ২য়	১॥০	পথে ও পথের প্রান্তে	১৲

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪৬

বিজ্ঞানবাদ

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

বেদান্তবাদ ও বৌদ্ধ মতবাদের মধ্যে কোন-কোন বিষয়ে ভেদ খুবই কম। এ কথা শা ন্তি র ক্ষি ত নিজের তত্ত্বসংগ্রহে (শ্লোক ৩৩০) বলিয়াছেন ("অল্পাপরাধ")। বৌদ্ধ মতবাদ বেদান্ত বা উপনিষদ্ হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে। এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধধর্ম বা বৌদ্ধমত সাঙ্খ্যদর্শনের ন্যায় বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড বিষয়ে অনেক কিছু পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সাঙ্খ্যদর্শনেরই ন্যায় উহা জ্ঞানমার্গ-বিষয়ে অনেক কিছু তাহা হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

বৌদ্ধমত বেদান্তেরই ন্যায় বলে যে, এই সংসারের মূল হইতেছে অবিদ্যা, এবং এই জন্যই ইহার বিনাশ আবশ্যক। উভয়ই মতে বলা হয়, দুঃখের মূল হইতেছে কাম, তাই বেদান্তের অনুগামীরা ইহাকে যেমন মহাপাপ বলেন, বৌদ্ধেরা তেমনি বলেন মা র অর্থাৎ মৃত্যু। তাই স্বভাবতই ইহার উচ্ছেদে অমৃত হইতে পারা যায়।[১] উভয়ই মতে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি ('অহঙ্কার' ও 'মমকার') বন্ধের কারণ, এবং সেই জন্যই পরিত্যাজ্য—যদিও ইহার পরিত্যাগের উপায় দুই মতে দুই প্রকার, একবারে বিপরীত। উভয় মতে এইরূপ মিল অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে একটি প্রধান হইতেছে অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, বিজ্ঞানবাদ। ইহা প্রথমত দেখা যায় উপনিষদে, এবং পরে বৌদ্ধমতে কিঞ্চিৎ রূপান্তরে প্রকাশ পাইয়াছে।

ইহা বলাই বাহুল্য, উপনিষদের প্রধান কথা হইতেছে ব্রহ্মবাদ, এবং ব্রহ্মবাদ ও আত্মবাদ একই; কেন না, উপনিষদের ঋষিদের কাছে ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে কেবল শব্দের

১। "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"
কঠ উপ., ৬, ১৪; বৃহ. উপ., ৪-৪-৭।

ভেদ, অর্থের ভেদ নাই। উপনিষদে বহু স্থানে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতেছে বি জ্ঞা ন,[২] বা জ্ঞা ন[৩]। অতএব ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদ আর বিজ্ঞানবাদ একই।

ইহাই যদি হয়, তবে নিম্নোদ্ধৃত ও তৎসদৃশ শ্রুতিসমূহে ব্রহ্ম শব্দে অনায়াসেই বিজ্ঞান বুঝিতে পারা যায়—

'যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত জাত হয়, জাত হইয়া যাহা দ্বারা জীবিত থাকে, এবং (শেষে) গিয়া যাহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা ব্রহ্ম।[৪]

এই উপনিষদেই একটু পরেই (৩.৫) ইহা সমর্থিত হইয়াছে—

'তিনি বিজ্ঞানকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। কেন না, বিজ্ঞানই হইতে সমস্ত ভূত জাত হয়, জাত হইয়া বিজ্ঞানের দ্বারা জীবিত থাকে, এবং (শেষে) গিয়া বিজ্ঞানে প্রবিষ্ট হয়।'[৫]

যেরূপেই হউক, যখন একবার এই ব্যাখ্যাটি মনে লাগিল, তখন নিম্নলিখিত ও তৎসদৃশ শ্রুতিসমূহকে বিজ্ঞানের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা সহজ হইয়া উঠিল—

'এই সব আত্মাই।'[৬]

'এই সব ব্রহ্মই।'[৭]

২। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"—বৃহ. উপ., ৩-৯-২৮। দ্রষ্টব্য তৈত্তি. উপ., ২-৫-১, ৩-৫-১; বৃহ. উপ., ৪-৩-৭। বিজ্ঞানময় = বিজ্ঞান।

৩। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তৈত্তি. উপ., ২-১-১। শ ঙ্ক র এখানে বলিয়াছেন—"সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্ম। সত্যমিতি যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যম্। জ্ঞানং জ্ঞপ্তিরববোধো ভাবসাধনো জ্ঞানশব্দঃ।" এখানকার এই জ্ঞ প্তি শব্দের সহিত বৌদ্ধদের বি জ্ঞ প্তি শব্দ তুলনীয়। উপনিষদের এখানে আলোচ্য স্থানগুলি হইতে বুঝা যাইবে যে, পূর্বে জ্ঞা ন ও বি জ্ঞা ন শব্দের অর্থগত কোন ভেদ করা হয় নাই, যদিও বৌদ্ধশাস্ত্রে সাধারণত কিছু ভেদ করা হইয়াছে। জ্ঞা নে র কাজ হইতেছে "অর্থমাত্রপরিচ্ছেদ", আর বি জ্ঞা নে র কাজ হইতেছে "অর্থবিশেষপরিচ্ছেদ"। বৌদ্ধশাস্ত্রেও কখন কখন এ ভেদ অনুসরণ করা হয় নাই।

৪। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্ম।" তৈত্তি. উপ. ৩-১।

৫। "বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

৬। "আত্মৈবেদং সর্বম্"—ছান্দোগ্য উপ., ৭-২৫-২; "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা"—বৃহ. উপ., ৪-৫-৭।

৭। "ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্"—মুণ্ডক উপ., ২-২-১১; "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—ছান্দোগ্য উপ., ৩-১৪-১; "ব্রহ্ম খল্বিদং বাব সর্বম্"—মৈত্রী উপ., ৪-৬।

'এখানে নানা কিছু নাই। যে ব্যক্তি এখানে নানার মত দর্শন করে, সে মৃত্যুর নিকট হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।'[৮]

অতএব, এই সব আত্মা, বা এই সব ব্রহ্ম, ইহা বলা, অথবা এই সব বিজ্ঞান, ইহা বলা, কিংবা এই সব বিজ্ঞানের পরিণাম বা বিবর্ত,[৯] ইহা বলা বস্তুত একই।

এখানে বৌদ্ধশাস্ত্রের নিম্নলিখিত বচনগুলি চিন্তনীয়:—

'হে জিনপুত্রগণ, এই তিন ধাতু (লোক) কেবল চিত্ত।'[১০]

'ইহা কেবল বিজ্ঞপ্তি।'[১১]

বৌদ্ধমতে চিত্ত, মন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞপ্তি, এই কয়টি পর্যায় শব্দ।[১২]

এই সমস্ত কথায় জানা যাইবে যে, এক ঐ বিজ্ঞান ছাড়া বাহ্য বস্তু কিছু নাই। কিন্তু তথাপি ইহা তো দেখা যায়। কীরূপে ইহা হয়? বেদান্তী বলিবেন, ইহার কারণ অবিদ্যা, বৌদ্ধ বলিবেন, ইহার কারণ বাসনা। অবিদ্যা বা বাসনা বিজ্ঞানকে বাহ্য বস্তুরূপে পরিণত করে, ঠিক যেমন স্বপ্নে, বা মায়ায়, বা মৃগতৃষ্ণা-প্রভৃতিতে।

৮। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"—বৃহ. উপ., ৪-৪-১৯।

৯। প রি ণা ম, বি কা র, ও বি ব র্ত, ইহাদের অর্থ অন্যথাভাব, অবস্থান্তর বা রূপান্তর। বি ব র্ত শব্দের অদ্বৈত বেদান্ত-সম্মত অর্থ শ ঙ্ক রে র পূর্বে ছিল কি? অদ্বৈত বেদান্ত বি কা র ও বি ব র্ত শব্দের অর্থ বলেন এইরূপ—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ।"

বেদান্তসার (জ্যাকোব, নির্ণয়সাগর), পৃ. ২৯। দ্রষ্টব্য—বেদান্তকল্পতরুপরিমল, ১-২-২১; সিদ্ধান্তলেশ (বিজয়নগর), পৃ. ১০।

১০। 'চিত্তমাত্রং ভো জিনপুত্রা যদুত ত্রৈধাতুকম্।' দ্রষ্টব্য সুভাষিতসংগ্রহ (Bendall), পৃ. ১০; তত্ত্বরত্নাবলী (Gaekwad Oriental Series), পৃ. ১৮; Lévi : *Materiaux pour l'étude du Système Vijñānamātra*, Paris, 1932, p. 43.

১১। "বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদম্।"—ব সু ব ন্ধু র বিংশিকা (Levi), পৃ. ১; "বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদং ত্রৈধাতুকম্"—তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকা (GOS), পৃ. ৫৫০; "বিজ্ঞপ্তিমাত্রং ত্রিভবম্"—লঙ্কাবতার (B. Nanjio), ১০.৭৭ (পৃ. ২৭৪)।

১২। "চিত্তং মনো বিজ্ঞানং বিজ্ঞপ্তিশ্চেতি পর্যায়াঃ।"—বিংশিকা, পৃ. ৩; "চিত্তং মনোঽথ বিজ্ঞানমেকার্থম্"—অভিধর্মকোশ, ২.৩৪; "চিত্তং মনো বিজ্ঞানমিতি তস্যৈব পর্যায়াঃ"—মধ্যমকবৃত্তি (Poussin), পৃ. ৩০৩।

গৌ ড় পা দ স্বকীয় আগমশাস্ত্রে অর্থাৎ মাণ্ডূক্যকারিকায় বেদান্তের এই বিজ্ঞানবাদ-অনুকূল ব্যাখ্যা দিয়াছেন। নিম্নে ইহা হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন (৪.৭২) :—

"চিত্তস্পন্দিতমেবেদং গ্রাহ্যগ্রাহকবদ্ দ্বয়ম্।
চিত্তং নির্বিষয়ং নিত্যমসঙ্গং তেন কীর্তিতম্॥"

'এই যে গ্রাহ্য ও গ্রাহক[১৩] লইয়া দুইটি (জিনিস) আছে, ইহা কেবল চিত্তের স্পন্দন। চিত্তের কোন বিষয় নাই, এই জন্য সর্বদা ইহাকে অসঙ্গ[১৪] বলা হয়।'

এখানে চিত্তের স্পন্দিত (অর্থাৎ স্পন্দ বা স্পন্দন) বলিতে তাহার চেষ্টা অর্থাৎ চিন্তনক্রিয়া। ইহা হইতেই বিবিধ বস্তু প্রতীয়মান হয়।[১৫]

নিম্নলিখিত কারিকাগুলিও আগমশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"ঋজুবক্রাদিকাভাসমলাতস্পন্দিতং যথা।
গ্রহণগ্রাহকাভাসং বিজ্ঞানস্পন্দিতং তথা॥" ৪.৪৭।

'অলাত (জলন্ত কাঠকে) নাড়াইলে-চাড়াইলে যেমন তাহা সোজা ও বাঁকা প্রভৃতি আকারে প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানের স্পন্দন সেইরূপ গ্রাহ্য ও গ্রাহক আকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে।'

"অস্পন্দমানমলাতমনাভাসমজং যথা।
অস্পন্দমানং বিজ্ঞানমনাভাসমজং তথা॥" ৪.৪৮।

'অলাত যদি না নড়ে-চড়ে, তবে তাহা যেমন (সোজা বা বাঁকা প্রভৃতি আকারে) উৎপন্ন হয় না, এবং প্রকাশও পায় না, স্পন্দন না হইলে বিজ্ঞানও সেইরূপ (গ্রাহ্য-গ্রাহক আকারে) উৎপন্ন হয় না, এবং প্রকাশও পায় না।'

"অলাতে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্নালাতং প্রবিশন্তি তে॥" ৪.৪৯।

১৩। অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করা যায়, এবং যে গ্রহণ করে, অর্থাৎ দৃশ্য ও দ্রষ্টা, বা বিষয় ও বিষয়ী।

১৪। "অসঙ্গলক্ষণং জ্ঞানম্।" লঙ্কাবতার, পৃ. ১৫৭।

১৫। যোগবাসিষ্ঠে বিজ্ঞানবাদের বহু কথা আছে। চিত্তস্পন্দ-সম্বন্ধে তাহা হইতে নিম্নলিখিত কথা কয়টি এখানে উদ্ধৃত করিতে পারা যায় (৩.৬৭.৬–৮) :—

"স্পন্দাস্পন্দস্বভাবং হি চিন্মাত্রমিহ বিদ্যতে।
খে বাত ইব তৎস্পন্দাৎ সোল্লাসং শান্তমন্যথা॥
চিত্বং চিত্তং ভাবিতং সৎ স্পন্দ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
দৃশ্যস্বাভাবিতং চৈতদস্পন্দনমিতি স্মৃতম্॥
স্পন্দাদ্ ভবতি চিৎসর্গো নিঃস্পন্দাদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্"

'অলাত যখন স্পন্দিত হয়, তখন (সোজা বা বাঁকা প্রভৃতি আকারে তাহার) প্রকাশগুলি অন্য কিছু হইতে হয় না, এবং যখন উহা স্পন্দিত হয় না, তখন ঐ (প্রকাশ-)গুলি অন্যত্র যায় না, এবং অলাতেও প্রবেশ করে না।'

"বিজ্ঞানে স্পন্দমানে বৈ নাভাসা অন্যতোভুবঃ।
ন ততোঽন্যত্র নিস্পন্দান্ন বিজ্ঞানং বিশন্তি তে॥" ৪.৫১।

'বিজ্ঞানের যখন স্পন্দন হয়, তখন তাহার (গ্রাহ্য ও গ্রাহক আকারে) প্রকাশগুলি অন্য কিছু হইতে হয় না, এবং যখন তাহার স্পন্দন হয় না, তখন ঐ (প্রকাশ-)গুলি অন্যত্র যায় না, এবং বিজ্ঞানেও প্রবেশ করে না।'

"যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্ দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥" ৩.২৯, ৪.৬১।

'যেমন স্বপ্নে মায়ায় মনের স্পন্দন হয়, আর তাহা (গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই) দুই (আকারে) প্রকাশ পায়, সেইরূপ জাগ্রদ্ অবস্থায় মায়ায় মনের স্পন্দন হয়, এবং তাহা (গ্রাহ্য ও গ্রাহক এই) দুই (আকারে) প্রকাশ পায়।'

"অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ ন সংশয়ঃ॥" ৩.৩০, ৪.৬২।

'ইহাতে সংশয় নাই যে, স্বপ্নে মন অদ্বয় (অর্থাৎ তাহাতে গ্রাহ্য ও গ্রাহক, এই দুই থাকে না), কিন্তু তাহা (ঐ) দুই আকারে প্রকাশ পায়; সেইরূপ ইহাতে সংশয় নাই যে, জাগ্রদবস্থায় মন অদ্বয়, কিন্তু তাহা দুই আকারে প্রকাশ পায়।'

এখানে লঙ্কাবতার হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাউক :—

"চিত্তমাত্রমিদং সর্বং দ্বিধা চিত্তং প্রবর্ততে।
গ্রাহ্যগ্রাহকভাবেন আত্মাত্মীয়ং ন বিদ্যতে॥" ৩.১২১; পৃ. ১৮১।

'এই সব কেবল চিত্ত। গ্রাহ্য ও গ্রাহক, এই দুই আকারে চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মা ও আত্মীয় (বলিয়া কিছু) নাই।'

"চিত্তমাত্রং ন দৃশ্যোঽস্তি দ্বিধা চিত্তং প্রবর্ততে।
গ্রাহ্যগ্রাহকভাবেন শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিতম্॥" ১০.৫৮; পৃ. ২৭২।

'কেবল চিত্ত আছে, দৃশ্য নাই। গ্রাহ্য ও গ্রাহক, এই দুই প্রকারে চিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই চিত্ত শাশ্বতও নহে, এবং ইহার উচ্ছেদও নাই।'[১৬]

"গ্রাহ্যগ্রাহকভাবেন চিত্তং নমতি দেহিনাম্।
দৃশ্যস্য লক্ষণং নাস্তি যথা বালৈর্বিকল্প্যতে॥" ১০.৫৮; পৃ. ২৭২।

'গ্রাহ্য ও গ্রাহক, এই (দুই) রূপে দেহীদের চিত্ত বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। দৃশ্যের (অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ের) লক্ষণ নাই—মূঢ়েরা যেমন কল্পনা করিয়া থাকে।

১৬। বুদ্ধদেব শাশ্বতবাদীও ছিলেন না, উচ্ছেদবাদীও ছিলেন না, তাঁহার পথ ছিল মধ্যম ("মজ্‌ঝিমা পটিপদা" বা "মধ্যম প্রতিপদ্")।

"গন্ধর্বনগরং যদ্বদ্ যথা চ মৃগতৃষ্ণিকা।
দৃশ্যং খ্যাতি তথা নিত্যং প্রজ্ঞয়া চ ন বিদ্যতে॥" ১০.৬৯ ; পৃ. ২৭২।

'যেরূপ গন্ধর্বনগর ও যেরূপ মৃগতৃষ্ণা, দৃশ্যও (অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়ও) সেইরূপ সর্বদা প্রকাশ পায় ; কিন্তু প্রজ্ঞায় তাহার অস্তিত্ব নাই।'

এই দৃশ্য জগৎ যে, মনের সৃষ্টি, মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদে (মহীশূর, ১৯০০, পৃ. ১২) তাহা এইরূপে বলা হইয়াছে :—

"যন্মনস্ত্রিজগৎসৃষ্টিস্থিতিব্যসনকর্মকৃৎ।"

'যে মন তিন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্ম করে।'

বিজ্ঞানবাদে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' বা 'বিজ্ঞানমাত্রতা'র সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ। 'বিজ্ঞানমাত্র' বলিতে 'কেবল বিজ্ঞান', এই কেবল বিজ্ঞানের অবস্থার নাম 'বিজ্ঞানমাত্রতা'। বিজ্ঞান যখন কোন বিষয়কে গ্রহণ না করে, ইহা নিজেতেই অবস্থান করে, উহা স্বস্থ বা আত্মস্থ হয়, তখন সেই অবস্থাকে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা' বলা হয়।[১৭]

বিজ্ঞানবাদীদের মতে এই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বা বিজ্ঞানমাত্রতাই মুক্তি।[১৮] এ সম্বন্ধে পরে কিছু বলা হইবে।

গৌড়পাদ স্বীয় আগমশাস্ত্রে (৩.৩৮) এই বিজ্ঞানমাত্রতাকেই 'আত্মসংস্থ জ্ঞান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[১৯] কঠোপনিষদের (২.৩.১০) নিম্নলিখিত শ্লোকেও ইহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে :—

১৭। বসুবন্ধু লিখিয়াছেন :—

"যদা ত্বালম্বনং জ্ঞানং নৈবোপলভতে তদা।
স্থিতং বিজ্ঞানমাত্রত্বে গ্রাহ্যাভাবাৎ তদগ্রহাৎ॥"

ত্রিংশিকা ২৮ ; বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (Poussin), p. 585.

"যদা ত্বালম্ব্যমর্থং নোপলভতে জ্ঞানং তদা বিজ্ঞপ্তিমাত্রব্যবস্থানং ভবতি।
বিজ্ঞপ্তের্গ্রাহ্যাভাবাদ্ গ্রাহকস্যাপ্যভাবঃ। তদগ্রহণায় প্রবর্ততে জ্ঞানম্।" লঙ্কাবতার, পৃ. ১৬৯।

১৮। "বিদিত্বা নৈরাত্ম্যং দ্বিবিধমিহ ধীমান্ ভবগতং
সমং তচ্চ জ্ঞাত্বা প্রবিশতি চ তত্ত্বং গ্রহণতঃ।
ততস্তত্র স্থানান্ মনস ইহ ন খ্যাতি তদপি
তদখ্যানং মুক্তিঃ পরম উপলম্ভস্য বিগমঃ॥

মহাযানসূত্রালঙ্কার, ১১.৪৭।

তৃতীয় চরণটির ব্যাখ্যা এইরূপ—

"ততস্তত্র তত্ত্ববিজ্ঞপ্তিমাত্রস্থানান্ মনসস্তদপি তত্ত্বং ন খ্যাতি বিজ্ঞপ্তিমাত্রম্। তদখ্যানং মুক্তিঃ।"

১৯। "গ্রহো ন তত্র নোৎসর্গশ্চিন্তা যত্র ন বিদ্যতে।
আত্মসংস্থং তদা জ্ঞানমজাতি সমতাং গতম॥"

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্।"

'যখন পাঁচটি জ্ঞান মনের সহিত অবস্থান করে, এবং বুদ্ধিও নড়ে না, তখন তাহাকেই তাঁহারা পরম গতি বলেন।'

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতেছে বিজ্ঞান। মনে হয়, ইহা বিজ্ঞানমাত্রতাকে লক্ষ্য করিতেছে। বিজ্ঞান যখন 'আত্মসংস্থ', তখন তাহাই ব্রহ্ম।

এ স্থানে ছান্দোগ্য উপনিষদের (৭.২৪.১-২) এই কথাটি মনে করিতে পারা যায়:—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্ বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং। স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। স্বে মহিম্নি। যদি বা ন মহিম্নীতি।"

'যাহাতে (কেহ) অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শোনে না, অন্য কিছু জানে না, তাহা ভূমা (মহৎ)। আর যাহাতে (কেহ) অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শোনে, অন্য কিছু জানে, তাহা অল্প। যাহা অল্প, তাহা মরণশীল।'

(নারদ প্রশ্ন করিলেন—) 'ভগবন্, তিনি (সেই ভূমা) কাহাতে প্রতিষ্ঠিত?'

(সনৎকুমার উত্তর করিলেন—) 'নিজের মহিমায়। অথবা (নিজের) মহিমাতেও নহে।'

এ বিষয়ে গৌ ড় পা দে র ব্যাখ্যা খুব পরিষ্কার। তিনি বলিতেছেন (৩.৪৬)—

"যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ।
অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা॥"

'চিত্ত যখন লীন[২০] হয় না, আবার বিক্ষিপ্তও[২১] হয় না, তাহা নিঃস্পন্দ থাকে, এবং তাহাতে (কোন বস্তুর) আভাস (অর্থাৎ আকৃতি)[২২] থাকে না, তখন তাহা ব্রহ্ম নিষ্পন্ন[২৩] হয়।'[২৪]

দ্রষ্টব্য—

"আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।" ভগবদ্গীতা, ৬.২৫।

"মনো নির্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।" শ্রীমদ্ভাগবত, ২.১.১৯।

ইহা বস্তুত নির্বিকল্প জ্ঞান = অকল্পক জ্ঞান (গৌ ড় পা দ, ৩.৩৩)।

দ্রষ্টব্য—বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি (২য় খণ্ড), পৃ, ৬০৭।

২০-২১। অর্থাৎ লয়-অবস্থাপ্রাপ্ত। লয় হইতেছে নিদ্রাবস্থা। ইহারই অপর নাম মূঢ়াবস্থা। ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া গৌ ড় পা দ অন্যত্র (৩.৩৬) "অনিদ্র" ও "অস্বপ্ন" বলিয়াছেন। দ্রষ্টব্য ৩.৪২। বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিক্ষেপ অবস্থাপ্রাপ্ত। লয় ও বিক্ষেপ অবস্থায় যোগ বা সমাধি হয় না। দ্রষ্টব্য—যোগসূত্র-ব্যাসভাষ্য, ১. ১।

২২। 'আভাস' শব্দের অর্থ প্রতিচ্ছায়া বা কোন বস্তুর ছবিও হইতে পারে।

২৩। ভাষ্যকার শ ঙ্ক র "নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা" ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ:—"যদৈবংলক্ষণং চিত্তং তদা নিষ্পন্নং ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বরূপেণ নিষ্পন্নং চিত্তং ভবতি।"

২৪। শ ঙ্ক র আগমশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় অন্যত্র (৪.৭৭) লিখিয়াছেন:—"চিত্তস্য নিশ্চলা

এইরূপে দেখা যাইতেছে, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের বিজ্ঞানমাত্রতা আর ব্রহ্মবাদীদের ব্রহ্মভাব একই। ব্রহ্মভাব অর্থে ব্রহ্ম হওয়া।[২৫] ইহাই ব্রহ্মবাদীদের মুক্তি, এবং ইহাই হইতেছে বিজ্ঞানবাদীদেরও মুক্তি। ইহা আমরা পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি।[২৬]

চিত্ত যখন বিজ্ঞানমাত্রতায় অবস্থিত হয়, তখন তাহাকে অনুপলম্ভ, অচিত্ত,[২৭] লোকোত্তর জ্ঞান, অচিন্ত্য, ধ্রুব, কুশল ও সুখ ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ করা হয়।[২৮]

চলনবর্জিতা ব্রহ্মস্বরূপৈব তদা স্থিতির্যৈষা ব্রহ্মস্বরূপা স্থিতিশ্চিত্তস্যাদ্বয়বিজ্ঞানৈকরসঘনলক্ষণা।" তিনি বৃহদারণ্যকের ভাষ্যেও (৪.৩.৭ ; নির্ণয়সাগর, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫৮৭) লিখিয়াছেন—"বিজ্ঞানস্য নির্বাণং পুরুষার্থঃ।"

এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে হয় :—

"নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সংনিরুদ্ধং মনো হৃদি।
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্।" ব্রহ্মবিন্দু উপ., ৪।
"নৈব চিন্ত্যং ন চাচিন্ত্যমচিন্ত্যং চিন্ত্যমেব চ।
পক্ষপাতবিনির্মুক্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা।" ঐ, ৬।
"স্পন্দাদ্ ভবতি চিৎসর্গো নিঃস্পন্দাদ্ ব্রহ্ম শাশ্বতম্।" পূর্বোদ্ধৃত যোগবাসিষ্ঠ, ৩.৬৭.৮।

২৫। "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।" মুণ্ডক উপ., ৩. ২. ৯।

২৬। ১৮শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৭। চিত্ত তখনই চিত্ত, যখন কিছু চিন্তা করা যায়, চিন্তন ক্রিয়া না থাকিলে চিত্ত থাকে না।

২৮। "অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।
আশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ॥
স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ॥" ত্রিংশিকা, ২৯, ৩০।

এখানে যে "অনুপলম্ভ" বলা হইয়াছে, পূর্বোদ্ধৃত মহাযানসূত্রে (১১.৪৭) তাহাকেই "পরম উপলম্ভস্য বিগমঃ" বলা হইয়াছে। "অচিত্ত" শব্দের অর্থ বসুবন্ধুর ত্রিস্বভাবনির্দেশে (৩৬) পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে :—

"চিত্তমাত্রোপলম্ভেন জ্ঞেয়ার্থানুপলম্ভতা।
জ্ঞেয়ার্থানুপলম্ভেন স্যাচ্চিত্তানুপলম্ভতা।

'অনুপলম্ভ' শব্দ-সম্বন্ধে Poussin সাহেব বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধিতে (পৃ. ৬০৬) লিখিয়াছেন যে, স্থিরমতির টীকা-অনুসারে উহা বোধিসত্ত্বের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ("D'aprés le commentair de Sthiramati les motes *anupalambho' sau* se rapportent au Bodhisattva"), কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। স্থিরমতি এ স্থলে পূর্বোক্ত শব্দ কয়টির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"তত্র গ্রাহকচিত্তাভাবাদ্ গ্রাহ্যার্থানুপলম্ভাচ্চ অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ।

অনুচিতত্বাৎ (তিব্বতী পাঠ-অনুসারে অপরিচিতত্বাৎ) লোকে সমুদাচারাভাবান্ নির্বিকল্পাচ্চ লোকাদুত্তীর্ণমিতি জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তদিতি।

এখানে বিচার করিয়া দেখা উচিত, বিজ্ঞানবাদীর এই বিজ্ঞান আর ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্মরূপ বিজ্ঞানের মধ্যে কোন ভেদ আছে কি না। এখানে ব সু ব ন্ধু ও স্থি র ম তি র মতে এই অবস্থায় বিজ্ঞান ধ্রুব বা নিত্য।[২৯] অন্যত্রও বহু স্থানে এইরূপ বলা হইয়াছে।[৩০] কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ যে, বিজ্ঞানবাদীদের মতে বিজ্ঞান হইতেছে ক্ষণিক, বেদান্তীদের ন্যায় নিত্য নহে। শা ন্তি র ক্ষি ত ও বলিয়াছেন যে, বেদান্তীদের মতের ইহাই ত্রুটি যে, তাঁহারা বিজ্ঞানকে নিত্য বলেন।[৩১] তবে বিজ্ঞানবাদীদের মতে বিজ্ঞানকে

অচিন্ত্যস্তর্কাগোচরত্বাৎ প্রত্যাত্মবেদ্যত্বাদ্ দৃষ্টান্তাভাবাচ্চ।

ধ্রুবো নিত্যত্বাদক্ষয়তয়া।

সুখো নিত্যত্বাদেব যদনিত্যং তদ্দুঃখম্। অয়ং চ নিত্য ইতি। অস্মাৎ সুখঃ।"

২৯। তন্ত্রালোকের টীকায় (Kashmir Sanskrit Texts and Studies, Vol. III, p. 33) জ য় র থ নিম্নলিখিত শ্লোকে বিজ্ঞানবাদীর মত উল্লেখ করিয়াছেন :—

"প্রভাস্বরমিদং চিত্তং প্রকৃত্যাগন্তবো মলাঃ।
তেষামপায়ে সর্বার্থং তজ্জ্যোতিরবিনশ্বরম্॥"

এখানেও চিত্তজ্যোতিকে অবিনশ্বর বলা হইয়াছে।

৩০। "অনাদিনিধনা শান্তা সর্বধর্মেশ্বরী চ সা।
বিভ্রতী সর্বরূপাণি সত্যদ্বয়সমন্বিতা॥
জ্ঞানসিদ্ধি, ১৫.৫০ (Two Vajrayana Works, GOS, p. 85.)।

ইহা এখানে 'চিত্তধারার' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

"অনাদিনিধনং শান্তং বোধিচিত্তম্।" ঐ, পৃ. ৭৫।

"জ্ঞানমমরণমলক্ষণমঘোষং প্রভাস্বরমনভিলাপ্যমিতি।" ঐ, পৃ. ৮৫।

দ্রষ্টব্য Suzuki: *Outlines of Mahayana Buddhism*, p. 318: "Nirvana is sometimes spoken of as possessing four attributes; (1) eternal (*nitya*), (2) blissful (*sukha*), (3) self-acting (*ātman*), and pure (*suci*). It is eternal, because it is immaterial; it is blissful, because it is above all sufferings; it is self-acting, because it knows no compulsion; it is pure, because it is not defiled by passion and error." আরও দ্রষ্টব্য বিসুদ্ধিমগ্‌গ (Pali Text Society), খণ্ড ১, পৃ. ২৯৪; সংযুক্তনিকায় (Pali Text Society), খণ্ড ৪, পৃ. ৩৬২, ৩৬৯: "অসঙ্খতঞ্চ বো ভিক্‌খবে দেসিস্‌সামি...সচ্চঞ্চ পারঞ্চ সুদুদ্দসঞ্চ অজরঞ্চ ধুবঞ্চ অমতঞ্চ সিবঞ্চ।" অভিধানপ্পদীপিকায় (সু ভূ তি-সংস্কৃত, ৭) ধুব (সংস্কৃত ধ্রুব) নির্বাণের অন্যতম নাম।

৩১। নিত্যজ্ঞানবিবর্তোঽয়ং ক্ষিতিতেজো জলাদিকঃ।
আত্মা তদাত্মকশ্চেতি সংগিরন্তেঽপরে পুনঃ।
গ্রাহ্যলক্ষণসংযুক্তং ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে।
বিজ্ঞানপরিণামোঽয়ং তস্মাৎ সর্বঃ সমীক্ষ্যতে।
তেষামল্পাপরাধং তু দর্শনং নিত্যতোক্তিতঃ।" তত্ত্বসংগ্রহ, ৩২৮ ৩৩০।

কীরূপে নিত্য বলা যায়? সাখ্যমতে যেমন পরিণাম-নিত্যতা স্বীকৃত হয়, এখানে সেইরূপ সন্তান-নিত্যতা ধরা হইয়াছে কি? জ্ঞানসিদ্ধির পূর্বোদ্ধৃত বচন[৩২] ইহা সমর্থন করিতে পারে।[৩৩]

ইহাই যদি হয়, তবে বেদান্তী ও বিজ্ঞানবাদীর ভেদ কোথায়?[৩৪]

কিন্তু লঙ্কাবতারেও (পৃ. ১৫৭) বলা হইয়াছে, জ্ঞানের উৎপত্তিও নাই, ধ্বংসও নাই—"অনুৎপন্নপ্রধ্বংসি জ্ঞানম্।"

৩২। ৩০শ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩৩। এ স্থলে জয়ন্ত ভট্টের (ন্যায়মঞ্জরী, বিজয়নগর সংস্কৃত গ্রন্থমালা, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬৪) কথা মনে হয়:—

"অথাপি নিত্যং পরমার্থসন্তং
সন্তাননামানমুপৈষি ভাবম্।
উত্তিষ্ঠ ভিক্ষো ফলিতাস্তবাশাঃ
সোঽয়ং সমাপ্তঃ ক্ষণভঙ্গবাদঃ।

৩৪। কিন্তু একটা কথা বলিবার আছে। মাধ্যমিকই হউন আর যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীই হউন, বৌদ্ধেরা হইতেছেন মধ্যম পথের পথিক। ইহারা কেহই কিছুকে নিত্যও বলিতে পারেন না, উচ্ছিন্নও বলিতে পারেন না ("শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিত")। দ্রষ্টব্য—(লঙ্কাবতার, ৩.৬৫):—

"চিত্তমাত্রং ন দৃশ্যোঽস্তি দ্বিধা চিত্তং প্রবর্ততে।
গ্রাহ্যগ্রাহকভাবেন শাশ্বতোচ্ছেদবর্জিতম্।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালী-সমাজের সমস্যা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এদেশে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বাঙালীর সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—প্রথম, মোটামুটি ১৭৫৬ হইতে ১৮১৫ সন; দ্বিতীয়, ১৮১৫ হইতে ১৮৫০ সন; ও তৃতীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ। এই তিন যুগের মধ্যে প্রথমটি ইংরেজের সহিত বাঙালীর বৈষয়িক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাল; দ্বিতীয়টি ইংরেজী শিক্ষার কাল; ও তৃতীয়টি ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সমাজ সংস্কারের কাল। একটু ঘুরাইয়া বলা চলে, প্রথম যুগে বাঙালীর সহিত ইংরেজের ব্যবসা ও চাকুরীগত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; দ্বিতীয় যুগে প্রধানতঃ এই চাকুরী করিবার জন্য বাঙালী ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে; ও তৃতীয় যুগে এই শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাঙালী সমাজে পুরাতন ধর্ম্ম ও দেশাচারকে সংস্কার করিবার চেষ্টা দেখা দেয়। কিন্তু মুখ্য কার্য্যকলাপ যাহাই হউক, এই তিন যুগেই বাঙালীর জীবনে দুইটি ধারার সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। উহার একটি ইউরোপীয় প্রভাব, অপরটি দেশের প্রাচীন আচার ও বিশ্বাস। এই দুইটি জিনিষের সংস্পর্শ ও মিলনের ইতিহাসই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর প্রকৃত ইতিহাস।

তবু যুগভেদে এই মিলনের প্রকৃতিভেদ আছে। প্রথম যুগে, অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশ-পনর বৎসর পর্য্যন্ত বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর সূত্রে ইংরেজ শাসনতন্ত্রের সহিত ক্রমেই আরও বেশী জড়িত হইয়া পড়িতেছিল সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান বা রাষ্ট্রীয় চিন্তার দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয় নাই। উহার প্রধান কারণ অবশ্য ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের অভাব। সে যুগের বাঙালীর ইংরেজী জ্ঞান কাজ চালাইবার মত মাত্র ছিল, সুতরাং ছোটখাট বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে ইংরেজের অনুকরণ করিলেও উহারা পাশ্চাত্য চিন্তাধারার দ্বারা গভীর-ভাবে অনুপ্রাণিত হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙালী শুধু ইংরেজের চাকুরীই নয়, ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারাও গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসে যে দ্বিতীয় যুগের কথা বলিয়াছি, তাহার সূত্রপাত হইল।

বাঙালীর জীবনে ও চিন্তাধারায় এই নূতন যুগ প্রবর্ত্তনের তারিখ আমি ১৮১৫ সন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, ইহা একটা স্থূল হিসাব। কোন সামাজিক পরিবর্ত্তনই একটা নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্তে আরম্ভ হয় না। তবু তিনটি ঘটনার

জন্য বাঙালীর ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগ ১৮১৫ হইতে ১৮১৮ সনের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছে বলিলে অন্যায় হইবে না। উহাদের একটি রামমোহন রায় কর্তৃক ধর্ম্মান্দোলন প্রবর্ত্তন, অপর দুইটি হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠা ও প্রথম বাংলা সংবাদ-পত্র প্রকাশ। এই তিনটি ঘটনার সহিত বাঙালীর জীবনে একটা নূতন ধারা দেখা দেয়। কিছু কিছু প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন হইলেও সেই ধারা আজও চলিতেছে। এই সমগ্র ইতিহাস বিবৃত করিবার স্থান বা কাল এই প্রবন্ধ নয়। সেজন্য আজ আমি শুধু সামাজিক ও নৈতিক জীবনের নানা প্রশ্ন লইয়া এই যুগের প্রারম্ভে বাঙালীর মনে যে-সব প্রশ্ন দেখা দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দিব।

* * *

প্রথমেই বলা প্রয়োজন, এই পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন সে-যুগের বাংলা সাময়িক-পত্র। বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার মনে বাংলা সাময়িক-পত্রের একখানি ইতিহাস সঙ্কলন করিবার সংকল্প জাগে। এই উদ্দেশ্যে আমি পুরাতন বাংলা পত্রিকার সন্ধান লইতে আরম্ভ করি; কিন্তু এই অন্বেষণ কিছু দূর অগ্রসর হইতে-না-হইতেই আমি বুঝিতে পারিলাম, সাময়িক-পত্রের ইতিহাসের জন্য যে যে তথ্যের প্রয়োজন, তাহা ছাড়া আরও বহু ঐতিহাসিক উপকরণ এই সকল পত্রিকার মধ্যে বিস্মৃত, অনাদৃত ও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ইহাদের সাহায্যে বাংলায় অতি সুন্দর একখানি সামাজিক ইতিহাস রচিত হইতে পারে; অথচ সাময়িক-পত্রগুলি এরূপ জীর্ণ অবস্থায় আছে যে, শীঘ্র এই সকল তথ্য উদ্ধার না করিলে উহাদের চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমার মনে এই আশঙ্কা উদয় হওয়ার ফলেই 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' শীর্ষক তিন খণ্ড পুস্তক প্রকাশ। এই গ্রন্থে আমি সে-যুগের সামাজিক বা সংস্কৃতিমূলক ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করি নাই, মাল-মশলা ধরিয়া দিয়াছি মাত্র। এই মাল-মশলার সাহায্যে যোগ্যতর ঐতিহাসিকেরা সে-যুগের চিত্র অঙ্কন করিবেন, এই আমার আশা। আজ আমি কয়েকটি সূত্র ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালীর মনে যে-প্রশ্ন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল, সে-প্রশ্ন শিক্ষার। মুসলমান-যুগে বহু বাঙালী ফার্সী শিখিয়া নবাব-সরকারে কাজ করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যখন বাংলা দেশে মুসলমান আধিপত্যের অবসান হইল, তখন এই সকল চাকুরীজীবী বাঙালী স্বভাবতই ফার্সী শিক্ষা ছাড়িয়া ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন ও নূতন ভাষা আয়ত্ত করিয়া ইংরেজের চাকুরী লইতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপারটা প্রথমে খুব উৎসাহের সহিত চলিতেছিল; কারণ, ইংরেজী শিক্ষা পাইলে চাকুরী পাওয়া যাইবে, এই লাভের কথাই লোকের মনে প্রথমে জাগিয়াছিল; উহার ফলে যে একটা সামাজিক ধর্ম্মবিপ্লবের সূত্রপাত হইতে পারে, সে আশঙ্কা তাহাদের মনে একেবারেই হয় নাই।

কিন্তু হিন্দু-কলেজ স্থাপনের পর হইতে ইংরেজী শিক্ষার বৈষয়িক ভিন্ন অন্য ফলও দেখা দিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনপন্থীদের মনে একটা ভয় হইল,—ইহার ফলে বাঙালী জাতি সনাতন আচার ও ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে না ত? তদানীন্তন সমাজের রক্ষণশীল-সম্প্রদায় এই সম্ভাবনার চিহ্ন চারি দিকে সুস্পষ্ট দেখিয়া 'ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল' বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ তুলিলেন। তাঁহাদের মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতিতে এই বিষয়ে পত্র ও মন্তব্য প্রকাশিত হইতে লাগিল। ৬ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখে হিন্দু-কলেজের এক ছাত্রের পিতা লিখিলেন :—

> শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়েষু। আমি বিদেশী মনুষ্য এই শহরে বিষয় কর্ম্ম করি শুনিলাম হিন্দুকালেজনামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চ্চা ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয় আর বড়২ সাহেবেরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন কৃতবিদ্যা হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম্ম হইতে পারে ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া আপন বালককে দেশহইতে আনিয়া ঐ কালেজে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি…।
>
> আপন বিষয়ানুসারে পুত্রকে উত্তম পোষাক দিলাম প্রতি দিন প্রাতে আহার করাইয়া পাঠশালায় পাঠাই সন্তানটি শান্ত ও বশীভূত ছিল চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় বলিতে কি আমি নির্দ্ধন মনুষ্য পুত্রটি ঘরের কর্ম্ম কখন২ দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত কিন্তু কিছু কালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল পরে দেশের রীত্যনুসারে আচার ব্যবহার ও পোষাক ত্যাগ করিলেক অর্থাৎ চুল কাটা সাপাতু জুতাধারি মালাহীন স্নানবিহীন প্রাপ্তমাত্রই ভোজন করে শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান জাতির বিষয় অভিমানত্যাগী উপদেশ কথা হইলেই Nonsence কহে ইত্যাদি ব্যবহারদৃষ্টে মনেং ভাবিলাম যে পুত্রের পুত্রত্ব হইবার লক্ষণ বটে ভাল বিদ্যাবিষয়ে কি হইয়াছে জানিব এজন্যে পাঠশালার অন্য পড়ুয়ার এবং মাষ্টরের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে জানিলাম যে ছেলে ইঙ্গরেজী অঙ্ক গণিত শাস্ত্র ক্ষেত্রপরিমাণবিদ্যা বিলাতের পুরাতন রাজারদিগের উপাখ্যান ভূগোল খগোল ইতিহাসইত্যাদি পড়ে সপ্তাহে তিন দিন লেক্চর শুণেন অর্থাৎ আগুণকে জল করে জলকে বাতাস করে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ দেখায় পাঠান্তে কোন দিন ধর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞান শাস্ত্র পড়ে আর বার রাত্রিতে সভা করিয়া বিচার করে চড়২ করিয়া টানাকলমে ইঙ্গরেজী লেখে মধ্যে২ তরজমাও করে ইহাতে বলি ভাল ছেলেটি অবশীভূত অদম্য হইল কিন্তু অনেক শাস্ত্র জানিতেছে পরে লেখার তজবীজ করিলাম অতি কদক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না যে তরজমা করে তাহার বাঙ্গলা বুঝা যায় না পাঁচটা অঙ্ক ঠিক দিতে পারে না কসামাজা জানে না নিমন্ত্রণপত্র কিম্বা বাজারের চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করে Nonsence ইত্যাদি অর্থাৎ লিখন কার্য্য Drudgery নীচ লোকের কর্ম্ম সুন্দর অক্ষর লেখা Painting অর্থাৎ চিত্র করা তাহাতে আবশ্যক নাই পণ্ডিত হইলে কদর্য্য অক্ষরই লেখে অপর কহে হিসাব করা নীচবৃত্তি এই প্রকার নানা বিষয়ে অভিমানী হইল পুত্রটি স্বজাতীয় স্বদেশীয় লোকের সভায় যাইতে চাহে না এ সকলহইতে দূরে থাকিতে নিয়ত চেষ্টা করে আমার নিকটে আসিয়া বসিতে

চাহে না কারণ আমি ইঙ্গরেজী ভাল জানি না কিন্তু মূর্খ নহি যাহা জানি তদ্দারা ধনোপার্জন করিয়া কালযাপন করিতেছি সে যাহা হউক সংপ্রতি ঐ সন্তানকে দেশানুসারে পোষাক দিলে কহে আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্ত্তনের পাইল নহি যে এমত পোষাক পরিব বলে আমি মোজা ওয়াকিংশুজ ও ইজারআদি চাহি তাহা কোথা পাইবে সুতরাং এজন্য কোথাও যায় না মনে করিলাম ছেলেটির বিদ্যাতে বিদ্যার মত হইল ভাল অন্য২ বালকের কি রীতি ইহা জানা উচিত পরে দেখিলাম আমার বাচ্চার রীতি অন্যহইতে নূতন নহে উপর উক্ত লক্ষণ সকলি আছে অধিকন্তু যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে চোর ও ডাকাইত গরু বলে পিতা পিতৃব্যদিগকে নির্ব্বোধ কহে মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায় ইহারা কেহ নাস্তিক কেহ বা চার্ব্বাক কেহ এক আত্মবাদী কেহ বা দ্বৈত্যবাদী নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেষী যাহা ভাল বোধ হয় সেই গ্রাহ্য ইঙ্গরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি বিষয় কর্ম্ম আর অন্য প্রকরণে সুস্তি এবং অমনোযোগী দীর্ঘসূত্রী কিন্তু যখন হাঁটে ইঙ্গরেজদের মত মস২ করিয়া দ্রুত চলে স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়ে দ্বেষ করে ইহারদিগের বাঙ্গলা কথার ধারা একপ্রকার অর্থাৎ ইঙ্গরেজীর মত তরজমা পরন্তু রুসদেশে কোন স্থানে কোন নদীপর্ব্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে পারে কিন্তু স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না বর্দ্ধমান কলিকাতার কোন্‌দিগে শোণ নদী ও রাজমহলের পর্ব্বত কোথা তাহা জানে না স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়েতেই অনভিজ্ঞ এবং প্রায় সকল ছেলেগুলি একগুঁয়ে অবশ অধৈর্য্য এবং অনেক বিষয়ে বিপরীত ইহারা স্থানে২ সভা করিয়াছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রাজনিয়মের বিবেচনা করে এই সকল দেখিয়া পুত্রের কালেজে যাওয়া রহিতকরণের চেষ্টা করিলাম কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে না পরে মাসিক বন্দ করিলাম এইক্ষণে ছেলে লইয়া যে উৎপাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবশ্যক হয় পশ্চাৎ লিখিয়া জানাইব…। হিন্দুকালেজচ্ছাত্রস্য পিতুঃ।

ইহার কয়েক মাস পরে 'চন্দ্রিকা'-সম্পাদক নিজে লিখিলেন :—

…কোম্পানি বাহাদুরের এবং তৎসম্পর্কীয় মহাশয়দিগের আনুকূল্যে বালক সকল নানা বিদ্যার অভ্যাস ও আলোচনাদ্বারা মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক ইহা নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল। নানা বিদ্যাদ্বারা রাজকীয় ও বাণিজ্য ইত্যাদি কর্ম্ম করিয়া ধন উপার্জ্জন করণপূর্ব্বক ধর্ম্মকর্ম্ম করত সুখে কালযাপন করিতে পারিবেক ভরসা ছিল ভাগ্যহেতু ধন উপার্জ্জন করা দূরে গিয়া অধর্ম্মে প্রবৃত্ত এবং নাস্তিক হইয়া উঠিল তাহারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা দূরে থাকুক এবং জীবৎ পিতা মাতাকে আহারাদি দেওয়া [দূরে] থাকুক মান্যও করে না কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে মনোযোগ করেন না বরঞ্চ বুঝা যায় তাহাতে বাতাস আছে অতএব হিন্দুদিগের ভাগ্য অতি মন্দ বুঝিতেছি কি জানি ইহার পর আর বা কি হয় কেননা এক্ষণে শুনিতেছি কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার মেয়াদ অত্যল্প কাল আছে ইহার পর ইহাঁরা আর পাইবেন না আমরা এখনি প্রায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধরম্ রাখ্২ ডাক ছাড়িতেছি পরে কি হয় তাহা কে জানে এক্ষণে মা গঙ্গা কৃপা না করিলে আর নিস্তার নাই।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ২৬ এপ্রিল ১৮৩১।

এই মন্তব্য প্রকাশের দিন-কুড়ি পরে 'সংবাদ প্রভাকরে' এই পত্রটি প্রকাশিত হইল :—

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত সম্বাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় কল্যাণবরেষু।—কতিপয় দিবস গত হইল কলিকাতার এক জন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনানন্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল যথা গুড্ মার্ণিং ম্যডম্ ইহা শ্রবণে অনেকেই শ্রবণে হস্ত দিয়া পলায়ন করিবায় তাহার পিতা তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হওয়ায় কোন ভদ্র ব্যক্তি নিবারণ করিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও এস্থানে রাগ প্রকাশ করা উচিত নয় তাহাতে ঐ ব্যলীকের পিতা আক্ষেপ করিয়া কহিল ওরে আমি কি ঝকমারি কর্য়ে তোরে হিন্দুকালেজে দিয়াছিলাম যে তোর জন্যে আমার জাতি মান সমুদায় গেল মহাশয় গো এই কুসন্তানের নিমিত্তে আমি একঘর্য়ে হইয়াছি ধর্ম্মসভায় যাইতে পারি না এই সকল খেদোক্তি শুনিয়া অনেকেই সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী বড় মানুস হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষতা করেন তবে কেন ছেলেরদের এমন কুব্যবহার হয় মহাশয় গো বাঙ্গালী বড় মানুষের গুণের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না দেখুন দেখি ঘরের টাকা দিয়া কেমন ভাবলোকের পরকাল টণ্টনে করিতেছেন অতএব আমারদের বাঙ্গালী বাবুরদের গুণের কথা কত কব ইতি। কস্যচিৎ কালীকিঙ্করস্য।—১৪ মে ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

হিন্দু-কলেজের শিক্ষায় বালকেরা নাস্তিক হইতেছে দেখিয়া আর এক জন লিখিলেন :—

পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন লোকের বিষয় কর্ম্মের এবং অন্যান্য সুখ ইচ্ছা রাগ রঙ্গাদির চেষ্টা সম্প্রতি কএক বৎসরাবধি প্রায় রহিত হইয়াছে ইহাতে প্রায় তাবৎ সংসারেই অসুখের সম্বাদ পাওয়া যায় ইহাতে ঐ নাস্তিক পশুদিগের সংবাদে এমনি বোধ হয় যেমন অস্ত্রাঘাতে হইয়াছে যে ক্ষত তাহাকে লবণাক্ত করা হয় এক্ষণে এই বিষয়ের গোল নিবৃত্ত হইলে আপাতত কিঞ্চিৎ জ্বালা নিবারণ হয় এ গোল নিবারণ করা রাজা ভিন্ন কাহার সাধ্য নহে যেহেতু যদ্যপি রাজাজ্ঞাক্রমে পূর্ব্ববৎ জাতিমালার এক কাছারি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের উপর ভারার্পণ করেন যে ভাবলোক আপন২ আচার ব্যবহার ধর্ম্ম যাজন না করিলে দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক এই আজ্ঞা প্রকাশ হইলেই ঐ ব্যলীকেরা তৎ পর দিবসেই ব্রাহ্মণ দেখিয়া কহিবেক ঠাকুর মহাশয় প্রণাম করি দশ জনের সাক্ষাৎ জিজ্ঞন হইলে অর্থাৎ হাই উঠিলে রাধাকৃষ্ণ রামনারায়ণ গোবিন্দ কালী দুর্গা ইত্যাদি নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গুলি ধ্বনি করিয়া আস্তিকতা জানাইবেক কেহবা কোশা লইয়া প্রাতঃস্নানে যাইবেক কেহ তুলসী মালা ধারণ করিয়া সর্ব্বদা হরিবোল২ বলিবেক অতএব প্রার্থনা যে শ্রীযুত গবরনর বাহাদুর এই হুকুম জারি করিয়া আমারদিগের জাতি ধর্ম্ম রক্ষা করণ পূর্ব্বক পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হউন এবং ব্যলীক ব্যাটারদিগের তামাসা দেখুন।—'সমাচার চন্দ্রিকা', ৯ মে, ১৮৩১।

কিন্তু এই সকল নিন্দা সত্ত্বেও যুবকবৃন্দ ভিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মধ্যেও সে-যুগে হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের পক্ষ সমর্থন করিবার লোকের একান্ত অভাব ছিল না। তাঁহাদের এক জন 'সমাচার দর্পণে' লিখিলেন :—

…হিন্দুকালেজনামক যে বিদ্যালয় কএক বৎসরাবধি এদেশে স্থাপিত হওয়াতে সর্ব্বসাধারণের যে উপকার হইতেছে বিশেষতঃ যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের সন্তানদিগের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যে মহোপকার হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা ভদ্র লোকের অবিদিত কি আছে কিন্তু চন্দ্রিকাকার তদ্বিষয়ে নিতান্ত অসুখী তিনি যে কালেজস্থ অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগের অল্প২ দোষে তাহারদিগের প্রতি নানা দোষারোপ করিয়া চন্দ্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন ইহাতেই ব্যক্ত হইতেছে যে তিনি উক্ত কালেজের বিপক্ষ কিন্তু তাঁহার এতাদৃশ বিপক্ষতার কি তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারি নাই।…যাহা হউক এক্ষণে আমি চন্দ্রিকাকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হওনের পূর্ব্বে কি হিন্দু বালকদিগের কখন কোন কদাচার হইত না কেবল বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি তাঁহারা সহস্র অপবাধে অপরাধী হইয়াছেন। কালেজ স্থাপিত হওনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কয়েক জন বাঁকা বাবুরা তাঁহারদিগের স্ব২ পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক ধনাধিকারী হইয়া ধনযৌবন এবং মূর্খতাপ্রযুক্ত মদ্যপান এবং যবনীগমনাদি কোন্২ অবৈধ কর্ম্ম না করিয়াছেন এবং পৈতৃক ধন কিং২রূপ অসদ্ব্যয়ে না নষ্ট করিয়াছেন উক্ত বাঁকা বাবুদিগের নাম লিখিবার আবশ্যক নাই কিন্তু উক্ত বাঁকা বাবুরা উক্ত কালেজের নাম কখন কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন কি না আমরা বলিতে পারি না বিশেষতঃ পূর্ব্বে এই রাজধানীতে কএকটা দল হইয়াছিল তদ্বিশেষ। গাঁজাখুরী ঝকমারি সবলোটইত্যাদি তৎকালে বিদ্যার অপ্রাচুর্য্যহেতুক ভদ্রলোকের সন্তানেরা উপরের লিখিত দলসকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন্২ অসৎকর্ম্ম না করিয়াছেন এবং কিং২রূপে তাঁহারদিগের পিতৃমাতৃপ্রভৃতি অমাত্যগণদিগকে মনঃপীড়া না দিয়াছেন ইহা কি চন্দ্রিকাকার জ্ঞাত নহেন। শুনিয়াছি নববাবুবিলাসনামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ কএক বৎসর পূর্ব্বে কোন মহাশয়কর্ত্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কি চন্দ্রিকাকার ভ্রমেও পাঠ করেন নাই কেবল ক্রোধান্বিত হইয়া অল্পবয়স্ক কালেজের ছাত্রদিগের উপর প্রাণপণে আক্রমণ করিয়াছেন। উক্ত কালেজে যাঁহারা২ বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন বা করিতেছেন তাঁহারা কি সকলেই মন্দ সর্ব্বত্র তিন প্রকার মনুষ্য শাস্ত্রে বলেন যথা সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ এ বচনের তাৎপর্য্য কি চন্দ্রিকাকার মহাশয়ের মনে কখন উপস্থিত হয় না। তণ্ডুলাদি ভক্ষ্য দ্রব্য কিরূপে সুলভ হয় ইহার উপায় চেষ্টা আবশ্যক বটে কিন্তু শস্যাদির সুলভত্ব এবং দুর্ল্লভত্ব জগদীশ্বরের হস্তগত তবে ভূমিরোপণাদিতে মনুষ্যের কিঞ্চিৎ উদ্যোগাবশ্যকমাত্র কিন্তু পূর্ব্বজন্মার্জিতা বিদ্যাঃ পূর্ব্বজন্মার্জিতং ধনং ইত্যাদি বচনসত্ত্বেও বহুকষ্টে বিদ্যোপার্জ্জন হয় এবং বিদ্যাধনকে মহাধন শাস্ত্রে বলিয়াছেন যথা বিদ্যারত্নং মহাধনংইত্যাদি অতএব যখন বিদ্যারূপ যে মহারত্ন তাহার মূলোৎপাটনের চেষ্টায় চন্দ্রিকাকার মহাশয় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন তাঁহাকে দেশের ক্ষতিকারক ভিন্ন আর কি বলিব ভারতবর্ষে ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের অধিকার হওয়াতে তৎস্থানস্থদিগের

ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে হিন্দুকালেজ স্থাপনের পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তানদিগের মধ্যে কেহ২ বহুশ্রম এবং ব্যয়পূর্ব্বক ইঙ্গরেজী শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা স্বীকার করেন যে উক্ত কালেজের ছাত্রেরা অল্প দিবসের মধ্যে স্বল্পায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যায় যেরূপ পারগ হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি অতএব কালেজ স্থাপন হওয়াতে কি দোষ। এইক্ষণে পরমেশ্বরের কৃপায় এবং বিজ্ঞোত্তম ও অতিধার্ম্মিক ইংগ্লণ্ডীয় মহাশয়দিগের সদ্বিবেচনার দ্বারা এতদ্দেশে হিন্দুকালেজপ্রভৃতি কএকটা পাঠশালা স্থাপিত হওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না বরং হিন্দু বালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছেন এবং তদ্দৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।—২২ জানুয়ারি ১৮৩১।

কিন্তু নানা আপত্তি সত্ত্বেও ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও প্রতিপত্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশের অন্যান্য আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে লোকের মনে অসহিষ্ণুতা জন্মিতে লাগিল। এই সকল অপ্রচলিত প্রথার মধ্যে সতীদাহের কথা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু সে-যুগে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন একমাত্র সতীদাহতেই আবদ্ধ থাকে নাই। তখন কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বাংলা দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে—বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে—খুব চলিত। এই কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ব্বেও দেশের লোকের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮৩১ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণে' কৌলীন্যের অত্যাচার সম্বন্ধে এই পত্রটি প্রকাশিত হয়:—

বহুগুণান্বিত শ্রীযুক্ত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় মহোদয়েষু। এদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের অত্যন্নুপযুক্ত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধরূপে প্রাধান্য থাকাতে দেশের প্রতুল নাই উক্ত বিষয় রাজশাসনাভাবে প্রায় এতদ্দেশীয় সমস্ত লোকেরি পক্ষে অমঙ্গলদায়ক হইয়াছে বিশেষতঃ যাঁহারা যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণ তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা ক্লেশ পাইতেছেন তাহা লিখিয়া কত জানাইব। কুলীন মহাশয়দিগের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় অথবা বংশজ ব্রাহ্মণদিগের বিবাহ হওয়া অতি দুঃসাধ্য হইয়াছে যেহেতুক অর্থ ব্যয় ভিন্ন তৎকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া উঠে না সুতরাং যাঁহারা যোত্রহীন তাঁহারদিগের বিবাহ হওয়া ভার কত শত যোত্রহীন শ্রোত্রিয় এবং বংশজ ব্রাহ্মণ বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিয়া পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এবং এইক্ষণেও অনেকে ৩০।৪০।৫০ পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসরবয়স্ক হইয়া অবিবাহরূপে শোকে জরজর থরথর এবং মরমর হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারদিগের এ কাটামোতে আইবড় নাম ঘুচে কি না বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেরি ঘরে এই রীতি আছে যে তাঁহারদিগের ঘরের কন্যা সন্তানদিগের বিবাহ কুলীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারো সহিত দেন নাই ইহাতে তাঁহারদিগের অনেক ব্যয় করিতে হয় যেং কন্যাকে তাঁহারা পাত্রস্থা করেন ঐ২ কন্যার এবং সন্তানসন্ততি এবং তাহার স্বামীপ্রভৃতির ভরণপোষণ কন্যাকর্ত্তাকে আপন জীবদ্দশাপর্য্যন্ত যোড়শোপচারে করিতে হয় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশে যিনি যখন বাতি দিতে থাকেন তাঁহাকে তাহার আপন ভরণপোষণের ন্যূনতা করিয়াও উক্ত কুলীন মহাশয়ের ভরণপোষণ যথাসাধ্য-

ক্রমে করিতে হয়…। নবগুণবিশিষ্টত্ব কুলীন অর্থাৎ আচারো বিনয়ো বিদ্যা ইত্যাদি নয় গুণ কৌলীন্যের প্রসিদ্ধ লক্ষণ কিন্তু এইক্ষণে যে২ মহাশয়দিগকে কুলীন বলিয়া মান্য করা যায় তন্মধ্যে অনেকে উক্ত নবগুণ বর্জ্জিত বরং তাঁহারদিগকে নির্গুণ চূড়ামণি বলা যাইতে পারে কোন২ স্থানে এমত ঘটিয়াছে যে কোন২ কুলীন জামাতা আপন২ শ্বশুর প্রভৃতির প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রাত্রিমানে রাগভরে আপন২ পত্নীর সহ শয়নে থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে আপন নিদ্রিত পত্নীর গাত্রের সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদির আভরণ এবং পরিধেয় বস্ত্র অতি সাবধানপূর্ব্বক খুলিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছেন এবং আরো শুনা এবং দেখা গিয়াছে যে কোন২ কুলীন মহাশয়েরা রাগচ্ছলে আপন শ্বশুরের বাটীহইতে স্ব২ পত্নীকে আপন২ গৃহে আনয়নপূর্ব্বক ঐ২ কন্যার পিতৃদত্ত স্বর্ণাভরণাদি সমস্ত কাড়িয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া আপনারা মজা মারিয়াছেন এবং উক্ত কন্যারদিগকে নানামতে ক্লেশ দিয়াছেন পরে ঐ অভাগা কন্যারদিগের পিতৃ মাতৃ অথবা ভ্রাতৃপ্রভৃতিরা ঐ কন্যার ধড়ে প্রাণ থাকিতে২ তত্ত্বৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন মহাশয়দিগকে অর্থ দানদ্বারা এবং নানা স্তব বিনয়দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া চিকিৎসাদিদ্বারা উক্ত কন্যারদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন কিন্তু যে স্থলে উপযুক্ত সময়ে উক্ত কুলীন পাত্রস্থা কন্যা সন্তানদিগের তত্ত্বাবধারণ তত্তৎ পিতৃ বা ভ্রাতৃপ্রভৃতি দ্বারা না হয় সে স্থলে ঐ অভাগা কন্যাসন্তানাদির জীবনাবসান হওনের প্রতি কোন সন্দেহ থাকে না যেহেতুক কুলীন মহাশয়েরা আপন২ স্ত্রীপুত্রদিগের প্রতিপালন করাকে এমত কুকর্ম্ম জানেন যে তাঁহারদিগের পীড়িতা-বস্থাতেও তাঁহারদিগের চিকিৎসাবিষয়ে কোন চেষ্টা করেন না এবং এতদ্রূপ চেষ্টাকে আপন২ কৌলীন্যের হানিকারক জানেন…।

কৌলীন্য প্রথার জন্য দেশে অন্য যে-সকল অনাচার হইত, তাহা আমরা 'জ্ঞানান্বেষণে' প্রকাশিত আর একটি পত্র হইতে পাই। পত্রটি এইরূপ:—

…সম্পাদক মহাশয় এ দেশের কুলীন বংশজ ব্রাহ্মণেরাই জাতি লোপ করিয়াছেন তাহার কারণ আমি বিশেষ করিয়া বলি আপনি বিবেচনা করিবেন বংশজ ব্রাহ্মণেরা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন কিন্তু তাহাতে অনেক জাতির কন্যা চলিয়া যায় অধিক কি কহিব কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহকরণ ব্যবহার থাকাতে বংশজ ব্রাহ্মণ মোসলমানের কন্যা পর্য্যন্তও বিবাহ করিয়াছেন আমি ইহার কএক প্রমাণ লিখিতেছি।

১। এক সময়ে কন্যাবিক্রয়ি দুই ব্রাহ্মণ বর্দ্ধমান দিয়া আসিতেছিল তাহাতে পথিমধ্যে এক সুরূপা বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে ক্রয় করণার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরে তাহারদিগের অভিলাষ বুঝিয়া এক জবনী কহিল ব্রাহ্মণঠাকুর এইটি মোসলমানের কন্যা ইহার কেহ নাই শিশুকালাবধি আমি প্রতিপালন করিয়াছি তোমরা মোসলমানের কন্যাকে লইয়া কি করিবা তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিল ভাল সে কথা পরে সংপ্রতি তুমি দিবা কি না তাহা বল অনন্তর জবনীকে ছয় টাকা দিয়া কন্যাকে ক্রয় করিল এবং বাজারে আসিয়া একখানি শাড়ী কিনিয়া তাহাকে পরাইয়া লইয়া চলিল কিন্তু পথের মধ্যেই কুমারীকে শিক্ষা দিল কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিবে না পরে ঐ ধূর্ত্তেরা সন্ধ্যাকালে এক ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইল তাহার দুই মাস পূর্ব্বে গৃহস্থ ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ছিলেন সেই শোকের সময়ে

দিব্যাঙ্গনা দেখিয়া অতিথির নিকট ঘনাইয়া বসিলেন ঐ ব্রাহ্মণের সম্পত্তিও কিঞ্চিৎ ছিল অতএব বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মূল্যের ডাক আরম্ভ হইল বিক্রেতারা প্রথমতঃ পাঁচশত টাকা চাহিল কিন্তু শেষ চারিশত টাকা রফা হইলে তৎক্ষণাৎ টাকাগুলি গণিয়া লইয়া সেই রাত্রিতে বিবাহ দিল এবং পরদিবস প্রাতে উঠিয়া তাহারা প্রস্থান করিল অনন্তর গৃহী সকল জ্ঞাতি কুটুম্বাদিকে গৃহিণীর পাকান্ন ভোজন করাইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে লইয়া সুখভোগ করেন তাহার পরে এক দিবস লাউ পাক করিতে ঐ স্ত্রী অভ্যাস প্রযুক্ত হঠাৎ কহিয়া উঠিল যে "কদু ছে কেয়া ছালান হোগা" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের ভগিনী তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিল "ওমা শুন্ আসিয়া তোর বৌ কি বলিতেছে" তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিবাতে জবন কন্যা আপন জাতিকুলের সকল কথাই ভাঙ্গিয়া বলিয়া ফেলিল তাহাতে ব্রাহ্মণ চমৎকার ভাবিয়া স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেন।...

৪। ভাটপাড়াতেও এক ব্রাহ্মণ ক্রীত কন্যা বিবাহ করেন এবং বহুকাল সহবাস করিয়া শেষ জানিলেন পোদজাতীয় বৈষ্ণবের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছেন এতদ্ভিন্ন কলিকাতা শহরের মধ্যে এইরূপ স্ত্রী অনেক আছে আমি সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি ভারি২ পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান২ বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহারদিগের পুত্র পৌত্রাদির গৃহিণী সকল আছেন তাহারদিগের অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কপালিক কন্যা কিন্তু সম্পত্তিশালি ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহারদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।—১৭ জুন ১৮৩৭ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত।

এই একই মর্ম্মের আরও কয়েকটি আলোচনা দুই তিন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয় এবং প্রশ্ন উঠে, গবর্মেণ্ট কৌলীন্য প্রথা রহিত করিতে পারেন কি-না। এই বিষয়ে 'সমাচার দর্পণ' ৪ ডিসেম্বর ১৮৩০ তারিখে লেখেন :—

...এই কুব্যবহার কেবল বঙ্গদেশে প্রচলিত কিন্তু ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও লোকের সুখ বিরোধী এবং হিন্দুরা এই অনুমান করেন যে ভারতবর্ষের মধ্যে রাজাজ্ঞা ক্রমেতে যেমন এই নিয়ম স্থাপিত হয় তেমন বর্ত্তমান দেশাধিপতির আজ্ঞাতেও তাহা স্থগিত হইতে পারে। এবং এই কুব্যবহার যদি একেবারে লুপ্ত হয় তবে তাবৎ ব্রাহ্মণেরদের যেমত উপকার জন্মে বোধ হয় যে ঐহিক অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ উপকার প্রায় দৃষ্ট হয় না।

এবং বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা উক্ত বর্ত্তমান ব্যবহারেতে যে অনুপকার ও তদনুপকার যে উপায়েতে নিবৃত্তি হইতে পারে ইহার এক দরখাস্ত তথায় যদি গবর্ণমেণ্টে প্রদান করেন তবে ঐ দরখাস্ত তথায় যে সুগ্রাহ্য হইবে ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই।

গবর্মেণ্টের পক্ষে সামাজিক আচার-ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, এই আপত্তি আশঙ্কা করিয়া আর এক জন লেখেন :—

...যদি কেহ বলেন গবর্ণমেণ্ট কুলীনদিগের প্রাধান্য রহিতের কোন আইন প্রচলিত করিলে এতদ্দেশীয় অনেক মান্য লোকেরা মনঃপীড়া পাইবেন। উত্তর এতদ্রূপ মনঃপীড়াতে গবর্ণমেণ্টকে কোন পাপে ঠেকিতে হইবেক না যেহেতুক সান্নিপাতিক রোগী সদা সর্ব্বক্ষণ জল পান করিতে চাহে কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ রোগ ত্যাগ না করে সে পর্য্যন্ত তাহার চিকিৎসক কদাচ

তাহার এতদ্রূপ মনোরথ পূর্ণ করিতে সমর্থ হন না তৎপ্রযুক্ত উক্ত রোগী আপন চিকিৎসকের প্রতি নানা অভিশাপ করে এবং কটু উক্তি করে কিন্তু তাহাতে চিকিৎসকের কোন হানি হয় না···।—'সমাচার দর্পণ', ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১।

কৌলীন্য প্রথার জন্য শ্রেণীবিশেষের পুরুষের যে অসুবিধা হইতেছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্ট হইতেছিল স্ত্রীলোকদিগের। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষ হইতেও যে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে আপত্তি হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। স্ত্রীলোকদিগের এই সকল দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া সমসাময়িক পত্রিকায় অনেকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শুধু যে কৌলীন্য-প্রথার অত্যাচার সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়, তাহা নহে; স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা সকল দিক্ হইতে যাহাতে উন্নতি লাভ করে, তাহার জন্য আবেদন জানান হয়। ১৫ মার্চ ১৮৩৫ তারিখে "চুঁচুড়ানিবাসি স্ত্রীগণ" লেখেন :—

১। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয় তদ্রূপ আমারদের কি নিমিত্ত না হয়। আপনারা কি ইহা বুঝেন যে বিদ্যাধ্যয়ন করিলেই সাংসারিক নীতি ও ধর্ম্ম প্রতিপালন হইতে পারে না।

২। অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন। কি আমারদের স্বভাবপ্রযুক্ত কি আমারদের দেশে কোন বাধা আছে যে এমত ব্যবহার করা হইতে পারে। ফলতঃ প্রথমতঃ আপনারা অবিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যবহারে আসক্ত আছেন এইক্ষণে তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ।

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দয়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না। আপনারা কহেন যে আমারদের কুলধর্ম্ম ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতে হইবে এই নিমিত্ত কোন বিবেচনা করিয়া যাহারদের সঙ্গে আমারদের কখন কিছু জানা শুনা নাই এবং বিদ্যা কি রূপ ধনাদি কিছু নাই এমত পোড়া কপালিয়ারদের সঙ্গে কেবল ছাইর কুলের নিমিত্ত আমারদের বিবাহ দিতেছেন এবং যখন অতি বালিকা অর্থাৎ ৪।৫।১০।১২ বর্ষ বয়স্কা এমত অজ্ঞানাবস্থায় আমারদিগকে দান করিতেছেন সংসারের মধ্যে প্রবেশের কি এই উচিত সময়। ইহাতে কি কুফল হইতেছে তাহাও আপনারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। আমরা তাহার বিস্তার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া লোকের ঘৃণা জন্মাইব না যে ব্যাপারেতে আমারদের সুখ দুঃখের ক্ষতি বৃদ্ধি সেই কর্ম্মেতে যদি আমারদিগকে বিবেচনা করিতে ভার দিতেন তবে কি তাহাতে আপনারদের কুলের সম্ভ্রম ও আমারদের সুখের হানি হইত। ফলতঃ প্রার্থনা এই যে এই বিষয়ে আপনারা কেবল সাধারণ কর্তৃত্ব করেন আমারদের প্রতি মনোনীত করণের ভার থাকে।

৪। হে পিতঃ ও ভ্রাতরঃ আপনারা কেহ২ টাকা লইয়া আমারদিগকে বিবাহ দিতেছেন তাহাতে যাঁহারা মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমারদের স্বামী হন এবং আমরা তাঁহারদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্যা হই তাহাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা যদি আমারদিগকে স্ত্রীধন বলিয়া দেওয়া যাইত তবে সে স্বতন্ত্র কথা ছিল কিন্তু সেই সকল টাকা লইয়া

আপনারা নিজ ব্যয় করিতেছেন। অতএব ইহাতে আমারদিগকে জীবদ্দশাতে বিক্রয় করা হইতেছে। যদি আমারদের দেশের শাসনকর্ত্তা এই ঘৃণ্যব্যাপার সহিষ্ণুতা করেন তবে পাপ-ভাগী হইবেন কিন্তু পরমেশ্বর যে কতকাল সহিবেন তাহা কহা যায় না তিনি আপনারদের অপরাধ মার্জ্জন করুন।

৫। যাঁহারদের অনেক ভার্য্যা আছে তাঁহারদের সঙ্গে কেন আমারদের বিবাহ দিতেছেন। যাঁহার অনেক ভার্য্যা তিনি প্রত্যেক ভার্য্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্ত্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন।

৬। ভার্য্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামির মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই। এই স্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়। হে প্রিয় পিতঃ ও ভ্রাতৃবর্গ এই সকল বিষয়ে মনোমধ্যে যথার্থ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমারদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।

শুধু এই সকল গুরুতর বিষয়েই নয়, অন্যান্য সামান্য ব্যাপারেও সে যুগে সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। এই সকল ব্যাপারের মাত্র একটি উল্লেখ করিয়া আজিকার এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এই বিষয়টি বাংলা দেশে স্ত্রীলোকদের সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার। এ বিষয়ে এক ব্যক্তি 'সমাচার দর্পণে' লেখেন :—

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের পরিধেয় অতিসূক্ষ্ম এক বস্ত্রই সাধারণের ব্যবহার্য্য ইহা অনেক দোষাভাসের ও ভিন্নদেশীয় লোকেরও ঘৃণার্হ এবং নব্য ব্যবহারই অনুভব হয়। যেহেতুক পুরাণ কাব্যাদি শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্রের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় মহাশয়রা উত্তম সনাতন ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কদর্য্য নব্য ব্যবহার কেন গ্রহণ করিয়াছেন।

যেহেতুক বর্ত্তমান ব্যবহারে অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সর্ব্বাঙ্গাভাদর্শক বস্ত্রে স্ত্রীলোকের তাদৃশ সম্ভ্রম সম্ভবে না যাদৃশ উত্তরীয় তদুপরি সর্ব্বগাত্রাচ্ছাদন বসনে হয়। কিন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয়রা এতদবস্থা বিলক্ষণরূপ নিরীক্ষণ করিয়াও দৃষ্টিপাত করেন না। কেবল শক্ত্যনুসারে নানাভরণে স্ত্রীলোকদিগকে সুশোভিতা করিবার প্রযত্ন রাখেন। অথচ যে স্থলে স্বর্ণ মাণিক্য মুক্তাদি বহু-মুল্যাভরণ দিতেছেন সে স্থলে একখানি সূক্ষ্ম শাটী হদ্দ পাঁচ ছয় টাকা মূল্যের কি সুশোভিতা হয়। যদি বলেন শাটী বস্ত্র কি বহুমূল্যের হয় না। উত্তর যদ্যপিও হইয়া থাকে তথাপি এতদ্দেশীয় সাধারণ স্ত্রীলোকের পরিধান দৃষ্ট হয় না। তথাহি চন্দ্রিকাসম্পাদককৃত দূতীবিলাসে অনঙ্গমঞ্জরীর উত্তম বেশবর্ণনে। সুবর্ণের গোল মল পরিয়াছে পায়। পরেছে ঢাকাই শাড়ী অঙ্গ দেখা যায়। ইত্যাদি এ কি ভূষণানুযায়ি বসনের সুদৃশ্যতা হইয়াছিল। অতএব বিজ্ঞ মহাশয়রা এই ঘৃণিত ব্যবহার পরিবর্ত্তনে মনোযোগ করুন। যদি বলেন তোমার লিখনের অভিপ্রায় কি এই যে আপামর সাধারণ সকলই বহুমুল্যের বস্ত্র স্ত্রীলোককে প্রস্তুত করাইয়া দেউন ও শাটীবস্ত্রের ব্যবহার একদাই পরিত্যাগ হউক। উত্তর অস্মদভিপ্রেত তাহা নহে ফলতঃ যে ব্যক্তি যত মূল্যের অলঙ্কার স্ত্রীগণকে দিতে সুসমর্থ তিনি তদুপযুক্ত বস্ত্রও পরাইতে অবশ্য

ক্ষম বটেন। এবং পূজা রন্ধন ভোজনকালীন সাটী পরিধান হিন্দু স্ত্রীগণের আবশ্যক বটে তাহা পরুন। যদ্রূপ হিন্দুস্থানে ব্যবহার আছে। এতদ্দেশীয় বাবু ও জমীদার ও সেরেস্তাদার ও উকীল ইত্যাদি মহাশয়েরা জামা নিমা কাবা কোরতা অর্থাৎ হিন্দুস্থানীয় পরিচ্ছদ সম্ভ্রমার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্ব২ কুলাঙ্গনাদিগকে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদনার্থে লাঙ্গা উড়ানী ইত্যাদি বস্ত্র ব্যবহার করাইলে কদাচ দূষ্য হইতে পারে না। বরং সুদৃশ্যা ও সলজ্জিতা দৃষ্ট হইতে পারে। যদি বলেন এতদ্দেশমাত্রেই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যবহার একদা কিপ্রকার সম্ভাবনা। উত্তর তাহার এক সদুপায় সুলভ অনুভব আছে। অর্থাৎ কলিকাতাস্থ স্ত্রীগণ যাদৃশ পরিচ্ছদ ভূষণ ব্যবহার করেন তদ্রূপই ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়। তদ্বিস্তার এতদ্দেশীয় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলই বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন।—১ আগষ্ট ১৮৩৫।

১৮৫১ সনের ১৪ই জুন তারিখের 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রেও এই বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করা হয়:—

আমরা যে বিষয় নিবারণের জন্য অনেকবার লিখিয়াছি এবং আমারদিগের পত্রপ্রেরকেরা নানা প্রকার হেতুবাদ দর্শাইয়া যাহা পরিত্যাগ করণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে অনুরোধ করিয়াছেন অদ্যাপিও এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতে ঘৃণা বোধ করেন নাই. সে বিষয় এই যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহারে সবস্ত্র বিবস্ত্র প্রভেদ থাকে না শরীরাচ্ছাদন জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, যে বস্ত্র পরিধান করিলে সর্ব্বাঙ্গ দেখা যায় সে বস্ত্র পরিধানে প্রয়োজন কি, ইংরাজদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার প্রায় নাই, যবন জাতীয়েরাও সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন না, হিন্দুদিগেব মধ্যেও হিন্দুস্থানীয় লোকেরা সরু বস্ত্র পরেন না, কেবল বঙ্গ রাজ্যের মধ্যে সরু কাপড়ে স্ত্রী পুরুষ সাধারণ সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল, এই কারণ ঢাকা, চন্দ্রকোণা, শান্তিপুরাদি স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণারম্ভ হয় ঐ তিন স্থানীয় বস্ত্রেতেই বঙ্গদেশীয় পুরুষ পুরুষীগণ লম্পট লম্পটী হইয়া উঠিয়াছেন,...এতদ্দেশীয় মান্যবর মহাশয়গণ আপনারদিগের পরিবারাদির মধ্যে এই কুব্যবহার রাখিয়াছেন ইহাতে আমরা পূর্ব্বাপর আক্ষেপ করিয়া আসিতেছি এইক্ষণে শ্রবণে আনন্দিত হইলাম বর্দ্ধমানাধীশ্বর মহারাজা তাঁহার অধিকার হইতে সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার উঠাইয়া দিয়াছেন এবং ঘোষণা করিয়াছেন তাঁহার অধিকারে কেহ সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না, যদি করেন তবে দণ্ডযোগ্য হইবেন,...।

সে-যুগের বাঙালীর সম্মুখে যে-সকল সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটির পরিচয় এই প্রবন্ধে দেওয়া হইল। সমসাময়িক সংবাদপত্রে ও পুস্তকে এই ধরণের আরও বহু সমস্যা ও প্রশ্নের সন্ধান মিলে। সেগুলি একত্র করিয়া বিগত যুগের বাঙালী সমাজের চিত্র কেহ সম্পূর্ণ করিলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।*

* ৮ ফাল্গুন ১৩৪৩ তারিখে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামপ্রাণ গুপ্ত-স্বর্ণপদক-বিতরণ সভায় পঠিত।

মহাভারতের কয়েকটি টীকাকার

শ্রীসুশীলকুমার দে, এম-এ, ডি-লিট

মহাভারতের যে বিংশাধিক টীকা সমগ্র বা অসমগ্রভাবে পাওয়া যায়, তাহাদের অতি অল্পসংখ্যকই মুদ্রিত বা প্রচলিত হইয়াছে। ব্যাখ্যা হিসাবে ইহাদের যাহাই মূল্য হউক না কেন, ইহাদের অধিকাংশই মহাভারতের বর্ত্তমান পুঁথিগুলির অপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং, যে সকল পাঠ বা পাঠান্তর এই টীকাগুলিতে ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মূল্য অস্বীকার করা যায় না, এবং মূলের প্রাচীন পাঠ উদ্ধার করিতে হইলে এই সকল পাঠের বিচার নিতান্ত আবশ্যক।

মহাভারতের যথেষ্ট অনুশীলন হইলেও, এই দিক্ হইতে টীকাগুলির যথাযোগ্য চর্চ্চা বা আলোচনা হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না। নীলকণ্ঠের সুপ্রসিদ্ধ টীকা ভিন্ন, অন্য টীকা-গ্রন্থগুলি দুষ্প্রাপ্য; এবং যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাদের পরীক্ষা প্রয়োজন, তাহা এ পর্য্যন্ত হয় নাই বলিলেই হয়। ১৮৯৭ সালে হোল্‌টস্‌মান[১] প্রথম এই টীকাগুলির একটি বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, কিন্তু তৎকালে ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সম্প্রতি পুনা প্রাচ্যবিদ্যাসংশোধক মন্দির হইতে মহাভারতের যে বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে,[২] তাহাতে অনেকগুলি টীকাকারের উল্লেখযোগ্য পাঠ যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ হইতেছে। উক্ত সংস্করণের প্রধান সম্পাদক, ডক্টর বিষ্ণু সীতারাম সুকৃথঙ্কর, তৎসম্পাদিত আদিপর্ব্বের ভূমিকায়, এবং পরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় প্রকাশিত Notes on the Mahābhārata Commentators[৩] শীর্ষক প্রবন্ধে, কতকগুলি প্রসিদ্ধ টীকাকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত সংস্করণের উদ্যোগপর্ব্বের ভূমিকাতেও বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল উপকরণ হইতে বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচিত হইল; আশা করা যায়, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে এই টীকাগুলির আরও বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হইবে।

---

১ Holtzmann, *Das Mahābhārata,* Kiel 1894, vol. 3, pp. 87f.

২ এ পর্য্যন্ত সুকৃথঙ্কর-সম্পাদিত আদিপর্ব্ব (১৯২৭-৩৩), রঘুবীর-সম্পাদিত বিরাটপর্ব্ব (১৯৩৬) ও বর্ত্তমান লেখক-সম্পাদিত উদ্যোগপর্ব্ব (১৯৩৮-৩৯) প্রকাশিত হইয়াছে। বনপর্ব্ব ছাপা হইতেছে; সভাপর্ব্বের সম্পাদনা প্রায় শেষ হইয়াছে এবং ভীষ্মপর্ব্বের সম্পাদনা আরম্ভ হইয়াছে। এই শেষোক্ত তিনটি পর্ব্বের ভার যথাক্রমে সুকৃথঙ্কর, এড্‌জারটন ও বেল্‌ভাল্‌কর লইয়াছেন।

৩ *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute,* xvii, 1936, pp. 185-202.

মহাভারতের যে কয়জন টীকাকারের নাম জানা যায়, তাঁহাদের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—অনন্তভট্ট, অর্জ্জুনমিশ্র, আনন্দ, কণ্ঠাভরণ, চতুর্ভুজমিশ্র, জগদীশ চক্রবর্ত্তী, দেববোধ, নীলকণ্ঠ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, মহানন্দপূর্ণ, যজ্ঞনারায়ণ, রত্নগর্ভ, রামকিঙ্কর, রামকৃষ্ণ, রামানুজ, লক্ষ্মণ, বরদ, বাদিরাজ, বিদ্যাসাগর, বিমলবোধ, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীনিবাস, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ ও স্বষ্টিধর। ইহাদের সকলেই সমগ্র মহাভারতের উপর টীকা লিখিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না; কারণ, অনেকেরই টীকা কোন কোন পর্ব্বের উপর অথবা অসম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহারা যে-মূলের উপর টীকা করিয়াছেন, তাহা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে প্রচলিত, এবং ইহাদের ধৃত প্রাদেশিক পাঠগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। দু-একটি টীকাকারকে বাদ দিলে, ইহাদের তারিখ বা অন্যান্য বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, এবং সকলের টীকাও আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে মুদ্রিত হয় নাই। সমগ্র মহাভারতের উপর একমাত্র নীলকণ্ঠেরই ধারাবাহিক টীকা এখন পাওয়া যায়, এবং ইহা সমগ্রভাবে মুদ্রিতও হইয়াছে।

পুনা সংস্করণের বিভিন্ন প্রকাশিত পর্ব্বে যে সকল টীকা হইতে উল্লেখযোগ্য পাঠ গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের রচয়িতার নাম যথাক্রমে এইরূপ :—

আদিপর্ব্বে—দেববোধ, অর্জ্জুনমিশ্র, রত্নগর্ভ ও নীলকণ্ঠ। [ইহাদের মধ্যে একমাত্র নীলকণ্ঠের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে]।[৪]

বিরাটপর্ব্বে—সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ, অর্জ্জুনমিশ্র, চতুর্ভুজমিশ্র, নীলকণ্ঠ, রামকৃষ্ণ ও বিষম-পদবিবরণ-রচয়িতা কোনও অজ্ঞাত টীকাকার। [এই টীকাগুলি মহাদেব গঙ্গাধর ভট্ট বাক্রে সম্পাদিত বিরাটপর্ব্বের সংস্করণে, গুজরাতি প্রিন্টিং প্রেস, বোম্বাই হইতে ১৯১৫ সালে মুদ্রিত হইয়াছে]।

উদ্যোগপর্ব্বে—দেববোধ, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ, অর্জ্জুনমিশ্র, শঙ্করাচার্য্য (কেবল সনৎসুজাত পর্ব্ব) এবং নীলকণ্ঠ। [দেববোধের টীকা ভিন্ন, অন্য টীকাগুলি উক্ত বোম্বাই সংস্করণের উদ্যোগপর্ব্বে ১৯২০ সালে মুদ্রিত হইয়াছে]।

ইহা ভিন্ন, বাদিরাজের লক্ষাভরণ বা লক্ষালঙ্কার (সভা, বিরাট ও উদ্যোগ)[৫] এবং

৪ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (*Indian Culture*, vol. i, p. 704, foot-note) লিখিয়াছেন যে, ১৮৯৭ সালে ভূধর চট্টোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ ও অর্জ্জুনমিশ্রের টীকা সমেত আদিপর্ব্ব বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এই সংস্করণ দেখি নাই।

৫ উডিপির মাধ্বগুরু বাদিরাজতীর্থের মৃত্যুকাল শকাব্দ ১২৬১ (= খ্রীষ্টাব্দ ১৩৩৯), এইরূপ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ধরিয়াছেন; কিন্তু পি. কে. গোডে দেখাইয়াছেন যে, এই তারিখ ঠিক নয় (*Annals of the Bh. Inst.* xvii, pp. 203-10) ; বাদিরাজতীর্থ ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার রচিত মহাভারতের সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী গ্রন্থাক্ষর-লিখিত দাক্ষিণাত্য পাঠই অনুসরণ করে, এবং পাঠ বা ব্যাখ্যা হিসাবে মূল্যবান্ নহে।—সনৎসুজাতীয়ে শঙ্করাচার্য্যও দাক্ষিণাত্য পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়ে উদ্যোগপর্ব্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

বিমলবোধের দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী বা দুর্ব্বোধপদভঞ্জিকা (বিরাট ও উদ্যোগ) টীকাও উক্ত বোম্বাই সংস্করণে অংশতঃ মুদ্রিত হইয়াছে।

এই সকল টীকাকারের মধ্যে নীলকণ্ঠের নামই বর্ত্তমান সময়ে সুপ্রসিদ্ধ, এবং তাঁহার সময় ও পরিচয় অজ্ঞাত নয়। সুতরাং মহাভারতের অন্যান্য প্রাচীন টীকাকারদের সম্বন্ধ বা পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিতে হইলে নীলকণ্ঠ হইতেই আমাদের আরম্ভ করিতে ও অগ্রসর হইতে হইবে। নীলকণ্ঠের সমগ্র টীকা বহুবার মুদ্রিত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। এমন কি, গত শতাব্দ হইতে মহাভারতের বিবিধ উত্তর-ভারতীয় মুদ্রিত সংস্করণে যে পাঠ গৃহীত হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ নীলকণ্ঠ-নির্দ্ধারিত পাঠ। ১৮৩৪-৩৯ সালে মহাভারতের যে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কলিকাতায় সম্পাদিত ও মুদ্রিত হইলেও, বাঙ্গালা দেশের পুঁথির পাঠ অনুসরণ করে না; ইহাতে নীলকণ্ঠের টীকা মুদ্রিত হয় নাই বটে, কিন্তু নীলকণ্ঠের টীকানুযায়ী প্রচলিত দেবনাগরী পুঁথির পাঠই গৃহীত হইয়াছে। গণপৎ কৃষ্ণজী-প্রকাশিত ও বোম্বাই হইতে ১৭৯৯ শকে (=১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে) মুদ্রিত যে আদি বোম্বাই সংস্করণ, তাহাতেও এই পাঠ ও নীলকণ্ঠের টীকাও রহিয়াছে। এই দুইটি সংস্করণ পরবর্ত্তী প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারতীয় মুদ্রিত সংস্করণের উপজীব্য; এবং ইহাদের দ্বারা, ও সর্ব্বত্র প্রচলিত দেবনাগরী পুঁথির দ্বারা, এই পাঠই আধুনিক সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের (বিশেষতঃ কাশ্মীর ও মলয় প্রদেশের) পুঁথিতে মহাভারতের যে মূল পাওয়া যায়, তাহা নীলকণ্ঠ-ধৃত মূল হইতে যথেষ্ট বিভিন্ন ও প্রাচীন।

নীলকণ্ঠের টীকার বা পাঠের যে সর্ব্বত্র প্রচলন হইয়াছে, তাহার কারণ এই নয় যে, নীলকণ্ঠের টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অথবা প্রকৃত পাঠ সংরক্ষণ হিসাবে মূল্যবান্। প্রকৃত-পক্ষে, মহাভারতের অধিকতর প্রাচীন ও মূল্যবান্ টীকাগুলি লুপ্ত হওয়াতে, বর্ত্তমান সময়ে নীলকণ্ঠের অপেক্ষাকৃত আধুনিক টীকা নিজস্ব মূল্য অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধি ও সমাদর লাভ করিয়াছে। আত্মপরিচয় হইতে জানা যায় যে, চতুর্ধর (আধুনিক চৌধুরী) উপাধিধারী নীলকণ্ঠ ছিলেন গৌতমগোত্রসম্ভূত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, এবং গোদাবরীতীরস্থ কূর্পারগ্রাম (আধুনিক কোপারগাঁও) নিবাসী গোবিন্দসূরি ও ফুল্লাম্বিকার জ্যেষ্ঠ পুত্র। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, কাশীক্ষেত্রে, যথাক্রমে তাঁহার ভারতভাবদীপ ও গণপতিভাবদীপ নামক সমগ্র মহাভারতের ও গণেশগীতার টীকা লিখিত হইয়াছিল; শেষোক্ত গ্রন্থের রচনাকাল সংবৎ ১৭৫০ (=খ্রীষ্টাব্দ ১৬৯৪) এইরূপ পাওয়া যায়।

টীকার প্রারম্ভে তাঁহার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন,—

> বহূন্ সমাহৃত্য বিভিন্নদেশ্যান্ কোশান্ বিনিশ্চিত্য চ পাঠমগ্র্যম্।
> প্রাচাং গুরূণামনুসৃত্য বাচমারভ্যতে ভারতভাবদীপঃ।

অর্থাৎ তিনি বিভিন্ন দেশ হইতে সংগৃহীত মহাভারতের বহু পুঁথি হইতে সমীচীনতম পাঠ

নির্ণয় করিয়া এবং প্রাচীন গুরুদিগের বাক্য অনুসরণ করিয়া ভারতভাবদীপ রচনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে সর্ব্বত্র বিবিধ পাঠান্তরের এবং প্রাচীন টীকাকারদের উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এই পাঠগ্রহণে বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা সংগ্রহবুদ্ধিরই বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশের পুঁথিতে যে অধিক অথবা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক, শ্লোকাংশ এবং প্রাদেশিক পাঠ পাওয়া যায়, তাহাও তিনি বাদ দেন নাই। এমন কি, অধুনাতন পুঁথির পাঠও যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উদ্যোগপর্ব্বের সনৎসুজাতীয়ের আরম্ভে স্বীকার করিয়াছেন[৬]। অর্থাৎ, তাঁহার ধারণা ছিল যে, মহাভারতের যে কোন পুঁথিতে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই আহরণ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার নির্ণীত মূল, অবিচারিত পাঠস্বীকারে ও প্রক্ষিপ্তাংশে,[৭] পল্লবিত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা বা উদাহরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য[৮]; এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সর্ব্বত্র প্রচলিত ও আদৃত হইলেও, নীলকণ্ঠের অর্ব্বাচীন টীকাকে মহাভারতের মূল পাঠের আলোচনায় প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

তথাপি, নীলকণ্ঠ যে-সকল পাঠভেদের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকারদের যে-সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করা যায় না। অগ্রগামীদের মধ্যে, বিভিন্ন পর্ব্বে, দেববোধ, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ, অর্জ্জুনমিশ্র ও রত্নগর্ভ—এই চারি জনের নাম ও তাঁহাদের ব্যাখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে রত্নগর্ভ বেশী প্রাচীন ব্যাখ্যাকার বলিয়া মনে হয় না, এবং তাঁহার টীকার মূল্যও বেশী নয়[৯]। অন্য তিন জনের মধ্যে দেববোধই প্রাচীনতম। দ্রোণপর্ব্বের এক স্থলে (৭।৮২।২)[১০] মধুপর্কিক এই শব্দের ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ দেববোধের পাঠ প্রামাণিক বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন[১১]; এবং আদিপর্ব্বে (১।১৫৮।১৪) দেববোধধৃত একটি সমগ্র শ্লোকের পাঠকে প্রাচীন পাঠ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন[১২]।

৬ উদ্যোগপর্ব্বণি সনৎসুজাতীয়ে ভাষ্যকারাদিভির্ব্যাখ্যাতান্ সংপ্রতিতনপুস্তকেষু চ স্থিতান্ পাঠান্ শ্লোকাংশ্চ গুণোপসংহারন্যায়েন একত্রীকৃত্য ব্যাখ্যাস্যতে।—ইহাতে যে অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্য হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে মল্লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৭ কেবল উদ্যোগপর্ব্বেই প্রায় ১৫০ প্রক্ষিপ্ত অংশ রহিয়াছে; তাহার মধ্যে একটি ১০৩ লাইন বিস্তৃত।

৮ পুনা সংস্করণের আদি ও উদ্যোগপর্ব্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৯ আদিপর্ব্বের ভূমিকা, পৃ. ৬৯।

১০ বর্ত্তমান প্রবন্ধে যেখানে আদি, বিরাট ও উদ্যোগপর্ব্ব উদ্ধৃত হইয়াছে, সেখানে পুনা সংস্করণ ও অন্যান্য পর্ব্বের ক্ষেত্রে গণপত্ কৃষ্ণজী-প্রকাশিত বোম্বাই সংস্করণ বুঝিতে হইবে।

১১ মধুপর্কিকা মধুপর্কসময়ে পঠস্ত ইতি দেববোধঃ।

১২ ইতি প্রাচীনঃ পাঠো দেববোধাদিভির্ব্যাখ্যাতত্বাৎ।—কিন্তু এই পাঠ দেববোধের টীকার পুঁথিতে পাওয়া যায় না।

এইরূপ সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ ও অর্জ্জুনমিশ্রের উল্লেখ যথাক্রমে উদ্যোগপর্ব্বের দুই স্থলে (৫।৪০।৯ ও ৫।৪০।২৪)[১৩] এবং বনপর্ব্বের এক স্থলে (৩।২৯১।৭০)[১৪] পাওয়া যায়।

নীলকণ্ঠের এই তিন জন অগ্রবর্ত্তীর মধ্যে অর্জ্জুনমিশ্র কনিষ্ঠতম; কারণ, অর্জ্জুনমিশ্র তাঁহার টীকায় দেববোধ ও সর্ব্বজ্ঞনারায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন। বিমলবোধও তাঁহার পূর্ব্বগামী। আদিপর্ব্বের টীকার প্রারম্ভে অর্জ্জুনমিশ্র শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন,—

বেদব্যাস-বৈশংপায়ন-দেববোধ-বিমলবোধ-সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ-শাণ্ডিল্যমাধব-পিতৃভ্যো নমঃ।

শ্রীদেববোধপাদাদিমতমালোক্য যত্নতঃ।
ক্রিয়তেঽর্জ্জুনমিশ্রেণ ভারতার্থপ্রদীপিকা॥

এবং অন্যত্র হরিবংশের টীকার শেষে লিখিয়াছেন,—

শ্রীদেববোধবিমলবোধশাণ্ডিল্যমাধবাঃ।
নারায়ণশ্চ সর্ব্বজ্ঞঃ পিতা চ গুরবো মম॥

শাণ্ডিল্যমাধব সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই; কিন্তু অর্জ্জুনমিশ্র ইঁহাদের সহিত নিজের পিতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ, তাঁহার পিতা ঈশান তৎসময়ে মহাভারতের খ্যাতনামা পাঠক ছিলেন; টীকার পুষ্পিকায় তাঁহাকে পাঠকরাজ ও ভারতাচার্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। তাঁহার অন্য অভিধান 'চম্পাহেঠিকুলসরিন্নাথেন্দু' হইতে বুঝা যায় যে, তিনি চম্পাহট্টীয় কুলের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং অর্জ্জুনমিশ্রই মহাভারতের একমাত্র প্রাচীন বাঙ্গালী টীকাকার। পরবর্ত্তী সময়ের অন্য বাঙ্গালী টীকাকার হইতেছেন বোধ হয়—সৃষ্টিধর[১৫] ও জগদীশ চক্রবর্ত্তী[১৬]।

অর্জ্জুনমিশ্র পুনরায় বিরাটপর্ব্বের টীকার আরম্ভে দেববোধের এইরূপ স্তুতি করিয়াছেন এবং পিতৃ-উপদেশের কথা বলিয়াছেন—

বেদব্যাসমুখাম্ভোজগলিতং বাঙ্ময়ামৃতম্।
সংভোজয়ন্তং ভুবনং দেববোধং ভজামহে॥

*　　*　　*　　*

শ্রীদেববোধপাদাদিতাতোপদেশসেবিনা।
ক্রিয়তেঽর্জ্জুনমিশ্রেণ বিরাটপর্ব্বদীপিকা॥

১৩ বিষং লোহমিতি সর্ব্বজ্ঞঃ।…দক্ষিণাবর্ত্তঃ শঙ্খ ইতি নারায়ণঃ।—এতেনাগ্নিহোত্রমুপলক্ষয়তীতি নারায়ণঃ।—এই সমস্ত ব্যাখ্যাই সর্ব্বজ্ঞনারায়ণের টীকায় পাওয়া যায়।

১৪ জাত্বথ্যান্ ত্রিগুণদক্ষিণানিত্যর্জ্জুনমিশ্রঃ।

১৫ যদি এই সৃষ্টিধর পুরুষোত্তমদেবের ভাষাবৃত্তির টীকাকার হন, তবে তিনি, বোধ হয়, সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

১৬ বাণীকণ্ঠ আচার্য্যের পুত্র এবং কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী নলাহাটীগ্রামনিবাসী। ইঁহার সভাপর্ব্বের ব্যাখ্যার একখানি পুঁথির লিপিকাল সন ১১৫৯, ২২ ফাল্গুন।

এই সকল শ্লোকে অর্জ্জুনমিশ্র দেববোধের প্রতি যে অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিরর্থক নয়; কারণ, দেববোধের টীকাই তাঁহার প্রধান উপজীব্য। যদিও দু-একটি স্থলে তিনি স্পষ্ট নামোল্লেখ করিয়া দেববোধের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন,[১৭] তথাপি দুইটি টীকা পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে, অর্জ্জুনমিশ্র তাঁহার টীকার আদ্যোপান্ত (বিশেষতঃ উদ্যোগপর্ব্বে) বহু স্থলে নামোল্লেখ না করিয়াও দেববোধের টীকার বিস্তৃত নকল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার টীকাকে দেববোধের টীকার সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, দেববোধের টীকার জ্ঞানদীপিকা নামের অনুকরণে তিনি নিজের টীকার নামকরণও করিয়াছেন—অর্থদীপিকা! আমরা পরে দেখিব, দেববোধ খুব সম্ভব কাশ্মীর বা উত্তর-পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী ছিলেন; কারণ, তাঁহার টীকায় উক্ত প্রদেশের পুঁথির পাঠই বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, অর্জ্জুনমিশ্র বাঙ্গালী হইলেও তাঁহার টীকায় বঙ্গীয় পুঁথির পাঠ সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই, বরং অন্য প্রদেশের পুঁথির পাঠ প্রচুর পরিমাণে বঙ্গীয় পাঠকে অন্তর্হিত করিয়াছে। অনেক স্থলে তিনি বঙ্গীয় পাঠকে 'অসম্যক্' বলিয়া দেববোধের পাঠ স্বীকার করিয়াছেন; এবং তাঁহার টীকায় এমন অনেক পাঠ পাওয়া যায়, যাহা কেবল দেববোধের টীকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কোনও পুঁথিতে পাওয়া যায় না![১৮] সুতরাং বাঙ্গালা দেশে লিখিত হইলেও অর্জ্জুনমিশ্রের টীকা বঙ্গীয় পাঠের প্রকৃত নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান্ নহে, এবং দেববোধের টীকার অংশতঃ বা পূর্ণতঃ নকল বলিয়া ইহার মৌলিকতা যথেষ্ট খর্ব্ব হইয়াছে।

অর্জ্জুনমিশ্রের টীকার পুঁথি বাঙ্গালা দেশেও সুলভ নয়, এবং সমস্ত পর্ব্বের উপর টীকা এখনও পাওয়া যায় নাই। তথাপি মনে হয়, তিনি সমস্ত মহাভারতের উপরই টীকা লিখিয়াছিলেন; কারণ, খিল হরিবংশকেও তিনি মহাভারতের অন্তর্ভূত বলিয়া গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুনমিশ্রের আবির্ভাবকাল নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অর্জ্জুনমিশ্রলিখিত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বের টীকার যে তালপত্রের পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন[১৯], তাহার লিপিকাল হইতেছে শকাব্দ ১৪৫৬ (= খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩৪)। ইহার লিপিকার গ্রন্থশেষে একটি শ্লোকে বলিয়াছেন[২০] যে, অর্জ্জুনমিশ্রের টীকা তাঁহার সময়েও লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। সুতরাং অর্জ্জুনমিশ্র ইহার বহুপূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ[২১] ও পি. কে. গোড়ে[২২] অর্জ্জুনমিশ্রের তারিখ সম্বন্ধে বিস্তৃত

---

১৭ যথা—১।১৪৩।৩৪ শেষপাঠদ্বয়ং দেববোধপাদানাং সংমতম্। (দেববোধের টীকায় উল্লিখিত দুইটি পাঠই পাওয়া যায়)।

১৮ উদাহরণের জন্য উদ্যোগপর্ব্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১৯ *Notices of Sanskrit Manuscripts,* 2nd Series, 1900, vol. i, p. 298, No. 295.

২০ অন্যাধীতৌলিপিগ্রন্থশুদ্ধাক্ষরসমুচ্চয়ঃ। বিদ্বষাং হেলয়া প্রাচ্যগ্রন্থো নাশমুপেয়িবান্।

২১ *Indian Culture,* vol. i, pp. 706-10; vol. ii, pp. 585-88.

২২ *Indian Culture,* vol. ii, pp. 141-46.

আলোচনা করিয়াছেন। ঘোষ মুখ্যতঃ কুলপঞ্জিকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার তারিখ আনুমানিক ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দ এইরূপ ধরিয়াছেন; কিন্তু গোড়ের মতে ইহা ১৪৫০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ কোন্ প্রদেশের অধিবাসী ও কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে তিনি অর্জ্জুনমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও দেববোধের পরবর্ত্তী; এবং তাঁহার টীকায় দাক্ষিণাত্য পাঠ বিরল বলিয়া তিনি যে উত্তর-ভারতের লোক, তাহাতে সন্দেহ নাই।[২৩] দেববোধ বা অর্জ্জুনমিশ্রের টীকার মত, তাঁহার ভারতার্থপ্রকাশ দুষ্প্রাপ্য নয়, তবে তিনি সমগ্র মহাভারতের উপর টীকা করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। আদিপর্ব্বের টীকার পুষ্পিকায় তাঁহাকে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বলা হইয়াছে। তিনি তাঁহার টীকায় দেববোধের যথেষ্ট অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু অর্জ্জুনমিশ্র যতটা করিয়াছেন, ততটা নয়। উদ্যোগপর্ব্বের টীকার প্রারম্ভে দেববোধের জ্ঞানদীপিকা টীকার অর্থ বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন—

উদ্যোগে দেববোধস্য বাগ্বাডবমরীচয়ঃ।
পিবন্তুজ্ঞানতৃজ্জ্ঞানবক্ষোরক্রমহার্ণবম্।

এই শ্লোকটি পূর্ব্বোক্ত গুজরাতি ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত টীকায় বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহের একটি[২৪] ও বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট সংগ্রহের দুইটি[২৫] পুঁথিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন উদ্যোগপর্ব্বের টীকার ভিতরেও এক স্থলে (৫।৯৫।৩৯) সর্ব্বজ্ঞ-নারায়ণ দেববোধের টীকা হইতে একটি ব্যাখ্যামূলক শ্লোক 'দেববোধপাদাস্তু'[২৬] বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। য়লি[২৭], ব্যুলার[২৮], হোল্‌টস্‌মান[২৯] প্রভৃতির মতে মহাভারতের টীকাকার সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ এবং মনুসংহিতার টীকা মন্বর্থবৃত্তি বা মন্বর্থনিবন্ধের[৩০] রচয়িতা সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ একই ব্যক্তি। শেষোক্ত টীকায় উদ্ধৃত কয়েকটি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্যুলার

২৩ ইহার আলোচনা উদ্যোগপর্ব্বের ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

২৪ নং ২১৬৯।

২৫ No. 33A of 1879-80 and 168 of 1884-87.

২৬ দেববোধের উদ্যোগপর্ব্বের টীকার যে প্রাচীন জীর্ণ তালপত্রের পুঁথি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে, তাহা খণ্ডিত এবং আলোচ্য অংশটিতে গ্রন্থপাত হওয়ায় এই শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

২৭ Jolly, *Law of Adoption* (Tagore Law Lectures), p. 7. Cf. also Recht u. Sitte, p. 31.

২৮ Buehler, *Laws of Manu* (SBE), p. cxx f.

২৯ Holtzmann, *op. cit.*, p. 71 f.

৩০ V. N. Mandlik তাঁহার মনুসংহিতার সংস্করণে (Bombay 1886) ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন।

সাধারণভাবে তাঁহার সময় খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের উত্তরার্দ্ধে ধার্য্য করিয়াছেন ; কিন্তু পি. ভি. কাণের মতে[৩১] সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ ১১০০ হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অমরকোষের বাঙ্গালী টীকাকার রায়মুকুট ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বজ্ঞ-নারায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন।

অর্জ্জুনমিশ্র বিমলবোধের নামোল্লেখ করিলেও, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণের টীকায় তাঁহার নাম পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং তিনি অর্জ্জুনমিশ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও, সর্ব্বজ্ঞনারায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু অর্জ্জুনমিশ্র প্রাক্তন টীকাকারদের নমস্কারে, দেববোধের পরে এবং সর্ব্বজ্ঞনারায়ণের পূর্ব্বে বিমলবোধের উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহাতে মনে হয়, বিমলবোধ সর্ব্বজ্ঞনারায়ণ অপেক্ষাও প্রাচীন। তিনি যে দেববোধের পরবর্ত্তী তাহা তাঁহার টীকার প্রারম্ভে নিজের উক্তি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়—

বৈশংপায়নটীকাদি দেবস্বামিমতানি চ।
বীক্ষ্য ব্যাখ্যা বিরচিতা দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী।

এখানে 'দেবস্বামি' আখ্যা নূতন হইলেও অনর্থক নয় ; কারণ, দেববোধকে তাঁহার টীকার পুষ্পিকায় পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য বলা হইয়াছে।[৩২] এই আখ্যা যে দেববোধকে বুঝাইতেছে, তাহা পরপৃষ্ঠায় দেববোধের স্পষ্ট নামোল্লেখ হইতে জানা যায়—

পশ্যতাং মুনীনামতিবিস্ময়মুৎপাদিতবানিতি লোমহর্ষণনামাভূদিতি দেববোধপাদা আহুঃ।

এই উদ্ধৃত অংশ দেববোধের টীকায় প্রায় অবিকলভাবে পাওয়া যায়।[৩৩] বিমলবোধের দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী বা দুর্ব্বোধপদভঞ্জিকা টীকা একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়, কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য টীকার মত ইহা ধারাবাহিক নয় ; বিভিন্ন পর্ব্বের যে সকল শ্লোক টীকাকারের দুর্ঘট বা দুর্ব্বোধ মনে হইয়াছে, কেবল তাহারই ব্যাখ্যা ইহাতে আছে।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত মহাভারতের যতগুলি পুরাতন টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে দেববোধের টীকাই, বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। শুধু প্রাচীনত্ব হিসাবে নয়, মূলের প্রাচীন পাঠসংরক্ষণ ও ব্যাখ্যা হিসাবেও এই টীকা মূল্যবান্। কিন্তু দেববোধের টীকা এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। বিরাটপর্ব্বের টীকা পাওয়া যায় নাই ; এবং আদি[৩৪] ও উদ্যোগপর্ব্বের[৩৫] টীকার যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে,

৩১ *Hist. of Dharmasastra*, vol. i, p. 157.

৩২ স্মৃষ্টিধরও টীকার প্রারম্ভে দেববোধকে দেবস্বামী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৩ পশ্যতাং মুনীনামতিবিস্ময়াদ্ রোমাঞ্চমুৎপাদিতবানিতি লোমহর্ষণনামাভূৎ (বরোদা পুঁথি, নং ১১৩৭২, পত্র ৩খ)

৩৪ বরোদা সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী পুঁথি নং ১১৩৭২ এবং কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ৩৩৯৭।২৯২৯।

৩৫ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি পুঁথি নং ৩৩৯৯।৪৮১৫।

তাহা অত্যন্ত জীর্ণ এবং বহুলাংশে খণ্ডিত। টীকার পুষ্পিকায় যে যৎসামান্য পরিচয় আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সত্যবোধের শিষ্য দেববোধ 'পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য' ছিলেন। কোন্ সময় তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা অজ্ঞাত; কিন্তু অর্জ্জুনমিশ্রের উল্লেখ হইতে দেববোধের আবির্ভাবকাল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের অনেক পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। টীকার মধ্যে অন্য কোন বিবরণ নাই; কারণ, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনীর মত, কেবল মধ্যে মধ্যে মূলের কিঞ্চিৎ তাৎপর্য্যবিবৃতি আছে। দেববোধ যে দাক্ষিণাত্য মূল বা পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাহা টীকায় ব্যাখ্যাত শব্দ বা বাক্যের প্রতীক হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়; কিন্তু উত্তর-ভারতের যে প্রচলিত ও পল্লবিত মূল (Vulgate text) নীলকণ্ঠের টীকার সহিত সাধারণতঃ মুদ্রিত হয়, তাহাও দেববোধের অজ্ঞাত। এই হিসাবে বঙ্গীয় বা প্রাচ্যদেশীয় পাঠও দেববোধ গ্রহণ করেন নাই। একমাত্র শারদালিপিতে লিখিত অথবা কাশ্মীরী আদর্শ হইতে দেবনাগরী লিপিতে অনুলিখিত পুঁথিতে যে মূল বা পাঠ পাওয়া যায়, তাহার সহিত দেববোধের মূল বা বিচ্ছিন্ন পদ ও বাক্যের পাঠের যথেষ্ট মিল রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিও অর্জ্জুনমিশ্র ও নীলকণ্ঠ আদিপর্ব্বের কণিকনীতি অধ্যায়ের (বোম্বাই সং. অঃ ১৪০) বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, দেববোধ ইহার কোনও টীকা করেন নাই, এবং শারদা-কাশ্মীরী পুঁথিতে এই অধ্যায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। তেমনি আদিপর্ব্বের ব্রহ্মা-গণেশ বৃত্তান্ত, যাহা কাশ্মীরী ও বাঙ্গালা পুঁথিতে বর্জ্জিত, তাহারও উল্লেখ দেববোধের টীকায় নাই। অন্য দিকে, আদিপর্ব্বের অন্তে কেবল কাশ্মীরী পুঁথি শ্বেতকির যে-গল্প সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, তাহা দেববোধও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ইহা উত্তর-ভারতের অন্য প্রদেশের বা দাক্ষিণাত্যের পুঁথিতে পাওয়া যায় না। যাহা কেবল কাশ্মীরী মূলের বৈশিষ্ট্য, তাহা ছাড়িয়া দিলে, মহাভারতের বিশুদ্ধ প্রাচীন পাঠ উত্তর-ভারতের কাশ্মীরী ও দক্ষিণ-ভারতের মলয়ালম পুঁথিতেই পাওয়া যায়। এই হিসাবে দেববোধের টীকায় এমন অনেক প্রাচীন পাঠ রক্ষিত হইয়াছে,[৩৬] যাহা নীলকণ্ঠের বা অন্য প্রদেশের গ্রন্থে লুপ্ত হইয়াছে; এবং এই সকল গ্রন্থে যে প্রক্ষিপ্ত অংশ পরবর্ত্তী কালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার কোনও নিদর্শন দেববোধের টীকায় নাই। এই কারণে এবং ব্যাখ্যার উৎকর্ষে দেববোধের প্রাচীন টীকা সত্যই মূল্যবান্।

৩৬ উদাহরণের জন্য উদ্যোগপর্ব্বের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনুমানিক ১৭৬২ সনে সুখসাগরের নিকটবর্ত্তী পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। তর্কভূষণের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ পুত্র—নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার, মধ্যম পুত্র রামধন বিদ্যালঙ্কার—ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং স্বগৃহেই অধ্যাপনা করিতেন, তৃতীয় পুত্র রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম আচার্য্যরূপে ইনি এদেশে সুপরিচিত।*

নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার প্রথমে অধ্যাপনা করিতেন। ন্যায়দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি পরে গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন এবং হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে খ্যাত হন।

হরিহরানন্দ রাজা রামমোহন রায়ের গুরু ছিলেন। রামমোহন তাঁহার নিকট তন্ত্র রীতি-মত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামমোহনের বয়স যখন ১৪ বৎসর (১৭৮৮ খ্রীঃ), তখন তাঁহার সহিত রাধানগরে হরিহরানন্দের পরিচয় হয়। তদবধি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান ছিল।† সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার পর হরিহরানন্দ দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। রামমোহন রায়ের রংপুরে অবস্থানকালে (১৮০৯-১৮১৪) হরিহরানন্দ রামমোহনের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। তিনি যে ১৮১২ সনের জানুয়ারি মাসে তথায় ছিলেন, তাহার প্রমাণ—এই সময় রংপুরে নিষ্পাদিত রামমোহনের বিষয়-সংক্রান্ত একটি দলিলে সাক্ষিস্বরূপ তাঁহার নামের স্বাক্ষর আছে। তাঁহার স্বাক্ষরের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

১৮১৪ সনের মাঝামাঝি রামমোহন রংপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হন। হরিহরানন্দও রামমোহনের সহিত কলিকাতা আসিয়াছিলেন। এই সময় তিনি তদীয় কনিষ্ঠ

* 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক (এপ্রিল ১৮৪৫)।

† সুপ্রীমকোর্টে রামমোহন রায়ের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়ের বৈষয়িক মোকদ্দমায় হরিহরানন্দ রামমোহনের পক্ষে সাক্ষী দিয়াছিলেন। ২৭ আগষ্ট ১৮১৮ তারিখযুক্ত জবানবন্দীতে হরিহরানন্দ বলেন :—

Nandakumar Vidyalankar of Manicktala in Calcutta Pundit aged fifty-six years or thereabouts....He is a Brahmin and maintains himself by the donations and contributions of his disciples *shishyas*....He hath known the Defendant Rammohun Roy from the time that the said Defendant attained the age of fourteen years and hath ever since been on the most intimate terms with him.

ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে আনাইয়া রামমোহনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।* এই রামচন্দ্রই অল্প দিন পরে রামমোহনের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ 'কুলার্ণব' তন্ত্র প্রকাশ করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন—'মহানির্ব্বাণতন্ত্রে'র† তাঁহার রচিত টীকা। ১৭৯৬ শকাব্দে (১৮৭৪ খ্রীঃ) আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সম্পাদকতায় রামায়ণ যন্ত্রে বঙ্গাক্ষরে 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্ (পূর্ব্বকাণ্ডম্)' "কুলাবধূত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাথ-ভারতীবিরচিতয়া টীকয়া সহিতম্" মুদ্রিত হইয়া সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

কলিকাতায় অবস্থানকালে হরিহরানন্দ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশনেও যোগ দিতেন। আত্মীয় সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা হইত। ইহার সেক্রেটরী বা নির্ব্বাহক ছিলেন—বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।‡ এই সভায় সহমরণ-নিষেধক আলোচনাও চলিত।§ সহমরণ-বিষয়ে সংবাদপত্রেও তখন খুব আন্দোলন চলিতেছিল। এই প্রসঙ্গে হরিহরানন্দের একখানি পত্র ১৮১৯ সনের এপ্রিল মাসে 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হয়; পত্রখানি উদ্ধৃত হইল :—

এই মোকদ্দমার নথিপত্রের সহিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার-স্বাক্ষরিত দুইটি দলিল আছে। একটির তারিখ ২০ ডিসেম্বর ১৭৯৯; ইহাতে তাঁহার নিবাস "সাং রঘুনাথপুর" বলা হইয়াছে। অপরটির তারিখ "রংপুর, ১৪ জানুয়ারি ১৮১২"; ইহাতে তাঁহার নিবাস "সাং পালপাড়া" দেওয়া আছে।

* রামমোহন রায় "তীর্থস্বামিকে সমভিব্যাহারি করিয়া ১৭৩৪ [১৭৩৬ ?] শকে কলিকাতা নগরে আগমন করিলেন। এই কালে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অগ্র অগ্র ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার বিরাগ প্রকাশ করাতে, এবং তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে, তিনি অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়েন, এ প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উক্ত তীর্থস্বামী রাজার নিকটে তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান্, এবং সংস্কৃত ভাষাতে শব্দালঙ্কারাদি ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে অত্যন্ত ব্যুৎপন্ন প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে মহা সম্ভ্রম পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।"—'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' ১ বৈশাখ ১৭৬৭ শক।

† কেহ কেহ মনে করেন, মূল মহানির্ব্বাণতন্ত্রই হরিহরানন্দ কর্ত্তৃক সংকলিত বা সংস্কৃত।—

....it has been suggested that the Mahanirvana was a fabrication in whole or in part of Hariharananda.—Avalon : Introduction to *Mahanirvana Tantra,* p. vii.

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের হরিহরানন্দ-কৃত টীকা সম্বন্ধে Avalon লিখিয়াছেন :—

The Manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting. In the beginning of each chapter of the Commentary the Raja writes *Om namo Brahmane....—Ibid.,* p. viii.

‡ B. N. Banerji : "Societies Founded by Rammohun Roy for Religious Reform."—The *Modern Review,* February 1935, pp. 415-19.

§ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' প্রথম খণ্ড (২য় সংস্করণ), পৃ. ৩০০ দ্রষ্টব্য।

TO THE EDITOR OF THE INDIA GAZETTE.

Sir,

Without wishing to stand forward either as the advocate or opponent of the concremation of Widows with the bodies of their deceased Husbands, but ranking myself among Brahmuns who consider themselves bound by their birth, to obey the ordinances and maintain the correct observance of Hindoo law, I deem it proper to call the attention of the public to a point of great importance now at issue amongst the followers of that law, and upon the determination of which, the lives of thousands of the female sex depend.

In the year 1818, a body of Hindoos prepared a petition to Government, for the removal of the existing restrictions on burning Widows, in cases not sanctioned by any Shastur, while another body petitioned for at least further restrictions, if not the total abrogation of the practice, upon the ground of its absolute illegality. Some months ago too, Bykunthnauth Banoorjee,* Secretary to the Brahmyu or Unitarian Hindoo community, published a tract in Bungla, a translation of which into English is also before the public, wherein he not only maintains that it is the incumbent duty of Hindoo Widows, to live as ascetics, and thus acquire divine absorption, but expressly accuses those who bind down a Widow with the corpse of her Husband, and also use bamboos to press her down and prevent her escape, should she attempt to fly from the flaming pile, as guilty of deliberate woman murder.

In support of this charge, as well as of his declaration of the illegality of the practice generally, he has adduced strong arguments founded upon the authorities considered the most sacred.

This tract we hear has been generally circulated in Calcutta, and its vicinity, and has also been submitted to several Pundits of the Zillah and Provincial Courts in Bengal, through their respective Judges and Magistrates. It is reported too, that consequent to the appearance of that publication, some Brahmuns of learning were requested by their wealthy followers to reply to that treatise, and I was therefore in sanguine expectation that the subject would undergo a thorough investigation.

This report has now entirely subsided, and the practice of burning Widows is still carried on, and in the manner which has been declared illegal and murderous. At this I cannot help astonishment; as I am at a loss to conceive how persons can reconcile themselves to the stigma of being accused of woman murder, without attempting to shew the injustice of the charge, or if they find themselves unqualified to do that, without at least ceasing to expose themselves to the reiteration of such a charge by further perseverance in similar conduct. I feel also both surprise and regret that European Gentlemen, who boast of the humanity and morality of their religion, should conduct themselves towards persons who submit quietly to the imputation of murder, with the same politeness and kindness as they would shew to the most respectable persons; I however must call on those Baboos and Pundits either to vindicate their conduct by the sacred authorities, or to give up all claims to be considered as adherents of the Shasturs; as if they do not obey written law, they must be looked upon as followers of blind and changeable custom, which deserves no more to be regarded with respect in this instance, than in the case of child murder at Gunga Sagur, which has long ago been suppressed by Government.

March 27, 1818. HURRIHURANUND.*

* ১১ এপ্রিল ১৮১৯ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' (পৃ. ১১৯-১২০) উদ্ধৃত। হরিহরানন্দ ইংরেজী জানিতেন না, সুতরাং ইহা রামমোহনের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত জীবন-চরিতের এক স্থলে হরিহরানন্দের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

এখানে [দিল্লীতে] সুখানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য। এই হরিহরানন্দের সঙ্গে রাম মোহন রায়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাম মোহন রায়ের বাগানেই থাকিতেন। ইহাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমি দীল্লিতে পঁহুছিবা মাত্রই সুখানন্দ স্বামী আমাকে আঙ্গুর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে উপহার পাঠাইয়া দিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার দেখা সাক্ষাৎ, আলাপ পরিচয় হইল। সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে, "আমি এবং রাম মোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রাম মোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।"—'পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন-চরিত'—প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৮), পৃ. ১৪৩।

শেষ-জীবনে হরিহরানন্দ কাশীবাস করিতেছিলেন। তথায় ১৭ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' যে প্রস্তাব লেখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

নির্ব্বাণপ্রাপ্তি।—সুখসাগরের সমীপবর্ত্তি পালপাড়া গ্রামে নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার এক জন অধ্যাপক ছিলেন তিনি কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের ধর্ম্ম শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অগ্রজ। ন্যায় দর্শনে এবং তন্ত্রে বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের এরূপ গতি ছিল যে সংপ্রতি তাদৃশ দুর্লভ বিশেষতঃ তাঁহার সদ্বক্তৃতা শক্তি যেরূপ ছিল যে তাদৃক আমরা প্রায় দেখি না ইনি অল্প বয়সেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশ ও দিগ দর্শন করিয়াছিলেন শেষে প্রায় বিংশতি বৎসর হইতে কাশীতে বাস করিতেন কাশীতে রাজাপ্রভৃতি অনেকে এবং কলিকাতা নগর ও পশ্চিম রাজ্যের লোকের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন কাশীতে বাসের মধ্যে প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয় কাশী নগরের জনেরা তাঁহার অত্যন্ত মান করিতেন এবং আমরা শুনিয়াছি যে গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগের পরেই তেঁহ হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীকুলাবধূত পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন সম্প্রতি তিনি সত্তরি বর্ষ বয়স্ক হইয়া এই মাঘ মাসের পঞ্চম দিবস [১৭ জানুয়ারি ১৮৩২] পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বাহ্নসময়ে কাশীক্ষেত্রে সমাধিপূর্ব্বক পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন ইঁহার মৃত্যুতে আমরা অবশ্য দুঃখিত হইলাম যেহেতু এতাদৃক লোক ইদানীং অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কেবল এক পুত্র শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পিতৃব্যদের সহিত দেশে বাস করিতেছেন।—'সমাচার দর্পণ,' ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২।

বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়

(৪)

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বৈদিক কৃষ্টির কালের অন্ধকার-দেশে ফল্গুনী পূর্ণিমা এক উজ্জ্বল দীপ। ইহার রশ্মিতে অদ্যাবধি খ্রি-পূ ৪৫০০ বৎসর পর্যন্ত আলোকিত হইয়াছে।

যে রাত্রিতে দৃশ্য ফল্গুনী নক্ষত্রের সমসূত্রে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয়, সেই রাত্রির নাম ফল্গুনী পূর্ণিমা। এইরূপ, দৃশ্য মৃগশীর্ষ নক্ষত্রের সমসূত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে মৃগশীর্ষ পূর্ণিমা, দৃশ্য জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের সমসূত্রে হইলে জ্যেষ্ঠা পূর্ণিমা, ইত্যাদি। যদি পূর্ণিমায় মাসান্ত ধরি, মাসের নাম ফাল্গুন, মার্গশীর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু কোন্ ঋতুতে এই এই মাস, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ ঋতুর কর্তা চন্দ্র নহেন, ঋতুর কর্তা সূর্য। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ বহু পূর্বকালে এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাঁহারা সূর্যদ্বারা ঋতুবিভাগ করিতেন।

এক বৎসরে দুই অয়ন। উত্তরায়ণ প্রথম, দক্ষিণায়ন দ্বিতীয়। উত্তরায়ণ-আরম্ভে সূর্য ২৭০° অংশে, দক্ষিণায়ন-আরম্ভে ৯০° অংশে আসে। অয়ন হইতে যে ঋতুগণনা তাহাকে আয়ন ঋতু বলিতেছি। যথা,

ক। আয়ন ঋতু।

শিশির···২৭০°-৩০০°-৩৩০°	বর্ষা··· ৯০°-১২০°-১৫০°
বসন্ত··· ৩৩০-৩৬০-৩০	শরৎ··· ১৫০-১৮০-২১০
গ্রীষ্ম··· ৩০-৬০-৯০	হেমন্ত···২১০-২৪০-২৭০

কালক্রমে দুই বিষুবদ্বারাও বৎসর বিভক্ত হইয়াছিল। বিষুব হইতে যে ঋতু-গণনা তাহাকে বৈষুব ঋতু বলিতেছি। যথা,

খ। বৈষুব ঋতু।

গ্রীষ্ম···০°-৩০°-৬০°	হেমন্ত··· ১৮০°-২১০°-২৪০°
বর্ষা··· ৬০-৯০-১২০	শিশির···২৪০-২৭০-৩০০
শরৎ··· ১২০-১৫০-১৮০	বসন্ত··· ৩০০-৩৩০-৩৬০

বৈদিক গ্রন্থে এই দ্বিবিধ ঋতু-গণনার নিদর্শন আছে। দ্বিবিধ গণনাই বৈজ্ঞানিক। এই কারণে ঋতু-গণনা চিরদিন একই আছে। কিন্তু মাসের নাম করিলে সে মাস কোন্ ঋতুর অন্তর্গত, ঋতু-গণনার ক্রম না জানিলে তাহা বলিতে পারা যায় না। তদুপরি আর এক বিষয় বিবেচ্য আছে। সূর্য-বিভক্ত ঋতু চিরদিন একই আছে, কিন্তু মাস অগ্রগত হইতেছে।

একটা উদাহরণ লইতেছি। মনে করি ফল্গুনী পূর্ণিমায় উত্তরায়ণ-আরম্ভ হইয়াছে। খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দে এইরূপ প্রথম হইয়াছিল। ফাল্গুন পূর্ণিমার পর চৈত্র মাস। মাস পূর্ণিমান্ত। অতএব

গ। আয়ন ঋতু। (খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ)

শিশির…চৈত্র বৈশাখ
বসন্ত… জ্যৈষ্ঠ (৩৬০°) আষাঢ়
শ্রাবণ ভাদ্র (৯০°)
বর্ষা… আশ্বিন কার্তিক
শরৎ… মার্গ (১৮০°) পৌষ
হেমন্ত…মাঘ ফাল্গুন (২৭০°)

বৈষুব ঋতু। (খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ)

শিশির…ফাল্গুন (২৭০°) চৈত্র
বসন্ত… বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ (৩৬০°)
আষাঢ় শ্রাবণ
বর্ষা… ভাদ্র (৯০°) আশ্বিন
শরৎ… কার্তিক মার্গ (১৮০°)
হেমন্ত…পৌষ মাঘ

ফাল্গুন মাস কোন্ ঋতুর অন্তর্গত? আয়নক্রমে হেমন্তের, বৈষুবক্রমে শিশিরের। কোন্ ঋতুর প্রথম মাস? শিশিরের।

মনে করি দুই সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে। তখন ঋতু ও মাস কিরূপ দাঁড়াইবে?

চ। আয়ন ঋতু। (খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দ)

শিশির…ফাল্গুন চৈত্র
বসন্ত… বৈশাখ (৩৬০°) জ্যৈষ্ঠ
গ্রীষ্ম… আষাঢ় শ্রাবণ (৯০°)
বর্ষা… ভাদ্র আশ্বিন
শরৎ… কার্তিক (১৮০°) মার্গ
হেমন্ত…পৌষ মাঘ (২৭০°)

ছ। বৈষুব ঋতু। (খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দ)

শিশির…মাঘ (২৭০:) ফাল্গুন
বসন্ত… চৈত্র বৈশাখ (৩৬০°)
গ্রীষ্ম… জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়
বর্ষা… শ্রাবণ (৯০) ভাদ্র
শরৎ… আশ্বিন কার্তিক (১৮০°)
হেমন্ত…মার্গ পৌষ

ফাল্গুন মাস কোন্ ঋতুর অন্তর্গত? দ্বিবিধ গণনায় শিশির ঋতুর। কিন্তু আয়ন-গণনায় শিশির ঋতুর প্রথম মাস, বৈষুব গণনায় দ্বিতীয় মাস। ফাল্গুন পূর্ণিমায় কোন্ ঋতুর আরম্ভ? বসন্ত ঋতুর।

মনে করি আরও দুই সহস্র আট শত বৎসর অতীত হইয়াছে। তখন,

জ। আয়ন ঋতু। (খ্রি-পর ৩০০ অব্দ)

শিশির…মাঘ ফাল্গুন
বসন্ত… চৈত্র (৩৬০) বৈশাখ
গ্রীষ্ম… জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় (৯০°)
বর্ষা… শ্রাবণ ভাদ্র
শরৎ… আশ্বিন (১৮০°) কার্তিক
হেমন্ত…মার্গ পৌষ (২৭০°)

ঝ। বৈষুব ঋতু। (খ্রি-পর ৩০০ অব্দ)

শিশির…পৌষ (২৭০°) মাঘ	বর্ষা… আষাঢ় (৯০°) শ্রাবণ
বসন্ত… ফাল্গুন চৈত্র (৩৬০°)	শরৎ… ভাদ্র আশ্বিন (১৮০°)
গ্রীষ্ম… বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ	হেমন্ত…কার্তিক মার্গ

জ, ঝ, গণনা খ্রি-পূ ৩০০ অব্দে আরম্ভ হয় নাই, খ্রি-পর ৩০০ অব্দে হইয়াছিল। জ্যোতিষীরা খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দে এক উপায় দ্বারা কৃত্তিকায় আদিবিন্দু স্থির রাখিয়াছিলেন। সে কারণে জ, ঝ গণনা আসিয়াছে। আমাদের বর্তমান কালে এই ঋতু-বিভাগ চলিতেছে। কিন্তু বহুকাল হইতে অয়ন-গণনা সমধিক প্রচলিত আছে। চ, ছ যজুর্বেদের ও পরের গণনা। গ, ঘ তৎপূর্ববর্তী কালের গণনা। যজুর্বেদের কালে বৈশাখ পূর্ণিমায় ও কার্ত্তিক পূর্ণিমায় বাসন্ত ও শারদ বিষুবৎদিন পড়িত। ইহার পূর্বে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ও মার্গশীর্ষ পূর্ণিমায় হইত।

এখন কাল সংখ্যা করি। (১) বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধি আছে মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ। অর্থাৎ হায়নের বৎসরের প্রথম মাস। নিশ্চয় শরৎ ঋতুর প্রথম মাস। কারণ মাস অগ্রগত হয়। গ ঋতু-গণনায় দেখিতেছি মার্গশীর্ষ মাসে শরৎ ঋতু আরম্ভ হইয়াছে। সে সময় জ্যৈষ্ঠ মাসে বসন্ত ঋতুর আরম্ভ হইয়াছে।

সে কোন্ কালে ? যে কালে দৃশ্য মৃগশীর্ষ নক্ষত্রে সূর্য আসিলে ৩৬০° অংশে বাসন্ত বিষুব হইত, এবং সে দিন পূর্ণিমা হইলে চন্দ্র ও মৃগশিরা নক্ষত্র ১৮০° অংশে থাকিত। বর্তমান কালে দৃশ্য মৃগশিরা নক্ষত্র ৮২°৪০ অংশাদিতে আছে। এই নক্ষত্রে চন্দ্র পূর্ণ হইলে সূর্য ৮২°৪০´+১৮০°=২৬২°৪০´ অংশাদিতে থাকে। সূর্য ১৫ ডিসেম্বর এই স্থানে আসে। কিন্তু শারদ বিষুবৎদিন ২২ সেপ্টেম্বর। অতএব মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা প্রাচীন স্থান হইতে, ২২ সেপ্টেম্বর হইতে, ১৫ ডিসেম্বরে উপস্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণিমাটি ৮৪ দিন অগ্রগত হইয়াছে। ৭২ বৎসরে ১ দিন। ৮৪ দিনে ৮৪×৭২=৬০৪৮ বৎসর অতীত হইয়াছে। অর্থাৎ খ্রি-পূ ৪০০০ অব্দে মার্গশীর্ষ মাস অগ্রহায়ণ হইয়াছিল। মৃগশিরা নক্ষত্রটি মৃগনক্ষত্রের শীর্ষ বা মস্তক। তৎকালে মৃগনক্ষত্রটি ধরা হইত। মৃগের পূর্ব দিকের আর্দ্রা তারা ধরিলে খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ আসিবে। ফল্গুনী পূর্ণিমাদ্বারাও এই কাল আসিবে।

(২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্‌বেদের ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণে (৩।৩৩।৯) একটি আখ্যায়িকা আছে। "একদা প্রজাপতি স্বীয় কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। কেহ বলে সে কন্যা উষা, কেহ বলে দ্যৌঃ। দেবগণ দেখিয়া বলিলেন যাহা কেহ করে নাই প্রজাপতি তাহা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে শাসন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু আপনাদের মধ্যে তেমন বলবান্ কাহাকেও দেখিলেন না। তখন তাঁহারা তাঁহাদের ঘোরতম শরীর মিলিত করিলেন। তাহাতে এক দেবের উৎপত্তি হইল। তাঁহার নাম ভূতবান্। দেবগণ ভূতবান্‌কে বলিলেন, এই প্রজাপতি যাহা কেহ করে নাই তাহা করিয়াছেন। ইহাঁকে বাণদ্বারা বিদ্ধ কর। তখন তিনি প্রজাপতিকে লক্ষ্য করিয়া বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি

বাণবিদ্ধ হইয়া ঊর্ধ্বে উৎপতিত হইলেন। তাঁহাকে লোকে মৃগ বলে। তাঁহার কন্যা রোহিণী নক্ষত্র হইলেন। যিনি ভূতবান, তিনি পশুমান্। তিনি মৃগব্যাধ নক্ষত্র।"

তৈত্তিরীয় ও শতপথব্রাহ্মণেও আখ্যায়িকাটির উল্লেখ আছে। মহাভারতে বিস্তারিত আছে। প্রজাপতি নামের অর্থ, ভূতসমূহের পতি, স্রষ্টা ব্রহ্মা। ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রজাপতি নামের আরও অর্থ আছে। ইনি কালের অধিপতি, যুগের অধিপতি, বৎসর আরম্ভকালীন যজ্ঞের অধিপতি। অর্থাৎ নূতন বৎসর ও নূতন বৎসর আরম্ভকালীন যজ্ঞ।

আখ্যায়িকাটির মূল এই। একদা উষার পূর্বে মৃগনক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল। তখন নূতন বৎসর আরম্ভ ও তদুপলক্ষে যজ্ঞ হইয়াছিল। ইহার পূর্বে মৃগনক্ষত্রের উদয়ে বৎসর আরম্ভ হইত না। যাহা কেহ করে নাই, প্রজাপতি মৃগরূপ ধরিয়া তাহা করিয়াছেন।

বৎসর বৎসর মৃগনক্ষত্রের উদয় হইতেছে। কিন্তু উদয়দিনে নূতন বৎসর আরম্ভ হয় না। এখন কোন্ ঋতুতে কবে উদয় হয় তাহা দেখিলে বুঝি উল্লিখিত উদয় বাসন্ত বিষুবৎ-দিনের উদয়। ছয় মাস পরে সন্ধ্যাকালে উদিত হইত। তখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে পূর্ণিমাটি মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা। আর সে মাসে শরৎ ঋতুরও আরম্ভ। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ নামের অর্থ চিন্তা করিয়া যাহা পাইয়াছি, এখানে তাহাই পাইলাম।

ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, না কল্পিত? আকাশে বাণবিদ্ধ মৃগনক্ষত্র দেখিতেছি। সে বাণ বাড়াইলে পশ্চিম দিকে রোহিণী ও পূর্ব দিকে ব্যাধনক্ষত্র স্পর্শ করিবে। ইহা দেখিয়া আখ্যায়িকাটি রচিত হইতে পারিত। কিন্তু তদ্দ্বারা ভগবদ্গীতার "মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং," মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ প্রথম অর্থাৎ অগ্রহায়ণ এই নামের হেতু পাইতাম না।

ঋগ্‌বেদের রুদ্রদেব উক্ত ঘটনার কর্তা। কিন্তু আরম্ভ হইতে না বলিলে মধ্যপথ হইতে ঋগ্‌বেদের কোন দেবতাই বুঝিতে পারা যায় না। এক্ষণে সে প্রয়াসে না গিয়া সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিতেছি। ঋগ্‌বেদে রুদ্রদেব রুদ্রই বটেন। মৃগনক্ষত্রকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার রূপ কল্পিত হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণই মৃগনক্ষত্রে বামন, বরাহ, মহিষ, বৃষ ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন। মহিষমর্দিনীর উৎপত্তি সেখানে। ইনি তৎকালের শরৎবৎসর-আরম্ভকালীন যজ্ঞাগ্নি। ইনিই শিবা, ইনিই ঈশানী। আমরা মৃগনক্ষত্রকে কাল-পুরুষ বলি। নামটি সার্থক। ইনি কাল সংখ্যা করিয়া আসিতেছেন। তাহার আরম্ভ খ্রি-পূ ৪৫০০ বৎসর বলিতে পারি।

(৩) যদি মৃগনক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব ঘটে তবে সে নক্ষত্রের পূর্ব দিকে সপ্তম নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ অবশ্য হইবে। মৃগশিরা হইতে ফল্গুনী, সপ্তম নক্ষত্র। অতএব সেই পূর্বকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। ঋষিগণ নক্ষত্রের উদয় দেখিতেন। ফল্গুনীরও দেখিয়া থাকিবেন। আর দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনের সহিত যুক্ত করিয়া থাকিবেন। যদি তাহা না পারিয়া থাকেন, উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী পূর্ণিমা অবশ্য দেখিয়াছিলেন। কারণ ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয়কালে সূর্যার বিবাহ হইয়াছিল।

ঋগ্‌বেদে তিন চারি স্থানে সূর্যার বিবাহের উল্লেখ আছে। কেবল একটি স্থানে

(১০।৮৫) বিস্তারিত আছে। অথর্ব বেদেও বিবাহ-ক্রিয়া বর্ণিত আছে। ঋগ্‌বেদে সূর্যার বিবাহে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটা মন্ত্র ব্রাহ্মণের বিবাহে অদ্যাপি উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদে 'ফল্গুনী' নাম নাই, ফল্গুনী পূর্ণিমারও নাই। সেখানে ফল্গুনীর নাম অর্জুনী, অথর্ব বেদে ফল্গুনী। সূর্যা, সবিতার কন্যা। সবিতা, সোমের সহিত সূর্যার বিবাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবচক্রে অশ্বিদ্বয় সূর্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহ-ঘটনাটি বুঝিলে বলিতে পারি সে বিবাহ রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী পূর্ণিমায় সূর্যাস্তের পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। আরও বলিতে পারি প্রায় খ্রি-পূ ৩৫০০ অব্দে ঘটিয়াছিল। তখন ঋগ্‌বেদের অন্তিমকাল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

অগ্রহায়ণ মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। এই মত স্থাপন করিতে তিলক 'ওরায়ণ' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রোফেসর যাকোবি সূর্যার বিবাহ-দিনটি ধরিয়াছিলেন। তিনি রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যার বিবাহ মনে করিয়াছিলেন। প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ ধুআ ধরিলেন, নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ, ইহার সহিত সূর্যের কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্বে দেখাইয়াছি কথাটা সত্য নহে। উপস্থিত প্রসঙ্গে এই তর্কের প্রয়োজন নাই। কারণ যদি রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, ছয় মাস পরে সে নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ অবশ্য হইবে।

সূর্যার বিবাহ কবে হইয়াছিল, প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু ফল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ ও বৎসরের আরম্ভ, ইহার প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সম্বৎসর-সত্রের আরম্ভদিনে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ বটে (ছ ঋতুগণনা দেখুন)। তদনুসারে চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর থিব. বলিয়াছেন, ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস! এই কল্পনার কিছুমাত্র মূল নাই। কারণ ঋ ঋতুগণনায় খ্রি-পর ৩০০ অব্দের পরে ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস হইয়াছে, তৎপূর্বে হয় নাই। এখন ৭ই চৈত্র বাসন্ত বিষুব হইতেছে। আরও ৫০০ বৎসর ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস থাকিবে।

মার্গশীর্ষ মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। সেহেতু ইহার নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছিল। সে কোন্ কালে? ডক্টর থিব. বলিতেছেন,—"শরৎ হইতে একটা বৎসর আরম্ভ হইত। মার্গশীর্ষ মাসে তাহার আরম্ভ হইত। যেমন কেহ কেহ ফাল্গুনের পরিবর্তে চৈত্র মাসে বসন্ত আরম্ভ করিতেন।" প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ এই উত্তর অনুমোদন করিয়াছেন।*

* *Vedic Index.* Nakshatra.

আমি এই উত্তর বুঝিতে পারি নাই। প্রশ্ন হইল, "কত বৎসর পূর্বে মার্গশীর্ষ মাস অগ্রহায়ণ হইয়াছিল?" উত্তর হইল, "কেহ কেহ মার্গশীর্ষ মাস হইতে শরৎ ঋতু ধরিতেন।" বোধ হয় তিনি বলিতে চান, যেমন ফাল্গুন মাসে বসন্তের আরম্ভ হইলেও কেহ কেহ চৈত্র মাসে ধরিতেন এবং কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস হইলেও কেহ কেহ মার্গশীর্ষ মাস ধরিতেন। ইহা অসম্বদ্ধ আকাঙ্ক্ষা। বর্ষা-অপগমে শরৎ। এখন আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষা। এখন ভাদ্র মাস ঋতুর যেস্থানে, মার্গশীর্ষ মাস তখন সেই স্থানে ছিল। মার্গশীর্ষ তিন মাস অগ্রগত হইয়াছে। অর্থাৎ ছয় সহস্র বৎসর গত হইয়াছে।

চাতুর্মাস্য।

ঋগ্‌বেদের আদ্যকালে ঋষিগণ কৃষিকর্মের নিমিত্ত বৎসরকে তিন ভাগ করিতেন। এক এক ভাগে চারি মাস বা দুই ঋতু। তদনুসারে তাঁহারা তিনটি চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করিতেন। তখন বৎসরে তিন ঋতু গণ্য হইত। এই তিন ঋতুর আরম্ভ নির্ণয় করাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল। কবে বর্ষা ঋতু পড়িবে, ইহা না জানিলে তৎপূর্বে হলকর্ষণ ও বীজবপন হইতে পারে না। বর্ষা ঋতুর আরম্ভে যে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ হইত, তাহার নাম 'বরুণপ্রঘাস' ছিল। ইহার দুই ঋতু পূর্বে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর আরম্ভে যে যজ্ঞ হইত, তাহার নাম 'বৈশ্বদেব' এবং বর্ষার দুই ঋতু পরে অর্থাৎ হেমন্তের আরম্ভে যে যজ্ঞ হইত, তাহার নাম 'সাকমেধ' ছিল।

এখন আমরা একটি চাতুর্মাস্য জানি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি কেহ কেহ চাতুর্মাস্য ব্রত করিতেন। লোভনীয় ভোজ্য ত্যাগ করিয়া যতির আচরণ করিতেন। আষাঢ় শুক্ল একাদশীতে ইহার আরম্ভ, কার্তিক শুক্ল একাদশীতে অন্ত। প্রচলিত নাম হরির শয়ন-একাদশী ও উত্থান-একাদশী। যে বৎসর আষাঢ় শুক্ল একাদশী বিহিত হইয়াছিল সে বৎসর এই দিনে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। বর্ষা ঋতুর আরম্ভই চতুর্মাস গণনার মূল। কালে কালে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-তিথি অগ্রগত হইয়াছে। কিন্তু ঋতু-বিভাগ স্থির আছে। বসন্ত গ্রীষ্ম গতে বর্ষা। বসন্ত ঋতুর আরম্ভে 'বৈশ্বদেব'। যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে বৈষুব ঋতু গণনায় ফল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ। তদনুসারে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় গতে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস চাতুর্মাস্যের আরম্ভ। কিন্তু তৎকালে শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। আয়ন ঋতু গণনায় এই দিনই আসে। দেখা যাইতেছে, যজুর্বেদের কালে লোকে চাতুর্মাস্যের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া একটা প্রাচীন বিধি পালন করিতেন, শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ জানিয়াও আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বর্ষা-ঋতু-যাগ করিতেন।

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ শ্রৌত-সূত্র হইতে বৈশ্বদেব-চাতুর্মাস্য আরম্ভের তিনটি দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, (১) ফাল্গুনী পূর্ণিমা, (২) চৈত্রী পূর্ণিমা, (৩) বৈশাখী পূর্ণিমা।

(১০।৮৫) বিস্তারিত আছে। অথর্ব বেদেও বিবাহ-ক্রিয়া বর্ণিত আছে। ঋগ্‌বেদে সূর্যার বিবাহে যে মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহার দুই একটা মন্ত্র ব্রাহ্মণের বিবাহে অদ্যাপি উচ্চারিত হইয়া থাকে। ঋগ্‌বেদে 'ফল্গুনী' নাম নাই, ফল্গুনী পূর্ণিমারও নাই। সেখানে ফল্গুনীর নাম অর্জুনী, অথর্ব বেদে ফল্গুনী। সূর্যা, সবিতার কন্যা। সবিতা, সোমের সহিত সূর্যার বিবাহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবচক্রে অশ্বিদ্বয় সূর্যাকে লাভ করিয়াছিলেন। বিবাহ-ঘটনাটি বুঝিলে বলিতে পারি সে বিবাহ রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী পূর্ণিমায় সূর্যাস্তের পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। আরও বলিতে পারি প্রায় খ্রি-পূ ৩৫০০ অব্দে ঘটিয়াছিল। তখন ঋগ্‌বেদের অন্তিমকাল।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

অগ্রহায়ণ মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। এই মত স্থাপন করিতে তিলক 'ওরায়ণ' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রোফেসর যাকোবি সূর্যার বিবাহ-দিনটি ধরিয়াছিলেন। তিনি রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী নক্ষত্রে সূর্যার বিবাহ মনে করিয়াছিলেন। প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ ধুআ ধরিলেন, নক্ষত্র চন্দ্রের গৃহ, ইহার সহিত সূর্যের কোন সম্বন্ধ নাই। পূর্বে দেখাইয়াছি কথাটা সত্য নহে। উপস্থিত প্রসঙ্গে এই তর্কের প্রয়োজন নাই। কারণ যদি রবির উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, ছয় মাস পরে সে নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ অবশ্য হইবে।

সূর্যার বিবাহ কবে হইয়াছিল, প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ স্পষ্ট বলেন নাই। কিন্তু ফল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ ও বৎসরের আরম্ভ, ইহার প্রমাণ তুলিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণ-যজুর্বেদের সম্বৎসর-সত্রের আরম্ভদিনে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থের মতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ বটে (ছ ঋতুগণনা দেখুন)। তদনুসারে চৈত্র-বৈশাখ বসন্ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ডক্টর থিব. বলিয়াছেন, ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস! এই কল্পনার কিছুমাত্র মূল নাই। কারণ ঋ ঋতুগণনায় খ্রি-পর ৩০০ অব্দের পরে ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস হইয়াছে, তৎপূর্বে হয় নাই। এখন ৭ই চৈত্র বাসন্ত বিষুব হইতেছে। আরও ৫০০ বৎসর ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস থাকিবে।

মার্গশীর্ষ মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস ছিল। সেহেতু ইহার নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছিল। সে কোন্ কালে? ডক্টর থিব. বলিতেছেন,—"শরৎ হইতে একটা বৎসর আরম্ভ হইত। মার্গশীর্ষ মাসে তাহার আরম্ভ হইত। যেমন কেহ কেহ ফাল্গুনের পরিবর্তে চৈত্র মাসে বসন্ত আরম্ভ করিতেন।" প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ এই উত্তর অনুমোদন করিয়াছেন।*

---

* *Vedic Index.* Nakshatra.

আমি এই উত্তর বুঝিতে পারি নাই। প্রশ্ন হইল, "কত বৎসর পূর্বে মার্গশীর্ষ মাস অগ্রহায়ণ হইয়াছিল ?" উত্তর হইল, "কেহ কেহ মার্গশীর্ষ মাস হইতে শরৎ ঋতু ধরিতেন।" বোধ হয় তিনি বলিতে চান, যেমন ফাল্গুন মাসে বসন্তের আরম্ভ হইলেও কেহ কেহ চৈত্র মাসে ধরিতেন এবং কার্তিক মাস শরৎ ঋতুর প্রথম মাস হইলেও কেহ কেহ মার্গশীর্ষ মাস ধরিতেন। ইহা অসম্বদ্ধ আকাঙ্ক্ষা। বর্ষা-অপগমে শরৎ। এখন আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষা। এখন ভাদ্র মাস ঋতুর যেস্থানে, মার্গশীর্ষ মাস তখন সেই স্থানে ছিল। মার্গশীর্ষ তিন মাস অগ্রগত হইয়াছে। অর্থাৎ ছয় সহস্র বৎসর গত হইয়াছে।

চাতুর্মাস্য।

ঋগ্‌বেদের আদ্যকালে ঋষিগণ কৃষিকর্মের নিমিত্ত বৎসরকে তিন ভাগ করিতেন। এক এক ভাগে চারি মাস বা দুই ঋতু। তদনুসারে তাঁহারা তিনটি চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করিতেন। তখন বৎসরে তিন ঋতু গণ্য হইত। এই তিন ঋতুর আরম্ভ নির্ণয় করাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য ছিল। কবে বর্ষা ঋতু পড়িবে, ইহা না জানিলে তৎপূর্বে হলকর্ষণ ও বীজবপন হইতে পারে না। বর্ষা ঋতুর আরম্ভে যে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ হইত, তাহার নাম 'বরুণপ্রঘাস' ছিল। ইহার দুই ঋতু পূর্বে অর্থাৎ বসন্ত ঋতুর আরম্ভে যে যজ্ঞ হইত, তাহার নাম 'বৈশ্বদেব' এবং বর্ষার দুই ঋতু পরে অর্থাৎ হেমন্তের আরম্ভে যে যজ্ঞ হইত, তাহার নাম 'সাকমেধ' ছিল।

এখন আমরা একটি চাতুর্মাস্য জানি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছি কেহ কেহ চাতুর্মাস্য ব্রত করিতেন। লোভনীয় ভোজ্য ত্যাগ করিয়া যতির আচরণ করিতেন। আষাঢ় শুক্ল একাদশীতে ইহার আরম্ভ, কার্তিক শুক্ল একাদশীতে অন্ত। প্রচলিত নাম হরির শয়ন-একাদশী ও উত্থান-একাদশী। যে বৎসর আষাঢ় শুক্ল একাদশী বিহিত হইয়াছিল সে বৎসর এই দিনে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। বর্ষা ঋতুর আরম্ভই চতুর্মাস গণনার মূল। কালে কালে রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-তিথি অগ্রগত হইয়াছে। কিন্তু ঋতু-বিভাগ স্থির আছে। বসন্ত গ্রীষ্ম গতে বর্ষা। বসন্ত ঋতুর আরম্ভে 'বৈশ্বদেব'। যজুর্বেদে ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে বৈষুব ঋতু গণনায় ফল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ। তদনুসারে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় গতে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বরুণপ্রঘাস চাতুর্মাস্যের আরম্ভ। কিন্তু তৎকালে শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ হইত। আয়ন ঋতু গণনায় এই দিনই আসে। দেখা যাইতেছে, যজুর্বেদের কালে লোকে চাতুর্মাস্যের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া একটা প্রাচীন বিধি পালন করিতেন, শ্রাবণী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন-আরম্ভ জানিয়াও আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বর্ষা-ঋতু-যাগ করিতেন।

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ শ্রৌত-সূত্র হইতে বৈশ্বদেব-চাতুর্মাস্য আরম্ভের তিনটি দিনের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা, (১) ফাল্গুনী পূর্ণিমা, (২) চৈত্রী পূর্ণিমা, (৩) বৈশাখী পূর্ণিমা।

❦

এই তিন দিন এক কালের হইতে পারে না। যজুর্বেদে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ। তখন সূর্য ৩০০° অংশে আসিতেন। যজুর্বেদের এই বিধি ধরিলে তাহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমায় ও তাহারও দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্ত আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব খ্রি-পূ ৪৫০০ ও ৬৫০০ অব্দ পাইতেছি। সে সে কালের স্মৃতি চাতুর্মাস্য-গণনায় রক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু অন্য অর্থও হইতে পারে। উপরে দেখা গেল চৈত্র বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়, যজুর্বেদের বৈষুব ঋতুগণনায় বসন্ত ও গ্রীষ্ম বটে কিন্তু আয়ন-গণনায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় শ্রাবণ। অর্থাৎ চৈত্রী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভ। যদি এই অর্থ ধরি ফাল্গুনী পূর্ণিমা ও চৈত্রী পূর্ণিমা একই কালের দুই দিন। এক মতে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্তারম্ভ, অন্য মতে চৈত্রী পূর্ণিমায় আরম্ভ। তথাপি বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্তের আরম্ভের নিমিত্ত নিশ্চয় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে যাইতে হইবে। এতদ্দ্বারা খ্রি-পূ ৪৫০০ অব্দ পাইতেছি।

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। তাঁহারা ঋতুগণনা বুঝিতে পারেন না, মনে করিয়াছেন কোন নিয়ম ছিল না। কে সূর্যা চিনিতে পারেন নাই, সূর্যার বিবাহও বুঝিতে পারেন নাই, মনে করিয়াছেন বসন্ত ঋতুর আরম্ভে বিবাহ হইয়াছিল।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ষড়্‌বিংশ পল্লবে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলন-সংক্রান্ত ৬টি পদ আছে (সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, পদসংখ্যা ২৩৮৯-২৩৯৪)। এই পদগুলির মধ্যে একটি রূপনারায়ণের ভণিতায়, দুইটি বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং তিনটি চণ্ডীদাসের ভণিতায় আছে। শেষোক্ত তিনটি পদে বিদ্যাপতির নাম বা প্রসঙ্গ নাই। কাজেই এই পদ ৩টি ঐ মিলন-সংক্রান্ত কি না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এই ৬টি পদের পূর্বে প্রবেশক (Heading) দেওয়া আছে—'অথ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসমিলনং যথা'। এই প্রসঙ্গেই ষড়্‌বিংশ পল্লব যখন শেষ হইয়াছে, তখন মনে করা যাইতে পারে যে, শেষের তিনটি পদে চণ্ডীদাস রসের স্বরূপ বলিতেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় পদটির ভণিতায় আছে:—

> পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
>
> শুনতহি রূপনরাণ।
>
> কহ বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
>
> লছিমা পদ করি ধ্যান॥

অর্থাৎ চণ্ডীদাস প্রশ্নকর্ত্তা এবং বক্তা বিদ্যাপতি।

তৃতীয় পদে বিদ্যাপতি রসিক ও রসিকার তত্ত্ব বর্ণন করিতেছেন। অবশ্য দুই জন কবির ইষ্টগোষ্ঠী হিসাবে ধরিলে চণ্ডীদাসের উক্তি-পদগুলি ঐ প্রসঙ্গের মধ্যেই ধর্ত্তব্য বটে। 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'তে প্রথম দুইটি পদ নাই, শেষের চারিটি পদ আছে। প্রথম দুইটি পদ বিদ্যাপতির উক্তি বলিয়াই বোধ হয়, বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অনেকের মতে এই মিলন ব্যাপারটি নিছক কবিকল্পনা। দুই জন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কবির মধ্যে কথোপকথন কৌতূহল জাগ্রৎ করে। এই জন্য প্রচারের দিক্ দিয়া কোনও কবি এই মিলন ঘটাইয়াছেন, ইহাই মনে হয়।

সম্প্রতি বাঁকুড়ার একখানি পুথিতে এই মিলন-প্রসঙ্গ আরও বিস্তৃত ভাবে পাওয়া যাইতেছে। পুথিখানি ক্ষুদ্র বইয়ের আকারের। হস্তলিপি প্রাচীন, কিন্তু এই লিপি দেখিয়া পুথির বয়স স্থির করিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ, ইহাতে লিপিকালের পরিচয় আছে। এক স্থলে ১১০৫, আর দুই স্থলে সন ১১০২ ও ১১০৩ আছে।

পুথিখানি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে দেখিতে দিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পুরুলিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই পুথির স্বত্বাধিকারী। রামানন্দ বাবু তাঁহারই নিকট হইতে এই পুথি এবং অপর একখানি পুথি আনাইয়া আমাকে

দিয়াছেন। এই পুথিতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস মিলন প্রসঙ্গ আছে। উহাতে পদকল্পতরুধৃত প্রথম পদ ও শেষের ৩টি পদ নাই। তাহার স্থলে অন্য কয়েকটি পদ আছে। সেই পদগুলির কয়েকটিতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যাইতেছে। পদকল্পতরুর তিনটি পদের সহিত এই পদের প্রথম তিনটি পদের ঐক্য থাকিলেও পাঠভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। সেই জন্য সকলগুলি পদই প্রকাশ করা সঙ্গত মনে হইতেছে। এই পদগুলি হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, কোনও সহজিয়া লেখক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গলায় তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের ঝুলি ঝুলাইয়া দিয়াছেন।

ইতি শ্রীচণ্ডিদাস শ্রীবিদ্যাপতি সহ শ্রীরূপনারায়নরুক্তি
সাধ্য সাধমুক্তি কপনং লিক্ষতে ইতি।
জথা পদাবলী॥

সময় বসন্ত জাম দিন মাজ
বটতলে স[মু ?]রধনিতীর।
চণ্ডিদাস কবি রঞ্জন মীলন
পুলক কলে[বা]র গীর॥
দুহু জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ বৈঠত
দুহুক অবস প্রতিকার॥ধ্রু॥
দুহু জনে বৈঠল নৃভিত আলাপন
পুছত সহজ রস কী।
রসিক হইতে কিএ রস উপজায়ত
রস হৈতে রসিকহিঁ কি॥
রসিকা হইতে রোসিক হোয়ত
রসিক হইতে কীএ রসিকা।
রতি হইতে কাম কাম হইতে রতি
কাহাতে মানব ইথে অধিকা।
পুছত চণ্ডি দাস কবি রঞ্জন
সনতহিঁ রূপ নারান।
কহত বিদ্যাপতি ইহ রস কারণ
লছিমা পদ করি ধ্যান॥১॥

রসিক কারনে রসিকা রসিক
কারাদি ঘটনে রস।
রসিক কারনে রসিক হোয়ত
দুহাতে দুহার বস॥
সলভ প্রকৃতি কাম সুখগতি
সুলভ পুরুসে রতি।
দুহুক ঘটনে জে কীছু হোয়ত
ইথে তাহা নাঞি গতি॥*
দুহুক নয়নে নিকসএ বান
বান জে কামের হয়।
রতিক সেবন নাহিক কথন
তবে কৈছে নিকসয়॥
কাম দাবানল রতি সে শৃঙ্খল
সলিল প্রলয়ময়।
কুল কাঁটা খত প্রেমেতে আছএ
পচনে পবিত্র হয়॥
পচনে পচনে লোভ উপজএ
জবে ভেল ভ্রম[ব ?]ময়।
সেই সে বস্তুএ লীলা সে উপজে
তাহাকে রস জে কয়॥
ভনে বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস তথি
রূপ নারায়ন সঙ্গে।
দুহু আলিঙ্গন করিল তখন
ভাসিল প্রেমতরঙ্গে॥২॥

সকীর্ন্ন সম্ভোগ সঙ্গতি তীন।
সম্পূর্ন্ন লইয়া চারোর চিণ॥
নায়ক নাইকা গুনেতে তোল।
না হল্যে রসেতে ভাসিব ঘোল॥

* ইহার পরে পদকল্পতরুতে এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীতে কতকগুলি অতিরিক্ত কলি আছে।

সামান্নি　স্নী .হজে লয়।
চারিটী তিনেতে মিসাঞা রয়
ধিরত্রিত ধির সান্ত জে হয়।
ধিরের ললীত তাহাতে বয় ॥
সম্ভোগ চারিটী তিনেতে গত।
কোন ভাবে দুটী হইবে নত ॥
বিদ্যাপতি পুছে রসের রাসী।
চণ্ডিদাস কহে নিকটে বসি ॥৩॥

গুরু জন ভয় অবাক রয়।
সম্পূর্ণ সম্ভোগ তাহাকে কয় ॥
সম্ভোগ দুজনে চাতুরি ঢেউ।
অন্য নারি তাথে নাহিক কেউ ॥
সম্ভোগ গুনে ধীর সামান্য রয়।
সম্পূর্ণ সম্ভোগ একুই হয় ॥
সমিধ্যা নাইকা একেলি যোগ।
রাধার সহিত করএ ভোগ।
ধিরের ললীত সহজে পাই।
ইহার অধিক নাহিক ভাই ॥
সম্পূন্ন সম্ভোগ সভাই পায়।
ধির কৃত ধির নাএক পায় ॥
অজনি হইলে রাগেতে গত।
বুঝিয়া ভাবিতে হইবে নত ॥
চণ্ডিদাস কহে সনহে ভাই।
রসিকা রসিক যোগেতে পাই ॥ ৪ ॥

যোগেতে জনম　এ ভাব বিষম
কেবা তাহা জানে ভাই।
ভ্রমিতে ২　উনমত চিতে
রসিক নাগর পাই ॥
তাহাতে প্রবত্ত　সেই অনমত
প্রেমগন্ধ রসপুর।
ভোগ হৈল খিন　নিতুই নৌতন
বাড়িত সাধক সুর ॥

স্থির হৈল রতি　সে ভাব পিরিতি
পুরুস প্রকৃতি কে।
রূপের স্বরূপ　স্বরূপের রূপ
কুমার্য্যা হইল সে ॥
রতির তরঙ্গ　কিবা তার সঙ্গ
দেখিতে ২ আঁখি।
জে জন জজিছে　সে জন বুঝ্যাছে
সেই সে তাহার সাখি ॥
চণ্ডিদাস বলে　ধরি তার গলে
রজকীনি দেখি তথী।
লছিমা বলিয়া　পড়িল ঢলিয়া
অচেতন বিদ্যাপতি ॥ ৫ ॥

সরূপ ধরম　না হল্য বিসম
বড়ই বিসম দেখি।
সরূপ ধরম　মরম নাহিক
বাগান গাচার সাখি ॥
সাধক সে নয়　দিএ পরিচয়
সরূপে রূপেতে এক।
সে গুরু সেবক　না হল্য পৃথক
সাধনে পড়িল ঠেক ॥
ভেদ্য ভেদক　পস্য পোসক
ইতি বিবেচনা চাই।
দসার ঘটনা　কভু স্তন পান
কভুত রমন ভাই।
বালেতে প্রবর্ত্ত　পৌগণ্ডেতে গত
আর বাল্য নাহি তায়।
পৌগণ্ডে থাকীয়া　কৈসর ভাবিয়া
সাধক বলিএ তায়।
প্রাকৃত মধ্যম　মধ্যম উত্তম
এমনি সাধক চলে।
সিদ্ধের সাধক　প্রবর্ত্ত জজিতে
কোন উপাসক বলে ॥
উপাসনাক্রম　দধি দুগ্ধে যেন
ধ[দ ?]ধিতে নবনি হয়।
ঘৃত ছাড়ি কেন　মুনি দধি মন
দধি নাহি সয় ॥

রূপ নারায়ণ এ সব বচন
সনিল আপন কানে।
চণ্ডি বিদ্যাপতি রসের মরূতি
বসতি করূন মনে॥
রতি প্রেম গুটী দিনে হএ দুটী
অবুস্য জায়ত মার।
কিবা বিবেচনা খেনে দুটী জনা
বলিহারি জাই তার। ৬॥

কি নারি পুরুষ ভুবনে বহু।
ইহাতে রসিক আছএ কেহু॥
রসের নাগর রসের নারি।
দুহে দুহুঁ রহুঁ রসেত ভরি॥
জাহার জনম রসেতে রিজে।
সফল সরির ধরএ সে্জে॥
সে দেহ ধরিয়া কিসের তরে।
কাঠের পুতলি বহিয়া মরে॥
রসের সন্ধান করএ জে।
তা সম চতুর আছএ কে॥
চণ্ডিদাস বলে কাতর বানি।
সপুনে না ছাড়ি রসিকমণি॥ ৭॥

দেহেতে বইসে মদনরাজ।
রতিরসরঙ্গ তাহার কাজ॥
সদাই বিরাজে রসিকদেহে।
রসরতি মিলে তাহার লেহে॥
পিরিতি ২ পিরিতী কার।
পিরিতি নগরে বসতি জার॥
সেই সে জানএ পিরিতি কথা।
তাহার অন্তরে দুগুন বেথা॥
একুই আখর রাধার ভাব।
প্রেম বিলাইতে কি তার লাভ॥
প্রাকৃত বস্তু তাহাতে আছে।
কহে চণ্ডিদাস কে কাহা জাচে॥৮॥

সুন২ ওহে সাধক জন।
রসের ভজনে করহ মন॥
রসিক নাগর পাইবে কোথা।
রসের কৌতুক বাড়ীব তোথা॥
রসিক জুবতি পাইব জেই।
রসিক পাইলে না ছাড়ে সেই॥
আনন্দ মুরতি সরিরে জার।
রসিক সঙ্গেতে বিহার তার॥
সহজ দেহেতে বুঝিয়া নীবে।
দেহ ছাড়ি পুন সহজে যাবে॥
কি নারি পুরুস নহেত এক।
চণ্ডিদাস বলে পড়িল ঠেক॥৯॥

নন্দের নন্দন জনম যে।
এ কথা কহিতে আছএ কে॥
নন্দ না জানে জনম কথা।
না জানি ভজিল ভজন এথা॥
আনন্দ কালেতে জে রূপ ধরে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিএ তারে॥
আনন্দ লহরি জে কালে উঠে।

ইহার পরের পাতাটি সাদা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বের পদটি অসমাপ্ত বলিয়া একটি পাতা অবশিষ্ট কলির জন্য রাখা হইয়াছিল। পরে উহা আর সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ হইয়া উঠে নাই।

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবন

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, ডি. এস্‌সি

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী হিন্দু দ্বারাই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। গণিতের ইতিবৃত্তবিদ্‌গণ অধুনা তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু কোন্ হিন্দু মনীষী কোন্ কালে উহা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপিও নিরূপিত হয় নাই। প্রাচীন হিন্দু গণিতবিদ্‌গণ ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। 'বায়ুপুরাণে'র (১০১।২০৮) মতে উহার আবিষ্কর্তা ব্রহ্মা। পরবর্তী কালের কোন কোন হিন্দু গণিতবিদ্‌ও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।[১] ঐ কথার তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, ঐ সকল গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বেই দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু কত পূর্বে? বিগত দশাধিক বৎসর ধরিয়া আমরা ঐ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছি। কিন্তু এযাবৎ কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সম্প্রতি সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐ বিষয়ে একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] উহার প্রতিষ্ঠার্থ তিনি আমাদের কোন কোন লেখার তীব্র সমালোচনা ও খণ্ডনের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সমস্ত লেখা না দেখিয়াই তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন।

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী এবং উহার প্রাণস্বরূপ শূন্যচিহ্ন ও স্থানীয়মানতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াছি। উহাদের কতকগুলি হিন্দুস্থানে এবং অপরগুলি হিন্দুস্থানের বাহিরে, আমেরিকা ও ইটালীতে, প্রকাশিত হইয়াছে।[৩] দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনকাল সম্বন্ধে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, ডক্টর শ্রীঅবধেশনারায়ণ সিংহ এবং

১। সুপ্রসিদ্ধ (দ্বিতীয়) ভাস্করাচার্য্য (জন্ম ১০৩৬ শক) এবং তাঁহার টীকাকার কৃষ্ণদৈবজ্ঞ (১৫০০ শকপ্রায়) এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। আরব ঐতিহাসিক অল্-মাসুদি হিন্দুস্থানে আসিয়া (৮৩৪ শকে) তাহা শুনিয়াছিলেন। (লেখকের "Testimony of early Arab writers on the Origin of our Numerals" নামক প্রবন্ধ দেখ। *Bull. Cal. Math. Soc.*, Vol. 24 (1932), p. 195).

২। সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, "স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটির উদ্ভাবনকাল," 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ, ১১০-১১৯ পৃষ্ঠা।

৩। এ বিষয়ে আমাদের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে,—

(*i*) "A Note on the Hindu-Arabic Numerals," *Amer. Math. Mon.*, Vol. 33, 1926, pp. 220-1;
(*ii*) "Early Literary Evidence of the use of the Zero in India," *Amer. Math. Mon.*, Vol. 33, 1926, pp. 449-54;
(*iii*) "The present mode of expressing numbers," *Ind. Hist. Quart.*, Vol. 3, 1927, pp. 530-40;
(*iv*) "Early Literary Evidence of the use of the zero in India (Second Article)," *Amer. Math. Mon.*, Vol. 38, 1931, pp. 566-572;

মৎকর্ত্তৃক লিখিত 'হিন্দুগণিতের ইতিহাস' নামক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে[৪], দুই বৎসর পূর্বে, তাহা যুক্তি-প্রমাণ সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উহার পরে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহারও কিছু কিছু 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, তিনি আমাদের দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত প্রমাণগুলি দেখেন নাই।[৫] হয়ত উহার সুযোগও তাঁহার হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের মত

সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন, "৪৯৬ হইতে ৪৯৯ খ্রীষ্টীয় অব্দের মধ্যে বৃদ্ধ আর্য্যভট কর্ত্তৃক স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের প্রচলিত সঙ্কেতটি উদ্ভাবিত হইয়াছিল।"[৬] এই মতের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, উহাদের সারমর্ম এই,—

(১) "মূলপুলিশসিদ্ধান্তের কাল অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্য্যন্তও স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সংকেতটি উদ্ভাবিত হয় নাই। পক্ষান্তরে বৃদ্ধ আর্য্যভটের পরে রচিত জ্যোতিষের গ্রন্থগুলিতে এই সঙ্কেতটির অস্তিত্বের অখণ্ডনীয় প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।" (১১৪ পৃষ্ঠা)

(২) ৩৬০০ কল্যব্দে বা ৪২১ শকাব্দে রচিত 'আর্য্যাষ্টশতে' আর্য্যভট ঐ সঙ্কেতটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(*v*) "Early History of the principle of Place-value," *Scientia,* July, 1931;
(*vi*) "Testimony of early Arab writers on the origin of our Numerals," *Bull. Cal. Math. Soc.,* Vol. 24, 1932, pp. 193-218;
(৭) "মহাভারতে দশাঙ্কসংখ্যা", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ১-১৩ পৃষ্ঠা ;
(৮) "মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ. ১৬১-২ পৃষ্ঠা।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধেও প্রসঙ্গক্রমে ঐ বিষয়ের কোন কোন প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে,—

(১) "শব্দসংখ্যা-প্রণালী", ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮-৩০ পৃষ্ঠা ;
(২) "অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী", ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২২-৫০ পৃষ্ঠা ;
(৩) "নামসংখ্যা", ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা ;
(৪) "জৈনসাহিত্যে নামসংখ্যা", ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৮-৩৯ পৃষ্ঠা ;
(৫) "অঙ্কানাং বামতো গতিঃ", ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭০-৮০ পৃষ্ঠা ;

৪। Bibhutibhusan Datta and Avadhesh Narayan Singh, *History of Hindu Mathematics,* Part I, Lahore, 1935.

৫। উহার একটা প্রমাণ দিতেছি। "The Jaina School of Mathematics" (*Bull. Cal. Math. Soc.,* Vol. 21, 1929, pp. 115-145.) প্রবন্ধে উল্লিখিত 'অনুযোগদ্বারসূত্রে'র বচনের মূল দিই নাই বলিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অনুযোগ করিয়াছেন। কিন্তু "Early History of the Principle of Place-value" নামক প্রবন্ধে মূল বচনটি বস্তুতই উদ্ধৃত হইয়াছিল।

৬। তাঁহার পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, ১১৮ পৃষ্ঠা।

(৩) 'দশগীতিক' রচনাকালে (৪১৮ শকে) তিনি উহা জানিতেন না। "দশগীতিকে প্রদত্ত বর্ণমালা সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের সঙ্কেতে স্বর দ্বারা স্থানীয়মানের নির্দ্দেশ ও স্থান বিভাগ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট হয়ত দশগীতিক রচনাকালে আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি জানিতেন।" কিন্তু ঐ অনুমান ভ্রমাত্মক। তিব্বতীয় সংখ্যালিখন-প্রণালীর দৃষ্টান্তে ঐ অনুমান অসিদ্ধ হয়।

তাহার খণ্ডন

তাঁহার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবনকালে আচার্য্য আর্য্যভট স্থানীয়মানতত্ত্ব নিশ্চয়ই জানিতেন। বস্তুতঃ ঐ তত্ত্বের উপরই উহা সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন টীকাকারগণের ব্যাখ্যা সহায়ে আমরা তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। আর্য্যভটের গ্রন্থের প্রাচীনতম ভাষ্যকার তাঁহার শিষ্য (প্রথম) ভাস্কর। ভাস্করের ভাষ্য তখন আমাদের হস্তগত হয় নাই; এখন হইয়াছে। ঐ বিষয়ে তাঁহার মত কি, বলা উচিত। ভাস্কর লিখিয়াছেন,—

"বর্গ ইতি গণিতশাস্ত্রে বিষমস্থানস্যাখ্যা। তস্মিন্ বিষমস্থানে বর্গাক্ষরসংখ্যাভিধীয়তে। (অ)বর্গে ন বর্গঃ অবর্গসংস্থানঃ। তস্মিন্নবর্গসংজ্ঞিতে সমস্থানে অবর্গাক্ষরাণি তানি যকারাদীনি হকার-পর্য্যবসানানি" ইত্যাদি।

"খদ্বিনবকে স্বরা নব বর্গেঽবর্গে" আর্য্যভটের এই বাক্যের ব্যাখ্যা তিনি নিম্নোক্ত প্রকারে করিয়াছেন,—

"খদ্বিনবকে স্বরা নব বর্গে। খানি শূন্যানি খানাং দ্বিনবকং তস্মিন্ খদ্বিনবকে অষ্টাদশসু শূন্যাঙ্কিতেষু স্বরাঃ। নব বর্গেঽবর্গে বর্গে বর্গস্থানে নব স্বরাঃ। অষ্টাদশসু চ স্থানেষু নব বর্গস্থানানি। তত্র নবসু বর্গস্থানেষু নবস্বরাঙ্কে পুনস্তে নবস্বরাঃ গ্রাহ্যাঃ ইতি গ্রন্থ এব কেবলং পরিগৃহ্যন্তে।... এবং স্বরোপলক্ষিতেষু বর্গস্থানেষু বর্গাক্ষরসংখ্যা। অবর্গাক্ষরসংখ্যা চ স্বরোপলক্ষিতবর্গস্থানোত্তরে অবর্গস্থানে। অথবা বর্গে বর্গে চ ইত্যয়ং বীপ্সা বর্গে অবর্গে চ বর্গস্থানে অবর্গস্থানে চ ত এব নবস্বরাঃ। তদ্‌যথা প্রথমে বর্গস্থানে তদনন্তরাবর্গস্থানে চ...এবমিকারাদিষ্বপি স্বেষু বর্গাবর্গস্থানেষু যোজ্যম্।"

এইরূপে দেখা যায়, শিষ্য এবং ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যের মতেও স্বকীয় অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবনকালে আচার্য্য আর্যভট অঙ্কস্থানের কথা জানিতেন। ঐ স্থানগুলি তখন শূন্য দ্বারা চিহ্নিত হইত।[৭] স্বরবর্ণের সংখ্যা-জ্ঞাপিকা কোন শক্তি নাই। উহারা স্থান

৭। গণিতপাদের দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্যে ভাস্কর আরও স্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

"ন্যাসশ্চ স্থানানাং 0000000000"

পরবর্ত্তী টীকাকারগণও একবাক্যে সেই প্রকার কথা বলিয়াছেন। যথা, সূর্য্যদেব যজ্বা (জন্ম ১১১৩ শক) লিখিয়াছেন,—

'খানি শূন্যোপলক্ষিতানি সংখ্যাবিন্যাসস্থানানি তেষাং দ্বিনবকং খদ্বিনবকং তস্মিন্ খদ্বিনবকে শূন্যোপলক্ষিতস্থানাষ্টাদশ (১৮) ইত্যর্থঃ।"

নির্দ্দেশ করে মাত্র। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন, "দশগীতিকে প্রদত্ত বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা-প্রকাশের সঙ্কেতে স্বর দ্বারা স্থানীয়মানের নির্দেশ ও স্থানবিভাগ" বর্ত্তমান আছে। স্থানীয়মানই যদি রহিল, স্থানীয়মানতত্ত্বের আর বাকী রহিল কি? স্থানগুলি যে দশোত্তর, তাহা ত জানাই আছে। প্রকৃতপক্ষে, একক, দশক প্রভৃতি দশোত্তরা সংজ্ঞা অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থসমূহে তাহাদের উল্লেখ আছে।[৮] কিন্তু তখন উহারা সংখ্যা মাত্র খ্যাপন করিত। পরে যখন স্থানীয়মানতত্ত্বের উদ্ভাবন হইল, তখন উহারা অঙ্কস্থানও নির্দ্দেশ করিত। এই স্থাননির্দ্দেশের মূলেই স্থানীয়মানতত্ত্ব গূঢ় নিহিত আছে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনকালে আর্য্যভট স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন। স্থানীয়মানতত্ত্বের প্রাণস্বরূপ শূন্য চিহ্নও আর্য্যভটের তখন জানা ছিল।[৯] গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও পূর্বে তাহা স্বীকার করিতেন। তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, "যিনি স্থানগুলিকে বর্গ ও অবর্গরূপে বিভাগ করিয়াছিলেন, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান প্রণালীটি সেই আর্য্যভটের জানা ছিল।"[১০] পরে আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি সেই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি যে তিব্বতীয় সংখ্যালিখন-প্রণালীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, উহা ভ্রমাত্মক। *The Encyclopaedia of Pure Mathematics* নামক ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এক গ্রন্থ হইতে তিনি তিব্বতীয় সংখ্যাপ্রণালী সম্বন্ধে সমাচার সংগ্রহ করিয়াছেন। ভুল উহারই। 'মহাব্যুৎপত্তি'[১১] নামক প্রাচীন বৌদ্ধ কোশগ্রন্থ দেখিলে তিনি ঐ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন। ঐ কোশগ্রন্থ অষ্টম শকশতকে লাসাস্থ হিন্দু পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক সঙ্কলিত হয় এবং ঐ সময়েই তিব্বতী পণ্ডিতগণের সহায়ে উহার তিব্বতী ভাষান্তর হয়। পরে—সময় নিশ্চিতরূপে জানা নাই—উহার চীন এবং মঙ্গোল ভাষান্তরও হয়। সুতরাং উহাই সমধিক প্রামাণ্য। 'মহাব্যুৎপত্তি'র মতে একুশ, বাইশ, ইত্যাদি সংখ্যার তিব্বতী নাম যথাক্রমে বিশ-এক, বিশ-দুই, প্রভৃতি; সারদাবাবু কর্তৃক উল্লিখিত 'দুই-এক', 'দুই-দুই', প্রভৃতি নহে। সমগ্র মূলটাই উদ্ধৃত করিতেছি। তিব্বতী উচ্চারণ জ্ঞাত নহি বলিয়া যথাদৃষ্ট রোমান অক্ষরে লিখিতেছি।

৮। *History of Hindu Mathematics*-এর ১ম ভাগের ৯-১২ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ের সমস্ত সমাচার সংগৃহীত হইয়াছে।

৯। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শূন্যচিহ্ন ব্যতীত স্থানীয়মান নির্দ্দেশের অপর কোন উপায় হিন্দুস্থানে কখনও ছিল না। মধ্যযুগে য়ুরোপে 'আবেকশ' যন্ত্র দ্বারা অঙ্কের স্থান নির্দেশের রীতি প্রচলিত ছিল। উহাতে শূন্যচিহ্নের আবশ্যক হইত না। হিন্দুস্থানে ঐ প্রকার কিছু কখনও ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

১০। "The modern place-value notation was known to Aryabhata who classified the places as *barga* and *abarga*." (Sarada Kanta Ganguly. "Was Aryabhata indebted to the Greeks for his Alphabetic System of expressing numbers?" *Bul. Cal. Math. Soc.*, Vol. 17, p. 201.

১১। *Mahavyutpatti*, ed. Sakaki, Tokiyo, pp. 514 ff.

১ = gcig　　১১ = bcu-gcig
২ = gñis　　১২ = bcu-gñis
৩ = gsum　　...................
৪ = bshi　　১৯ = bcu-dgu
৫ = lña　　২০ = ñi-çu, thamp-pa ; (দুই সংজ্ঞার সমাহারে ইহাকে সংক্ষেপে ñer বলা হয়)
৬ = drug
৭ = bdun　　২১ = ñer-gcig, ñi-çu rtsa gcig
৮ = brgyad　　২২ = ñer-gñis, ñi-çu rtsa gñis]
৯ = dgu　　২৩ = ñer-gsum, ñi-çu rtsa gsum
১০ = bcu　　...................
　　২৯ = ñer-dgu

ইত্যাদি। এ সকল সংজ্ঞার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যদ্দারা তিব্বতীয় সংখ্যা-প্রণালীতে স্থানীয়মানের সদ্ভাবের অনুমান হইতে পারে। সুতরাং আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর মূলে স্থানীয়মানতত্ত্বের সদ্ভাবের বিরুদ্ধে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভুল সমাচার মূলেই তিনি ঐ শঙ্কা করিয়াছেন।

আর্য্যভটোক্ত সংখ্যাবাক্যবিশেষ বস্তুতঃ কোন্ সংখ্যা খ্যাপন করে, অঙ্কে পাত না করিলে তাহা জানা যায় না। ইহা বিশেষ প্রণিধান করিতে হইবে। যথা, 'খ্যু' = ৩২০০০০ ; খ্ ও য্ বোধিত সংখ্যাদ্বয়কে (যথাক্রমে ২ ও ৩কে) ইকার দ্বারা নির্দিষ্ট অঙ্কস্থানদ্বয়ে স্থাপন করিলেই উহা জানা যায় ; অন্যথা নহে। অন্য প্রকারে জানা গেলে বলিতে হইত, ইকার 'অঙ্কসংজ্ঞা' নির্দ্দেশ করে, 'অঙ্কস্থান' নহে। কিন্তু ইহা অতি প্রকৃত যে, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীতে স্বরবর্ণ 'অঙ্কস্থান'ই নির্দেশ করে ; উহার সংখ্যা-খ্যাপিবা শক্তি নাই। এবং ঐ স্থানসমূহ শূন্য চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত হইত। মূলসূত্রের "খদ্বিনবকে স্বরা" বাক্য হইতে তাহাই সহজে এবং নিশ্চিতরূপে প্রতীতি হয়। সুতরাং ঐ অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনের মূলে দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর সদ্ভাব বর্তমান, উহাতে কোন সংশয় নাই।

দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী এবং আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীর মধ্যে পার্থক্য কি, তাহা আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছিলাম। "উভয় প্রণালীই স্থানীয়মানতত্ত্বের উপর সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষের স্থানীয়মান সংখ্যা মধ্যে তাহার অবস্থিতি দেখিয়া বুঝিতে হয় এবং তাহা অব্যাহত রাখিবার জন্য সময় সময় কোন 'স্বপ্রকাশ' অঙ্কের সঙ্গে 'পরপ্রকাশ' শূন্য চিহ্ন (•) জুড়িয়া দিতে হয়। শূন্য চিহ্ন একাকী অবস্থান করিয়া কোন সংখ্যা খ্যাপন না করিলেও অপর অঙ্কচিহ্নের পার্শ্বে বসিয়া তাহার স্থানীয়মান নির্ণয় করে এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই অঙ্কটি কোন্ সংখ্যা খ্যাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীতে স্বরবর্ণ-সম্পৃক্ত করিয়াই প্রত্যেক

অঙ্কের স্থানীয়মান অপরোক্ষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং তাহার জন্য অপর কোন চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক অঙ্কের সঙ্গে তাহার স্থানীয়মান দৃঢ় নিবদ্ধ আছে বলিয়াই সংখ্যা-বাক্যের যে কোন অংশে তাহা রাখা যায়। কিন্তু দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষে তাহার স্থানীয়মান অপরোক্ষরূপে অভিনিহিত থাকে না বলিয়াই, সংখ্যা-বাক্যে তাহার অবস্থিতি পরিবর্তন করা যায় না। ফলে আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যাপ্রণালীর দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা দশমিক-প্রণালী হইতেও সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দশমিক-প্রণালী মতে ৬য়টি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে ৮০০০০০। কিন্তু আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী মতে তাহা একটা চিহ্নের দ্বারা লেখা যায়—'খ্' ।"[১২]

মহাভারতের প্রমাণ

'মহাভারতে'র বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইবার যুগে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল বোধ হয়। তথায় একটা আখ্যায়িকায় ব্রহ্মচারী অষ্টাবক্র এবং বিদেহরাজ জনকের বন্দীর বাদানুবাদ বিবৃত আছে।[১৩] উহার সমস্তটা একটা 'অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্ট' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহাতে আছে,—

"নবৈব যোগো গণনেতি শশ্বৎ।"[১৪]

'গণনা যোগ (বা অঙ্ক) সদাই নব মাত্র।' টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি (১৫০০ শককাল প্রায়) এই প্রকারেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "নবৈবাঙ্কাঃ ক্রমভেদেন স্থিত্বা যথেষ্টং সংখ্যা-বাচিনো ভবন্তি।" তিনি উহার একটা প্রাচীন টীকাও অনুবাদ করিয়াছেন, "গত্বাঽনন্তং নবাঙ্কী গণিতমিব···।" হিন্দুগণিতশাস্ত্রে 'অঙ্ক'সংজ্ঞা ৯ খ্যাপন করে। হিন্দুগণ শূন্যচিহ্নকে ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করেন না। সেই হেতু তাঁহারা নবাঙ্কের কথা বলেন। কিন্তু হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংখ্যা-প্রণালীতে শূন্য চিহ্নকে লইয়া সর্ব্বসমেত দশটা অঙ্ক আছে। সেই নিমিত্ত মধ্য-যুগের পাশ্চাত্য গণিতবিদ্গণ উহাকে দশাঙ্ক-সংখ্যা-প্রণালী বলিতেন। ঐ নামই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে জানা যায়, বর্ত্তমান মহাভারতকালের পূর্বে হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল।

এতদপেক্ষা প্রকৃষ্টতর এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণও 'মহাভারতে' আছে। তথায় উক্ত হইয়াছে, অগ্নি পনর দিন ধরিয়া খাণ্ডববন দাহ করিয়াছিল। তৎসম্পর্কে মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন,—

১২। "অক্ষর-সংখ্যাপ্রণালী," ৩০ পৃষ্ঠা।

১৩। 'মহাভারত', বনপর্ব, বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১৩৪।৮-২১ ; কুম্ভকোণম্ সংস্করণ, ১৩৬ অধ্যায়।

১৪। ঐ, ১৩৪।১৬ (বা ১৩৬।১৬)

"তত্বনং পাবকো ধীমন্ দিনানি দশ পঞ্চ চ।
দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাৎ॥"[১৫]

'হে ধীমন্! কৃষ্ণ এবং পার্থ কর্তৃক ইন্দ্র হইতে পরিরক্ষিত হইয়া অগ্নি পঞ্চদশ ("দশ পঞ্চ চ") দিনে সেই বন দগ্ধ করিয়াছিল।' উহার কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পাবকশ্চ তদা দাবং দগ্ধা সমৃগপক্ষিণম্।
অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিররাম সুতর্পিতঃ॥"[১৬]

'১৫ ("পঞ্চ চৈকঞ্চ") দিবস ধরিয়া মৃগপক্ষিসমাকুল (সেই) বন দগ্ধ করত পরম পরিতুষ্ট হইয়া অগ্নি বিরত হইল।'

এই দ্বিতীয় উক্তিস্থ "পঞ্চ চৈকঞ্চ" অবশ্যই ১৫ এই সংখ্যা খ্যাপন করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা প্রথম বচনের "দশ পঞ্চ চ" অর্থাৎ ১৫ সংখ্যার সহিত উহার বিরোধ হইবে। ইহাতে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয় যে, 'মহাভারতে'র প্রচলিত সংস্করণের সময়ে হিন্দুস্থানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত, এবং অঙ্কপাতে তাহাতে বামাগতি অনুসৃত হইত। সুতরাং দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীও তখন জানা ছিল।

শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বালগঙ্গাধর তিলক প্রমুখ মনীষিগণ প্রমাণ করিয়াছেন, শকপূর্ব ৫০০ অব্দে 'মহাভারত' বর্তমান আকারে ছিল।[১৭] সুতরাং দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীও ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল।

প্রক্ষিপ্ততাবাদের এবং পাঠভ্রান্তির শঙ্কা তুলিয়া দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালী ও স্থানীয়মানতত্ত্ব উদ্ভাবনের প্রাচীনত্ব বিষয়ে উপরে সংগৃহীত 'মহাভারত'-প্রমাণের মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বচন প্রক্ষিপ্ত কি না এবং উহাদের বর্ত্তমান পাঠ ভ্রান্ত কি না, তাহা নির্দ্ধারণের সুসঙ্গত উপায় কি? যত দিন না যুক্তিযুক্ত বিরোধী প্রমাণ পাওয়া যায়, তত দিন উহাদিগের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেই হইবে। আরও একপ্রকার শঙ্কা হইতে পারে। যদি ঐ যুগে দশাঙ্কসংখ্যা প্রচলিত ছিল, 'মহাভারতে' উহার প্রমাণ এত বিরল কেন? কিন্তু এই শঙ্কাও বিশেষ প্রবল নহে। কেন না, বলা যাইতে পারে যে, তখনও হয়ত জনসাধারণের মধ্যে উহা সুপ্রচলিত হয় নাই। যাহা হউক, দশাঙ্কসংখ্যার সদ্ভাবের অপর কিছু কিছু প্রমাণও 'মহাভারতে' পাওয়া গিয়াছে। উহারা তেমন স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ নহে। আমরা অন্যত্র উহাদের কতিপয় সংগ্রহপূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছি।[১৮]

১৫। মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২২৮।৪৬ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

১৬। ঐ, আদিপর্ব্ব, ২৩৪।১৫ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

১৭। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', পুণা, পৃষ্ঠা ৮৭-৯০, ১১১ ও ১৪৭; বালগঙ্গাধর তিলক, 'গীতারহস্য', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত বাঙ্গালা ভাষান্তর, কলিকাতা, ১৯৮১ সম্বৎ, ৫৬৭-৫৭১ পৃষ্ঠা।

১৮। "মহাভারতে দশাঙ্কসংখ্যা" এবং "মহাভারতে স্থানীয়মানতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধদ্বয় দেখ

পুরাণ

'অগ্নিপুরাণে'র "জ্যোতিঃশাস্ত্রসার" অধ্যায়সমূহের (১২১—১৪১) অন্তর্গত ১২২-৩, ১৩১ ও ১৪০-১ অধ্যায়ে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে। আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম।[১৯] কতিপয় দৃষ্টান্তও তখন প্রদর্শিত হইয়াছিল। যথা, 'খরাম'=৩০, 'রসার্ক'=১২৬ (১২২।৫); 'খেষব'=৫০, 'খযুগা'=৪০ (১২২।১৬); 'খার্ণব'=৪০, 'খরস' =৬০ (১২৩।৩); 'বেদাগ্নি'=৩৪, 'বাণগুণ'=৩৫ (১৪১।১৪) ইত্যাদি। উহার অন্যত্রও ঐ প্রকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা, 'রসবাণাক্ষি'=২৫৬ (২৯।২)। তত্রোক্ত জ্যোতিষ বিষয়ের আধারে গণনা করিয়া শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দপ্তরী নিরূপণ করিয়াছেন যে, উহার কাল ২৯৫০ কলিগতাব্দ (বা ২২৯ শকপূর্বাব্দ)।[২০] সমগ্র পুরাণের রচনাকাল উহা কি না, বলা যায় না। কিন্তু যে জ্যোতিষসিদ্ধান্ত তাহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে,[২১] উহার কাল ২২৯ শকপূর্বাব্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে জানা যায় যে, শকপূর্ব তৃতীয় শতকে (বা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে) স্থানীয়মানতত্ত্ব, এদেশের লোকে জানিত এবং নামসংখ্যায় উহার উপযোগ হইত।

'নারদপুরাণে'র "জ্যোতিষবর্ণন" নামক অধ্যায়েও (পূর্বখণ্ড, ৫৪ অধ্যায়) স্থানীয়-মান সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার আছে। যথা, 'খচতুষ্করদার্ণবাঃ'=৪৩২০০০০ (৫৪।৬১), ইত্যাদি।

"একং দশং চ শতঞ্চ সহস্রমযুতনিযুতে তথা প্রযুতম্।
কোট্যর্বুদঞ্চ বৃন্দং স্থানাৎ স্থানং দশগুণং স্যাৎ॥"

সারদা বাবু লিখিয়াছেন, স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্তমান সঙ্কেতটি 'আর্যভটীয়ে'র (রচনাকাল ৪২১ শক) গণিতপাদের এই দ্বিতীয় আর্যাটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকারের বচন পুরাণেও আছে।

পুরাণে কথিত আছে যে, প্রলয় তিন প্রকার—নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। কোন কোন পুরাণে নিত্য নামে চতুর্থ প্রকার প্রলয়েরও উল্লেখ আছে। কল্পান্তে যে প্রলয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক বা ব্রহ্মপ্রলয়। দ্বিপরার্ধিক প্রলয় প্রাকৃত এবং মোক্ষ আত্যন্তিক প্রলয়। এই প্রসঙ্গে 'পরার্ধ' কাহাকে বলে, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ব্রহ্মপুরাণে' আছে,—

"স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকৈকং গণ্যতে দ্বিজাঃ।
ততোঽষ্টাদশমে ভাগে পরার্ধমভিধীয়তে॥"[২২]

১৯। "নামসংখ্যা" নামক প্রবন্ধ, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ৭-২৭ পৃষ্ঠা; এ স্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য ১০-১ পৃষ্ঠা।

২০। শ্রীকেশবলক্ষ্মণ দপ্তরী, 'ভারতীয়জ্যোতিঃশাস্ত্রনিরীক্ষণ', ১৮৫১ শকাব্দা, নাগপুর, ৯৩-৫ পৃষ্ঠা।

২১। দপ্তরী মহাশয় মনে করেন, উহা 'বৃদ্ধবসিষ্ঠসিদ্ধান্ত'।

২২। 'ব্রহ্মপুরাণ', পুণা, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, ২৩১।৪

সেইরূপ 'বিষ্ণুপুরাণে'ও আছে,—

"স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্‌গুণ্যতে স্থলে।
ততোহষ্টদশমে স্থানে পরার্ধমভিধীয়তে॥"[২৩]

'অগ্নিপুরাণে'ও আছে,—

"স্থানাৎ স্থানং দশগুণমেকস্মাদ্‌গুণ্যতে স্থলে।
ততোহষ্টদশমে ভাগে পরার্ধমভিধীয়তে॥"[২৪]

'বায়ুপুরাণে' আছে,—

"একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রঞ্চৈব সংখ্যয়া॥৯৩॥
বিজ্ঞেয়মাসহস্রং তু সহস্রাণি দশাযুতম্।
একং শতসহস্রং তু নিযুতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥৯৪॥[২৫]
তথা শতসহস্রাণাং দশকং কোটিরুচ্যতে।
অর্বুদং দশ কোট্যস্তু অব্দং কোটিশতং বিদুঃ॥৯৫॥

*　　　*　　　*　　　*

সমুদ্রং মধ্যমঞ্চৈব পরার্ধমপরং ততঃ।
এবমষ্টাদশৈতানি স্থানানি গণনাবিধৌ॥১০২॥
শতানীতি বিজানীয়াৎ সংজ্ঞিতানি মহর্ষিভিঃ।"[২৬]

এই বচন 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'ও আছে।[২৭]

পার্জিটার লিখিয়াছেন, "পুরাণসমূহ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভিক শতাব্দীগুলির পরবর্ত্তী কালের হইতে পারে না।"[২৮] তাঁহার চেয়ে বেশী পুরাণবিদ্ আর কেহ আধুনিক কালে নাই, বোধ হয়। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার মত খুব সমাদরযোগ্য। অতএব, চতুর্থ খ্রীষ্টশতকে বা তৃতীয় শকশতকে পুরাণগুলি বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এদেশের প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে পুরাণ 'মহাভারত' অপেক্ষাও প্রাচীন। কথিত আছে যে, ভগবান্ ব্যাস পুরাণ সঙ্কলনের পরে 'মহাভারত' রচনা করেন। 'মহাভারতে' 'ব্রহ্মপুরাণে'র উল্লেখ আছে।[২৯] অপর পুরাণের মতে উহা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহা আদি

২৩। 'বিষ্ণুপুরাণ', বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৬।৩।৪

২৪। 'অগ্নিপুরাণ', বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৩৬৮।১৬। এই পুরাণের অন্যত্র (৩৬৬।৩৬) আছে, "পঙ্‌ক্তে শতসহস্রাদি ক্রমাদ্দশগুণোত্তরম্।"

২৫। এই পঙ্‌ক্তির ও পর পঙ্‌ক্তির পাঠে ভুল আছে।

২৬। 'বায়ুপুরাণ', বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১০১ অধ্যায়।

২৭। 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ', বোম্বে, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, ৩।২ অধ্যায়।

২৮। "The *puranas* cannot be later than the earliest centuries of the Christian era." (*Journ. Roy. Asiat. Soc.*, 1912, pp. 254-5.)

২৯। 'অনুশাসনপর্ব', ১৪৩.১৬,১৮

পুরাণ। যাহা হউক, এইরূপে দেখা যায়, 'অগ্নিপুরাণে' অন্তর্নিহিত 'জ্যোতিঃশাস্ত্রসারে'র প্রাচীনত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও, পূর্বোক্ত পুরাণ-প্রমাণে সিদ্ধ হয় যে, অন্ততঃ তৃতীয় শকশতকে দশাঙ্ক-সংখ্যাপ্রণালী এদেশে প্রচলিত ছিল।

অনুযোগদ্বারসূত্র

'অনুযোগদ্বারসূত্র' নামক প্রাচীন জৈন আগমগ্রন্থে পৃথিবীর মনুষ্যসংখ্যা এই প্রকারে নির্দেশিত হইয়াছে,—

"কোড়াকোড়িও এগুণতীসং ঠাণাইং তিজমলপয়স্স উবরিং চউজমলপয়স্স হেট্ঠা, অহব ণং ছট্ঠো বগ্গো পংচমবগ্গপড়ুপ্পন্নো, অহব ণং ছন্নউইছেঅণদায়ীরাসী"৩০

'ঐ রাশি কোটি কোটি প্রভৃতি একোনত্রিংশ স্থান (ব্যাপী), ত্রিযমলপদের উর্দ্ধে এবং চতুর্যমলপদের অধে, অথবা পঞ্চমবর্গগুণিত ষষ্ঠবর্গের (সমান), অথবা উহাকে ৯৬ বার (দুই দ্বারা) ছেদ করা যায়।'

যমলপদ কাহাকে বলে, ঐ সূত্রের ভাষ্যে হেমচন্দ্র (জন্ম ১০১১ শক) তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"অষ্টানামষ্টানামঙ্কস্থানানাং যমলপদমিতি সাময়িকী সংজ্ঞা; ততস্ত্রয়াণাং যমলপদানাং সমাহারস্ত্রিযমলপদং চতুর্বিংশত্যঙ্কস্থানলক্ষণম্ অথবা তৃতীয়ং যমলপদং ষোড়শানামঙ্কস্থানামুপরিতনাঙ্কাষ্টকলক্ষণমিতি স এবার্থঃ তস্য ত্রিযমলপদস্য উপরি প্রস্তুতমনুষ্যা ভবন্তি, চতুর্বিংশত্যঙ্কস্থানান্যতিক্রম্য জঘন্যপদবর্তিনাং গর্ভজমনুষ্যাণাং সঙ্খ্যা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তর্হি চতুরাদীন্যপি যমলপদানি ভবন্তি? নেত্যাহ—'চউজমলপয়স্স হেট্ঠে'তি চতুর্ণাং যমলপদানাং সমাহারশ্চতুর্যমলপদং দ্বাত্রিংশদঙ্কস্থানলক্ষণম্ অথবা চতুর্থযমলপদস্যাধস্তাদেকোনত্রিংশদঙ্কস্থানেষ্বনন্তরমেব বক্ষ্যমাণস্বরূপেষু প্রকৃতমনুষ্যসংখ্যা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ, অথবা দ্বৌ বর্গাবনন্তরমেব বক্ষ্যমাণস্বরূপৌ যমলপদমিতি সাময়িক্যেব পরিভাষা ততস্ত্রয়াণাং যমলপদানাং সমাহারস্ত্রিযমলপদং—বর্গষট্লক্ষণং তস্যোপরি চতুর্যমলপদস্য—বর্গাষ্টলক্ষণস্যাধস্তাদেতন্মনুষ্যসংখ্যা লভ্যতে, ষষ্ঠবর্গস্যোপরি সপ্তমবর্গস্য ত্বধস্তাৎ প্রস্তুতমনুষ্যসংখ্যা প্রাপ্যত ইতি হৃদয়ম্, তত্রাপ্যেতান্যেবৈকোনত্রিংশদঙ্কস্থানানি মন্তব্যানি।"

প্রাচীন জৈনগণিতের ভাষায়৩১

১ম বর্গ $= ২ \times ২ = ৪ = ২^{২}$,

২য় বর্গ $= ৪ \times ৪ = ১৬ = ২^{৪}$,

৩০। 'অনুযোগদ্বারসূত্র,' হেমচন্দ্র সূরীকৃত ভাষ্য সহ মেহসানা হইতে আগমোদয়সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৪২ সূত্র। উদ্ধৃত অংশের সংস্কৃত ছায়া এবংপ্রকার,—

"কোটীকোটয় একোনত্রিংশৎস্থানানি ত্রিযমলপদস্য উপরি চতুর্যমলপদস্য অধস্তাৎ, অথবা নমু ষষ্ঠবর্গঃ পঞ্চমবর্গপ্রত্যুৎপন্নঃ, অথবা নমু ষন্নবতিছেদনদায়ী রাশিঃ।"

৩১। লেখকের "The Jaina School of Mathematics" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (১৩৭ পৃষ্ঠা)

৩য় বর্গ = ১৬ × ১৬ = ২৫৬ = $২^{৮}$,

৪র্থ বর্গ = ২৫৬ × ২৫৬ = ৬৫,৫৩৬ = $২^{১৬}$,

৫ম বর্গ = $(৬৫,৫৩৬)^{২}$ = ৪,২৯৪,৯৬৭,২৯৬ = $২^{৩২}$,

৬ষ্ঠ বর্গ = $(৪,২৯৪,৯৬৭,২৯৬)^{২}$

= ১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬ = $২^{৬৪}$

পূর্ব্বোক্ত বচন অনুসারে

মনুষ্যসংখ্যা = (৬ষ্ঠ বর্গ) × (৫ম বর্গ)

= (১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬) × (৪,২৯৪,৯৬৭,২৯৬)

= ৭৯,২২৮,১৬২,৫১৪,২৬৪,৩৩৭,৫৯৩,৫৪৩,৯৫০,৩৩৬

= $২^{৬৪} × ২^{৩২} = ২^{৯৬}$

এইরূপে দেখা যায়, সংখ্যাটি সত্যই ২৯ অঙ্কস্থানব্যাপী ; উহাকে সত্যই ৯৬ বার অর্ধীকৃত করা যায়।

একই সংখ্যা এই ভাবে চারি প্রকারে নির্দেশিত হইল কেন ? এই প্রশ্ন করা যায়। 'পঞ্চমবর্গ-গুণিত ষষ্ঠবর্গের (সমান)' কিম্বা 'উহাকে ৯৬ বার (দুই দিয়া) ছেদ করা যায়', এ কথা না বলিলে সেই ২৯-পদী সংখ্যাটি কি, তাহা জানা যাইত না। সংখ্যাটি অতি বৃহৎ, সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবিত ভুল নিরসনার্থই বোধ হয়, উহা একাধিক প্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর একটা কথাও মনে করিতে হইবে। সংখ্যাটি ২৯-পদী। সুতরাং উহাকে বিবৃত করিতে এক, দশ প্রভৃতি ২৯টি অঙ্কসংজ্ঞার প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন জৈনগণ ততটা অঙ্কসংজ্ঞা জানিতেন না। যে কয়টা জানিতেন, সেগুলিও ইংরাজী অঙ্ক-সংজ্ঞার ন্যায় অল্প কতিপয়ের সমাহারে সৃষ্ট। যথা, এক, দশ, শত, সহস্র, দশসহস্র, শতসহস্র, দশশতসহস্র, কোটি, দশকোটি, শতকোটি, ইত্যাদি। এই প্রকারে ২৯ সংজ্ঞা সৃষ্টি করিতে গেলে উহারা অতি দীর্ঘ ও উৎকট হইয়া পড়িবে। এবং উহাদের দ্বারা বিবৃত সংখ্যা বুঝিতে লোক দিশেহারা হইয়া পড়িবে।[৩২] সুতরাং হেমচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন, "এই রাশিকে কোটিকোট্যাদি প্রকারে বলিতে কেহই সমর্থ নহেন।"[৩৩] উহাকে নির্দেশার্থ তিনি দুইটি প্রাচীন গাথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে সংখ্যাটি নামসংখ্যা দ্বারা খ্যাপিত হইয়াছে।

"ছত্তিন্নি তিন্নি সুন্নং পংচেব য ণব য তিন্নি চত্তারি।
পংচেব তিন্নি নব পংচ সত্ত তিন্নেব তিন্নেব॥
চউ ছ দো চউ একো পণ দো ছক্কেক্কগো য অট্ঠেব।
দো দো ণব সত্তেব য অংকট্ঠানা পরাহুত্তা॥"

৩২। "জৈনসাহিত্যে নামসংখ্যা" প্রবন্ধের ৩৭-৮ পৃষ্ঠা দেখ।

৩৩। "অয়ং চ রাশিঃ কোটিকোট্যাদিপ্রকারেণ কেনাপ্যভিধাতুং ন শক্যতে।"

এই গাথাদ্বয় কোথা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ হেমচন্দ্র করেন নাই। সেই হেতু উহারা কত প্রাচীন, তাহা নিরূপণ করা যায় না।[৩৪] নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তচক্রবর্তী (৯০০ শক) ঐ বৃহৎ সংখ্যাটিকে অক্ষরসংখ্যা দ্বারা নির্দেশ করিয়াছেন।[৩৫]

সার্পেন্টিয়ারের মতে 'অনুযোগদ্বারসূত্র' খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভের পূর্ব্বে বিরচিত।[৩৬] সুতরাং দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালী উহার পূর্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। 'ব্যবহারসূত্র' নামক জৈন আগমেও "গণনাস্থানে"র উল্লেখ আছে।[৩৭]

তিলোয়পন্নত্তি

'তিলোয়পন্নত্তি' (সংস্কৃত 'ত্রিলোক-প্রজ্ঞপ্তি') নামক জৈন আগম গ্রন্থে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার প্রয়োগ আছে। মহীশূর-রাজের পাণ্ডুলিপিশালায় ঐ গ্রন্থের একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। উহাতে গ্রন্থের শেষ সংস্করণের কাল উল্লিখিত আছে—৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং উহা প্রাচীন। আমরা এখানে উহা হইতে নামসংখ্যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।[৩৮]

(১) "নবচদুদুগখত্তিয়দুগচউক্কেক্ক
১৪২৩০২৪৯" (৭ শ্লোক)

(২) "সুংণনভগয়ণপণদুগএকখত্তিয়সুংণনবনহাসুণংছক্কেক
১৬০০৯০৩০১২৫০০০" (৮)

(৩) "অট্ঠছানংসুংণংপঞ্চদুরিগিগয়ণতিনহনবসুংণ
অংবর ছক্কেক্কো হিং অংককাম…
১৬০০৯০৩০১২৫০০০০০০০০০" (১০)

(৪) "অংবরপংচেক্কচউনবছপণসুংণব য সত্তেব
অংককমে জোয়ণয়া জংবুদীবস্স খেত্তফলং ॥৫৬॥
৭৯০৫৬৯৪১৫০—
একো কোসো…"

৩৪। এই গাথাদ্বয় 'পঞ্চসংগ্রহে'ও উদ্ধৃত হইয়াছে। তথায় দ্বিতীয় গাথার শেষ চরণের 'অংকট্ঠানা ইগুণতীসং' পাঠ আছে। তথায় বলা হইয়াছে যে, গাথাদ্বয় "পূর্বপুরুষপ্রণীত"। ('অভিধানরাজেন্দ্র', ৪র্থ খণ্ড, ১৫৩১ পৃষ্ঠা)। সুতরাং উহারা অতি প্রাচীন মনে হয়।

৩৫। নেমিচন্দ্রসিদ্ধান্তচক্রবর্তী-কৃত 'গোম্মটসার', জীবকাণ্ড, ১৫৮ গাথা।

৩৬। 'উত্তরাধ্যয়নসূত্র', জে. সার্পেন্টিয়ার কর্তৃক সম্পাদিত, উপসালা, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, ভূমিকার ২৯-৩০ পৃষ্ঠা।

৩৭। 'ব্যবহারসূত্র', ১ম অধ্যায়।

৩৮। সংযুক্ত-প্রদেশের এটা জেলার জমিদার শ্রীকামতাপ্রসাদ জৈন মহাশয় ঐ গ্রন্থের এক প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে উহার উপযোগ করিয়াছি।

বাক্‌শালী পাটীগণিত

তথাকথিত বাক্‌শালী পাটীগণিতের সর্বত্রই দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার হইয়াছে। এ স্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

"৮৮০/৮৪ | ৯৬৪/১৬৮ | গুণিত জাতং | ৮৪৮৩২০/১৪১১২ |

চত্বারিংশপৃথক্‌স্থানানাং বর্গং | ১৬০০ | এষ উপরা(হ্) পাত্য শেষং | ৮৪৬৭২০/১৪১১২ |

বর্ত্য জাতং | ৬০ | "[৩৯]

"(৪০) ৫২৮০/৩৮৭২৪ | ৪৪৪০০৪/৩৮৭২৪ |

অর্ধং কর্তব্যং (ত)ত (জাতং)

| (৪০)৫২৮০/(৩) ৮৭২৪ | ৪৪৪০০৪/৭৭৪৪৮ |

সংগুণ্য জাতং অ(ংশ অংশেষু) হর হরেষু গু(ণিতং ;

| (১) ৭৯৯৪৫৯৪১১২০/২৯৯৯০৯৬৩৫২ | "[৪০]

নামসংখ্যাপ্রণালীর দুই একটা দৃষ্টান্তও তাহাতে পাওয়া যায়। যথা, একটা উদাহরণে

"ষড়্‌বিংশচ ত্রিপঞ্চাশ একোনত্রিংশ এব চ।
দ্বাব(ষ্টি) ষড়্‌বিংশ চতুঃচত্বারিংশ সপ্ততি ॥
চতুঃষষ্টি ন(ব)······ংশনন্তরম্।
ত্রিরশীতি একবিংশ অষ্ট······পকম্ ॥"[৪১]

এই বৃহৎ সংখ্যাকে অঙ্কে পাত করিতে বলা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দেওয়া আছে।

২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৪৯৯৪···৮৩২১৮

তাহাতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এখানে দক্ষিণাগতিক্রমে নামসংখ্যার ব্যবহার হইয়াছে।

বাক্‌শালী পাটীগণিতের রচনাকাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। উহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা বস্তুতঃ দুঃসাধ্য। উহার লিপির তত্ত্ব বিচার দ্বারা হর্নেল অনুমান করেন, বর্তমান পাণ্ডুলিপিখানি সম্ভবতঃ সপ্তম, কি অষ্টম শকশতকে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু অপর কারণে তিনি মনে করেন, মূল গ্রন্থ ঐ সময়ের বহু পূর্ব্বে দ্বিতীয়, কি তৃতীয় শকশতকে বিরচিত হইয়াছিল। বাংলার প্রমুখ ভারতীয় লিপিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহার অনুমান সঙ্গতবোধে অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু কে' উহার প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে উহার রচনাকাল একাদশ শকশতক। গ্রন্থের রচনাকাল এবং লিপিকাল তিনি পৃথক্ মনে করেন না।

৩৯। 'বাক্‌শালী পাণ্ডুলিপি', ৫৬ক পৃষ্ঠা।

৪০। ঐ, ৬৪ক পৃষ্ঠা। ( ) এই বন্ধনীর মধ্যে অংশ পুনরুদ্ধৃত করা হইয়াছে।

৪১। ঐ, ৫৮ক পৃষ্ঠা

ভারতীয় লিপিতত্ত্ব সম্বন্ধে কে'র জ্ঞান অতি সামান্য। হিন্দুগণিতের ইতিহাসও তিনি বিশেষ জানেন না। সুতরাং ঐ সকল বিষয়ে কোন সুনিশ্চিত মত দিবার অধিকার তাঁহার নাই। তাই বাক্‌শালী পাটীগণিতের রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁহার মতের কোন মূল্য নাই। হিন্দুগণিতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের দিক্ হইতে তুলনামূলক সূক্ষ্ম বিচার করতঃ আমরা দেখাইয়াছি, ঐ বিষয়ে হর্নেলের অনুমান সমীচীন হইয়াছে।[৪২] এইরূপে দেখা যায়, দ্বিতীয়, কি তৃতীয় শকশতকেও হিন্দুস্থানে দশাঙ্কসংখ্যা এবং নামসংখ্যা-প্রণালীর ব্যবহার হইত।

মূলপুলিশসিদ্ধান্ত

বরাহমিহিরকৃত 'বৃহৎসংহিতা'র স্বরচিত বিবৃতিতে উৎপল ভট্ট (৮৮৮ শক) 'মূলপুলিশসিদ্ধান্ত' হইতে একটা বচন অনুবাদ করিয়াছেন।

"খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রিপাঃ।
ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"[৪৩]

এখানে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সারদাকান্ত গাঙ্গুলী মনে করেন, "ভট্টোৎপল উক্ত বচনটি মূলপুলিশসিদ্ধান্ত হইতে উদ্ধৃত করেন নাই; স্থানীয়মান অনুসারে সংখ্যালিখনের বর্ত্তমান সঙ্কেতটি প্রচলিত হওয়ার পরে পুলিশসিদ্ধান্তের যে সকল সংস্করণ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের কোন একটি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।" কেন না, সুধাকর দ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি'তে উহাকে পুলিশসিদ্ধান্তের বচন বলা হইয়াছে। কার্ণ ও শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত কর্তৃক পরিদৃষ্ট ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" পাঠ ছিল। এ কথা তাঁহারা বলিয়াছেন।[৪৪] দ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থ দেখা সত্ত্বেও আমি তাঁহাদের অনুসরণে উহাকে মূলপুলিশসিদ্ধান্তের বচন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাহার হেতুও নির্দ্দেশ করিতেছি। দ্বিবেদী ছয়খানা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা "ব্যবহারের অযোগ্য" ছিল। সুতরাং পুস্তক সম্পাদনে তিনি প্রকৃতপক্ষে পাঁচখানা পাণ্ডুলিপির উপযোগ করিয়াছিলেন। কার্ণও 'বৃহৎসংহিতাবিবৃতি'র

৪২। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, "The Bakhshali Mathematics," *Bull. Cal. Math. Soc.*, ২১ খণ্ড, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১-৬০ পৃষ্ঠা।

৪৩। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত "শব্দসংখ্যাপ্রণালী" নামক আমাদের প্রবন্ধে "রাত্রিপাঃ" স্থলে "রাত্রয়ঃ" পাঠ ছিল। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পত্রিকায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ঐ পাঠভুল প্রদর্শন করেন। পর সালে "নাম-সংখ্যা" প্রবন্ধে আমরা ঐ ভুল স্বীকার করি।

৪৪। কার্ণকর্তৃক সম্পাদিত 'বৃহৎসংহিতা,' ভূমিকার ৫০ পৃষ্ঠা। শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত-রচিত 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র,' ১৬৩ পৃষ্ঠা।

পাঁচখানি পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একখানা ছিল বেনারস কলেজ লাইব্রেরীর, যাহা দ্বিবেদীও ব্যবহার করিয়াছিলেন। উহা অতি বিকৃত ছিল। যাহা হউক, দ্বিবেদী ও কার্ণ সমানসংখ্যক পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। দীক্ষিত কয়খানি পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, লেখেন নাই। যদি একখানাই ধরা যায়, তবেও তিনি এবং কার্ণ একত্রে 'বৃহৎসংহিতা-বিবৃতি'র দ্বিবেদী-দৃষ্ট সংখ্যা অপেক্ষা অধিক পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত বচন সম্বন্ধে কার্ণ ও দীক্ষিতের সাক্ষ্য দ্বিবেদীর সাক্ষ্য হইতে অধিক বিশ্বাস্য মনে করিয়াছিলাম।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' "সমবৃত্তা" নামে এক তুলাদণ্ডের উল্লেখ আছে। উহার লৌহদণ্ডের উপর মানপরিজ্ঞাপক চিহ্ন খোদিত থাকিত। সর্বপ্রথম চিহ্ন কর্ষ মানের। অপরাপর চিহ্ন সম্বন্ধে কৌটিল্য লিখিয়াছেন,[৪৫]

"ততঃ কর্ষোত্তরং পলং, পলোত্তরং দশ পলং, দ্বাদশ পঞ্চদশ বিংশতিরিতি কারয়েৎ। ততঃ আশতাদ্দশোত্তরং কারয়েৎ। অক্ষেষু নান্দীপিনদ্ধং কারয়েৎ।"

'তার পর এক এক কর্ষ বৃদ্ধি করিয়া পল (পর্য্যন্ত), পল পল বৃদ্ধি করিয়া দশ পল (পর্য্যন্ত), দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও বিংশতি এই চিহ্ন করিবে। অতঃপর দশ বৃদ্ধি করিয়া শত পর্য্যন্ত চিহ্নিত করিবে। অক্ষস্থলাদিতে নান্দীচিহ্ন খোদিত করিবে।' প্রাচীন টীকাকার ভট্টস্বামী ও আধুনিক টীকাকার মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যার প্রতিকূলে আমরা মনে করি, ঐ স্থলে "অক্ষেষু" শব্দ ২৫, ৩৫, ৪৫, ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতেছে। এখন প্রশ্ন, কি প্রকারে একমাত্র অক্ষ শব্দ দ্বারা এতগুলি সংখ্যা নির্দেশ করা যাইতে পারে? নামসংখ্যাপ্রণালী মতে ২৫, ৩৫, ৪৫, ইত্যাদি সংখ্যা বুঝাইতে 'অক্ষকর', 'অক্ষাগ্নি', 'অক্ষবেদ' ইত্যাদি পদ ব্যবহৃত হইতে পারে। সুতরাং অক্ষ শব্দের দ্বারা উহাদের সকলকে লক্ষণা করা যাইতে পারে। উহা হইতে আমরা অনুমান করিয়াছিলাম যে, কৌটিল্য (শকপূর্ব ৫ম শতক) স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন এবং তৎসহকারে নামসংখ্যা ব্যবহার করিয়াছেন।[৪৬] ঐ অনুমানের সমর্থনে, কৌটিল্যের গ্রন্থ হইতে গণনাবিষয়ক নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, আমরা প্রদর্শন করিয়াছিলাম যে, সংখ্যালিখনের কোন না কোন প্রকার সহজ ও সরল পদ্ধতি জানা, কৌটিল্যের পক্ষে খুবই সম্ভব ; এমন কি, তাহা অপরিহার্য্য। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ও উহা বিশ্বাস করেন।[৪৭] কিন্তু উপরোদ্ধৃত কৌটিল্য-বাক্যের আমাদের ব্যাখ্যা তিনি

৪৫। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র', শ্রীশ্যামশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ইংরাজী ভাষান্তরিত, ২য় অধিকরণ, ১৯শ অধ্যায়।

৪৬। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ২১-২ পৃষ্ঠা।

৪৭। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, "আঙ্কিক শব্দ", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২৩৫-২৪৮ পৃষ্ঠা।

স্বীকার করেন নাই। প্রতিবাদে তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহা সঙ্গত মনে হয় না। সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের ব্যাখ্যাকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। কিন্তু তন্মূলে আমরা যে অনুমান করিয়াছিলাম, উহা তিনি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, কৌটিল্যের পরে ৭৫০ বৎসরের মধ্যে কোনও গ্রন্থে স্থানীয়মানতত্ত্বের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি, তাঁহার কর্ম্মভূমি মগধের অন্তর্গত রোটাসের শিলালিপির উৎকীর্ণ কাল (১৩২ শক) যোগবিধি সহকারে নামসংখ্যায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাই তিনি বলেন, কৌটিল্য স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না। তিনি মনে করেন, পঞ্চবিংশতি, পঞ্চত্রিংশৎ, পঞ্চচত্বারিংশৎ ইত্যাদি সংখ্যাজ্ঞাপক 'পঞ্চসু' শব্দের সমানার্থক 'অক্ষেষু' পদই কৌটিল্য প্রয়োগ করিয়াছেন। যদি সত্যই তাহা হইয়া থাকে, তবে কৌটিল্য যে স্থানীয়-মানতত্ত্ব জানিতেন, তাহার কোন প্রমাণ থাকে না। কিন্তু যদি পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি পদই কৌটিল্যের মনে মনে ছিল, তিনি 'পঞ্চসু' না লিখিয়া 'অক্ষেষু' শব্দ ব্যবহার করিলেন কেন? যাহা হউক, সারদাবাবুর অনুমানও আমাদের সমীচীন মনে হয় না। উহার সমর্থনে তিনি অপর যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সেগুলি সারবান্ নহে। মহাভারত পুরাণাদি হইতে আমরা যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, কৌটিল্যের সমকালে এবং তাহার পরে স্থানীয়মানতত্ত্ব এদেশে জানা ছিল। রোটাসের শিলালিপিতে যোগবিধি সহকারে নামসংখ্যার প্রয়োগ আছে বলিয়াই যে, সেই কালে স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহৃত হইত না মনে করা ভুল। কেন না, বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা'য়ও ঐ প্রকার যোগবিধির দু একটি প্রমাণ দেখা যায়।[৪৮] অথচ, উহাতে স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যার ব্যবহার আছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

ছন্দঃসূত্র

কোন নির্দিষ্টসংখ্যক মাত্রাবিশিষ্ট বৃত্তছন্দের কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহা গণনা করিবার বিধি পিঙ্গলাচার্য্য-প্রণীত 'ছন্দঃসূত্রে' বিবৃত হইয়াছে। আমরা অন্যত্র, দৃষ্টান্ত সহকারে, এই বিধির মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছি।[৪৯] ঐ সূত্রে এক, দুই ও শূন্য চিহ্নের উল্লেখ আছে। গণনা সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, ঐখানে এক ও দুইয়ের ন্যায় শূন্যও অঙ্কবিশেষ। তাহা হইতে আমরা অনুমান করি যে, 'ছন্দঃসূত্রে'র সময়ে (শকপূর্ব ৩য় শতকে) স্থানীয়মানতত্ত্ব জানা ছিল। কেন না, গণিতের ইতিবৃত্তবেত্তাগণ বলেন, শূন্য চিহ্ন ও স্থানীয়মানতত্ত্ব সহজাত। সারদা বাবু মনে করেন, ঐ ধারণা ভ্রমাত্মক। ঐ অনুমানের সমর্থনে তিনি ময় ও সুমের জাতিদিগের শূন্যচিহ্নের কথা উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি ব্যতীত, অপর সকলে স্বীকার

৪৮। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ৪।৬ দেখ।

৪৯। *History of Hindu Mathematics* এর ১ম ভাগের ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

করেন যে, ময় ও সুমের জাতির উক্ত সংখ্যালিখনে স্থানীয়মানতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস অবশ্যই আছে। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। তবে ঐ প্রণালীদ্বয় দোষদুষ্ট। আমরা অন্যত্র তাহা প্রদর্শন করিয়াছি।[৫০] আরও বিশেষ প্রণিধানের কথা এই যে, উক্ত প্রণালীদ্বয় তারিখ লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইত। সাধারণ গণনায় ময় ও সুমেরগণ সংখ্যালিখনের ভিন্ন প্রণালী ব্যবহার করিতেন। ঐ সকলে শূন্যচিহ্ন বা স্থানীয়মানের কিছুই নাই। ময় ও সুমেরগণের মধ্যে শূন্যচিহ্নের সদ্ভাবের প্রমাণ শকপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বেকার নহে।

তন্ত্রশাস্ত্র

কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থেও স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায়। আমরা এখানে 'মেরুতন্ত্র'[৫১] হইতে উহার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি। 'গোত্রি'=৩৯ (২৬।১১৩৮); 'একচতুঃ'=৪১ (২৬।১১৫০); 'দ্বিচতুঃ'=৪২ (২৬।১১৫১); 'বেদবেদ'=৪৪ (২৬।১১৫৪); 'সায়ককৃত'=৪৫ (২৬।১১৫৫); ইত্যাদি। ঐ গ্রন্থের রচনাকাল অনির্ণীত। সুতরাং উহার আধারে নামসংখ্যাপ্রণালী বা স্থানীয়মানতত্ত্বের উদ্ভাবনকাল অনুমান করা যায় না।

সিংহরাজ, জীবশর্ম্মা ও মনিত্থ

'বৃহজ্জাতকবিবৃতি'তে উৎপল ভট্ট মনিত্থ ও জীবশর্ম্মার গ্রন্থ হইতে কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহাদের কোন কোনটাতে স্থানীয়মানতত্ত্ব সহকারে নামসংখ্যার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—[৫২]

"নবরূপাঃ (১৯) শরযমলা (২৫) স্তিতয়ো (১৫) হর্কা (১২) পঞ্চরূপকাঃ (১৫) ক্রমশঃ।
রূপযমা (২১) কৃতিসংখ্যাঃ সূর্য্যাদীনাং স্বতুঙ্গভেষ্বদাঃ।" (মনিত্থ)

"সপ্তদশৈ (১৭) কো (১) দ্বিযমৌ (২২) বসবো (৮) বেদাগ্নয়ো (৩৪) গ্রহেন্দ্রাণাম্।" (জীবশর্ম্মা)

বরাহমিহির মনিত্থ ও জীবশর্ম্মার নামোল্লেখ করিয়াছেন।[৫৩] সুতরাং তাঁহারা বরাহের প্রাগ্বর্ত্তী হইবেন।

সিংহরাজকৃত 'সহস্রাক্ষর' হইতে প্রথম ভাস্করাচার্য্য একটি বচন অনুবাদ করিয়াছেন।[৫৪]

৫০। Bibhutibhusan Datta, "Early History of the Principle of Place-value" *Scientia*, 1931.

৫১। 'মেরুতন্ত্র', বোম্বে, ১৮৩০ শক।

৫২। 'বৃহজ্জাতক,' ৭।৯ শ্লোকের উৎপল ভট্টকৃত বিবৃতি।

৫৩। 'বৃহজ্জাতক' ৭।১ (মনিত্থ); ৭।৯ ও ১১।১ (জীবশর্ম্মা)।

৫৪। 'আর্য্যভটীয়', ২।১২ (ভাস্করভাষ্য)।

"রব্যুদয়ে লঙ্কায়ামাষাঢ়ীপৌর্ণমাস্যাং তু সোমদিনে কৃতকৃতবর্ষৈঃ যাতৈঃ শকেন্দ্রকালাত্যগঃ স্যাৎ"

তাহাতেও নামসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহার আছে। 'কৃতকৃত'=৪৪. প্রথম ভাস্কর 'আর্য্যভটীয়'কার আর্য্যভটের (৪২১ শক) শিষ্য ও ভাষ্যকার। বরাহমিহির[৫৫] এবং ব্রহ্মগুপ্ত[৫৬]ও সিংহাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, দেখা যায়। ৪৪ শক হইতে যুগপ্রবৃত্তি গণনার হেতু কি, ভাস্কর তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। "তাঁহার (সিংহরাজের) অভিপ্রায়ানুসারে ঐ সময়ে অধিকমাস ও অবমমাস যুগপৎ প্রবৃত্ত হয়। সেই হেতু তিনি উহাকে অবধি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সংবৎসরের (আরম্ভ বলিয়া) পরিকল্পনা করিয়াছেন।" ৪৪ শকে যে 'অধিকমাস ও অবমমাস যুগপৎ প্রবৃত্ত হয়,' এ কথা সিংহরাজ কি করিয়া জানিলেন? যদি গণনা করিয়াই জানিয়া থাকেন, ৪৪ শকে অধিকমাস ও অবমমাস কি ছিল, তাহা গণনা করিতে বসিলেন কেন? যদি তিনি পরবর্তী কালের লোকই হইবেন, ৪৪ শককেই গণনার জন্য গ্রহণ করিলেন কেন? এ সকল বিচার করিয়া আমাদের অনুমান হয়, সিংহরাজ ঐ সময়েরই লোক। স্বসময়ের অধিকমাস ও অবমমাস গণনা করিতে গিয়া তিনি দেখিলেন, তখন উহারা যুগপৎ প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ভাস্কর-ধৃত আরও একটা বচনে স্থানীয়মান সহ নামসংখ্যার প্রয়োগ আছে।[৫৭]

"অল্পে মহতি চ মণ্ডলে মণ্ডলদ্বাদশভাগো রাশিঃ।
ষষ্টিশতত্রয়ভাগো ভাংশঃ খখষট্‌ঘনভাগো লিপ্তাঃ।"

এখানে 'খখষট্‌ঘন'=২১৬০০। ঐ বচনটি কোথা হইতে গৃহীত হইয়াছে, ভাস্কর তাহা উল্লেখ করেন নাই।

কটপয়াদি প্রণালী

প্রাচীন হিন্দুস্থানে ব্যবহৃত অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীসমূহের একটা সাধারণত 'কটপয়াদি-প্রণালী' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। উহার উৎপত্তিকাল এখনও নিরূপিত হয় নাই। ঐ প্রণালীর কয়েকটা অন্তর্বিভেদ পাওয়া যায়।[৫৮] প্রথম ভাস্করাচার্য্য-প্রণীত (৪৪৪ শক) 'লঘু-ভাস্করীয়ে'র কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে উহার প্রয়োগ দেখা যায়।[৫৯] শঙ্করনারায়ণ (৭৯১ শক) রচিত উহার টীকার স্থানে স্থানেও উহার ব্যবহার আছে।

৫৫। 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', ১৪।৪৪

৫৬। 'ব্রাহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত', ১১।৪৬-৭

৫৭। 'আর্য্যভটীয়,' ৩।১৪ (ভাস্করভাষ্য)।

৫৮। এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে, লেখকের "অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী" নামক প্রবন্ধ দেখ।

৫৯। ঐ ভাস্করবচনের মৌলিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কেন না, শঙ্করনারায়ণের ভাষ্যে উহা নাই।

টীকাকার সূর্যদেব যজ্বার (জন্ম ১১১৩ শক) উক্তি মূলে জানা যায়, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন-সময়ে কটপয়াদি প্রণালী এ দেশে প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"বর্গাক্ষরাণাং সংখ্যাপ্রতিপাদনে কটপাদিত্বং নঞোশ্চ শূন্যত্বমপি প্রসিদ্ধং। তন্নিরাসার্থং কাং গ্রহণং। কাং প্রভৃত্যেব বর্গাক্ষরাণাং সংখ্যা ন টকারাং পকারাচ্চ প্রভৃতি। কাং প্রভৃত্যেব সর্বাণি সংখ্যা প্রতিপাদয়ন্তি, ন তু ঞকারনকারয়োশ্চ শূন্যত্বমিত্যর্থঃ। অবর্গাক্ষরাণাং তু লোকেঽপি যকারস্যৈবাদিত্বাং তদাদিত্বনিয়মস্যাপ্রয়োজনাদ্ যকারাদিত্বং নোক্তং। কিন্তু তেষামপি লোকপ্রসিদ্ধৈনৈকাদিসংখ্যা প্রাপ্তা। তদপবাদার্থং 'ঙ্মৌ যঃ'।"

এদেশে পরম্পরাগত প্রসিদ্ধি আছে যে, কটপয়াদি প্রণালীর উদ্ভাবক বররুচি। তদ্বিষয়ে তাঁহার সূত্র এই,—

"কাদিনব টাদিনব পাদিপঞ্চ যাদ্যষ্টৌ।

'মহাভারতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠ (১৫০০ শকপ্রায়) এই সূত্র বররুচির বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বররুচিপ্রোক্তয়া কাদিনব-টাদিনব-পাদিপঞ্চ-যাদ্যষ্টাবিতি পরিভাষয়া ক্রিয়তে" (আদিপর্ব, ২।৩৯৬ শ্লোকের টীকা)। 'মহাভারতে'র প্রতিপর্বস্থ উপপর্ব-সংখ্যা নীলকণ্ঠ এই প্রণালীতে নির্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

"আদিধ্যানং (১৯) সভাধনং (৯) বনচয়ং (১৬) বৈরাটভূ (৪) দ্যোগযুক্ (১১),
ভীষ্মদ্রোণম্ (৫) জং (৮) চ কর্ণকু (১) তথা শল্যেভ (৪) সৌষুপ্তগম্ (৩)।" ইত্যাদি

'বার্ত্তিক'কার কাত্যায়নের (শকপূর্ব ৫ম শতক) নামও বররুচি। ইনি কি তিনিই? বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনি বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার গ্রন্থের 'বার্তিক'কার বররুচি উহাকে প্রণালীবদ্ধ করেন। ইহা অসম্ভব নহে। যদি ইহা সত্য হয়, তবে বলিতে হয়, শকপূর্ব পঞ্চম শতকে স্থানীয়মানতত্ত্ব এদেশে উদ্ভাবিত হইয়াছিল এবং অক্ষরসংখ্যাপ্রণালীতে উহার উপযোগ হইয়াছিল। কেরলের প্রসিদ্ধ প্রাচীন জ্যোতিষী বররুচির 'পরংপেরু' নামক গ্রন্থে প্রত্যেক অক্ষরের একটা সুনির্দিষ্ট মান বিধিবদ্ধ আছে নাকি। তাঁহার প্রাদুর্ভাবকাল জানা নাই। অধ্যাপক শ্রী কে. রাম পিশারোটি অনুমান করেন,[৬০] উহা তৃতীয় শকশতকের কাছাকাছি হইবে; অন্ততঃ তাহার পরে নহে। এই বররুচিই যদি কটপয়াদি প্রণালীর উদ্ভাবক হন, তবে বলিতে হয়, তৃতীয় শকশতকে স্থানীয়মানতত্ত্ব হিন্দুস্থানে প্রচলিত ছিল।

দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন-কাল

উপরে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, উহাদের সার সঙ্কলন ও বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়,—

৬০। K. Rama Pisharoti, "Sastras—Practical and Theoretical," *Quarterly Journal of the Mythic Society*, Vol. 21, No. 3.

(১) স্থানীয়মান সহকারে অক্ষর-সংখ্যা ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায়, বররুচির গ্রন্থে। তিনি শকপূর্ব পঞ্চম শতকে কিম্বা তৃতীয় শকশতকে বর্তমান ছিলেন।

(২) স্থানীয়মান সহকারে নামসংখ্যা ব্যবহারের নিঃসন্দিগ্ধ প্রাচীনতম প্রমাণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শকশতকের। 'অগ্নিপুরাণ', 'নারদপুরাণ' ও 'বাক্শালী পাটীগণিতে' উহা পাওয়া যায়। চতুর্থ শকশতকের 'তিলোয়পন্নত্তি' এবং 'মূল পুলিশসিদ্ধান্তে'ও ঐ ব্যবহার আছে। সিংহরাজের, কৌটিল্যের এবং 'মহাভারতে'র বচনের মূলে জানা যায়, প্রথম শকশতকে, চতুর্থ এবং পঞ্চম শকপূর্বশতকেও উহা ছিল।

(৩) পাটীগণিতে দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ আছে, দ্বিতীয় শকশতকের 'বাক্শালী পাটীগণিতে'।

(৪) সাধারণ সাহিত্যে দশাঙ্কপ্রণালীর উল্লেখ ৫০০ শকপূর্বাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০ শকাব্দের গ্রন্থে পাওয়া যায়। যথা, 'মহাভারত', 'ব্রহ্মপুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'বায়ুপুরাণ', 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্র,' 'অনুযোগদ্বারসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থে উহার উল্লেখ আছে।

(৫) শূন্য চিহ্ন ব্যবহারের প্রাচীনতম প্রমাণ পাওয়া যায় তৃতীয় শকপূর্ব্বশতকের কিম্বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্বেকার 'পিঙ্গলছন্দঃসূত্রে'।

এই সকল প্রমাণ মূলে স্থানীয়মানতত্ত্ব ও দশাঙ্কসংখ্যাপ্রণালীর উদ্ভাবনকাল সম্বন্ধে কি অনুমান করা যাইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য।

সংখ্যাপ্রণালীসমূহের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কোন প্রণালীবিশেষের উদ্ভাবনের পরে জনসাধারণের মধ্যে উহার প্রচার হইতে প্রায় পাঁচ ছয় শত বৎসর লাগে। হিন্দুস্থানে কিম্বা তাহার বাহিরে সব দেশের পক্ষেই ঐ কথা। যথা, হিন্দুদশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালী ১০ম ও ১১শ খ্রীষ্টশতকে য়ুরোপে আনীত হয়। কিন্তু সাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত গণিতগ্রন্থে ১৭শ শতকের পূর্বে উহা পরিগৃহীত হয় নাই। এই দৃষ্টান্ত হইতে হিন্দু পাটীগণিতে মাত্র প্রয়োগ মূলে আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলাম যে, শকপূর্ব তৃতীয় শতকে (২০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে) দশাঙ্কসংখ্যা-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল।[৬১] তখন মহাভারতোক্ত প্রমাণ আমরা জানিতাম না। এখন মনে হয়, ঐ সময়কে আরও প্রায় দুই শত বৎসর পিছাইয়া দিতে হইবে।

স্থানীয়মানতত্ত্বের উদ্ভাবনার প্রেরণা

স্থানীয়মান সহকারে অঙ্ক, অক্ষরসংখ্যা বা নামসংখ্যা ব্যবহারের পরিকল্পনা হিন্দুগণিতবিদ্গণ স্বতন্ত্রভাবে করিয়াছিলেন, না অপর কোথাও হইতে তাঁহারা উহার

৬১। *History of Hindu Mathematics,*—Part I, pp. 86 ff.

প্রেরণা পাইয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য। ঐ বিষয়ে আমাদের মনে একটা ধারণা বহুদিন হইতে জন্মিয়াছে। সুধীগণের নিকট তাহা প্রকাশ করিতেছি। উহা সমীচীন কি না, তাঁহারা বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদের মনে হয়, গণিতবিদ্‌গণ ছন্দঃশাস্ত্র হইতে স্থানীয়মানের প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ছন্দঃশাস্ত্রে কেবল দুইটি মাত্রা—লঘু ও গুরু। উহাদের চিহ্ন যথাক্রমে ল ও গ। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ দ্বারা, যথা-প্রয়োজন পুনরুক্তি সহ, কোন নির্দিষ্টমাত্রিক বৃত্তছন্দের কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহা গণনার বিধি ছন্দঃশাস্ত্রে বিবৃত আছে। যথা, ছয়মাত্রিক বৃত্তছন্দের $২^৬$ সংখ্যক ভেদ হইতে পারে। ইহা হইতেই জানা যায় যে, অল্পসংখ্যক চিহ্ন দ্বারাও বহু প্রকারের ছন্দঃ রচনা করা যায়। বিকল্পগণিতে (Permutation)ও দ্রব্যের সমাবেশের ভেদ দ্বারা বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তুত করা যায়। এসকল হইতে গণিতবিদ্ দেখিলেন, স্বল্পসংখ্যক অঙ্ক দ্বারাও বহু সংখ্যা প্রকাশ করা যায়। তাহা হইতে তাঁহারা স্থানীয়মানতত্ত্বের পরিকল্পনা করিলেন। ছন্দঃশাস্ত্র অতি প্রাচীন। শকারম্ভের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে বিকল্পগণিত এদেশে জানা ছিল। জৈন আগমশাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে।[৬২] সুতরাং স্থানীয়মানতত্ত্বের পরিকল্পনার প্রেরণার উপকরণ প্রাচীন কাল হইতেই বর্ত্তমান আছে।

৬২। লেখকের "The Jaina School of Mathematics" নামক প্রবন্ধ দেখ।

ভ্রমসংশোধন ঃ— ২০৩ পৃ. নীচে হইতে দ্বিতীয় পংক্তিতে "ভ্রাতুষ্পুত্র" কথাটির স্থলে "ভ্রাতুষ্পৌত্র" হইবে।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৭)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরীর শেষ জীবন ও চরিত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য, এক হিসাবে এই বৎসরকে যুগ-পরিবর্ত্তনের বৎসর বলা চলে; যে ভাষা এত দিন অনুবাদ-গ্রন্থ, বিচার-গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তকের অস্বাভাবিক আশ্রয়ে খোঁড়াইয়া চলিতেছিল, সাময়িক-পত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাষাকেই যেন খোঁড়া পায়ে দৌড় করান হইল; অর্দ্ধ শতাব্দী-কালের মধ্যেই পঙ্গু কি ভাবে গিরিলঙ্ঘন করিল, সেই ইতিহাসই আমরা লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছি।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে চারিটি সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়; তিনটি বাংলা ভাষা ও একটি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। মাসিক 'দিগ্দর্শন', সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' এবং মাসিক *The Friend of India*—এই চারিটি পত্রই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে জুন মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। 'দিগ্দর্শন' বয়সে বড় হইলেও তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই; বাঙালী-সম্পাদিত ও পরিচালিত প্রথম সাময়িক-পত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি'ও নাম-স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; 'সমাচার দর্পণ' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দীর্ঘকাল প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া বাংলা দেশে বর্ত্তমান ছিল ও আছে। ইহাদের ইতিহাসের সহিত বাংলা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাস কিরূপ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে তাহা দেখাইয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি দিব।

উইলিয়ম কেরীর জীবনের সহিত শ্রীরামপুর মিশন হইতে প্রকাশিত 'দিগ্দর্শন' ও 'সমাচার দর্পণে'র পরোক্ষ যোগ আছে। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশে প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পরে নানা উপাদান সরবরাহ করিয়া কেরী ইহার পুষ্টিসাধনে যত্ন করিয়াছিলেন; এই পত্রিকাটিতে তাঁহার জীবনের অনেক কীর্ত্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।*

'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কেরীর অন্যতম কীর্ত্তি। ইহার সম্পাদনায় জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়ম ওয়ার্ড তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ১৮১৮ সালের মে মাস হইতে ইহার প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইংরেজী পত্রিকা হইলেও কেরী-প্রসঙ্গে এই 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র যৎসামান্য আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৮১৮ সনের ৩০ এপ্রিল কেরীপ্রমুখ সম্পাদক-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা' তিন খণ্ড দ্রষ্টব্য।

সঙ্গ ইহার যে "প্রসপেক্টাস্" বা অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

. . . Drawn from their native land wholly by the hope of thus promoting the welfare of India, one of them has spent nearly the fourth of a century, and others a period of time fast approaching thereto, in studying its languages, and making themselves acquainted with the habits and ideas of its inhabitants, with the view of effectually promoting their highest interests; and to this important object they are desirous of devoting the remainder of their days. . . . With this view therefore they propose to meet the wishes of those who encourage the work, by including in their small monthly publication, every thing communicated to them either of a religious or literary nature which has any bearing on the future happiness of India. . . . In the important work of illuminating India, they cannot be insensible to the value of *Literature* . . . Without some idea of their literature, how can we become acquainted with the ideas and modes of expression common to those whose good we seek? Whatever information may be communicated therefore respecting the Languages of Eastern Asia, or the Characters by which they are expressed, will be gratefully received. Books published in India too, which in any degree bear on its welfare, will be deemed fit subjects for notice.

এই উদ্দেশ্য অনুযায়ী 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায়, বিশেষ করিয়া ১৮২০ সাল হইতে প্রকাশিত ইহার ত্রৈমাসিক সংস্করণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইতে দেখি। সম্পাদকত্রয়ের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে কেরীর জ্ঞানই সমধিক ছিল; সুতরাং 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র এই বিভাগের কৃতিত্ব কেরীর উপরেই আরোপ করিলে দোষ হইবে না। হালহেড, উইলকিন্স, পঞ্চানন কর্ম্মকার, ফর্ষ্টার প্রভৃতি সম্বন্ধে আদিমতম আলোচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ জুলাই জোশুয়া মার্শম্যান ও তাঁহার পত্নী হানা মার্শম্যানের বিশেষ চেষ্টায় শ্রীরামপুর কলেজের ভিত্তি স্থাপিত হয়; মদনাবাটীতে ও খিদিরপুরে অবস্থানকালে এদেশে শিক্ষাবিস্তারের যে স্বপ্ন কেরী দেখিয়াছিলেন, এত দিনে যেন তাহা বাস্তবে পরিণত হইল।

জন মার্ডকের মতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরী-কৃত বাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু কেরীর জীবনে এই সালের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—তাঁহার প্রায় শতাব্দীপাদের সাধনার ফল, তাঁহার বাংলা-ইংরেজী অভিধানের প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। বৃহৎ অক্ষরে এই অভিধানের কিয়দংশ মুদ্রণ ও প্রকাশ করিতে গিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে সে কাজ কি ভাবে পরিত্যক্ত হয়, গতবারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অভিধানের জন্য বিশেষভাবে ছোট হরফ প্রস্তুত করাইয়া কেরী তখন হইতেই অভিধান পুনর্ম্মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন; ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল সমস্ত স্বরবর্ণ লইয়া প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে এইটিই কেরীর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর মুদ্রণের কাজ যথারীতি চলিতে থাকে এবং ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ দুই ভাগে প্রকাশিত হইয়া অভিধান সম্পূর্ণ হয়। আখ্যা-পত্রটি (১ম খণ্ডের; ২য় খণ্ডের আখ্যা-পত্রও অনুরূপ) এইরূপ—

'A/ Dictionary/ Of The/ Bengalee Language,/ In Which/ The Words/ Are Traced To Their origin,/ And/ *Their Various Meanings Given.*/ Vol. I./ By W. Carey, D.D./ *Professor Of The Sungskrita, And Bengalee Languages, In the/ College Of Fort William.*/ Second Edition, With Corrections and Additions./ Scrampore : Printed At The Mission Press,/ 1818./

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন অভিধান মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়, তখন অবিক্রীত প্রথম খণ্ডগুলিরও আখ্যা-পত্রের তারিখ বদল করিয়া ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ করা হয়। এই কারণে একই সংস্করণের আখ্যা-পত্রে ১৮১৮ এবং ১৮২৫ দুই তারিখই মুদ্রিত দেখা যায়। প্রথম খণ্ড ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ম্মুদ্রিত হয় নাই।

এই পুস্তকের আকার ডিমাই কোয়ার্টো, দুই কলমে মুদ্রিত। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা মোট ৬১৬; তন্মধ্যে ভূমিকা ৫ পৃষ্ঠা এবং সংস্কৃত ধাতুর তালিকা ৩৫ পৃষ্ঠা; দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা (দুই ভাগে ১-৭৯০ + ৭৯১-১৫৪৪) মোট ১৫৪৪; গোড়াতে প্রথম খণ্ডের ভূমিকাও যোজিত আছে।

কেরীর অভিধানে গুণ বা ধাতুর তালিকা হিসাবের মধ্যে ধরিলে প্রায় পঁচাশী হাজার শব্দ স্থান পাইয়াছে। এই অভিধানের ভূমিকায় কেরী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়; বাংলা ভাষাকে উর্দ্দ-কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে ভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলে আজিকার দিনে হিন্দুস্থানীবিরোধী-সম্প্রদায় আনন্দিত হইবেন। আমরা ভূমিকাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রবন্ধের "সংস্কৃতীকরণ" ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা', ৪৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) অধ্যায় পাঠকদিগকে স্মরণ করিতে বলি। কেরী বলিতেছেন (শ্রীরামপুর, ১৭ এপ্রিল, ১৮১৮)—

The Bengalee language, of which the following is a Dictionary, is almost entirely derived from the Sungskrita: considerable more than three-fourths of the words are pure Sungskrita, and those composing the greatest part of the remainder are so little corrupted, that their origin may be traced without difficulty. Words of Arabic or Persian origin bear a small proportion to the whole; and most of those, the origin of which appears doubtful, may be generally traced to a Sungskrita or an Arabic origin. A few Portuguese words, and a few English ones often so distorted as scarcely to be recognized, and are now incorporated therewith, and may be admitted as forming a part of it.

Till of late, the Bengalee language was almost wholly neglected by Europeans, under the idea of its being a mere jargon, only used by the lower orders of people. Most of the Vernacular languages of India still lie under the same neglect, from a supposition that the Hindoosthanee [Ordoo] is the language universally prevailing. . . .

However polished and elegant . . . the Ordoo dialect may be, it can scarcely be called the language of any country, and is very imperfectly understood even in Hindoosthan proper, beyond a certain class of society; while . . . the Bengalee, and the other languages of India . . . are current through large tracts of country, and are spoken and understood by the whole body of the inhabitants. These languages, though all derived from Sungskrita, differ from each other as much as most European languages which have a common origin.

The mistaken idea, that the Moosulman dialect of the Hindoosthanee was the most prevalent language in India, was probably the cause that formely induced the greater number of those Europeans who came thither, to study it in preference to all others . . .

This imperfect knowledge of the Ordoo dialect being deemed sufficient for all ordinary purposes, the great body of Europeans were thereby led to despise the Vernacular languages of the country, and in consequence remain ignorant of them.

Since the institution of the College of Fort William, this prejudice has been gradually giving way. The Bengalee language has become an object of study, a good number of the Civil Servants of the Honourable Company, and many other persons resident in India, have made it the object of their attention, and not a few may be ranked among the number of good Bengalee Scholars.

.. .. ..

The number of books yet published in the language is very small, and they are mostly translations from the Sungskrita; no work has yet been published upon any one science, nor a treatise upon any particular subject. When literature and science become objects of pursuit in Bengal, and works on various subjects are published, . . . many of these terms, which are now only known to the learned, will become more common, and perhaps the language will be enriched by many words borrowed from other tongues.

The want of a Dictionary of the Bengalee language has been long felt, especially by the students in the College of Fort William. . . He [Carey] has endeavoured to introduce every simple word used in the language, and all the compound terms which are in common use, or which are to be found in Bengalee works whether published or unpublished. He has availed himself of every advantage which the labours of others could afford him, particularly those of Dr. Gilchrist, Dr. Hunter, and Mr. Forster, . . .

কেরীর অভিধান সম্পর্কে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উইলসন যে মন্তব্য করিয়াছেন (১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ), তাহা হইতেই ইহার বিশেষত্ব ধরা পড়ে; পরবর্ত্তী কালে এ বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা উইলসনের কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র। উইলসন বলিয়াছেন—

Besides the meanings of the words, their derivation is given wherever ascertainable. This is almost always the case, as the great mass of the words are Sanskrit. .he endevoured to introduce into the dictionary every simple word used in the language, and all the compound terms which are commonly current, or which are to be found in Bengali works, whether published or unpublished. It may be thought, indeed, that in the latter respect he has been more scrupulous than was absolutely necessary, and has inserted compounds which might have been dispensed with, their analysis being obvious, and their elements being explained in their appropriate places. The dictionary also includes many derivative terms, and private, attributive, and abstract nouns, which, though of legitimate construction, may rarely occur in composition, and are of palpable signification. . . it evinces his careful research, his conscientious exactitude, and his unwearied industry. The English equivalents of the Bengali words are well chosen, and of unquestionable accuracy. Local terms are rendered with the correctness which Dr. Carey's knowledge of the manners of the natives, and his long domestication amongst them, enabled him to attain; and his scientific acquirements and conversancy with the subjects of natural history qualified him to employ, and not unfrequently to devise, characteristic denominations for the products of the animal or vegetable world peculiar to the East. . . the dictionary of Dr. Carey must ever be regarded as a standard authority.

কেরীর মৃত্যুর পরে *The Gentleman's Magagine*-এ প্রকাশিত প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই, কেরীর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮২৭-৩০ সালের মধ্যে বাহির হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই উক্তি ভুল। জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর অভিধানের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন; মার্শম্যানের অভিধানের এইটি প্রথম খণ্ড (অক্টোবো, ৫৩১ পৃষ্ঠা); দ্বিতীয় খণ্ড ইংরেজী হইতে বাংলা, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর বাহির হয় (অক্টোবো, ৪৪০ পৃষ্ঠা)। এইগুলির আরও কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে একাধিক প্রকাশক কেরীর অভিধানকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকটি অভিধান প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর, রামকমল সেন, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, মর্টন, মেণ্ডিস, হটন প্রভৃতি অভিধানকারেরাও কেরীর নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। লঙের ১৮৫৯ সালের *Return*-এ কেরীর অভিধানের মূল্য এক শত টাকা ছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরী নিউ টেষ্টামেণ্টের অসমীয়া সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রক্সবার্গের *Flora Indica* দুই খণ্ড তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে; ঐ সালেই তিনি ভারতবর্ষে কৃষি ("On the Agriculture of India") বিষয়ে তাঁহার প্রসিদ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন; 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র কোয়ার্টারলি সিরিজের প্রথম খণ্ডে এই প্রবন্ধ মুদ্রিত আছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কেরী তৃতীয় বার বিবাহ করেন।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত লিনিয়ান সোসাইটির সভ্য হন; এই সালের শেষভাগে তাঁহার প্রথম পুত্র এবং বাংলা সাহিত্যের সেবায় অক্লান্ত কর্ম্মী ফেলিক্স কেরীর মৃত্যু হয়।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর তারিখে রাত্রে নৌকাযোগে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া ঘাটে নামিবার সময় কেরীর পা ভাঙিয়া যায়, ফলে তিনি সাংঘাতিক অসুস্থ হইয়া পড়েন; তাঁহার বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি আরোগ্যলাভ করেন। এই বৎসরেই তিনি লণ্ডন জিওলজিকাল সোসাইটি, রয়াল এগ্রিকালচারাল সোসাইটি প্রভৃতির সভ্য হন এবং ভারতবর্ষে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি স্থাপন করেন।

১৮২৪ সালে তিনি উক্ত সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন এবং এই সালেই মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে গবর্মেণ্টের বাংলা অনুবাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত হন; ১৮২২ সালের বাজেয়াপ্তি আইন তাঁহারই অনুবাদ।

১৮২৬ সালে তাঁহার সহায়তায় Gotthelf Schrœter-রচিত ভুটান অভিধান প্রকাশিত হয়।

১৮২৯ সালে তিনি সতীদাহ-নিবারক আইন অনুবাদ করেন।

১৮৩০ সালের জুলাই মাস হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁহার বেতন পাঁচ শত টাকা কমিয়া যায় এবং গবর্মেণ্টের অনুবাদকের পদটি উঠিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে আয়ের দিক্ দিয়া বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়। ১৮৩১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক-পদ হইতেও তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়। তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে পেন্সন পাইতে থাকেন। ১৮৩৪ সালের ৯ জুন তারিখে ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদেশিক সহায়ক উইলিয়ম কেরীর সংক্ষিপ্ত কীর্ত্তি ইহাই। অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার গুণে তিনি একাকী যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীতে ক্বচিৎ মিলে। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইউষ্টেস কেরী তাঁহার চরিত্র বর্ণনা করিতে বসিয়া যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই উদ্ধৃত করিয়া কেরী-প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

In Dr. Carey's mind, and in the habits of his life, there is nothing of the marvellous to describe. There was no great and original transcendency of intellect; no enthusiasm and impetuosity of feeling; there was nothing in his mental character to dazzle or even to surprise. Whatever of usefulness and of consequent reputation he attained to, it was the result of an unreserved and patient devotion of a plain intelligence and a single heart to some great, yet well defined, and withal practicable objects . . . He had no genius, no imagination. He had nothing of the sentimental, the tasteful, the speculative, or the curious, in his constitution.

তিনি স্বয়ং একবার ইউষ্টেসকে বলিয়াছিলেন—

Eustace, if, after my removal, any one should think it worth his while to write my life, I will give you a criterion by which you may judge of its correctness. If he give me credit for being a plodder, he will describe me justly. Anything beyond this will be too much. I can plod. I can persevere in any definite pursuit. To this I owe everything.

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

পঞ্চচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর অন্যতম বান্ধব-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন,—

১। মহারাজ স্তর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৮	...	৮
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৪
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৯
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮২৫	...	৯১৫
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৬	...	১২
		৮৭২		৯৫৮

(ক) আলোচ্য বর্ষে স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এবং স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ

শীল এবং পুরাতন বিশিষ্ট-সদস্য রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু এবং রায় জলধর সেন বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৮ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন,—

১। স্যর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। স্যর জর্জ্জ এ. গ্রায়ার্স'ন, ৫। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৬। ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ৭। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ৮। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আলোচ্য বর্ষে রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নূতন আজীবন-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বর্ষশেষে যাঁহারা আজীবন-সদস্য আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(গ) আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক-সদস্য-সংখ্যার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইঁহারা অধ্যাপক-সদস্য আছেন,—

১। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, ৫। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী, ৬। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৭। শ্রীসীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ, ৮। শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, ৯। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৫ ছিল। বর্ষমধ্যে ১১ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ১০১ জন ব্যক্তি সাধারণ-সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৯১৫ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৬ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বর্ষশেষে এই বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৩ জনের স্থিতি-কাল ফুরাইয়াছে। এই জন্য এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা এখন ১২ জন।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—১। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, ৩। রায় জলধর সেন বাহাদুর।

আজীবন-সদস্য—রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

সাধারণ-সদস্য—১। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, ২। আশুতোষ ঘোষ, ৩। গিরিশচন্দ্র বসু, ৪। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫। ঝঞ্ঝানিল আচার্য্য চৌধুরী, ৬। ননীগোপাল মজুমদার, ৭। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ৯। বীরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ১০। শ্রীহর্ষলাল মুখোপাধ্যায়, ১১। অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের অধিকাংশেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছেন। অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত এবং গিরিশচন্দ্র বসু যথাক্রমে 'জ্যোতিষ-দর্পণ' এবং 'উদ্ভিদ্‌জ্ঞান' নামক পরিষদ্‌গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে এবং রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর পরিষদের ও রমেশ-ভবনের কোষাধ্যক্ষরূপে এবং নানা ভাবে অর্থসাহায্য দ্বারা পরিষদের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ননীগোপাল মজুমদার পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া এবং অর্থ সাহায্য করিয়া পরিষদের সেবা করিয়াছেন। নলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রাদি দান করিয়া পরিষৎকে উপকৃত করিয়াছেন।

সহায়ক-সদস্য—যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। ইনি পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং বহু প্রাচীন পুথি দান করিয়া পরিষদের সম্পদ্ বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ

বর্ষমধ্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যসেবী ও বন্ধুগণ পরলোকগমন করিয়াছেন,—

১। পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, ২। দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৩। ললিতমোহন ঘোষাল, ৪। স্বামী শুদ্ধানন্দ, ৫। ডক্টর সতীশচন্দ্র বাগচী, ৬। মধুসূদন জানা, ৭। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৮। রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, ৯। রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, ১০। শিবরতন মিত্র, ১১। শরৎচন্দ্র মিত্র।

ইঁহাদের মধ্যে ৪, ৬, ৮ এবং ৯ সংখ্যায় উক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সকলেই এক সময়ে পরিষদের সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ পরিষৎ-পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) **চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন**—৭ই শ্রাবণ, শনিবার। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের পর, ঝাড়গ্রামরাজ কুমার নরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে পরিষদের 'বান্ধব' নির্ব্বাচন এবং (১) ৺স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর এবং

(৩) স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে চতুশ্চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণ পঠিত, পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়। এই অধিবেশনে (ক) মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং (খ) শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চিত্রপ্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) **মাসিক অধিবেশন**—১। ১৪ই ভাদ্র—(ক) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ' এবং (খ) শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত 'পরমানন্দমত-সংগ্রহ' নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১৮ই অগ্রহায়ণ।—(ক) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-লিখিত "ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা" এবং শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-লিখিত "ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২২এ চৈত্র। প্রবন্ধ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-লিখিত "চোরের পাঁচালি" পঠিত হয়।

(গ) **সাহিত্যিকগণের বার্ষিক স্মৃতি-সভা**—(১) আলোচ্য বর্ষে ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ও শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীসন্তোষকুমার বসুর নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং মাইকেল-পত্নীর সমাধি-সংরক্ষণের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়। অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং কুমারী আলোচনা রায় গান করেন এবং শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত কবিতা পাঠ, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস কবির রচনা আবৃত্তি করেন। মৌলবী রেজাউল করিম, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং শ্রীপ্রিয়লাল দাস বক্তৃতা করেন।

বর্ত্তমান বর্ষে (১) ২৩এ জ্যৈষ্ঠ আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের বার্ষিক স্মৃতি-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস সভাপতিরূপে এবং শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন। (২) মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা ১৪ই আষাঢ় সম্পন্ন হয়। ঐ দিন প্রাতে স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার মহাশয়ের নেতৃত্বে গোরস্থানে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও প্রার্থনা হয় এবং অপরাহ্ণে পরিষদ্ মন্দিরে বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার এবং শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় গান করেন। শ্রীকৃষ্ণলাল ঘোষ ও শ্রীরাজকুমার মল্লিক আবৃত্তি করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

(ঘ) **শোকসভা**—(১) ৺রায় জলধর সেন বাহাদুরের জন্য শোকপ্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন, ৩০এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমলতা ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর বক্তৃতা করেন এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী প্রবন্ধ পাঠ করেন। শোকপ্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) ৺রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের জন্য শোক-প্রকাশ—৩১এ আষাঢ়, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীমন্মথমোহন বসু এবং শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু প্রবন্ধ পাঠ করেন ও কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়-লিখিত 'নগেন্দ্রস্তোত্র' পঠিত হয়। শোক-প্রস্তাব ও স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৩) ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের জন্য শোক-প্রকাশ—২রা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং ডাক্তার শ্রীপান্নালাল দাস বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্তা পুষ্পরাণী দাস ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের প্রদত্ত ৺জ্ঞানেন্দ্রবাবুর চিত্র প্রদর্শিত ও শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) ৺রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীগণপতি সরকার, ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমন্মথমোহন বসু বক্তৃতা করেন এবং শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৫) ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়—২০এ শ্রাবণ, ১৩৪৬। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মৌলবী রেজাউল করিম বক্তৃতা করেন। শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায় পরিষদ্ মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত গান গাহিয়া, পরে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়-প্রমুখ চারণগণ কবির রচিত কয়েকটি গান গাহেন।

(ঙ) **বিশেষ অধিবেশন**—(১) শ্রীসজনীকান্ত দাস ৪ঠা বৈশাখ "বাংলা ভাষার প্রথম যুগ" বিষয়ে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতামালার অন্তর্গত দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। (২) রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর ২৭এ ভাদ্র "বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। (৩) ১৮ই অগ্রহায়ণ শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রামনারায়ণ তর্করত্ন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। (৪) ডাক্তার শ্রীসরসীলাল সরকার "বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া মনঃসমীক্ষণের আলোচনা" নামক প্রবন্ধ বর্ত্তমান বর্ষের ৫ই জ্যৈষ্ঠ পাঠ করেন।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা

পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে বক্তৃতাকালে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "তরল ও কঠিন বায়ু" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া এই ধারাবাহিক বক্তৃতার উদ্বোধন করেন। বিজ্ঞান-শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নাম এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

(১) ৫ই মাঘ (১৯এ জানুয়ারি) বুধবার, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী "তরল ও কঠিন বায়ু" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(২) ১৭ই মাঘ (৩১এ জানুয়ারি) মঙ্গলবার—অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ "প্রাচীন ও আধুনিক রসায়ন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৩) ২৮এ মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারি) শনিবার—ডক্টর শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ "আকাশের কথা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৪) ৭ই ফাল্গুন (১৯এ ফেব্রুয়ারি) রবিবার—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অক্সিটার' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৫) ১৯এ ফাল্গুন (৩রা মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীবসন্তকুমার বাগচী "মনুষ্য-মস্তিষ্কে তড়িৎস্পন্দন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৬) ৩রা চৈত্র (১৭ই মার্চ) শুক্রবার—ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার "ব্যোমরশ্মি" (Cosmic Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৭) ১৮ই চৈত্র (১লা এপ্রিল) শনিবার—ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "রঞ্জন-রশ্মি" (X-Ray) বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৮) ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬), ৩০ এপ্রিল, রবিবার—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "মৃগনাভি ও তজ্জাতীয় গন্ধদ্রব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(৯) ২৯এ বৈশাখ (১৩ই মে) শনিবার—শ্রীরাধাভূষণ বসু "সুড়ঙ্গ রেলপথ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১০) ২২এ আষাঢ় (৭ই জুলাই) শুক্রবার—ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন "দৃষ্টিশক্তি সংরক্ষণ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

(১১) ৫ই শ্রাবণ (২১এ জুলাই) শুক্রবার—ডক্টর জে. পি. গ্রেগরি "'মাংসাশী উদ্ভিদ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

শতবার্ষিক জন্মোৎসব

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তিনটি শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল,—

১। **হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**—৪ঠা বৈশাখ, বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর। সভাপতি মহাশয়, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা বক্তৃতা করেন এবং শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী আবৃত্তি করেন।

২। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**—(ক) ১০ই আষাঢ় সেনেট হলে বিশেষ অধিবেশন। সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্যামবাজার নিউ ক্লাবের সভ্যগণ ব্লু রিবন অর্কেষ্ট্রা পার্টির সহযোগে "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত গাহিলে পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় মঙ্গলাচরণ এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধনে তাঁহার লিখিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয়ের ভাষণের পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, পি. ই. এন-এর পক্ষে শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রীঅমরনাথ ঝা, ঝাঁসির শ্রীমৈথিলীশরণ গুপ্ত, কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষৎ, কর্ণাটক বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘ, বাণহট্ট ভারতীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, স্যর হাসান সারওয়ার্দ্দি, মিঃ ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ, কলিকাতার মেয়র, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু প্রভৃতি ব্যক্তিগণের ও প্রতিষ্ঠানের বাণী ও পত্র পঠিত হইলে শ্রীসরলা দেবী, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজা শ্রীক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, রেজাউল করিম, শ্রীগুরুসদয় দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযদুনাথ সরকার "বঙ্কিমচন্দ্র ও ইস্‌লামীয় সমাজ" প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এই প্রবন্ধগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়—Bankim Chandra, the Prophet of Bengal— মিঃ কে. এন. কেলকার, Bankim Chandra's Influence on Tamil Literature—দেওয়ান বাহাদুর কে. এস্. রামস্বামী শাস্ত্রী, Bankim Chandra in Kerala—টি. কে. কৃষ্ণ মেনন।

পরদিন প্রাতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে উক্ত 'বন্দে মাতরম্'-গায়ক-সম্প্রদায়ের সহিত বহু সদস্য ও সাহিত্যসেবী কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে গমন করেন। তথায় একটি সভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার, শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। ঐ দিন অপরাহ্লে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর রমেশ-ভবনে বঙ্কিম-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক, ব্যবহৃত দ্রব্য, লেখা পত্র ও পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি প্রদর্শনের পর সান্ধ্য সম্মিলন হয়। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু ও শ্রীচামেলীকুমার চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের

রচনা হইতে আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে 'বারবেলা সমিতি'র সভ্যগণ 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' অভিনয় করেন। এই দিন জলযোগের আয়োজন করা হইয়াছিল।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্তা শান্তি বসু, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গান করেন এবং শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী আবৃত্তি করেন।

৩। **ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন**—১০ই অগ্রহায়ণ। ঐ দিন প্রাতে ৩৪, রামকমল সেন লেনে কেশবচন্দ্রের জন্মস্থানে পরিষদের সভাপতি প্রভৃতি সদস্যগণ ও বহু সাহিত্যসেবী সমবেত হন এবং যে স্থানে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিদর্শন করেন। তৎপরে তথায় সভাপতি মহাশয়ের নেতৃত্বে এক অধিবেশন হয়। সভাপতি মহাশয়, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীমন্মথমোহন বসু, এবং শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে পরিষদে বিশেষ অধিবেশন এবং কেশবচন্দ্রের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, হস্তাক্ষর ও চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়। মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, ডাক্তার বি. সি. ঘোষ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন, এবং শ্রীমন্মথমোহন বসু কেশবচন্দ্রের 'স্বর্গ' আবৃত্তি করেন এবং শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

মহারাণী শ্রীযুক্তা সুচারু দেবী, শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়, "কমল-কুটীরে"র কর্ত্তৃপক্ষগণ, শ্রীসত্যানন্দ রায়, মিসেস মহলানবীশ, শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন, বি. কে. সেন, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্রীসরলা দেবী, এন. সি. দাস প্রভৃতি প্রদর্শনীর দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

উৎসব ও সংবর্দ্ধনা

১। প্রতিষ্ঠা উৎসব—আলোচ্য বর্ষের ৮ই শ্রাবণ পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব, সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে প্রাচীন মূর্ত্তি, পুথি, পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, সাহিত্যিকগণের ব্যবহৃত দ্রব্য ও চিত্র উপহার পাওয়া যায়। উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র 'আনন্দবাজার' হইতে আবৃত্তি করেন। কুমারী অমিতা সেন ও শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি গান করেন। এই উপলক্ষে জলযোগের আয়োজন করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষের ৮ই শ্রাবণ সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসবও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমেই ডক্‌টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় 'তুফান' নামক স্বরচিত গ্রন্থ হইতে "ডাকঘরের আত্মকাহিনী" আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুরের নেতৃত্বে বাণীপীঠের ছাত্রীগণের গান, শ্রীপান্নালাল দে ও কুমারী রমা ঘোষের গান, শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও শ্রীসারদা গুপ্তের হাসির গান এবং শ্রীঅরুণকুমার সিংহের কীর্ত্তনের পর জলযোগের দ্বারা নিমন্ত্রিতগণকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের

কাঁঠালপাড়ার বাড়ী সংস্কারের জন্য সভাপতি মহাশয় আবেদন জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীগুরুসদয় দত্ত, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীগণপতি সরকার ও শ্রীলালবিহারী দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲ হিসাবে এই উদ্দেশ্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন এবং দুইজন বন্ধু নগদ ৭৲ দান করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্ত্তি, মুদ্রা, পুস্তক, পুথি, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি ও পুস্তকাদি প্রদর্শিত হয় এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

২। ৩১এ ভাদ্র শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে পরিষদের অন্যতম বান্ধব ঝাড়গ্রামরাজ কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুরকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য এক সান্ধ্য সম্মিলন হয়। এই উপলক্ষে কুমার বাহাদুরকে পরিষদের গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ-লিখিত "আশীর্ব্বচন" ও শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত অভিনন্দন পঠিত হইলে শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীসমরেশ চৌধুরীর গানের পর জলযোগান্তে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠা

বিগত বর্ষে রমেশ-ভবন নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলেও উহার প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান এ পর্য্যন্ত হইয়া উঠে নাই। আলোচ্য বর্ষের ২৫এ ফাল্গুন মহারাজাধিরাজ স্যর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিশেষ অধিবেশনে এই ভবন-প্রতিষ্ঠা-উৎসব সম্পন্ন হয়। মিসেস জ্ঞানাঙ্কুর দে, মিস্ দে, শ্রীযুক্তা সাধনা বসু ও শ্রীমধু বসু স্তোত্র গান করিয়া সভার উদ্বোধন করিলে পর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাণী পঠিত হয়। মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস রমেশভবন কমিটির কার্য্যবিবরণ ও ভবন নির্ম্মাণে সাহায্যকারিগণের নাম পাঠ করেন। এই ভবনের দ্বিতল নির্ম্মাণের জন্য লেডী প্রতিমা মিত্রের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টার কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেন। গবর্ন্মেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তিতে কণ্ট্রাক্টরের দেনা শোধ হইলেও ইহার নানাবিধ আসবাব প্রভৃতির জন্য আরও চারি হাজার টাকার অভাবের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিলে সভাপতি মহাশয় স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করিয়া শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের মূর্ত্তি ও রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীঅরুণা সেনের স্বহস্তে অঙ্কিত ও তাঁহার প্রদত্ত রমেশচন্দ্রের তৈলচিত্র উন্মোচনপূর্ব্বক রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন। শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধন্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিলে পর সভা ভঙ্গ হয়। আলোচ্য বর্ষে রমেশ-ভবনের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক বরোদার মহারাজ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে।

(১) সারদাচরণ মিত্র, (২) রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (৩) রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও (৪) ভূমিদাতা মহারাজা ৺মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের পরলোকগমনে

রমেশ-ভবনের এই চারি জন ন্যাস-রক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় রমেশ-ভবন কমিটির অধিবেশনে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠা-সভার অনুমোদনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ও মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী ন্যাসরক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইঁহারা এক্ষণে রমেশ-ভবনের ন্যাসরক্ষক রহিলেন,—

(১) মহারাজ স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, (২) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (৩) কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, (৪) মাননীয় মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এবং (৫) মাননীয় বিচারপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস।

আলোচ্য বর্ষে এবং বর্ত্তমান বর্ষে চিত্রশালার জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে,—বঙ্কিমচন্দ্রের পোষাক ও ব্যবহৃত দ্রব্য, দীনবন্ধু মিত্র, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রভৃতি মনস্বিগণের ব্যবহৃত দ্রব্য, হস্তলিপি প্রভৃতি। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের জন্য চিত্র-শালার দ্রব্যগুলি গুদামজাত ছিল। আলোচ্য বর্ষে তন্মধ্যে কতকগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। উপযুক্ত আধারের অভাবে সকল জিনিষ রীতিমত প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বঙ্গীয় রাজসরকারকে এই বিষয় জানাইয়া অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে বিশ্বভারতীর চিত্র ও শিল্পসম্পদ্ রমেশ-ভবনের হলে প্রদর্শিত হইয়াছিল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে গত ১৬ই মাঘ রমেশ-ভবন ও উক্ত প্রদর্শনী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। চিত্রশালার জন্য একজন ফরাশ আলোচ্য বর্ষে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং চাকরদের আহারাদির জন্য একটি সাময়িক টিনের চালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ স্থানে একতলা ঘর ও তদুপরি বিক্রেয় গ্রন্থাবলী রাখিবার জন্য গুদাম প্রস্তুত করা সত্বর আবশ্যক। তদভাবে বহু মূল্যবান্ পুস্তক নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আলোচ্য বর্ষে The Calcutta Electrical Mfg. Co., Ltd. তাঁহাদের ৩ খানি Orient fan রমেশ-ভবনে তিন মাসের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন। পরিষৎ ইহার জন্য উক্ত কোম্পানীর নিকট কৃতজ্ঞ।

বঙ্কিমচন্দ্র

১২৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। আলোচ্য ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্মের শত বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে ও বঙ্গের বাহিরে নানা স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণোৎসব হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য পরিষৎ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল,—

(১) বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে এবং বঙ্গের বাহিরে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসবের জন্য পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদকের প্রেরিত অনুরোধপত্রের ফলে বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যূন পক্ষে দুই সহস্রাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বঙ্কিমচন্দ্রের শুভ জন্মদিন স্মরণে বর্ত্তমান বর্ষের ১০।১১।১২ই আষাঢ় উৎসবানুষ্ঠান হয়। পরিষৎ ঐ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব করিবার সঙ্কল্প পূর্ব্ববৎসরেই গ্রহণ করেন এবং তদনুসারে ঐ দিবসত্রয় সমারোহে উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের যে বৈঠকখানাটি আছে—যেখানে বসিয়া তিনি কিছুকাল সাহিত্য-সাধনা করিয়াছিলেন—তাহা অতি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার ¾ অংশের মালিক কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন। এই সম্মেলন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্ত ত্রিচতুর্থাংশ, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য তিন জন দৌহিত্রের নিকট খরিদ করিয়াছিলেন। বিগত বর্ষে শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার অংশ পরিষৎকে দান করিয়া দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। কাঁঠালপাড়া বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মেলন তাঁহাদের সকল স্বত্ব পরিষৎকে দান করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ অধিবেশনে মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই দানপত্রও আলোচ্য বর্ষে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। এই জীর্ণ বৈঠকখানাটির সংস্কার সাধনে আনুমানিক ২৫০০৲ ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং বৈঠকখানার সীমানার প্রাচীর নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। নৈহাটীর শ্রীকালীতোষ ভট্টাচার্য্যের উপর সংস্কার কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাচীর নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় (১২০৲) নিজে বহন করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেকে ১০০৲, কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ১০১৲, শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীএন. সি. চ্যাটার্জ্জি প্রত্যেকে ২৫৲ এবং শ্রীবলাইলাল শেঠ ২০৲, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু ৫৲, শ্রীধন্যকুমার জৈন ৫৲, শ্রীকিরণচন্দ্র বসু ২৷৷০ ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র ২৲ দান করিয়াছেন। দেশবাসী বাঙ্গালার এই পুণ্যতীর্থ সংস্কার করিবার জন্য মুক্তহস্ত হইবেন—ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

(৪) বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থের সঙ্কলিত জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এই সংস্করণে (১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে প্রকাশিত পুস্তকগুলি, (২) তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং (৩) অপ্রকাশিত বাংলা ও ইংরাজী প্রবন্ধাদি এবং চিঠিপত্র মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থ সম্পাদন করিতেছেন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস। ইতিমধ্যেই আটখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, অন্য দুইখানি প্রায় শেষ হইয়া আসিল এবং এক মাসের মধ্যে আরও ৩।৪ খানি মুদ্রিত হইবে। অপর খণ্ডগুলি পর পর প্রকাশিত হইবে। প্রকাশিত খণ্ডগুলির বিবরণ 'গ্রন্থপ্রকাশ' শিরোনামে দ্রষ্টব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থস্বত্বের ¼ অংশ শ্রীব্রজেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খরিদ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশকার্য্যে আনুষঙ্গিক কপিরাইট্ এক্ট অনুযায়ী বিজ্ঞাপনাদি এবং

গ্রন্থের প্রচারকল্পে কয়েক বার বিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণ পরিষৎকে বিশেষভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

(৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্কিম-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ও উপযুক্ত ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হয়।

কার্য্যালয়

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—সভাপতি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত; সহকারী সভাপতিগণ—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ইনি পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ইনি পরলোকগমন করায় রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ; সম্পাদক শ্রীমন্মথমোহন বসু; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ এবং শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; চিত্রশালাধ্যক্ষ—শ্রীগণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) মূল-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

১। ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ২। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, ৩। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৪। শ্রীঅমলচন্দ্র হোম, ৫। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৭। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ৮। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ৯। রেভারেণ্ড এ. দোঁতেন, ১০। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ১১। শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার, ১৭। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৯। শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত, ২০। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—

২১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—

২৬। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২৭। ডাক্তার শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১১টি সাধারণ ও একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা পাঁচ বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক) ভুবনমোহিনী পদক সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) কমলা-লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীমন্মথমোহন বসু, (গ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এবং (ঘ) জগত্তারিণী-পদক সমিতিতে শ্রীত্রিদিবনাথ রায় পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

২। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালন-সমিতিতে সভ্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল,—(১) শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, (২) শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, (৩) শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, (৪) শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, (৫) শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ।

৩। নিম্নলিখিত অনুষ্ঠানে পরিষদের প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল,—(ক) জ্যোতিষ পরিষদে, (খ) প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে, (গ) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে, (ঘ) বালী সাধারণ পাঠাগারের বঙ্কিম উৎসবে, (ঙ) মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভায়।

৪। দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট ও গুলু ওস্তাগর লেনের মধ্যে অবস্থিত পার্ক-এর 'সাধক রামপ্রসাদ সেন পার্ক' নামকরণ করিতে কলিকাতা করপোরেশনে প্রস্তাব করা হয়।

৫। (ক) বালী সাধারণ পাঠাগারে ও চন্দননগর পাঠাগারে বঙ্কিম উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (খ) কেশবচন্দ্র সেনের শতবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, (গ) রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে, (ঘ) হেতমপুরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলনের অধিবেশন উপলক্ষে প্রদর্শনীতে পরিষদের চিত্রশালা, পুস্তকালয়, ও পুথিশালা হইতে প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছিল।

৬। নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—(ক) সাহিত্য-শাখা, (খ) ইতিহাস-শাখা, (গ) দর্শনশাখা, (ঘ) বিজ্ঞানশাখা, (ঙ) আয়-ব্যয়-সমিতি, (চ) পুস্তকালয় সমিতি, (ছ) চিত্রশালা সমিতি, (জ) ছাপাখানা-সমিতি, (ঝ) নিয়মাবলী সংস্কার সমিতি, (ঞ) কেশব-চন্দ্র সেন শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (ট) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার সমিতি, (ঠ) কাঁঠালপাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কার সমিতি, (ড) দেনা মিটাইবার জন্য সমিতি, (ঢ) রাজা রামমোহন রায় গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (ণ) কার্য্যালয়ের ছুটী নির্দ্ধারণ সমিতি, (ত) কালীপ্রসন্ন সিংহ শতবার্ষিক জন্মোৎসব সমিতি, (থ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র-নির্ব্বাচন সমিতি এবং (দ) বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি।

৭। ইংরেজি ১৯৪০ সনে কালীপ্রসন্ন সিংহের শতবার্ষিক জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং ঐ সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনী প্রকাশিত হইবে।

৮। ই. আই. রেলওয়ের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের 'সপ্তগ্রাম' নামকরণের প্রস্তাব ভারত গবর্মেণ্ট ও রেলওয়ে অফিসে করা হইয়াছে।

৯। ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের প্রস্তাবিত Indian Academy of Arts and Letters স্থাপন বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জানান হইয়াছে।

১০। বিশ্বভারতীর সহিত পরিষদের সংযোগ স্থাপনের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

১১। রমেশ-ভবনে বিশ্বভারতীর কলাভবনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১২। ৺সরযূ ফরাসের মাসিক ৫৲ পেন্সন ও তৎপরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীকে এককালীন ২০৲ সাহায্য করা হইয়াছিল।

১৩। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু মহোদয়ার প্রস্তাবিত দানের (৩০০০৲ টাকার) সর্ত্তাদি আলোচিত হইতেছে।

১৪। বুদ্ধদেবের জন্মদিনে সাধারণ ছুটির প্রবর্ত্তন করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট আবেদনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট-গণনার জন্য ইঁহারা ভোট-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—শ্রীরমণীকান্ত বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং শ্রীবিনোদ চৌধুরী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শ্রেণীভেদ এইরূপ,—

(ক) প্রাচীন সাহিত্য—১। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুর ও তাল—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৩। ঐ আলোচনা —শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, ৪। ঐ প্রত্যুত্তর—রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৫। গোপাল ভট্ট—ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে, ৬। বগুড়ার কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ৭। মাণিক দত্ত ও মুকুন্দরাম—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৮। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। রামনারায়ণ তর্করত্ন—ঐ। ১০। চোরের পাঁচালি—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১১। পরমানন্দমতসংগ্রহ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, ১২। ভারতচন্দ্রের একখানি পুথি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(খ) আধুনিক সাহিত্য—১। প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২। বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ—ঐ, ৩। বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব—ঐ।

(গ) ইতিহাস—১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (১-৪)—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৫। বাংলা ভাষা-পরিচয়ের ভূমিকা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৬। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য —শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। "কলিকাতা" নামের উৎপত্তি—ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮। বৃন্দাবনের কয়েকটি মন্দিরের ঐতিহাসিক পরিচয়—ডক্টর শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, ৯। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, ১০। ভেলসংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব—ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ১১। মুঘল ভারতের ইতিবৃত্ত—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ১২। মুসলমান যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ—ঐ।

বিজ্ঞান—১। ভারতের মানব ও মানবসমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, ২। সড়াইকলা রাজ্যে তৈলনিষ্কাশণ-যন্ত্র—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার উন্নতি বিধানের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহার কলেবর বৃদ্ধি, প্রবন্ধসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ইহাতে প্রচুর চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি ইহা যথাসময়ে প্রকাশিত হওয়ায় সদস্য ও পাঠকগণের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইল,—

১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত ইহার ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব্বের ন্যায় সম্পাদক মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পরিষদের ঋণ পরিশোধার্থে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ইহার স্বত্ব তিনি পরিষৎকে দান করিয়াছেন। গ্রন্থে কয়েকখানি চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং পরিশিষ্টে অনেক নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হইয়াছে। এই সংস্করণটি বাঁধাইয়া প্রকাশ করা হইল। ২৪২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ শেষ হইয়াছে।

২। পরিষৎ-পরিচয়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্মাবধি গত ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত পরিষৎ-সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যে ইহা পূর্ণ। ২০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

৩। ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ।

(ক)	কপালকুণ্ডলা—	১০৮ পৃঃ
(খ)	মৃণালিনী—	১৫৩ পৃঃ
(গ)	দুর্গেশনন্দিনী—	১৭২ পৃঃ

(ঘ)	আনন্দমঠ—	১৭২ পৃঃ
(ঙ)	কমলাকান্ত—	১৪৬ পৃঃ
(চ)	সাম্য—	৫০ পৃঃ
(ছ)	বিজ্ঞানরহস্য	৬১ পৃঃ
(জ)	বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ)	৪১৬ পৃঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস বিপুল পরিশ্রম সহকারে এই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তি ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিতেছেন। ঝাড়গ্রাম-রাজের দানের উপর নির্ভর করিয়া পরিষৎ এই বিপুল ব্যয়সাধ্য গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই দান ব্যতীত কয়েক জন সদাশয় বন্ধুও ৫০৲ হিসাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই সকল দাতৃগণকে গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ উপহার দেওয়া হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থের জন্য কয়েক জন গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

সঙ্কলিত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে ১। ন্যায়দর্শন (২য় সংস্করণ) প্রথম ভাগের মুদ্রণ শেষ হইয়া আসিল—৪৩২ পৃষ্ঠা ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হইয়াছে। ভূমিকা মুদ্রিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ।

২। বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ মুদ্রণের কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৪৮ পৃষ্ঠা মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

৩। রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞান' মুদ্রণের কাজ এ বৎসর কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

৪। বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। এই গ্রন্থের মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পুথিশালায় সর্ব্বসমেত ৭২ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা পুথি ৮ খানি এবং সংস্কৃত পুথি ৬৪ খানি। বাঙ্গালা পুথির মধ্যে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল (অসম্পূর্ণ) ৩ খানি এবং জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল (অসম্পূর্ণ) একখানি উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত পুথির মধ্যে কাশীনাথ-কৃত শিববিলাস কাব্য, পূর্ণানন্দ-কৃত ষট্‌চক্রবিবরণের কয়েকখানি নূতন টীকা ও রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বের ১৫৪৪ শকাব্দে লিখিত একখানি পুথি উল্লেখযোগ্য।

পরিষদের হিতৈষী যে সকল ভদ্রমহোদয়ের প্রদত্ত পুথির মোড়ক হইতে উপরিলিখিত পুথিগুলি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে, তাঁহাদের নাম ও বাছাই-করা পুথির সংখ্যা এইরূপ,—শ্রীআদ্যপদ মুখোপাধ্যায় (৪২ খানি), শ্রীশ্রীনিবাস দেবশর্ম্মা (১৭ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (৫ খানি), শ্রীবনমালী ঘোষ (৪ খানি), শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় (২ খানি), শ্রীকৃপাশরণ

হালদার (২ খানি)। এই পুথিগুলি তালিকাভুক্ত করিয়া আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে,—

বাঙ্গালা পুথি	—	৩১৯৮
সংস্কৃত "	—	২২৩০
তিব্বতী "	—	২৪৪
ফার্সী "	—	১৩
অসমিয়া "	—	৩
ওড়িয়া "	—	৪
হিন্দী "	—	২
	মোট	৫৬৯৪খানি

নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আলোচ্য বর্ষে পরিষৎপুথিশালায় পুথি কিরূপ ব্যবহার হইয়াছে, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

(ধার)—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২খানি এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটকে ১খানি ধার দেওয়া হইয়াছে।

(প্রদর্শনী)—রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর বার্ষিক অধিবেশনের প্রদর্শনীতে কয়েকখানি পুথি প্রদর্শিত হইয়াছিল।

(ব্যবহার)—হুগলী কলেজের অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মিতভাবে পুথিশালায় বসিয়া বহু পুথি আলোচনা করিয়াছেন। *Abhand.* Kunde Morgen. (1937, XXI. 7)এ হইতে প্রকাশিত 'মহানাটক' এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র সংস্করণে পরিষদের ব্যবহৃত পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে।

শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্তের নিকট পরিষদের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র (২৫১ ও ২৫৭ সংখ্যক পুথি) শেষ কয়েকটি কবিতার নকল পাঠান হইয়াছে। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে 'সর্বসার' নামক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থের বিষয়ে বিবরণ প্রেরণ করা হইয়াছে।

(নকল)—শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী সংস্কৃত 'চৈতন্য ভাগবতে'র (১৬৯৭) সম্পূর্ণ প্রতিলিপি করিয়া লইয়াছেন। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য পুথিশালার তালিকা নকল করিয়া লইয়াছেন।

পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তি-সম্পাদিত প্রাচীন বাংলা পুথির বিবরণের ৪৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে পরিষদের পুথিশালায় 'মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল' ও কাশীনাথের 'চোর চক্রবর্ত্তী' পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় (৪৫শ বর্ষ, ২য় ও ৪র্থ সংখ্যা) প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার ১৭৪৯ শকে মুদ্রিত ভাগবতের পুথির পাটার উপরে অঙ্কিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চারিখানি চিত্র 'প্রবর্ত্তক' পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩৪৫) প্রকাশ করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে ১০০ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র একখানি প্রাচীন পুথিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য একটি বাক্স এবং পুথিশালার ব্যবহারার্থ একটি কাষ্ঠাধার প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থাগার

বর্ষারম্ভে সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে ৪১৭২২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৫০১ খানি নূতন পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৫৮ খানি উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে এবং ১৪৩ খানি ক্রয় করা হইয়াছে। বর্ষশেষে সর্ব্বসমেত পুস্তকসংখ্যা ৫২২২৩ হইয়াছে। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা ও পুস্তকাদির নাম

শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র—১। উদ্ভিজ্জ বিদ্যা—১২৬৬, ২। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত—১২৭৪, ৩। বস্তুপরিচয়—১৮৫৯, ৪। মনঃকল্পিত ইতিহাস, ১ম ভাগ—শকাঃ ১৭৮৩, ৫। বুদ্ধিমালা, ১ম ভাগ—১৮৬১, ৬। জিওগ্রাফি—১২৬৩, ৭। অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস, সংবৎ ১৯১৪, ৮। ধ্রুববাদী—১২৮১, ৯। পুরাবৃত্তসার, ১ম খণ্ড—১২৬৭, ১০। খগোল-বিবরণ—১৮৫৯, ১১। ভেক মূষিকের যুদ্ধ—১৮৫৮, ১২। ধন-বিধান—১৮৬২, ১৩। ভূবৃত্তান্ত, ২য় ভাগ—১২৭৮, ১৪। হিতশিক্ষা, ২য় ভাগ, ১২৮১, ১৫। অবোধবন্ধু (মাসিক পত্রিকা) ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, চৈত্র, ১২৭৩ সাল।

ক্রীত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। সতীদাহ (আবেদন.) ১৮৩০, হিতোপদেশ—রামকমল সেন-প্রণীত, ১৮২০, ৩। কঠোপনিষৎ—রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত, ১ম সং, ১২২৪, ৪। কবিতাসংগ্রহ (বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা সহ)—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-প্রণীত, ৫। প্রত্নকম্রনন্দিনী—(The Hindu Commentator) হিন্দী পত্রিকা, Oct 1867, June 1868, Sept. 1870, ৬। বঙ্গদর্শন (মাসিক পত্রিকা) ১২৭৯ হইতে ১২৯০।

আলোচ্য বর্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান হইতে পুস্তক ও পত্রিকাদি উপহার অথবা বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। Supdt. Government Printing, Bengal, ২। Manager of Publications, Delhi, ৩। Secretary, Smithsonian Institution, U.S.A., ৪। Director, Geological Survey of India, ৫। Registrar, Calcutta University, ৬। Manager, Gita Press, Gorakhpur, ৭। Librarian, Bengal Library, ৮। School of Oriental Studies, London, ৯। Supdt, Archaeological Survey of India, ১০। Supdt, Government Museum, Egmore, Madras, ১১। Secretary, Royal Asiatic Society, North China Branch, ১২। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩। Kokusai Bunka, Japan, ১৪। Director of Industries, Bengal, ১৫। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

এতদ্ব্যতীত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে তাঁহাদের সম্পাদিত 'মহাকোষ' ও 'শব্দকোষ' পরিষদ্‌গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি ও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান হইতে বিভিন্ন সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে যে সকল সাময়িক-পত্র পাওয়া গিয়াছে, শ্রেণীভেদে তাহার সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল,—দৈনিক ৫, সাপ্তাহিক ৩৪, পাক্ষিক ৫, মাসিক ৬৪, দ্বৈমাসিক ২, ত্রৈমাসিক ১০।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গ্রন্থাগারের পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয় করিবার জন্য এ বৎসরও ৬৫০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। করপোরেশনের সর্ত্তানুযায়ী গ্রন্থাগারের আয়-ব্যয়বিবরণ ও মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ করপোরেশনে প্রেরণ করা হইয়াছে।

করপোরেশনের সাহায্য ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে—পরিষদের পুরাতন কর্ম্মী শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুস্তক খরিদের জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়া পরিষৎকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগার হইতে নিম্নলিখিত স্থানে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও মাসিক পত্র প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল,—১। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী—বালি সাধারণ পাঠাগার, বালি, হুগলী, ২। বঙ্কিমচন্দ্র শত-বার্ষিকী—চন্দননগর সাধারণ পাঠাগার, চন্দননগর, হুগলী, ৩। কেশবচন্দ্র সেন শত-বার্ষিক জন্মোৎসব প্রদর্শনী—ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা, ৪। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মিলন—হেতমপুর, বীরভূম, ৫। বিদ্যাসাগর প্রদর্শনী—বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের সাহায্যার্থ ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দান করাতে পরিষৎ সবিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষেও পরিষদের আবেদনের ফলে বঙ্গীয় রাজসরকার, পরিষদের উন্নতিকল্পে ৫০০০৲ দানের বাজেট মঞ্জুর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এবং সহৃদয় মন্ত্রিগণের নিকট এই সকল দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখা

আলোচ্য বর্ষে প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রবন্ধ-সংখ্যাই বেশী হইয়াছিল বলিয়া সাহিত্য-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইতিহাস বিভাগে ১টি এবং বিজ্ঞান বিভাগে ১টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। দর্শন-শাখার কোন অধিবেশন হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে ডকৃটর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এবং ডকৃটর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্র-কৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ ঐ শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞান-শাখার নেতৃত্বে কয়েকটি লোকশিক্ষক ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এপিডায়োস্কোপ খরিদ করায় তাহার সাহায্যে এই সকল বক্তৃতাসংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়াদির চিত্র প্রদর্শনের সুবিধা হইয়াছে। বক্তৃতার বিবরণ 'অধিবেশন' অংশে দ্রষ্টব্য।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী। গত পূর্ব্ববৎসরে করপোরেশনের শাখা-সমিতি পরিষদের মন্দির নির্ম্মাণাদির জন্য ৬০০০৲ টাকা সাহায্য দানের বিষয় বজেটভুক্ত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ টাকা পাওয়া যায় নাই। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে ঐ টাকা পুনরায় করপোরেশনের বজেটে যেন ধরা হয়।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুইজন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে এবং একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য অনেকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং এই ভাণ্ডারের জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যায় নাই। বর্ত্তমান বর্ষে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মন্দির সংস্কারের এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়াছেন। সত্বরই কার্য্য আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

কার্য্যের সুবিধার জন্য আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরে টেলিফোন বসান হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনে বিশেষ বিশেষ বক্তৃতায় প্রসঙ্গতঃ যে সকল চিত্র প্রদর্শনের আবশ্যক হয়, তজ্জন্য একটি এপিডায়োস্কোপ খরিদ করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে পরিষদের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বক্তৃতায় চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিষদ্ মন্দিরের নীচের তলায় রক্ষিত বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের আলমারীগুলি রমেশ-ভবনের দ্বিতলে ও নিম্নতলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং সুসংস্কৃত করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পরিষৎ মন্দির ও রমেশ-ভবনের মধ্যে একটি শৌচাগার নির্ম্মাণের সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

পদক ও পুরস্কার

(ক) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার শাখা-সমিতির প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোকে বঙ্গভাষায় রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইবে।

(খ) স্বর্ণকুমারী দেবী স্মৃতি-পুরস্কারের জন্য বিজ্ঞাপিত "বঙ্গসাহিত্যে স্বর্গীয়া স্বর্ণকুমারী দেবীর দান" বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য শ্রীমতী সতী ঘোষকে 'স্বর্ণকুমারী স্বর্ণ-পদক' দেওয়া হইবে। এই প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং অধ্যাপক শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এই ভাবে করা হইয়াছে,—

১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—মেসার্স্ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

২। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৩। রামনারায়ণ তর্করত্ন—অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য-প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৪। রমেশচন্দ্র দত্ত—শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত প্যারিস্ প্লাষ্টারে নির্ম্মিত এক আবক্ষ মূর্ত্তি।

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত—রমেশচন্দ্রের পৌত্রী শ্রীযুক্তা অরুণা সেন মহাশয়ার অঙ্কিত এবং তাঁহারই প্রদত্ত তৈলচিত্র।

৬। কেশবচন্দ্র সেন—ব্রোমাইড চিত্র; ডাক্তার শ্রীসত্যানন্দ রায়-প্রদত্ত।

৭। শশাঙ্কমোহন সেন—ব্রোমাইড চিত্র; কন্যা শ্রীযুক্তা সুষমা দাশগুপ্তা মহাশয়া-প্রদত্ত।

৮। বনওয়ারিলাল চৌধুরী—মিসেস্ বি. এল. চৌধুরী মহাশয়ার প্রদত্ত ব্রোমাইড চিত্র।

৯। প্রিয়নাথ সেন—ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা-প্রদত্ত তৈলচিত্র। উহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

১০। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—ব্রোমাইড চিত্র ; তাঁহার পরিবারবর্গের প্রদত্ত।

১১। রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু—ইঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা সরযূবালা ঘোষ মহাশয়ার প্রদত্ত চিত্র অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

১২। রায় জলধর সেন বাহাদুরের চিত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নী হেনরিয়েটার সমাধি-বেষ্টনী ও মর্ম্মরস্তম্ভ বর্ত্তমান বর্ষে নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্র ৩৬০৲ দান করায় সমাধির উপর মর্ম্মরস্তম্ভাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধি-বেষ্টনীর জন্য পৃথক্ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছিল।

যাঁহারা চিত্রাদি দান করিয়া ও এই উদ্দেশ্যে অর্থাদি সাহায্য করিয়া পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে মেদিনীপুর শাখা-পরিষদের নবগৃহ-প্রবেশের সূচনা হইয়াছে। মেদিনীপুরে যে বিরাট্ বিদ্যাসাগর-স্মৃতিভবন বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে শাখার স্থায়ী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহনির্ম্মাণের জন্য এই শাখার সংগৃহীত অর্থ উক্ত স্মৃতিভবন-সমিতির হস্তে অর্পিত হইয়াছে। মফস্বলের পক্ষে শাখার এরূপ সুদৃশ্য ও বৃহৎ কার্য্যালয় নির্ম্মাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে শাখা নানা অধিবেশন ব্যতীত বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ও বর্ত্তমান বর্ষে যথাক্রমে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার এই উৎসবে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং মূল-পরিষৎ হইতেও উভয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিল। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ দিব্যস্মৃতি উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। মূল-পরিষদের সভাপতি ও প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভাগলপুরে তত্রত্য শাখার একটি সুদৃশ্য নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিপুরা-শাখা এই বৎসর কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন এবং গৌহাটী-শাখা প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকল শাখাই বঙ্কিম-উৎসব ব্যতীত নানারূপ সাহিত্যালোচনার আয়োজন এবং স্মৃতি-সভার অধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। কোন নূতন শাখা আলোচ্য বর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রিপুরা-শাখার আহ্বানে কুমিল্লায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বাবিংশ অধিবেশন গত ২৫এ ও ২৬এ চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। মূল সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দর্শন-শাখায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী, বিজ্ঞান-শাখায় ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ইতিহাস-শাখায় ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, সাহিত্য-শাখায় অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এবং সঙ্গীত-শাখায় শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভাপতি ছিলেন। সম্মিলন-পরিচালন-সমিতিতে নিয়মানুসারে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে ৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সম্মিলনের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন বীরভূম সাহিত্য-সম্মিলন ও বীরভূমবাসীর পক্ষে বোলপুরে শান্তিনিকেতনে আহ্বানের প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে।

বিশেষ বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল,—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের এককালীন দান
২। ঐ (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
৩। ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৪। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৫। স্থায়ী তহবিলে দান
৬। সাধারণ তহবিলে দান
৭। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য দান
৮। পুস্তক ক্রয়ের জন্য দান
৯। দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে দান
১০। প্রতিষ্ঠা-উৎসবে ও সংবর্দ্ধনার জন্য দান
১১। বঙ্কিম-উৎসবের জন্য দান
১২। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারের জন্য দান
১৩। কেশবচন্দ্র সেন স্মৃতি-উৎসবের জন্য দান
১৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান
১৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান
১৬। পুথিশালার জন্য দান
১৭। আজীবন-সদস্যপদের জন্য দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত পরিষদের কার্য্যালয়-সংক্রান্ত কার্য্যের সাহায্যের জন্য বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ, বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং পক্ষে শ্রীশিশিরকুমার বসু, দাস কোম্পানী এবং শ্রীনারায়ণচন্দ্র মৈত্র বিবিধ দ্রব্য দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-শীট) হইতে পরিষদের আর্থিক অবস্থার বিষয় সবিশেষ জানা যাইবে। প্রতি বৎসরই পরিষদের নানা অভাবের বিষয় এই কার্য্যবিবরণে জ্ঞাপন করিয়া, তাহার প্রতিকারের জন্য সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হইতেছে। কিন্তু পরিষদের প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। এই আর্থিক অভাবের জন্যই পরিষৎ বহু সঙ্কল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছেন না। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, আলোচ্য বর্ষে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দান প্রাপ্তির ফলে বর্ষশেষে পরিষৎ সকল বাজার-দেনা ও আভ্যন্তরীণ দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। এই দানগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্গীয় রাজসরকারের দানে অতীব প্রয়োজনীয় পরিষদ্ মন্দির সংস্কারাদি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক খরিদের জন্য দান, চিত্রা বায়োস্কোপ কোম্পানী, শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ-তহবিলে দান, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর স্থায়ী-তহবিলে দান, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ও কুমার শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংস্কারে দান, শ্রীনরনারায়ণ চন্দ্রের মাইকেল-পত্নীর সমাধি নির্ম্মাণের জন্য দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশমত শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু একাকী সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

উপসংহার

এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, নানা দিক্ দিয়া পরিষদের আলোচ্য বর্ষটি পরিষদের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভে পরিষৎ নিজ কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হইয়াছেন, সেই সকল সহৃদয় সদস্য, অনুগ্রাহক ও মঙ্গল-কামীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, যাহাতে পরিষৎ দিন দিন অধিকতর বল সঞ্চয় করিতে পারে তজ্জন্য তাঁহারা পরিষৎকে সাহায্য করিবেন। যে সকল কর্ম্মী ও কর্ম্মাধ্যক্ষ পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পাদনে সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিতেছি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩১এ শ্রাবণ

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে

শ্রীমন্মথমোহন বসু

সম্পাদক

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা

পরিষৎ-পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

মূল্য ॥০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পরিষৎ-সংক্রান্ত সকল সংবাদ ইহাতে পাওয়া যাইবে। পরিষদে রক্ষিত চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তির তালিকা, গত ৪৬ বৎসর যাবৎ 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় যে-সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা, প্রভৃতি 'পরিষৎ-পরিচয়' পুস্তকে আছে।

সুলভে পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

আগামী ১৩৪৬ চৈত্র পর্য্যন্ত পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর নিম্নোক্ত ৬টি সেট সর্ব্বসাধারণকে বিক্রয় করা হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থ পৃথক্ গ্রহণ করিতে হইলে উহাদের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে লইতে হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের পার্শ্বে সদস্যপক্ষে নির্দ্দিষ্ট মূল্য দেওয়া হইল, সাধারণের পক্ষে উহাদের মূল্য স্বতন্ত্র।

১ নং সেট—পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১।৵০ স্থলে ॥৵০

২ নং সেট—কৌলমার্গরহস্য ১।০, কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন ৸০, ধর্ম্মপূজাবিধান ॥০, গোরক্ষ-বিজয় ॥০, মৃগলুব্ধ ৶০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০। মোট ৩।৵০ স্থলে ১।০

৩ নং সেট—সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, সংকীর্ত্তনামৃত ॥৵০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয় ।০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০, মনোবিজ্ঞান ১৲। মোট ৫৸৵০ স্থলে ২॥০

৪ নং সেট—ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ১।০, গ্রহগণিত ২৲, উদ্ভিজ্জান (১ম ও ২য়) ১॥০, নব্য রসায়নীবিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি ।৵০, লেখমালানুক্রমণী ॥০। মোট ৫৸৵০ স্থলে ২।০

৫ নং সেট—মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, ময়ূরভট্টের ধর্ম্মপুরাণ ১৵০, তীর্থমঙ্গল ।৵০, কবি হেমচন্দ্র ॥৵০। মোট ৪৵০ স্থলে ১॥০

৬ নং সেট—সংকীর্ত্তনামৃত ॥৵০, শ্রীকৃষ্ণবিলাস ॥৵০, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৲, বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় ।০, সর্ব্বসংবাদিনী ১৸০, রসকদম্ব ১৲, মৃগলুব্ধ ৶০, মহাভারত (আদিপর্ব্ব) ২৲, মনোবিজ্ঞান ১৲, তীর্থমঙ্গল ।৵০, মৃগলুব্ধ-সংবাদ ৶০। মোট ৯৲ স্থলে ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

ইহাতে থাকিবে—বঙ্কিমের জীবিতকালে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ—বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত সকল গ্রন্থ—সাময়িক-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধাবলী—প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্রাদি- সমসাময়িক গ্রন্থে বঙ্কিম-রচিত ভূমিকা।

সম্পাদন-বিভাগ।—**সাধারণ ভূমিকা**—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। **ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা**—শ্রীযদুনাথ সরকার। **গ্রন্থ-সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস।

সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই মূল্য দুই কিস্তিতে দেয়। প্রথম কিস্তির ১২॥০ টাকা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইতে হইবে, বারখানি গ্রন্থ পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১২॥০ টাকা দিতে হইবে। ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৲ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ (১৫৲ করিয়া দুই কিস্তিতে দেয়) দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী নয় খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। বাঁধানো চারি খণ্ড পাইবার পর দ্বিতীয় কিস্তির ১৫৲টাকা দিতে হইবে। এই সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্র, ইংরেজী-বাংলা হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি প্রভৃতি থাকিবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র।

রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ নয় খণ্ডে বাঁধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে এবং গ্রন্থের শেষ খণ্ডে তাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—ইহা ছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—**কপালকুণ্ডলা**—১৷০, **সাম্য**—৸০, **বিজ্ঞান-রহস্য**—৸০, **আনন্দমঠ**—১৸০, **কমলাকান্ত**—১৷০, **দুর্গেশনন্দিনী**—২৲, **মৃণালিনী**—২৲ **দেবী চৌধুরাণী**—১৲, **বিবিধ প্রবন্ধ** (১ম ও ২য় ভাগ) ২৲, **লোকরহস্য**—৸০, **গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক**—৸০ এবং **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত**—।০ আনা।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৪৬শ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৪৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম-এ, বি-এল

সহকারী সভাপতিগণ

স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

মহারাজ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী, এম-এ

রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর এম-এ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, এম-এ, সি-আই-ই

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

রায় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, এম-এ

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ডি-লিট্

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ, এম-এল-এ

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, এম-এ

সহকারী সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু গীতারত্ন, বি-এ

শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, এম-আর-এ-এস

পুথিশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম-এ

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ কুণ্ডু, বি-এস্‌সি, জি-ডি-এ, আর-এ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন, বি-এ

ষট্‌চত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়, এম-এ, ডি-লিট্ এণ্ড ফিল্, ২। ডক্টর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-এচডি ৩। শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, ৪। শ্রীযুক্ত অমল হোম, ৫। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, এম এস্‌সি, ৬। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, এম-এ, ৮। শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, ৯। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, বি-এল, ১০। রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ দোঁতেন, জি-এস্, ১১। শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, এম-এ, ১২। শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, বি-এস্‌সি, ১৪। শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, এম-এ, ১৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, ১৬। শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, বি-এ, বি-ই, ১৭। শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায়, এম-এ, বি-এল, ১৮। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল, ১৯। শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায়, বি-এ, ২০। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ধর্ম্মভূষণ, ২২। শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ সেন, ২৩। শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু, সরস্বতী, এম-এ, বি এল, ২৪। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ২৫। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু, ২৬। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি-এল, ২৭। ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী

(মূল্যতালিকা : পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত — ৩৲, ৪৲

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ,
সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত — ৫৲, ৬।৹

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ — ৬॥৹, ৮॥৹

চণ্ডীদাস-পদাবলী ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ২॥৹, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ — ৩॥৹, ৪॥৹

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) — ৩।৹, ৪॥৹
২য় খণ্ড— — ৩৲, ৩।৹
৩য় খণ্ড— — ২॥৹, ৩।৹

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৲, ২॥৹

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ॥৹, ৸৹

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত — ২৲, ৩৲

সংকীর্ত্তনামৃত—দীনবন্ধু দাসের
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত — ॥৵৹

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত — ১৷৹, ১।৹

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ১৲, ১।৹

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
[illegible]নারায়ণ ঘোষ অনূদিত [illegible]

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৲, ১।৹

জ্যোতিষদর্পণ
অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত — ১৲, ১।৹

মাথুর কথা
পুলিনবিহারী দত্ত প্রণীত — ২৲, ২।৹

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in
the Museum of the Bangiya
Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — ২৲

সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (৩ খণ্ড)
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত — ৫৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ড)
গিরিশচন্দ্র বসু — ১॥৹, ২।৹

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত — ৸৹, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত — ১৲, ১।৹

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত — ॥৹, ৸৹

কুরল
শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল অনূদিত — ১৸৹, ২।৹

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত — ৫৸, ৬।৹

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় — [illegible]

কালীপ্রসন্ন সিংহ
[illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রকাশিত

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

ওঁ

"UTTARAYAN"
SANTINIKETAN, BENGAL.

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় বঙ্কিমের গ্রন্থাবলীর যে শতবার্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে তাকে বঙ্কিমের সাহিত্যকীর্তির তীর্থযাত্রা বলা যেতে পারে। কী মুদ্রণসৌষ্ঠবে, কী চিত্রসমাবেশে বিন্যাসে, কী জ্ঞাতব্য তথ্যের বিবৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিতর্পণ উপলক্ষে এই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সমুজ্জ্বল রূপ গ্রহণ করেছে। এজন্য এই ব্যাপারের কর্তৃপক্ষ ও সহায়কগণকে বাংলা দেশের হয়ে সাধুবাদ নিবেদন করি।

ইতি ৯/১২/৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে :—কপালকুণ্ডলা—১।০, সাম্য—৸০, বিজ্ঞান-রহস্য—৸০, আনন্দমঠ—১৸০, কমলাকান্ত—১।০, দুর্গেশনন্দিনী—২৲, মৃণালিনী—২৲ দেবী চৌধুরাণী—১৲, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম ও ২য় ভাগ) ২৲, লোকরহস্য—৸০, গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক—৸০ এবং মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—।০ আনা।

গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইবার নিয়মাবলী ও গ্রন্থ-সম্পাদনের বিবরণ স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানপত্রে দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৬

সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, এম-এ. পিএইচ-ডি.

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। উপসংহারে এই গ্রন্থ 'রাজতরঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণে ইহা রাজাবলী নামে প্রসিদ্ধ। বাংলা ১৩১২ সনে বঙ্গবাসী প্রেস হইতে 'রাজাবলী' নামে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একাধারে এরূপ জ্ঞাতব্যতত্ত্ব-পূর্ণ বিচিত্র ইতিহাসগ্রন্থ, কেবল বঙ্গ-ভাষায় কেন, ইংরাজীতেও নাই। এ বিষয়ে এই গ্রন্থ অদ্বিতীয়। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কলির প্রারম্ভ হইতে কতজন হিন্দু নৃপতি ভারতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন ক্ষত্রিয় এবং কতজন হিন্দুজাতির কোন বর্ণভুক্ত ছিলেন, এবং কোন নৃপতি কিরূপ গুণগৌরবসম্পন্ন ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে।

বস্তুত পক্ষে এই গ্রন্থে হিন্দুযুগের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। গল্প ও কিম্বদন্তী ব্যতীত রাজগণের যে নাম ও বিবরণ আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসে অজ্ঞাত অথবা ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী। কোন জাতির বা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে সেই দেশের বা জাতির জনশ্রুতি যে কিরূপ অজ্ঞ ও বিকৃত হইতে পারে, এবং পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে কোন জাতির ঐতিহাসিক সূত্র কিরূপে সমূলে ছিন্ন হইতে পারে, এই গ্রন্থ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

প্রাচীন কোন্ গ্রন্থ অবলম্বনে রাজতরঙ্গ বা রাজাবলী লিখিত হইয়াছিল, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে 'রাজাবলী' নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, বাংলা রাজাবলীতে প্রদত্ত রাজবিবরণ ও এই গ্রন্থোক্ত সংক্ষিপ্ত রাজবংশাবলী, এ দুয়ের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান। মুদ্রিত দ্বিতীয়

সংস্করণের বাংলা রাজাবলীর ৫-৬ পৃষ্ঠায় রাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে, তাহার সহিত নিম্নে বর্ণিত এই গ্রন্থের রাজবংশের বিবরণ তুলনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। আবুলফজল-কৃত 'আইন-ই-আকবরী'তে বঙ্গদেশীয় রাজগণের যে বিবরণ আছে, তাহার সহিতও এই গ্রন্থোক্ত বিবরণের সাদৃশ্য খুব বেশী। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সংস্কৃত রাজাবলী শ্রেণীর গ্রন্থ অবলম্বনেই আধুনিক যুগের পূর্ব্বে বাংলার ইতিহাস রচিত হইত। অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের প্রত্নানুসন্ধানের ফলে যে সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে বাংলাদেশের জনশ্রুতিমূলক যে ইতিহাস ছিল, সংস্কৃত রাজাবলীকে তাহার প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য না থাকিলেও আমাদের দেশে ইউরোপীয়গণ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ও অনুসন্ধানের পূর্ব্বে জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে এ জাতির জ্ঞান (অথবা অজ্ঞানতা ?) কত দূর ছিল, তাহার একটি বিশ্বস্ত প্রমাণস্বরূপ এই গ্রন্থখানির মূল্য আছে। সুতরাং এই গ্রন্থ সাধারণে পরিচিত করিবার জন্য আমরা ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম দিতেছি। প্রয়োজনস্থলে মূল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থোক্ত কোন কোন শ্লোক অন্যান্য গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়—তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। অবশ্য কে কাহার নিকট হইতে এই সমুদয় শ্লোক ধার করিয়াছেন, তাহা বলা শক্ত।

রাজাবলী পুঁথির সারমর্ম্ম

[পুঁথিখানির মোট ছয়টি পাতা ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পাতাটি নাই। প্রথম পাতায় এক পৃষ্ঠা ও অন্য পাতায় উভয় পৃষ্ঠাই লিখিত। মোট পংক্তিসংখ্যা ৫৫। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির তালিকায় ইহার ক্রমিক নম্বর K577A]

কলিযুগের ১৮১২ (পক্ষচন্দ্রেভচন্দ্রেঽব্দে) বৎসর গত হইলে পাণ্ডুগণের সাম্রাজ্য ও ক্ষত্রিয়নৃপগণের রাজত্ব শেষ হইল। তৎপরে মহাপদ্মনন্দ ও তদ্বংশধরগণ পাঁচ শত (খগগনশরমং) বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করেন। তৎপরে—'নাস্তিক ও পাপকর্ম্মা' বীরবাহু রাজা হন। তৎসদৃশ তাঁহার বংশধরগণ চারি শত বৎসর সার্ব্বভৌমরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে ধুরন্ধর রাজা হন। এই সময়ে আদিশূর বঙ্গদেশে রাজা হন। নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে আদিশূরের বর্ণনা আছে, এবং তাহার পরের পৃষ্ঠা না থাকায় আদিশূর সম্বন্ধে অন্য তথ্য জানা যায় না।

শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনিপতিস্তত্র বঙ্গাদিদেশে
সল্লোকৈঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুরপতিঃ স্বর্যথাসীত্তথাসীৎ।
প্রত্তাপাদিত্যভত্তাখিলতিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি(র)গৌড়রাজ্যাদ্রিরস্তান্ ।২

অম্বষ্ঠানাং কুলেঽসৌ প্রথমনরপতির্বীর্য্যশৌর্য্যাদিযুক্ত-
স্তস্মান্নামাদিশূরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তো বভূব ।
লৌহিত্যাৎ পশ্চিমে বিক্রমপুরনগরে রামপল্যাখ্যধাম্নি
চক্রে রাঢ়াদিদেশাধিপতিনরপতে রাজধানীং প্রধানাং ॥৩
পঞ্চপ্রবরমৌদ্‌গল্যগোত্রবেদজ্ঞযাজ্ঞিকঃ ।
অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥৪
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব উৎকলস্য কদাভবৎ ॥৫

[মন্তব্য ঃ—ইহার প্রথম শ্লোক (নং ২) ৺লালমোহন বিদ্যানিধি 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' (২য় সংস্করণ, ২৫৭ পৃ.) ধনঞ্জয়কৃত কুলপ্রদীপের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত ইহার প্রথম (নং ২) ও দ্বিতীয় শ্লোকের (নং ৩) প্রথম দুই চরণ 'ধনঞ্জয়কৃত রাঢ়ীয় পঞ্জী—কুল-প্রদীপের' বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন (বল্লালমোহমুদ্গর, ২১ পৃ.)। ৺পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী তাঁহার 'আদিশূর ও বল্লালসেন' গ্রন্থে (১৯ পৃ.) ২ নং শ্লোক ও ৩ নং শ্লোকের প্রথম দুই চরণ "অম্বষ্ঠসম্বাদিকোদ্ধৃত প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকার বচন" বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে (২৩২ পৃ.) ৩ নং শ্লোকের প্রথম দুই চরণ 'অম্বষ্ঠ-সংবাদিকা'র বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে "কায়স্থ" শব্দে দেবীবরের বচন বলিয়া কতকগুলি শ্লোক (সম্ভবতঃ) রামানন্দ শর্ম্মকৃত কুলদীপিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে (দ্বিতীয় কাণ্ড, ৯৭-৯৮ পৃ.)। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈব চ ।
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব সর্ব্বভূমীশ্বরো যথা ।

উল্লিখিত ৪ ও ৫ নং শ্লোকের সহিত ইহা প্রায় অভিন্ন, কেবল শেষ চরণে ঈষৎ প্রভেদ। আমাদের রাজাবলী গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার ইহাই শেষ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পত্রটি পাওয়া যায় নাই। তৃতীয় পৃষ্ঠার প্রারম্ভ হইতে পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ১৬টি শ্লোক সমস্তই শব্দ-কল্পদ্রুমোদ্ধৃত বচনটিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, শব্দকল্প-দ্রুমোদ্ধৃত দেবীবর-বচনের অবশিষ্ট যে কয়টি শ্লোক এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী, তাহা ২ সংখ্যক পৃষ্ঠায় (যাহা পাওয়া যায় নাই) ছিল। অতএব শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত সমগ্র 'দেবীবর-বচন'ই এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শব্দকল্পদ্রুমে 'বল্লালকৃতশ্রেণিবিভাগ' এই সংজ্ঞায় যে পাঁচটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও রাজাবলীতে পাওয়া যায়। এগুলিও সম্ভবতঃ রামানন্দশর্ম্মকৃত কুলদীপিকা হইতে উদ্ধৃত। পূর্ব্বোক্ত রাজাবলীর প্রথম শ্লোকটি (২ নং) শব্দকল্পদ্রুমে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে উদ্ধৃত হইয়াছে। (সম্ভবতঃ) ইহা দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা হইতে গৃহীত হইয়াছে।

এই সমুদয় বিবেচনা করিলে সংস্কৃত রাজাবলী গ্রন্থ হইতেই উল্লিখিত অন্যান্য সমুদয় গ্রন্থে এই শ্লোকগুলি গৃহীত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। দেবীবর ঘটক যদি সত্যই রাজাবলীর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাজাবলী খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।]

আদিশূর ৬৩ অথবা ৬২ বৎসর (অক্ষর্তুমিতং) রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যামিনীভানু, অনুরুদ্র, প্রতাপরুদ্র, ভূদত্ত—ইঁহারা ৩১৮ (বসুজবহ্ন্যব্দমিতং) বৎসর রাজত্ব করেন।

এই সময়ে ধুরন্ধরের বংশধরগণও সাম্রাজ্যচ্যুত হন এবং পার্ব্বতীয় শকাদিত্য সার্ব্বভৌম হন। তিনি ১৪ বৎসর রাজত্ব করার পর বিক্রমাদিত্য ও তৎপুত্র ৯৩ বৎসর (বহ্নুকাব্দ, সম্ভবতঃ বহ্ন্যঙ্কাব্দ) রাজত্ব করেন। তৎপরে সমুদ্রপাল ও তাঁহার যোগী সন্তানগণ ৬৪১ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তিলকচন্দ্রের বংশ ১৪০ (খাব্ধিভেশ্বরং) বৎসর সাম্রাজ্য পালন করেন। তৎপরে হরিপ্রেমের বংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। নিম্নলিখিত রাঢ়-দেশের রাজগণ ইঁহাদের করপ্রদ ছিলেন:—আদিশূর-কুলোৎপন্ন ভূদত্তের পুত্র রঘুদেব ও রঘুদেবের পর তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গিরিধারী, পৃথ্বীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর ও জয়ধর। জয়ধরের পরে তাঁহার দৌহিত্র ভূপাল (দেবপালের পুত্র, শক্তিগোত্র, তিন প্রবর) রাজা হন। তৎপরে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শূরপাল, ধনপতি, মকরন্দ, জয়পাল, রাজপাল। তৎপরে রাজপালের অনুজ ভোগপাল ও ভোগপালের পুত্র জগৎপাল। ইঁহারা ৬১০ বৎসর রাঢ়দেশে রাজত্ব করেন। তৎপরে জগৎপালের দৌহিত্র ধীসেন (পঞ্চপ্রবর ও ধন্বন্তরি গোত্র)। যখন ধীসেন রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় ও বরেন্দ্রে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন হরিপ্রেমের বংশোদ্ভব মহাপ্রেম বৈরাগী সার্ব্বভৌম রাজা ছিলেন। হরিপ্রেম বনে গমন করিয়াছেন শুনিয়া ধীসেন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলেন। বিনা যুদ্ধে সাম্রাজ্য জয় করায় তিনি বিজয়সেন নামে পরিকীর্ত্তিত হইলেন। স্বয়ং দিল্লীশ্বর হইয়া তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শুকসেনকে রাঢ়াদি রাজ্যের অধিপতি করিলেন। তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া শুকসেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ বল্লালসেন তাঁহার স্থলে রাজা হইলেন। পিতা দিল্লীশ্বর, নিজে মণ্ডলেশ্বর, সুতরাং রাজ্য-শাসনে কোন চিন্তা না থাকায় বল্লাল 'জাতিধর্ম্মাদি পালনে' মনোনিবেশ করিলেন। আদিশূর আনীত বিপ্র ও শূদ্রগণের সন্ততিগণকে নিজগৃহে আনাইয়া যে যে ব্রাহ্মণ যেখানে ছিলেন, সেই গ্রামে (তাঁহাদের বাসস্থান) নিরূপিত করিলেন (যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র গ্রামে নিরূপিতাঃ), এবং (বাসস্থান অনুসারে) রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণী নির্দ্দেশ করিলেন, এবং কুলীন ও অকুলীন, এই দুই শ্রেণীবিভাগ করিলেন (তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তমে। তেষাং যেতু সদাচারাস্তে কুলিনাঃ [কুলীনাঃ] প্রকীর্ত্তিতাঃ॥)। আদিশূরের পূর্ব্বেকার বঙ্গদেশবাসী সাত শত ব্রাহ্মণ সপ্তশতী নামে অভিহিত হইলেন (স্মৃতাঃ)। শূদ্রগণেরও চারি শ্রেণীভাগ হইল—উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গ ও বারেন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিপ্রাশ্রিত, তাঁহারা কুলীন হইলেন।

১২ বৎসর রাজ্য করিয়া বল্লাল স্বর্গারোহণ করিলে লক্ষ্মণসেন দিল্লীশ্বর হইলেন এবং অনুজ কেশবের উপর রাঢ়াদি রাজ্যের ভার অর্পণ করিলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্লোকে লক্ষ্মণসেন-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্যপ্রথা বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

তদা ক্রোধেন চাম্বষ্ঠান্ দিল্ল্যা(দিল্ল্যা)দিদেশবাসিনঃ।
চক্রে ধর্ম্মচ্যুতান্ সর্ব্বা(ন্) শূদ্রাচারসমন্বিতান্ ॥
অবশিষ্টাস্তু যে সর্ব্বে রাঢ়াদিদেশবাসিনঃ।
পুরান্নঞ্চাপি পদ্মিন্যা যগৃহু (জগৃহু) ন কঞ্চন (কদাচন ?) ॥
তেষাস্তু যস্য যদ্রূপো (পা) ক্রিয়া দৃষ্টা মহীভুজা।
তস্য লক্ষ্মণসেনেন তথাভাবো নিরূপতঃ (নিরূপিতঃ) ॥
সিদ্ধঃ সুসিদ্ধসৎসিদ্ধৌ বিসিদ্ধশ্চ প্রসিদ্ধকঃ।
সংসিদ্ধঃ সিদ্ধবংশানামুত্তমস্তু (স্তু)ত্তরোত্তরঃ ॥
শেসা (শেষা)স্ত্রয়ঃ কুলীনাঃ স্যুঃ কুলজা আদিম(মাস্)ত্রয়ঃ।
কুলীনত্ববিনাশাস্তে কুলজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
সাধ্যাঽতিসাধ্যকশ্চৈব মহাসাধ্যস্তথৈব চ।
কষ্টসাধ্যস্তু সাধ্যানামধমঃ স্যাদ্‌যথাক্রমং ॥
যে যে গোত্রাস্তু যে সাধ্যাস্তে তদ্বশা (তদ্‌বংশায় ?) উদাহৃতাঃ।
ধর্ম্মরক্ষার্থমেতেষামাজ্ঞাং চক্রে নৃপোত্তমঃ ॥

লক্ষ্মণসেনের সাম্রাজ্য ১০ (খচন্দ্রাব্দং) বৎসর, তৎপরে কেশবের সাম্রাজ্য ১৬ (রসাঙ্কাব্দং) বৎসর। রাঢ়াদি দেশে মাধব রাজত্ব করিতেন। দিল্লীতে কেশবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মাধব সম্রাট্ হইলেন। মাধবের সাম্রাজ্য ১১ (রুদ্রমব্দং) বৎসর। তৎপুত্র শূরসেন ৮ (বস্বব্দং) বৎসর। তৎপরে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভীমসেন, কার্ত্তিক, হরিসেন, শত্রুঘ্ন ও নারায়ণ মোট ৩৩ বৎসর (রামবহ্ন্যব্দমানং) সাম্রাজ্য ভোগ করেন। এই সময়ে মাধবসেনের অনুজ সদ(দা ?)সেন রাঢ়াদি দেশে রাজত্ব করেন। তৎপরে নারায়ণের পুত্র দ্বিতীয় লক্ষ্মণ দিল্লীতে সম্রাট্ হন এবং তাঁহার পুত্র জয়সেন গৌড়ে রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় লক্ষ্মণ ৩৬ (রসবহ্ন্যব্দ) বৎসর এবং তৎপুত্র দামোদর ১১ বৎসর রাজত্ব করেন। "পরদারাদিদোষ" প্রযুক্ত দামোদর অমাত্য কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইলে চোহান জাতীয় দ্বীপসিংহ রাজা হন। তৎপরে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রণসিংহ, রাজসিংহ, বরসিংহ, নরসিংহ, জীবনসিংহ ও তৎপরে নরসিংহের দৌহিত্র পৃথুরায়, ইঁহারা মোট দেড় শত বৎসর রাজত্ব করেন। যবনকুলজাত অতিবলবান্ শাহাবদ্দী পৃথুকে হত্যা করিয়া দিল্লীশ্বর হন। তৎপরে সপ্তবংশের ৫২ জন যবনরাজ ৬০০ বৎসর রাজত্ব করেন। শাহাবদ্দী দিল্লীতে কুতবুদ্দীনকে প্রতিনিধি রাখিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এদিকে গৌড়েশ্বর জয়সেন ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে রাঢ়াদি দেশে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উগ্রসেন, বীরসেন, পদ্মলোচন ও তেজসেন ১৫১ (৫১ ?) বৎসর

রাজত্ব করেন (তেজসেনস্ত তৎপুত্র[শ্]চন্দ্রবাণাব্জ [ব্দ ?]···নৃপাঃ)। তেজসেন পাঁচ বৎসর রাজ্য করার পর কুতবদ্দী তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন (গতে বাণাব্দমানে তু তেজসো রাজ্যকর্ম্মণি। রাজ্যদ্রোহে প্রবর্ত্তোভূৎ কুতবদ্দী মহাবলঃ)॥ আত্মীয়স্বজন রাজধানীতে রাখিয়া তেজসেন এক গৃহপালিত কপোত সঙ্গে করিয়া যুদ্ধে গেলেন। যুদ্ধে কুতবদ্দী পরাজিত হইলেন, কিন্তু দৈবক্রমে পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়া কপোতটি দ্রুত রাজধানীতে উড়িয়া আসিল। কপোত দেখিয়া পুরজন স্থির করিলেন যে, রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, এবং যবন-সংসর্গে ধর্ম্মনাশ হইবে, এই আশঙ্কায় প্রাণত্যাগ করাই স্থির করিলেন। অনন্তর এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সকলে তাহাতে প্রবেশ করিলেন। কপোতকে উড়িতে দেখিয়া রাজা দ্রুতবেগে রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং স্বজনবর্গের মৃতদেহ দেখিয়া স্বয়ং অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। কুতবদ্দী এই সংবাদ শুনিয়া দ্রুতবেগে রাজধানীতে আসিয়া তেজসেনের সিংহাসন অধিকার করিলেন।

গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ এইরূপ :—

কুতবদ্দ্যাদিত গণকশাঃ বার্য্যস্তং যবনা নৃপাঃ। আজ্ঞাধিনাঃ (আজ্ঞাধীনাঃ) সপ্তদশ রাঢ়াদৌ ক্রমশস্তদা ॥৩ ইতি অম্বষ্ঠসংবাদিকায়াং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ (:) ॥০॥০ ॥ তদা বিপ্রাশ্চ কায়স্থা অম্বষ্ঠাশ্চ বিশেষতঃ। ত্যক্তা (ক্ত্বা) গৌড়াদিকং রাজ্যং নানাদেশসমাশ্রিতাঃ। কেচিদিল্বাদি (কেচিদ্দিল্ল্যাদি) দেশেষু কেচি (ৎ) শ্রীহট্টকাদিষু। ছদ্মবেশেন কেচিত্ত (ত্ত্ব) রাঢ়াদিষু নিবাসিনঃ। এবং শার্দ্ধ (সার্দ্ধ) শতং বর্ষং ম্লানা অম্বষ্ঠযাতয়ঃ (জাতয়ঃ)। তৎপশ্চাদ্রাজসম্মানপ্রাপ্তাঃ কেচিৎ ক্রমাৎ ক্রমাৎ ।১। ইতি রাজাবলি (ঃ) সমাপ্তঃ (সমাপ্তা)।

গ্রন্থের শেষ অংশ দেখিয়া অনুমান হয় যে, গ্রন্থের নাম রাজাবলি—এবং ইহার অন্তর্গত অম্বষ্ঠসম্বাদিকা খণ্ড ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। কিন্তু গ্রন্থারম্ভে বা অন্যত্র অম্বষ্ঠসম্বাদিকার কোন কথা নাই। সুতরাং ইহাই অধিকতর সম্ভব যে, যে তিনটি শ্লোকে তেজসেনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, উহা অম্বষ্ঠসম্বাদিকার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত।

'ইতি রাজাবলি সমাপ্তঃ' পুঁথির এই শেষ পদ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, মূল গ্রন্থের নাম রাজাবলি। ইহা যে মূল গ্রন্থের কোন খণ্ডিত অংশ নহে, তাহা গ্রন্থারম্ভসূচক "ওঁ নমঃ কুলদেবতায়ৈ" ও পাণ্ডুবংশের উল্লেখ দেখিয়াই বুঝা যায়। তবে খুব সম্ভবতঃ ইহা মূল রাজাবলী গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ; কারণ, ইহাতে সমুদ্রপাল, তিলকচন্দ্র, হরিপ্রেম প্রভৃতির বংশের উল্লেখ আছে, কিন্তু বংশধরগণের নাম নাই। বাংলা রাজাবলী গ্রন্থে এই সমুদয় রাজার নাম ও রাজ্যকাল দেওয়া আছে, কিন্তু সমুদ্রপাল ও হরিপ্রেমের বংশের মোট রাজ্যকাল বিষয়ে বাংলা রাজাবলীর সহিত এই গ্রন্থের সাদৃশ্য আছে। মোটের উপর গৌড়ীয় রাজগণের সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ আছে, কিন্তু দিল্লীর রাজবংশ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মূল সংস্কৃত রাজাবলী হইতে কেহ সংক্ষেপ করিয়া বঙ্গদেশের [ইতি]হাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গতঃ দিল্লীর ইতিহাস যেটুকু প্রয়োজনীয়, মাত্র তাহাই বিবৃত করিয়াছেন।

সংস্কৃত রাজাবলী নামক কোন গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত তৎপ্রণীত 'বল্লালমোহমুদ্গরে' (পৃ. ৩৮২) সংস্কৃত রাজাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন,—

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ দাসগুপ্ত কবীন্দ্র মহাশয় (মুক্তাগাছার কবিরাজ) আমাকে মুখে মুখে এই শ্লোকগুলি লিখাইয়া দিয়াছিলেন। আমার জিজ্ঞাসায় বলিলেন, 'আমরা বাল্যকালাবধি ইহা সংস্কৃত রাজাবলীর কবিতা বলিয়া জানি ও মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। আরও জানিতাম, এখন বার্দ্ধক্যে স্মরণ নাই।'

উক্ত পাঁচটি শ্লোকের প্রথম চারিটি আলোচ্য পুঁথিতে আছে। পঞ্চম শ্লোকটি ঠিক অবিকৃত অবস্থায় এই পুঁথিতে নাই, কিন্তু সমার্থদ্যোতক শ্লোক আছে। এই পুঁথিখানিও মুক্তাগাছা হইতে সংগৃহীত। সুতরাং মুক্তাগাছার বৃদ্ধ কবিরাজ সম্ভবতঃ এই রাজাবলীর শ্লোকই শুনিয়া থাকিবেন। ঐ অঞ্চলে এই গ্রন্থের প্রসিদ্ধি ছিল এবং অনুসন্ধান করিলে সম্ভবতঃ রাজাবলীর অন্য পুঁথিরও সন্ধান মিলিতে পারে। মূল অম্বষ্ঠসম্বাদিকার কোন বিশুদ্ধ গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। কেহ ইহার সন্ধান দিতে পারিলে এই গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া 'রাজাবলী' ও 'অম্বষ্ঠসম্বাদিকা' এই দুই গ্রন্থের সম্বন্ধ নির্ণয় হইতে পারে। এইরূপ তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা এই শ্রেণীর গ্রন্থের উৎপত্তি ও রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যাইতে পারে। 'অম্বষ্ঠসম্বাদিকা' সংগ্রহ করিয়া, পরে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু এই সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। অথচ এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ইহার সন্ধান হয়ত সহজেই মিলিতে পারে—এইরূপ বিবেচনা করিয়াই সংস্কৃত রাজাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত করিলাম।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, এম-এ, ডি-লিট্

'দুর্গেশনন্দিনী'র গল্প-অংশটি এইরূপ—

রাজা মানসিংহ উড়িষ্যার পাঠান সুলতান কৎলু খাঁকে জয় করিবার জন্য মান্দারণের দিকে ৯৯৭ বঙ্গাব্দে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া অগণিত পাঠান যোদ্ধাদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়, এজন্য বর্ষার শেষে সহায়ক সেনা আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং তত দিন পর্য্যন্ত পাঠানদের দ্বারা বাদশাহী মুলুকের গ্রাম লুঠ বন্ধ করিবার চেষ্টায় মাত্র পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সহ নিজের বীর পুত্র কুমার জগৎসিংহকে নিযুক্ত করিলেন।

আর, জগৎসিংহও অত্যন্ত চতুরতা ও কার্য্যতৎপরতা দেখাইয়া, "গোপনভাবে থাকিয়া, যখন কোথাও স্বল্পসংখ্যক পাঠান-সেনার সন্ধান পাইতেন, তরঙ্গপ্রপাতবৎ বেগে তদুপরি সসৈন্যে পতিত হইয়া তাহা একেবারে নিঃশেষ করিতেন।...অতি সাবধানে অথচ দ্রুতগতি, আগন্তুক পাঠান-সেনার উপরে সুকৌশলে এবং অ-পূর্ব্বদৃষ্ট হইয়া আক্রমণ করিতেন।... জগৎসিংহ কৌশলময়।" ইত্যাদি।

তাহার পর এক "সুন্দরীর সরলদৃষ্টিতে এই যোদ্ধা পরাভূত হইয়া" অভিসার-গমনের সময় অসাবধানতার ফলে মান্দারণ দুর্গে আহত ও বন্দী হইয়া কৎলু খাঁর রাজধানীতে নীত হন এবং সেখানে কৎলু খাঁ বিজিত দুর্গেশ-পত্নীর ছোরার আঘাতে মারা গেলে পর পাঠানদের বাদশাহী-পক্ষের সঙ্গে সন্ধির ফলে কুমার জগৎসিংহ মুক্তি পান এবং বাঙ্গালিনী দুর্গেশ-নন্দিনীকে বিবাহ করেন।

এই হইল উপন্যাস। কিন্তু ৯৯৭ বঙ্গাব্দে বাঙ্গলা দেশে সত্যই কি রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা আকবর বাদশাহের সরকারী ইতিহাস 'আকবর-নামা' হইতে জানা যায়। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে ছাপান মূল ফারসী 'আকবর-নামা', ৩য় ভলুম, ৫৭৯-৫৮১ পৃষ্ঠায়, এই কাহিনী লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নীচে দিতেছি :—

আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজত্ব সালের শেষাশেষি (অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে) বিহার প্রদেশে বিদ্রোহী দমন করিবার পর, রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করিবার উদ্দেশ্যে ঝাড়খণ্ডের পথে (অর্থাৎ সাঁওতাল-পরগণা দিয়া) রওনা হইলেন। ভাগলপুরে পৌঁছিয়া তাঁহাকে অনেক বিলম্ব করিতে হইল। নিজ প্রাদেশিক সৈন্য একত্র করিয়া ও কামান লইয়া রাজা মানসিংহের সহিত যোগ দিতে এত দিন লাগিবে যে তাহার মধ্যে বর্ষা আসিয়া পড়িবে, এই ওজর করিয়া বাঙ্গলার সুবাদার স'ইদ খাঁ নিজ স্থানে নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু মানসিংহ প্রভুর কাজে একনিষ্ঠ, তিনি ১৫৯০ সালের মার্চ মাসের শেষে ভাগলপুর হইতে বর্দ্ধমানের পথে রওনা হইয়া জেহানাবাদে শিবির স্থাপন করিয়া রহিলেন ;—বর্ষা-শেষে স'ইদ খাঁ, মখসূস্ খাঁ এবং রাজভক্ত জমিদারগণ সসৈন্যে যোগ দিবে, এই প্রতীক্ষায়। উড়িষ্যার বিদ্রোহী নেতা কৎলু এই শিবির হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে ধারপুর (পাঠান্তরে ধরমপুর) আসিয়া পৌছিলেন, এবং যুদ্ধের জোগাড় করিতে করিতে বাহাদুর খাঁ কুরুংকে অনেক সৈন্য সহ (মানসিংহের দিকে) রায়পুরে পাঠাইয়া দিলেন। মানসিংহ কুমার জগৎ-সিংহকে তাহার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিলেন। বাহাদুর খাঁ নিজ শিবিরের চারি দিকে দেওয়াল তুলিয়া, নানা বাক্যজাল ও খেলার দ্বারা সেই কম-অভিজ্ঞ তরুণ যুবককে অসাবধানতার মধুর নিদ্রায় মগ্ন করিল, এবং কৎলু খাঁর নিকট হইতে আরও সৈন্য চাহিয়া পাঠাইল।

২০এ মে তারিখে, যখন কুমার জগৎসিংহ মদ্যপানে ভরপুর হইয়া ঘুমাইতেছিলেন, বাহাদুর খাঁ অসংখ্য সৈন্য লইয়া হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিল ও যুদ্ধে জিতিল। ইতিপূর্ব্বে কৎলুর নিকট হইতে জলাল খাঁ এবং অন্যান্য অনেক পাঠান যোদ্ধা আসিয়া পৌছিয়াছিল ; তাহাদের নেতা ছিল উমর খাঁ (কাসু খাঁর পুত্র এবং মীরু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং খাজা ইসা (কৎলুর দূত অর্থাৎ সান্ধিবিগ্রহিক Foreign Minister)। যদিও বিষ্ণুপুরের জমিদার (বীর) হাম্বির বাহাদুর খাঁর কপটতা এবং তাহার নিকট কৎলুর নূতন সৈন্যদল প্রেরণের কথা জগৎসিংহকে বলিলেন, কুমার সে কথা কানে প্রবিষ্ট হইতে দিলেন না। সহস্র চেষ্টার ফলে কিছু মুঘল সৈন্য একত্র করিয়া তাহাদের পাঠানো হইল শত্রুদল দেখিয়া খবর আনিবার জন্য। পাঠানরা একটা জঙ্গলে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং সেখানে তাঁবু ও মালপত্র ফেলিয়া, একটা গুপ্ত পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। অন্ধ ("কম-দৃষ্টিশালী") বাদশাহী সৈন্যগণ শত্রুর এই ঘাঁটি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল এবং আগের চেয়ে আরও বেশী অসাবধান হইয়া পড়িল। ঠিক দিনশেষে এই অবস্থায় পাঠানরা তাহাদের আক্রমণ করিল। দলমধ্যে বন্দোবস্তের সূত্র ছিঁড়িয়া যাওয়ায় বিশৃঙ্খল বাদশাহী যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই বিনা যুদ্ধে চারি দিকে তাড়িত হইল ; অল্প কয়েক জন সাহসে পায়ের উপর ভর করিয়া লড়াই করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের দলে বাঁকা রাঠোর, মহেশদাস (গৌড় রাজপুত ?) এবং নারো চারণ (= কবি) বীরের মত প্রাণ দিল। শত্রুপক্ষে উমর্ খাঁ, মীরু খাঁ এবং হুমায়ূন কুলীর পুত্রগণ ও তাহাদের কয়েক জন কুটুম্ব মারা গেল। কিন্তু বাদশাহী দলের উপর বিষম বিপৎপাত হইল। বীর হাম্বির সেই "বেহুঁশ নব-যুবককে" ঐ বিপদ্ক্ষেত্র হইতে বাহির করিয়া নিজ রাজ্য বিষ্ণুপুরে আনিলেন। গুজব রটিয়া গেল যে, কুমার যুদ্ধে মারা গিয়াছেন।

মানসিংহ মন্ত্রণাসভা করিলেন। সকলেই উপদেশ দিল যে, তিনি জেহানাবাদ হইতে পিছুর দিকে কুচ করিয়া সলিমাবাদে যান ; কারণ, সেখানে সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্য পাওয়া যাইবে ; এবং সেখানে বসিয়া থাকিয়া বর্ষার পরে যুদ্ধ পুনরারম্ভ করিবার জোগাড় করুন। কিন্তু মানসিংহ বীরের পথ বাছিয়া লইলেন ; তিনি পশ্চাৎপদ হইলে শত্রুরা উল্লসিত

হইবে ও বাদশাহী সৈন্যের সাহস দমিয়া যাইবে, এই বলিয়া তিনি সেখানেই থাকিয়া যুদ্ধ চালাইতে সঙ্কল্প করিলেন।

ইহার দশ দিন পরে কৎলু খাঁর মৃত্যু হইল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যারাম ছিল, ইদানীং পথ চলার কষ্টে প্রাণ বাহির হইয়া গেল। খাজা ইসা কৎলুর নাবালক পুত্র নসীর খাঁকে সিংহাসনে বসাইলেন এবং মানসিংহের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন; পাঠান-হাঙ্গামা কতকটা শান্ত হইল। পাঠান-নেতারা এই সর্ত্তগুলিতে সহি করিয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি করিল:—তাহাদের মসজিদে খুৎবা-পাঠের মধ্যে বাদশাহের নাম ভুক্ত করা হইবে; বাদশাহের নামের টাকা-পয়সা তাহাদের রাজ্যে অঙ্কিত করা হইবে, তাহারা তাঁহার আজ্ঞা ভক্ত-প্রজার মত পালন করিবে,—পুরীর জগন্নাথ-মন্দির ও তাহার চারি দিকের জেলা বাদশাহকে সমর্পণ করিতে হইবে, এবং বাদশাহের অনুরক্ত কোন জমিদারের (যেমন বিষ্ণুপুরের রাজার) উপর পাঠানরা ভবিষ্যতে অত্যাচার করিবে না।

১৪ই আগষ্ট খাজা ইসা কৎলুর পুত্রকে রাজা মানসিংহের দরবারে উপস্থিত করিল। পাঠানদের পক্ষ হইতে বাদশাহের জন্য দেড় শত হাতী এবং অন্যান্য মূল্যবান্ উপঢৌকন দেওয়া হইল। তাহার পর মানসিংহ বিহার প্রদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

জয়পুর-রাজের বাঙ্গালী-বিবাহ

৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে এক পত্রিকা বাহির করেন, পরে ৺নিখিলনাথ রায় তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাহার এক সংখ্যাতে জয়পুরী ভাষায় লিখিত কাচ্ছোয়া-রাজবংশের একখানা ইতিহাস হইতে মানসিংহের সম্পূর্ণ বাঙ্গলা-অভিযানের লোকমুখে প্রচলিত বিবরণ—অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনীর বর্ণিত ঘটনার অনেক বেশী কথা,—অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।* কিন্তু জয়পুর-রাজদরবার হইতে উঁহাদের যে বংশাবলী পাইয়াছি, তাহা অধিক বিশ্বাসযোগ্য, এবং তাহা হইতে ঐ রাজাদের বাঙ্গালিনী-বিবাহ ক'টি উল্লেখ করিব।

রাজা মানসিংহের ১৯ রাণীর মধ্যে এক জন "কোচীন্ ক্ষমাবতী" কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনী; ইঁহার দুই পুত্র—কেশোদাস ও অতিবল। মানসিংহ বেরার প্রদেশে মৃত হইলে তাঁহার চিতায় যে চারি জন রাণী সহমরণে যান, তাঁহাদের মধ্যে এই ক্ষমাবতী ছিলেন। ঐ মৃত্যুসংবাদ রাজধানী আম্বেরে পৌছিলে সেখানে মানসিংহের আরও পাঁচ জন রাণী অনুমরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনের নাম "প্রভাবতী বংগালীন—কৃষ্ণরায়ের কন্যা।"

জগৎসিংহ কোন বাঙ্গালিনীর পাণিগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার পুত্র মহাসিংহ (খুব বীর যোদ্ধা এবং বিখ্যাত মির্জা রাজা জয়সিংহের পিতা) কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের এক কন্যাকে বিবাহ করেন, এই রাণী নিঃসন্তান অবস্থায় ঘোড়াঘাটে মুঘল শিবিরে স্বামী বর্ত্তমানে মারা যান।

* ১৩১২ সালে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ঐতিহাসিক চিত্রে' প্রকাশিত নবকৃষ্ণ রায়-লিখিত "অম্বরের শিলাদেবী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমানে আমরা যে সংস্কৃত কলেজ দেখিতেছি, তাহার প্রতিষ্ঠা হয় এক শত বৎসরেরও আগে,—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে। প্রথমে ইহা ৬৬ নং বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল, পরে সরকারী ব্যয়ে বার্ণ কোম্পানী কর্ত্তৃক পটলডাঙ্গা স্কোয়ারে নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইলে ১৮২৬ সনের ১লা মে তথায় স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু কলেজও এই বাড়ীতে স্থান পাইয়াছিল।*

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে প্রথম পাঠারম্ভ হয়। সেকালের বহু খ্যাতনামা পণ্ডিত এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। এই সময়ে যিনি যে-বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন এবং মাসিক যে বেতন পাইতেন, তাহার একটি তালিকা দিতেছি :—

সেক্রেটরী :—	উইলিয়ম প্রাইস	...	৩০০৲
ব্যাকরণ :—	হরনাথ তর্কভূষণ	...	৪০৲
	রামদাস সিদ্ধান্ততর্কপঞ্চানন	...	৪০৲
পাণিনি :—	গোবিন্দরাম উপাধ্যায়	...	৪০৲
অলঙ্কার :—	কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার	...	৬০৲
কাব্য :—	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	...	৬০৲
স্মৃতি :—	রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	...	৬০৲
ন্যায় :—	নিমাইচরণ শিরোমণি	...	৬০৲
বেদান্ত :—	রুদ্রমণি দীক্ষিত	...	
গ্রন্থাধ্যক্ষ :—	লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার	...	৬০৲
হিসাবরক্ষক :—	রামকমল সেন	...	৪০৲

সেকালের সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া অপর কেহ পড়িতে পাইত না। ছাত্রদের বেতন দিতে হইত না, বরং কৃতী ছাত্রেরা কলিকাতায় বাসা-খরচের জন্য কিছু কিছু বৃত্তি পাইত। তখন রবিবার কলেজ বন্ধ থাকিত না;—প্রাচীন পদ্ধতি-অনুসারে প্রতিপদ্, অষ্টমী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা-পূর্ণিমা ও অন্যান্য পর্ব্বাহে কলেজ বসিত না।

*". . . . . the buildings attached to the Hindoo College are occupied as follows :—The Centre upper roomed house by the Sanscrit College. The two wings lower roomed houses by the Hindoo College."—Letter dated 28 June 1837 from Ramcomul Sen. Secretary, Sanscrit College, to the General Committee of Public Instruction.

১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে একটি বৈদ্যক-শ্রেণী ছিল, সেখানে অনেক ছাত্র আয়ুর্ব্বেদ পড়িত।

আমরা ধারাবাহিক ভাবে সংস্কৃত কলেজের প্রত্যেক শ্রেণী এবং সেই সেই শ্রেণীর প্রাচীন অধ্যাপকবর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাস প্রধানতঃ সংস্কৃত কলেজের পুরাতন নথিপত্রের সাহায্যেই আলোচিত হইবে। এখানে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি, সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত কলেজের পুরাতন নথিপত্র দেখিবার সুযোগ আমাকে দিয়াছেন।

বেদান্ত-শ্রেণী

রুদ্রমণি দীক্ষিত

বেদান্ত-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন রুদ্রমণি দীক্ষিত। ইনি অল্প দিনই সংস্কৃত কলেজে ছিলেন; ১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে পর-বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসের তিন দিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজে মাসিক ৬০৲ বেতনে নিযুক্ত হন, ছাড়িবার সময় তাঁহার বেতন ছিল ৮০৲।

প্রধানতঃ কোপনস্বভাবের জন্য কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ রুদ্রমণিকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৩১ জানুয়ারি ১৮২৫ তারিখে কলেজের সেক্রেটরী লিখিয়াছিলেন :—

The Secretary to the Sub Committee of the Government Sanskrit College is sorry to report the necessity of the removal of one of the College Pundits Rudramani, the Vedanta Professor for violent and quarrelsome conduct, offensive to the other teachers and tyrannical to his pupils, also for irregular attendance disregard of repeated admonitions both from myself and the Secretary to the General Committee and general insubordination.

রামকুমার

রুদ্রমণির স্থলে কেহ পাকাপাকি ভাবে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে রামকুমার তিন মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে বেদান্তের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ২৬ এপ্রিল ১৮২৫ তারিখে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর পত্রে প্রকাশ :—

The Acting Professor Ramkumara who has been employed with the sanction of the College Council during the last two months in superintending the Vedanta Class, has performed the duty assigned to him with great credit to himself and advantage to the pupils, ...

কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়

রুদ্রমণির স্থলে কাশীর এক জন পণ্ডিত ১৮২৫ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৮০৲ বেতনে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়।

সংস্কৃত কলেজে বেদান্তের অধ্যাপকের পদের জন্য জেনারেল কমিটির সেক্রেটরী ও বিশপ্‌স কলেজের অধ্যক্ষ পাদরি মিল কৃষ্ণদেবের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। পাদরি মিলের প্রশংসাপত্রটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

CALCUTTA, April 22nd, 1825.

The bearer Crishna Deva Pundit was recommended to me at Benares when in quest of a Hindustani Pundit for Bishop's College by the late profound Sanscrit scholar Captain Fell, as a person eminently qualified to answer my wishes. From that time (October 1822) to the present, I have been in the habit of reading with him and consulting him on various points of Brahmanical literature and antiquities—but particularly on the Vedantic Philosophy. From the information I have derived from him—on this latter point especially—I can with confidence recommend him as a learned man and an able teacher—and one whom nothing but the hope of receiving rewards with a lucrative appointment could induce me now to dispense with.

W. H. MILL,
Principal of Bishop's College.

সংস্কৃত কলেজে প্রায় এক বৎসর অধ্যাপনার পর, ২৯ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে কৃষ্ণদেবের মৃত্যু হয়। ২ মে ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী লেখেন :—

The Secretary to the Government Sanskrit College begs to inform the Committee that Krishna Deva the Vedanta Professor died on Saturday, the 29th ultimo.

কৃষ্ণদেব ১৮২৬ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কলেজের বেতন-বইয়ে প্রকাশ, তিনি পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসের কোন বেতন পান নাই।

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি

কৃষ্ণদেবের শূন্য পদে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মাসিক ৮০৲ বেতনে ১৮২৬ সনের মে মাস হইতে বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শম্ভুচন্দ্র কলিকাতায় এক ন্যায়-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল উইলসন সাহেবের পণ্ডিতও ছিলেন। ২ মে ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী তাঁহার সম্বন্ধে জেনারেল কমিটিকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল :—

There are several candidates for the vacant situation. Among others, Sambhu Chandra Vachespati, a Pundit who has long been known to the Secretary as an excellent scholar, well versed in the Vedanta and a man of good character. He has been in the employ of Mr. Wilson for about three years who will be able to bear testimony to his abilities . . . and in the meantime he has been directed to take charge of the Class until the pleasure of the Committee is known.

স্মৃতিশাস্ত্রেও শম্ভুচন্দ্রের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। বেদান্ত-শ্রেণীতে ছাত্রের অল্পতাহেতু কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে তিনি কিছু দিন স্মৃতিশাস্ত্রেরও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।*

---

* সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ তারিখের পত্রে লেখেন :—

The Logic and Vedanta classes are not numerically attended; there are indeed but two scholars in the latter, and the Pundit will be usefully employed hereafter in instructing the pupils newly admitted to the study of Law for which he is well qualified.

শম্ভুচন্দ্র জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্‌ট্রাকশনের অনুজ্ঞাক্রমে সদানন্দ-কৃত 'বেদান্তসার' (রামকৃষ্ণতীর্থ-বিরচিত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী নাম্নী টীকাসহ) শোধনপূর্ব্বক ১৮২৯ সনে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানি দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত; ইহার এক খণ্ড সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি

১৮৪২ সনের আগষ্ট (?) মাসে শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বেতন ছিল ৯০৲।

শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর পর সংস্কৃত কলেজে স্বতন্ত্র বেদান্ত অধ্যাপকের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন বেদান্ত-শ্রেণীতে মাত্র তিনটি ছাত্র ছিল। বেদান্ত-অধ্যাপকের পরিবর্ত্তে ১৮৪২ সনের অক্টোবর মাস হইতে "পুরাবৃত্ত" পড়াইবার জন্য কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কলেজের প্রথমাবস্থায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। যে-সকল ছাত্র বেদান্ত পড়িতে ইচ্ছুক, কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশে তাহাদের শিক্ষার ভারও কমলাকান্তের উপর ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতে সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত-শ্রেণী উঠিয়া যায়।

জ্যোতিষ-শ্রেণী

যোগধ্যান মিশ্র

১৮২৬ সনে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিষ শিক্ষার জন্য একটি নূতন শ্রেণীর পত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে স্থির হয়, এই শ্রেণীতে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য ও অলঙ্কার-শ্রেণীর ছাত্রগণকে অন্ততঃ এক বৎসর ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী ও বীজ-গণিত পড়িতে হইবে। এই বিষয় অধ্যাপনার জন্য পরবর্ত্তী মে মাস হইতে যোগধ্যান মিশ্র নামে এক জন পণ্ডিতকে মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ২৭ এপ্রিল ১৮২৬ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব লেখেন :—

A mathematical Pundit upon the original plan may also be employed. He [will] also receive the same salary as the other Professors and this branch of study must be imperative on all the Sahitya and Alankara pupils for one year at least. A Pundit named Yogadhyana Misra is recommended by Mr. Wilson as duly qualified for the office of Instructor.

সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যোগধ্যান মিশ্র দুই বৎসর উইলসন সাহেবের অধীনে গ্রন্থানুবাদ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে অন্যূন ২৩ বৎসর যোগ্যতার সহিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য্য যোগধ্যান মিশ্রের নিকট 'লীলাবতী' পড়িয়াছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁহার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হোরেস হেম্যান উইলসন ও সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী প্রাইস সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে পরীক্ষা করিয়া ৩০ জানুয়ারি ১৮২৭ তারিখে কর্ত্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট

দেন, তাহাতে সংস্কৃত কলেজের নবপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষ-শ্রেণী সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য :

9. It will probably be in the recollection of the Committee, that the attempt to enforce the original rule of the College, which provided that the pupils of the Alankara and Sahitya classes should attend for a certain period, the arithmetical class, was violently opposed and was at one time likely to occasion the departure of a great number of the most promising scholars. The opposition was overcome by temperate remonstrance and it will be gratifying to the Committee to find that this useful branch of science has been since cultivated with singular assiduity and success. The pupils are 22 in number and most of them very far advanced. They began their studies in last May prior to which they were ignorant of the simplest rudiments. They have since gone through all the elementary rules through vulgar and decimal fractions, and two of them have acquired a considerable acquaintance with Plane figure or the Geometrical computation of heights and distances. Their rapid progress we think is a strong evidence of the superiority of the Indian over the English method of studying arithmetic as well as of the abilities of the teacher and application of the scholars.

বাংলা ও নাগরী অক্ষরে গ্রন্থমুদ্রণের সুবিধার জন্য যোগধ্যান মিশ্র কলিকাতা বড়বাজারে 'সারসুধানিধি' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ৮ ডিসেম্বর ১৮৩২ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছিল :—

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম কলিকাতার বড়বাজারে পঞ্চানন-তলাতে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ধরের নূতন বাটীর পশ্চিমে শ্রীযুত লালা বাবু ক্ষত্রিয়ের ভাড়ার ১৫ নম্বরের বাটীতে শ্রীযুত যোগধ্যান মিশ্র সার সুধানিধি নামে এক প্রেশ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে উত্তম নাগরি ও উত্তম বাঙ্গলা অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইবে সংপ্রতি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অন্তঃপাতি বীজগণিত নাগর অক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে এবং ঐ আপীশে ভাল বাঙ্গলা ও নাগরি ও পারশী ও আরবী অক্ষর বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে…। ইতি ১৮২৯ সাল ২৭ নবেম্বর। শ্রীযোগধ্যান মিশ্র।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৮।

এই সারসুধানিধি যন্ত্র হইতে যোগধ্যান মিশ্র (হরচন্দ্র ও উলেষ্টন সাহেবের সহযোগে) 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা' দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির মুদ্রণকাল ১৮৪০ সন, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬৫ ; সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড দেখিয়াছি।

যোগধ্যান মিশ্র অতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ১৯৮)

যোগধ্যান মিশ্র ২১ নবেম্বর ১৮৪৯ তারিখে কাশীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ১২ ডিসেম্বর ১৮৪৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী শিক্ষা-পরিষদ্‌কে এইরূপ লেখেন :—

I have the honor to forward for the information of the Council of Education. the accompanying note from Taranath Sarma, Professor of Grammar (1st Division) in this Institution, announcing the death of Yogadhyan Pundit the Professor of Jyotish at Benares which event occurred I understand on the 21st November, 1849.

সংস্কৃত কলেজে তাঁহার স্থলে প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন নিযুক্ত হন।* ১৬ নবেম্বর ১৮৫৩ তারিখে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তদবধি সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী-গণিত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়; শ্রীনাথ দাস ইহার অধ্যাপনা করিতেন।

বৈদ্যক-শ্রেণী

খুদিরাম বিশারদ

১৮২৬ সনের শেষ ভাগে সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্ব্বেদ পড়াইবার জন্য একটি বৈদ্যক-শ্রেণী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হয়। খুদিরাম বিশারদ এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের বেতন-বইয়ে প্রকাশ, তিনি ১৮২৬ সনের নবেম্বর মাস হইতে মাসিক ৬০৲ বেতন লইয়াছিলেন।

সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক-শ্রেণী খোলা হয় ১৮২৬ সনের ডিসেম্বর মাসে—মাত্র ৭টি ছাত্র লইয়া। খুদিরাম এই শ্রেণীতে ১৮৩০ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যহানির জন্য সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর ২৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখের পত্রে প্রকাশ :—

The Secretary to the Government Sanscrit College begs leave to suggest to the Committee the propriety of making some definitive arrangement with regard to the situation of Pundit of the Medical Class. Khoodeeram, the present incumbent, was unable to attend the College during the greater part of last year in consequence of severe illness. He has again been absent for some time past from the same cause, and the nature of his disease does not warrant the expectation that his health will ever be so far re-established as to enable him to discharge effectively the duties of his office. It may also be remarked that the medical pupils are now far advanced beyond what their present Pundit can teach them which renders it the more imperative that a successor be permanently appointed. Under these circumstances, the Secretary would recommend that Madhusudana Gupta, the head student of the Class, a zealous and intelligent young man who has always had charge of the class in the absence of his principal, and who is in every respect highly qualified for the situation, be nominated Medical Pundit in the room of Khoodeeram. . . This arrangement to take effect from the 1st proximo.

* প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র। ২০ ডিসেম্বর ১৮৪৯ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি যে প্রশংসাপত্র লাভ করেন, তাহাতে প্রকাশ :—

. . . Priyanath Siddhantapanchanan has attended at the Sanscrit College for eight years one month and studied the following branches of Hindoo Literature and Science, *viz.*, Rhetoric, Mathematics, Logic and Law. . . . At the time of leaving the College he held a senior scholarship of the first grade.

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত

অতঃপর আমরা খুদিরাম বিশারদকে কলিকাতায় বৈদ্যসমাজ স্থাপন করিতে দেখি :— ১ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় নিম্নোদ্ধৃত অংশ প্রকাশিত হয় :—

বৈদ্য সমাজ।—আমরা অবগত হইলাম যে শ্রীযুত খুদিরাম বিশারদ যিনি পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজের বৈদ্যপণ্ডিত ছিলেন তিনি যত্নবান্ হইয়া ৬ শ্রাবণ বুধবারে উক্ত সভা সম্পাদকত্ব ভার গ্রহণপূর্ব্বক যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র বসুজের দক্ষণ বাটীতে তৎসভা সংস্থাপিতা করিয়াছেন। তথায় বহুবিধ কবি কবিরাজ মহাশয়েরা সমাগত হইয়া সভা শোভাকরণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ পাঠ করিবেন। এ অতি কুশলের বিষয় যেহেতু এক্ষণে অনেক বৈদ্য যথার্থ রূপ ঔষধ ও কোন দ্রব্যের কি গুণ তাহা জ্ঞাত নহেন…।

এই বৈদ্যসমাজ প্রসঙ্গে ১৩ আগষ্ট ১৮৩১ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রে আরও একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাও এখানে উদ্ধৃত হইল :—

বৈদ্য সমাজবিষয়।— …গত ১৬ শ্রাবণ রবিবার উক্ত সমাজের এক বৈঠক হয় তাহাতে অনেকানেক চিকিৎসক বৈদ্যদিগের সমাগম হইয়াছিল সম্পাদক বিশারদকর্ত্তৃক সমাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইল। সমাজের চিরস্থায়িত্বনিমিত্ত এবং অভিপ্রায়মত কর্ম্ম সর্ব্বদা সুসম্পন্নজন্য নিয়মপত্রের পাণ্ডুলেখ্য পাঠ হইবায় তদ্বিষয়ে যাঁহার যে বক্তব্য ছিল ব্যক্ত করিলেন। শুনিয়াছি শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন যদ্যপিও তিনি চিকিৎসক বৈদ্য* নহেন কিন্তু তাঁহার নানাবিষয়ে বিজ্ঞতা আছে এজন্য সমাজ স্থাপনের রীতিনীতি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিষয়ে অনেক পরামর্শ প্রদানে সক্ষম। সমাজের অভিপ্রায় এই শুনিয়াছি যে এপ্রদেশে এক্ষণে অনেক জাতীয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহারদিগের অধিকার নাই যাহা হউক যাঁহার যে স্বেচ্ছা তদনুসারে কর্ম্ম করুন্ কিন্তু বৈদ্য চিকিৎসকদের উচিত যে স্থানে রোগিকে অন্য জাতীয় চিকিৎসক ঔষধ দিবেন তথায় ইঁহারা হস্তার্পণ করিবেন না। এবং ঐ সমাজদ্বারা নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হইবে ইহা বৈদ্যভিন্ন কোন জাতীয়কে বিক্রয় করিবেন না অপর কোন চিকিৎসক যদি কোন স্থানে কঠিন রোগের উপশমার্থ তদ্বিবরণ লিখিয়া সমাজে জ্ঞাত করান্ তবে সমাজাধ্যক্ষ পণ্ডিত চিকিৎসকেরা যথাশাস্ত্র ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিয়া দিবেন যাহাতে সজাতির মানহানি না হয়। এবং যথাশাস্ত্র ঔষধাদিদ্বারা লোকসকল রোগহইতে মুক্ত হইতে পারেন ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ চেষ্টা হইবে।…

---

* ১৮১৯ সনে রামকমল সেন 'ঔষধসারসংগ্রহ' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির আখ্যা-পত্র এইরূপ :—

ঔষধসারসংগ্রহ অথবা সচরাচর ব্যবহৃত ঔষধ নির্ণয়. ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞ বৈদ্যর সহকারিতা অবলম্বন করিয়া ইংরাজী হইতে বাংলা ভাষায় মুদ্রাঙ্কিত হইল. কলিকাতা. হিন্দুস্থানী প্রেস ১২২৬।

পুস্তকের ভূমিকায় প্রকাশ :—

"ইদানীং ইংরেজের রাজ্যোন্নতি হইবাতে ইউরোপীয় চিকিৎসকের ব্যবসায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও ব্যাপক হইতেছে, আর হিন্দুর বৈদ্যক শাস্ত্রের অনুশীলনার অপ্রাচুর্য্য প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় অনেক বিশিষ্ট লোক ইংরাজী ঔষধ ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু ইংরাজী বৈদ্যক গ্রন্থ এপর্য্যন্ত এ দেশের ভাষায় হয় নাই একারণ তত্তদৌষধের তত্বজ্ঞ ইঁহারা হইতে পারেন না, অতএব যে সকল ভেষজ সতত ব্যবহার্য্য, তাহার নাম উৎপত্তি গুণ ও অধিকার বাংলা ভাষায় সর্ব্ব সাধারণের নিমিত্তে প্রকাশ করিলাম,…।"

মধুসূদন গুপ্ত

খুদিরামের স্থলে তখনকার বৈদ্যক-শ্রেণীর কৃতী ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩০ সনের মে মাস হইতে মাসিক ৬০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এক জন ছাত্রের অধ্যাপক-পদ প্রাপ্তিতে ছাত্র-মহলে প্রথমটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

১৮৩২ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজ-সংলগ্ন ৬৫ নং (একতলা) বাড়ীতে একটি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রসঙ্গে রূপনারায়ণ ঘোষালকে লিখিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী উইলিয়ম প্রাইস সাহেবের ১১ জানুয়ারি ১৮৩২ তারিখের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

I have to acknowledge the receipt of your letter of the 21st September proposing terms of rent of the lower roomed house No. 65, in the College Square required for the use of a Native Hospital and Dispensary and in reply to inform you that the Committee agree to the terms therein mentioned provided you keep the house in habitable repair after it has been repaired thoroughly by the Committee.

It appearing that the premises do not belong to you the Committee require the original or an authenticated copy of the lease under which you have rented them.

সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর ছাত্রেরা এই হাসপাতালে গিয়া সংস্কৃত কলেজের মেডিক্যাল লেকচারার—জে. গ্রাণ্টের বক্তৃতা শুনিত।

কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ১৮৩৫ সনের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণী লোপ পাইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গের মাহিনার হিসাব-বইয়ে প্রকাশ, মধুসূদন গুপ্ত ১৮৩৫ সনের জানুয়ারি মাস পর্য্যন্ত সহি করিয়া বেতন লইয়াছিলেন। তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৪৯ সনে "লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ঔষধ কল্পাবলী শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে কলিকাতার রাজকীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়ের শ্রীমধুসূদন গুপ্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিতা" হইয়া প্রকাশিত হয়।

১২৫৯ সালে মধুসূদনের "এনাটোমী অর্থাৎ শারীর বিদ্যা, ১ম ভাগ" প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৫৬ সনের শেষ ভাগে মধুসূদন গুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' ২৪ নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

আমরা অতি দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বহু কালের মেডিকেল কালেজের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার প্রাচীন অধ্যাপক বাবু মধুসূদন গুপ্ত মহাশয় জ্বর রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

আমীর খুস্‌রু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ, পি-এইচ ডি

প্রস্তাবনা

মহাকবি আমীর খুস্‌রু-কৃত কাব্যমালার সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে "দেবলরাণী" ঐতিহাসিক চরিত্র কি না, এ বিষয়ে কাব্যসমালোচকগণের মধ্যে বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্র সাহিত্য-ক্ষেত্রেও সংক্রামিত হইয়াছে; বাংলা দেশের ন্যায় মধ্যপ্রদেশেও কাব্য-উপন্যাস-সমালোচনায় রসগ্রাহিতা ও নিরপেক্ষ বিচার অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার ছাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নবাব-নন্দিনী কাফেরের প্রতি অনুরক্তা হইলে মুসলমানের মান থাকে না; দেবলরাণী বিধর্ম্মী অহিন্দুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলে লজ্জায় হিন্দুর মাথা কাটা যায়; সমালোচকদের যেন এই ভাব। এই শ্রেণীর সাহিত্যিকেরা যে ব্যাপার কল্পনামূলক হইলেও সহ্য করিতে প্রস্তুত নহেন, সেই ব্যাপারই ঐতিহাসিকের সম্মুখে সংবাদপত্র মারফত বাস্তব জগতে প্রায়ই ঘটিতেছে। হিন্দুর মেয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমানকে বিবাহ করিতেছে; প্রৌঢ়া মুসলমান রমণী হিন্দু যুবককে লইয়া অন্তর্হিত হইতেছে; দু-এক স্থলে আর্য্যসমাজমতে বিবাহাদি চলিতেছে; নবাব-নন্দিনী অপেক্ষাও রূপসী ও সুপরিচিতা ইসলাম-দুহিতা ঘৃণিত "তর্‌সা-জাদা" বা খ্রীষ্টান যুবককে বিবাহ করিতেছে। মোহ অথবা প্রেম, ধর্ম্ম কিংবা সমাজের বাধা মানে না। যাহা জীবের আদি ও শাশ্বত বৃত্তি, যুক্তি ও সংস্কারের বহু উর্দ্ধে মানুষের হৃদয়-রাজ্যের ব্যাপার—হিন্দু মুসলমান তাহাকে কেমন করিয়া বাধা দিবে? এ পর্য্যন্ত যুক্তপ্রদেশে যাহারা হিন্দী ভাষায় আমীর খুস্‌রুর জীবনী ও কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 'মিশ্র-বন্ধু-বিনোদ' বা হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস-সম্পাদক মিশ্র-ভ্রাতৃদ্বয়, 'খুস্‌রো কী হিন্দী' কবিতা-সংগ্রাহক শ্রীযুত ব্রজরত্ন দাস এবং "আশিকী" বা খুস্‌রু-কৃত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্য-সম্পাদক শ্রীযুত জগনলাল গুপ্ত মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুই পুস্তকের সম্পাদকগণ আমীর খুস্‌রুর ভারতীয় দেশাত্মবোধ, হিন্দী-প্রীতি এবং হিন্দী ভাষায় তাঁহার অমূল্য দান ও ব্যক্তিত্বের ছাপের প্রশংসা মুক্তকণ্ঠে করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শেষোক্ত সমালোচক উৎকট সাম্প্রদায়িক বাতিকগ্রস্ত বলিয়া মনে হয়। 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্যের হিন্দী ভূমিকায় তিনি ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গুজরাট-রাজ রাওকরণের পুত্রী দেবলরাণী নিছক কবি-কল্পনা; ইতিহাসে এ নামের কোন নারীচরিত্র নাই। এ বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও নূতন ভাবে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এই প্রেম-কাহিনীর সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়; এইরূপ একটি অলীক

ব্যাপারকে বিনা-বিচারে গ্রহণ ও পাঠ্যপুস্তকাদির মারফত প্রচার যে ঐতিহাসিকগণের ঔদাসীন্যের পরিচায়ক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতপক্ষে জগনলাল গুপ্ত মহাশয়ের অভিযোগ খণ্ডনের জন্যই আমি 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্যের আলোচনা ও ঐতিহাসিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গুপ্ত-মহাশয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি কবি আমীর খুস্রুকে অন্যায় আক্রমণ করিয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। কবির প্রতি তাঁহার আক্রোশ; কেন না, তিনি সরস্বতীর হাতের বীণা কাড়িয়া লইয়া মুসলমানী সেতার তুলিয়া দিয়াছেন; প্রাচীন রাগ-রাগিণীর পরিবর্ত্তে মিশ্র রাগ-রাগিণীর প্রচলন করিয়াছেন। গুপ্ত-মহাশয় সর্ব্ববিধ বিবর্ত্তন ও যুগধর্ম্মের বিরোধী। যদি প্রাচীন সঙ্গীতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিলে উহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই হৃদয়তন্ত্রীতে সমস্বরে বাজিয়া উঠে, তবে আমীর খুস্রু এ কার্য্য করিয়া হিন্দু কিংবা ভারতবাসী হিসাবে আমাদের কোন অনিষ্ট করিয়াছেন, কিংবা তাঁহার এ প্রচেষ্টার মূলে কোন সাম্প্রদায়িক দুরভিসন্ধি ছিল, এ কথা বলা যায় না। গুপ্ত-মহাশয় কবির সমগ্র জীবনী ও তাঁহার কাব্যচর্চ্চার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবির হিন্দী চর্চ্চার উদ্দেশ্যই ছিল—মুসলমান ফকীর ও আউলিয়াগণ যেন হিন্দু-জনসাধারণের মধ্যে হিন্দী ভাষায় ইস্লাম প্রচার করিতে পারে এবং মুসলমান সংস্কৃতি হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করে; অন্য কথায় ইহা বলা যাইতে পারে, না হিন্দুর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল, না হিন্দুদের ধর্ম্মকে তিনি শ্রদ্ধার বস্তু মনে করিতেন; তিনি সর্ব্বদা হিন্দুদিগকে "কাফের", "ভ্রান্তমতবাদী", "পতিত" ইত্যাদি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন; তাঁহার মনে হিন্দুর প্রতি যে ঘৃণার ভাব ছিল, উহা তাঁহার সমস্ত গ্রন্থেই পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে আমীর খুস্রুর বিন্দুমাত্র দোষ নাই; কেন না, প্রথমতঃ তৎকালীন মুসলিম বিদ্বৎ-সমাজের মনোবৃত্তিই এরূপ ছিল; দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্যই হইল, নিজের জাতীয় সংস্কৃতির পরিপোষক গ্রন্থ প্রণয়ন। অর্থাৎ এই সমালোচক মহাশয়ের মতে আমীর খুস্রু ভারত-প্রেমিক ছিলেন না; পরন্তু মুসলমান যোদ্ধা তলোয়ারের জোরে হিন্দুস্থানে যে বাদশাহী কায়েম করিয়াছিল, উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত মুসলমান কবি ও আলেম লেখনী ও প্রচারের দ্বারা হিন্দুর ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাকে হিন্দু ও মুসলমানের চক্ষে ইস্লামী ধর্ম্ম ও সভ্যতা অপেক্ষা হীন প্রতিপন্ন করিয়া চিরদিনের জন্য হিন্দু জাতির মেরুদণ্ড ভঙ্গ করিতেছিল, আমীর খুস্রু তাঁহাদেরই অন্যতম। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যদি বিজেতা ও বিদেশীয়গণের মানব-কল্যাণকর কার্য্যসমূহের বিচার করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হয়—কেরী, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিওপ্রমুখ ইংরেজগণই ছিলেন বাঙ্গালীর অনিষ্টকারী প্রচ্ছন্ন শত্রু।

বিদ্যাপতির কবিতা পড়িয়া তিনি শাক্ত ছিলেন, কি বৈষ্ণব ছিলেন, প্রমাণ করা যেমন ভ্রমাত্মক, আমীর খুস্রুর কাব্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হিন্দুর প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্যাবলী একত্র সংগ্রহ করিয়া তাঁহার মনোবৃত্তির পরিচয়-চেষ্টা তেমনি ভ্রমপূর্ণ ও অযৌক্তিক। আমীর

খুস্‌রুর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দীভাষী পল্লীসমাজ কবির যে স্মৃতি সাদরে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, উহার দ্বারাই কবিকে বুঝা উচিত, কিংবা বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে এক শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দুর মধ্যে সংক্রামিত হইয়া সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে শোচনীয় দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাইয়াছে, তাঁহাদের মতামত দ্বারা আমরা কবি আমীর খুস্‌রুকে বিচার করিব—নিরপেক্ষ রসগ্রাহী সাহিত্যিকগণ ইহা বিবেচনা করিবেন। দেবলরাণীকে কবি তাঁহার স্বাভাবিক হিন্দুবিদ্বেষবশতঃ ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই মত খণ্ডন করিতে হইলে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রথমে কবির জীবনী এবং উহার পর বিশদভাবে 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্যের আলোচনা আবশ্যক।

কবি-পরিচয়

স্থলতান আলতমশ্‌ (ইল-তুত্‌মিশ্‌)-এর রাজত্বকালে (১২১০-১২৩৫ খ্রীঃ) আমীর সৈফ্‌-উদ্দীন নামক এক জন তুর্কী সর্দ্দার বিধর্ম্মী মোঙ্গলদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া বল্‌খ বা প্রাচীন বহ্লীক প্রদেশ হইতে হিন্দুস্থানে আগমন করেন। তাঁহার আভিজাত্য ও গুণের পরিচয় পাইয়া শাহী দরবারের ক্ষমতাশালী আমীর ইমাদ্‌-উল্‌-মুল্‌ক তাঁহাকে জামাতা-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত কাম্পিল ও পাটিয়ালী জনপদ জাগীরস্বরূপ দিয়াছিলেন। এই কাম্পিল, রাজা ব্রহ্মদত্তের অন্যতম রাজধানী সেই কাম্পিল্য-নগরী—যাহা কালবশে হতশ্রী হইয়া এই সময়ে এক কস্‌বা বা উপনগরীতে পরিণত হইয়াছিল। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে (৬৫১* হিঃ) এই স্থানে আমীর সৈফ্‌-উদ্দীনের তৃতীয় পুত্র আবুল-হাসান জন্মগ্রহণ করেন; এই বালকই পরবর্ত্তী কালে কবি আমীর খুস্‌রু নামে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। খুস্‌রু সহজাত কবিত্ব-শক্তি এবং ললিতকলায় বহুমুখী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন; ১২ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত (১৩২৫ খ্রীঃ) একাধিক ভাষায় এবং অভিনব ভাবে কাব্যলক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া তিনি অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আরবী, ফার্সী, তুর্কী এবং হিন্দী ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; এবং মনে হয়, সংস্কৃত ভাষার সহিতও তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন না। আমীর খুস্‌রুর যুগ উত্তর-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতার যুগ-সন্ধির যুগ। প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার ধারা তখনও চলিয়া আসিতেছিল। টাইগ্রীস ও চক্ষু (Oxus) তীরবর্ত্তী মুসলমান-সভ্যতা ও সংস্কৃতি বৌদ্ধ মোঙ্গলদের অত্যাচারে এ সময়ে যমুনাতীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানের সভ্যতার সেই ধারা কালক্রমে হিন্দুসভ্যতার সহিত একই খাতে মিলিত ও প্রবাহিত হইয়া ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের রাজত্বে মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

* কবি-কৃত 'মুহ্‌-সিপ্‌হ্‌র' কাব্যের "খাতেমা" বা উপসংহারে লিখিত আছে, ৭১৪ হিঃ জমাদা-সানী মাসে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর ছিল (Elliot and Dowson, iii. 566.)

মুসলমান জাতি এ সময়ে বিজয়দৃপ্ত, সবল ও সতেজ। তাহারা ভারতবর্ষ লুটপাট করিয়া খোরাসান তুর্কীস্থানে ফিরিয়া যাওবার উদ্দেশ্যে আসে নাই; হিন্দুস্থানে স্থায়িভাবে বাস করিয়া তাহারা ভারতীয় হইয়া গিয়াছিল। জাতির উন্নতির সময় মন মুক্ত ও উদার থাকে; বিজিত জাতির সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও ভাষার উপর তাহাদের ঘৃণা ও সংকীর্ণ ভাব থাকে না; এ সমস্ত হজম করিয়া তাহারা চিন্তা ও ভাবরাজ্যে নব বলে বলীয়ান্ হয়। ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধ রাজনৈতিক প্রয়োজনে উপেক্ষা করিবার মত সাহস ও উদারতার অভাব ইহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। সুলতান শিহাব-উদ্দীন ঘোরীর সময় হইতে আলাউদ্দীন খিলজী পর্য্যন্ত সিক্কা বা মুদ্রাই উহার অন্যতম প্রমাণ।*

চৌহান-সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় ১০০ বৎসর পরেও মুসলমান সুলতানগণ "বৃষ ও চৌহান অশ্বারোহী" মূর্ত্তি নিজ মুদ্রায় প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। আজকালকার মত ছবি ও মূর্ত্তি মাত্রই সে যুগে মুসলমান-সম্প্রদায়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইত না। ইবন বতুতা লিখিয়া গিয়াছেন, আলতমশের রাজপ্রাসাদের বুরুজে দুইটি সিংহমূর্ত্তি ছিল; আমীরেরা সিংহ-ব্যাঘ্র-লাঞ্ছিত খেলাতী আবা (long coat) পরিয়া দরবারে যাইতেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে "অল-রব্ব" শব্দের হিন্দী প্রতিশব্দ "প্রভু" নাগরী অক্ষরে খোদাই-করা আংটি হাতে পরিয়াছিলেন, এ অজুহাতে মোল্লারা শাহ্‌জাদা দারাকে কাফের বলিয়া কতল করিবার ফতোয়া দিলেন। ভারতের ভাগ্যাকাশে পূর্ণচন্দ্র তখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধচন্দ্রে পরিণত হয় নাই; ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্যবোধ ধর্ম্মের বিধিনিষেধে বিকৃত হয় নাই। ভারতবর্ষ পদ্মফুল ও কলসের দেশ; এ-জন্য সে যুগের সমাধিমন্দির ও প্রাসাদাদির প্রাচীরগাত্র মাঙ্গলিক চিহ্ন ও শোভাস্বরূপ প্রস্ফুটিত পদ্ম-চিহ্নিত এবং স্তম্ভ-পাদদেশ কলসাকৃতিবিশিষ্ট দেখা যায়। প্রস্তরখোদিত স্ফুটনোন্মুখ কমলকলি আমীর খুসরুর যুগে তোরণ-মালিকারূপে ব্যবহৃত হইত; তোগলকাবাদে সুলতান গিয়াস্-উদ্দীনের সমাধিগাত্রে আজও ঐ সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

কবি আমীর খুস্রু ছিলেন সে যুগের লোক বিশেষতঃ পুণ্যাত্মা উদারমতি সাধু নিজাম্-উদ্দীন আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য। সুতরাং তিনি ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান হইলেও এই অধঃপতিত প্রতিক্রিয়াদুষ্ট যুগের সংকীর্ণ মনোভাব তাঁহার ছিল না। দুঃখের বিষয়, বাংলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত কবি আমীর খুস্রুর কোন বিশদ এবং প্রামাণ্য জীবন-বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই। কবি স্বয়ং তাঁহার কাব্যসমূহে এরূপ একখানি মনোরম জীবন-চরিতের প্রচুর উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, ইনি একমাত্র ফার্সী ভাষায় ৯৯ খানি কবিতা-

---

* আলতমশের একটি মুদ্রায় "আল্লা" শব্দের সংস্কৃত "অব্যক্তমেকম্" এবং "রসুল" শব্দের সংস্কৃত "অবতার" করা হইয়াছে (অব্যক্তমেকম্ | মহম্মদ অবতার | নৃপতি মহমুদ | – অব্যক্তীয় নামে অয়ং টঙ্কঃ মহমুদপুর সম্বতী ৪১৮)—Thomas : *Chronicle of Pathan Kings*, p. 48.

পুস্তক এবং অর্দ্ধনিযুত পদ রচনা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার ২২ খানা কাব্যের সন্ধান মিলিয়াছে এবং প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থ অবলম্বনে পরবর্ত্তী কালে "তজকিরা" বা কাব্যসঙ্কলন-সাহিত্যে তাঁহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে। সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসেও কবি আমীর খুস্‌রুর উল্লেখ অনেক পাওয়া যায়।*

ভারতবর্ষে দ্বাদশ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনেক মুসলমান ও হিন্দু ফার্সী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেবল আমীর খুস্‌রু এবং তাঁহার সমসাময়িক মীর হাসান কবি-হিসাবে ইরাণীয় কবিদের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন—স্বয়ং সাদী ইঁহাদের গুণবত্তা স্বীকার করিয়াছেন। রাজপুত ইতিহাসের মহাকাব্য-যুগে আমীর খুস্‌রুর আবির্ভাব হইয়াছিল; এবং তাঁহার কাব্য-প্রতিভাও ছিল মহাকবির প্রতিভা। ফার্সী কাব্যজগতে দ্বিতীয় ফিরদৌসী জন্মগ্রহণ করেন নাই; ভারতবর্ষে একমাত্র আমীর খুসরুর ভাষা ও ভাবে ফিরদৌসীর অনুপ্রেরণা আমরা দেখিতে পাই। পারসিক ভাষাকে আর্বী-প্রভাব-মুক্ত করিয়া নব-জাগ্রত ইরাণের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে কবি ফিরদৌসী নূতন রূপ দিয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার 'শাহ্‌-নামা'র মাহাত্ম্য। তদ্রূপ আমীর খুস্‌রুর কাব্যসমূহ ভারতের জাতীয়তাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবাসী তুর্কী, ইরাণী ও আরব হইতে স্বতন্ত্র জাতি; এবং অন্যের তুলনায় কোন অংশে হীন নহে; এই বিষয়ে আমীর খুস্‌রু সর্ব্বদা বিশেষ সচেতন ছিলেন। আমীর খুস্‌রু যে জাতির মুখপাত্র, সে জাতি মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়। তাঁহার জাতি বা nationality ছিল "হিন্দী" অর্থাৎ ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে ভারতীয় জাতি; যেমন দুই শত বৎসর পরে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে হিন্দু-মুসলমানদের কাছে এদেশের সবই ছিল

* এই শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় আমীর খুস্‌রুর কাব্য ও জীবন-বৃত্তান্ত আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; উর্দ্দু মাসিক পত্রিকাদিতে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি দেখা যায়। বাংলা ভাষায় কবির জীবনী লিখিতে হইলে ফার্সী ইতিহাস ও তজকিরা-সাহিত্য ব্যতীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়:—

১। নকল-ই-মজলিস—সংগ্রাহক হাজী শেখ রজব আলী। লক্ষ্ণৌ, ১৮৭১।

২। হয়াৎ-ই-খুস্‌রবী—মহম্মদ সইদ্‌ আহমদ। নবলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ, ১৯০৯।

৩। জবাহির-ই-খুস্‌রবী—মহম্মদ আমীন চিরিয়াকোটী-সম্পাদিত। আলীগড় কলেজ, ১৯১৮।

৪। আব্‌-ই-হয়াৎ—শমস্‌-উল্‌-উলেমা মৌলবী মহম্মদ হোসেন আজাদ। ইস্‌লামিয়া ষ্টীম প্রেস, লাহোর, ১৯১৭।

৫। মৌলানা শিবলী-কৃত 'শায়ের-উল-আজম'।

৬। মিশ্র-বন্ধু-বিনোদ।

৭। খুস্‌রুকী হিন্দী কবিতা—ব্রজরত্ন দাস।

৮। *Haxrat Amir Khusru* by **Prof. M. Hubib.**

গ্রন্থপঞ্জী স্থানাভাবে অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

"বাঙ্গালী"—বাবর তাঁহার পুস্তকে সুলতান নুসরৎ শাহ্‌কে বলিয়াছেন—"নুসরৎ বাঙ্গালী"। আমীর খুস্‌রু তাঁহার কাব্যে আর্বী ফার্সী উপমা খুঁজিয়া হয়রান হন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যের নায়িকা দেবলরাণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গমন-ভঙ্গীর সহিত প্রাপ্তবয়স্কা করভীর (উষ্ট্রীর) সাদৃশ্য দেখিতে পান নাই—যাহা আর্বী "বেদুইন" কবিতায় পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যে হিন্দুস্থানেরই আকাশ, বাতাস, বিহঙ্গের কলগীতি, ফলের গন্ধ ও ফুলের সুবাস আছে* ;—ইরাণ-তুরাণের নয়।

সম্প্রতি আমরা কবির কর্ম্মজীবনের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। সুলতান বল্‌বনের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতান মুলতান ও দিবালপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হওয়ার পর (১২৮২ খ্রীঃ) কবি তাঁহার সহিত দিল্লী গিয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে শাহজাদা মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে বীর-গতি লাভ করিলেন; কবিরও ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি বন্দী হইয়া এক সাধারণ মোঙ্গল সৈনিকের গোলামরূপে মধ্য-এশিয়ার মরুপ্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইলেন। দুই বৎসর অশেষ কষ্টভোগ করিয়া হিন্দুস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথমে তিনি পাটিয়ালীতে আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দিল্লীর দরবারে উপস্থিত হইলেন। সুলতানের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি খাঁ-ই-শহীদ মহম্মদ সুলতানের মৃত্যুবিষয়ক স্বরচিত এক করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী শোকগীতিকা আবৃত্তি করেন। কথিত আছে, বৃদ্ধ পুত্রশোকাতুর বল্‌বন ইহা শুনিয়া দরবারেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন—ইহার পূর্ব্বে কঠোরচেতা সুলতানের চোখে দিনের বেলা কেহ জল দেখে নাই। সুলতান বল্‌বন জরাক্রান্ত হইয়া কিছু দিন পরে ইহধাম ত্যাগ করিলেন, রাজধানীতে অশান্তি ও অরাজকতা আরম্ভ হইল। এই সময় কবি অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা আমীর আলীর আশ্রয়ে কিছু দিন অতিবাহিত করেন। ১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বল্‌বনের পৌত্র কাইকুবাদের আদেশে তিনি দরবারে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর-বৎসর সুলতানের অনুরোধে ছয় মাসের মধ্যে কবি 'কিরাণ-উস্‌-সদাইন' নামক গৌড়েশ্বর সুলতান নাসীর-উদ্দীন বোগ্‌রা খাঁ এবং তাঁহার পুত্র দিল্লীশ্বর কাইকুবাদের সরযূ-তীরে অভিযান ও সাক্ষাৎ বিষয়ক কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন। কাইকুবাদের রাজ্যচ্যুতি ও হত্যার পর খিলজী-বংশের রাজত্বেও তিনি শাহী-দরবারে সভা-কবি ছিলেন। কাব্যরসিক সুলতান জালাল-উদ্দীন্‌ আমীর খুস্‌রুকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং বার্ষিক ১২০০ মুদ্রা কবির বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি দরবারে কোরানশরিফ-রক্ষকের পদ পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে দরবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আমীরী খেলাত (পরিচ্ছদ)† বক্‌শিশ্‌ পাইয়াছিলেন। ক্রূরকর্ম্মা নিরক্ষর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর ধর্ম্মভয় কিংবা বিদ্যানুরাগ না থাকিলেও তিনি কবি ও আলেমদিগকে অশ্রদ্ধা করিতেন না; কবিকে হতাশ

* 'নুহ্‌-সিপ্‌হর' কাব্যের তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। † *Badayuni*, Ranking, p. 181.

করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়; কবির কলমের দাগ স্বয়ং মহাকালও নিশ্চিহ্ন করিতে পারেন না। ফিরদৌসীর ক্ষোভ-দৃপ্ত দুই ছত্র কবিতার কষাঘাতে সুলতান মামুদের দাসীপুত্র-খ্যাতি আজও ঘুচে নাই। কবি আমীর খুস্‌রু আলাউদ্দীনের প্রতি বিরূপ হইলে হয়ত তাঁহার কবিতায় সুলতান একাধারে "কেসিয়াস্‌-নীরো" কিংবা "দজ্জাল" (anti-Christ)রূপে চিত্রিত হইতেন। সুলতান আলাউদ্দীন কবিকে "খুস্‌রু-ই-শায়েরাঁ" বা "কবিসম্রাট্‌" উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন; কৃতজ্ঞ কবির কাব্য-মহিমায় সুলতানের ধর্ম্মযুদ্ধ ও বীরত্বের খ্যাতি ইরাণ-তুরাণে পৌঁছিয়াছিল। শাহজাদা খিজির খাঁ কবি খুস্‌রুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। দুই জনেই শেখ নিজাম্‌-উদ্দীন আউলিয়ার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। খিজির খাঁর ভগবৎপ্রেম এবং বিয়োগান্ত জীবননাট্য কবি তাঁহার খেয়ালী কাব্য 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' (অপর নাম আশীকী*) রচনা করিয়া তাঁহার স্মৃতি আশীকা বা আইভি লতার ন্যায় চির-সবুজ রাখিয়া গিয়াছেন।

আলাউদ্দীনের মৃত্যু ও পাপিষ্ঠ মালিক কাফুরের হত্যার পর আলাউদ্দীনের অযোগ্য পুত্র নরাধম কুতব্‌-উদ্দীন মোবারক শাহ্‌ (১৩১৬—১৩২০ খ্রীঃ) সম্রাট্‌ হইলেন। দরবারী কবি আমীর খুস্‌রুর অবস্থাও ছিল স্বর্গের উর্ব্বশী-চিত্রলেখার ন্যায়—যিনি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবেন, নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহারই চিত্তবিনোদন করাই ছিল ইঁহাদের কর্ত্তব্য। মোবারক শাহ্‌র অনুরোধ বা আদেশে কবি তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগের ঘটনাবলী 'নুহ্‌-সিপহর' নামক কাব্যে লিখিয়াছিলেন। কবির দেশ-প্রেম ও হিন্দুস্থান-মাহাত্ম্যের উচ্ছ্বাসে এ-কাব্য ভরপূর। অকৃতজ্ঞ গোলাম খুস্‌রুর পতন এবং গাজী গিয়াস্‌-উদ্দীন্‌ তোগলকের অভ্যুদয় কবি আমীর খুস্‌রু তাঁহার শেষ কাব্য 'তোগলক-নামা'য় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তোগলক শাহ্‌র বঙ্গ-অভিযানের সময় কবি দিল্লী-বাহিনীর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছিলেন। নানা কারণে তোগলক শাহ্‌ ও শেখ নিজাম্‌-উদ্দীন্‌ আউলিয়ার মধ্যে বিবাদ এ সময়ে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। সুলতান বাংলা দেশ হইতে শাসাইলেন—তিনি দিল্লী পৌঁছিয়া শাহজাদা জুনা খাঁকে বিপথগামী করিবার জন্য শেখজীকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন। ইহাতে নাকি শেখজী উপেক্ষাভরে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন—দেহ্‌লী হিনুজ্‌ দূর আস্ত্‌ (Delhi is a far cry)। তোগলক শাহ্‌ রাজধানীতে ফিরিবার পূর্ব্বেই শেখজী দেহরক্ষা করিলেন। সুলতানকে দিল্লী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে হয় নাই; তোগলকাবাদ হইতে চারি-পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আফগানপুরে তাঁহার বিজয়-প্রত্যুদ্‌গমনের অজুহাতে পুত্র জুনা খাঁ পিতার মৃত্যুর ফাঁদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভোজের সময় কাষ্ঠ-অট্টালিকা ভূপাতিত করিয়া জুনা খাঁ পিতা ও এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতার অপমৃত্যু ঘটাইলেন (ফেব্রুয়ারি, ১৩২৫ খ্রীঃ)। কবি আমীর খুস্‌রু গুরু নিজাম্‌-উদ্দীনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শোকবিহ্বলচিত্তে গৌড় হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া

* *Badayuni* : Ranking, i. 256.

আসিলেন। কথিত আছে, খুস্‌রু গুরুর সমাধি-পার্শ্বে তাঁহার শেষ কবিতা আবৃত্তি করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিতাটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

গৌরী সোবে সেজ্‌ পর্‌ মুঁহ্‌ পর্‌ ডারি কেস্‌।
চল্‌ খসরু ঘর আপ্‌না রৈণ ভয়ি চঁহু দেস্‌।

"কেশ-রাজি মুখের উপর বিন্যস্ত করিয়া গৌরাঙ্গিণী শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। রাত্রির অন্ধকার চতুর্দ্দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে। খুস্‌রু! এখন নিজগৃহে ফিরিয়া চল।" এই কবিতার সুফিয়ানা* অর্থ আরও চমৎকার। কবি গৃহে ফিরিয়া সমস্ত ধন ও আসবাবপত্র বিলাইয়া দিলেন এবং গুরুর সমাধি-পার্শ্বে ফকীরবেশে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বেশী দিন তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ঐ বৎসরের (১৩২৫ খ্রীঃ) ১৭এ সওয়াল বুধবার কবি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

ফার্সী কবি হিসাবে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আমীর খুস্‌রু জন্মগ্রহণ করেন নাই। ফিরদৌসী ও রুমীর† নিকট তিনি অবশ্য বিশেষ ভাবে ঋণী ছিলেন। প্রশংসা ও নিন্দা, দুই-ই তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছিল। তাঁহার সমসাময়িক উবেদ‡ নামক এক কবি ছিল; সম্পর্কে খুসরুর গুরুভ্রাতা। লোকটি ছিল সাক্ষাৎ দুষ্টসরস্বতী। সে লিখিয়াছে, খুস্‌রুর "খাম্‌সা" সত্যই খাম্‌ অর্থাৎ কাঁচা রকমের লেখা; যদিও তিনি তাঁহার "সিক্‌বা" রন্ধনের জন্য রুমীর কড়াইটি ধার লইয়াছিলেন! জগতের সর্ব্বত্রই—

---

* গৌরী—মাশুক; সাধনার অবস্থা-ভেদে সাধকের শেখ (গুরু) কিংবা আল্লা; বৈষ্ণবার্থে রাধা।

খুসরু—আশেক (প্রণয়ী); সাধক।

সেজ—শয্যা বা জাৎ-ই-মোহিত যাহা সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল সকলকে ঘিরিয়া আছে, "সর্ব্বানাবৃত্য তিষ্ঠতি"।

ঘর—লা-মকান (গৃহহীন ঠিকানা); যে স্থান দিক্‌শূন্য; যেখানে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব্ব-পশ্চিম নাই।

রৈইন্‌—রাত্রি বা প্রলয়ের ঘনান্ধকার।

† জালাল-উদ্দীন রুমীর সময়কাল—১২০৭-১২৭৩ খ্রীঃ।

‡ সুলতান গিয়াস্‌-উদ্দীনের আদেশে রাজদ্রোহের অপরাধে উবেদকে শূলে দেওয়া হইয়াছিল। এ প্রকার মৃত্যু নাকি তাঁহার গুরু নিজাম-উদ্দীনের অভিশাপের ফল। এক দিন শেখজী তাঁহার এক নবাগত মুরীদকে দুটি "মিসোয়াক" বা দাঁতন দিয়াছিলেন; বেচারা ছিল একটু বোকা সরল মানুষ। দুটা দাঁতন দেওয়ার মধ্যে কি গুহ্য ব্যাপার আছে বুঝিতে না পারিয়া লোকটি কবি উবেদের কাছে গিয়াছিল। উবেদ বলিল, শেখজী তাহাকে দুটা দাঁতন দিয়া তাহার ভক্তি পরীক্ষা করিতেছেন; একটার দ্বারা দাঁত পরিষ্কার এবং অপরটি অন্যত্র প্রবেশ করাইয়া দুটিই এক সঙ্গে কাজে লাগাইতে হইবে। লোকটিও তাহাই করিল, কিন্তু যন্ত্রণা অসহ্য হওয়াতে অন্য লোকের কাছে এ ব্যাপার বলিয়াই ফেলিল। ইহা শুনিয়া শেখজী বলিয়াছিলেন, উবেদ এই বদ্‌কার্য্যের জন্য ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা হাজার গুণ কষ্ট পাইবে! (শ্রীযুত কমলকৃষ্ণ বসু-কৃত 'তারিখ্‌-ই-মোবারকশাহী'র ইংরেজী অনুবাদ দ্রষ্টব্য।)

"যথা বাচাং তথা স্ত্রীণাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ।" সা'দ্‌ ফল্‌ছাপি (দার্শনিক) নামক আমীর খুস্‌রুর আর এক জন সমসাময়িক নিন্দুক ছিল। ইহাতে কবির কোন ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক শত বৎসর পরে প্রসিদ্ধ কবি ও সাধক নুরউদ্দীন্‌ আবদুর রহমান জামী খোরাসানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১৪১৪—১৪৯২ খ্রীঃ)। তখন পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের বাহিরেও খুস্‌রুর কবিত্ব-খ্যাতি মলিন হয় নাই; স্বয়ং জামী তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন। যাহা হউক, খুস্‌রুর ফার্সী-কাব্য-সমূহ ছিল তাঁহার পোষাকী কবিতা—দরবারে অনেক সময় পেটের খাতিরে কিংবা রাজ-রোষের ভয়ে লিখিত। এই সমস্ত এখন প্রায় বিস্মৃতির আঁধারে ডুবিয়া ঐতিহাসিক ও ফার্সীবিৎ পণ্ডিতদের গবেষণার বস্তু হইয়াছে। কিন্তু খুস্‌রুর মাতার ভাষা ফার্সী কিংবা তুর্কী হইলেও তাঁহার প্রকৃত মাতৃভাষা তৎকালীন অধিকাংশ মুসলমানদের মত হিন্দীই ছিল। এই ভাষায় আমীর খুস্‌রু তাঁহার আটপৌরে কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দী পদাবলী এবং গ্রাম্য গীত হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে দেশবাসীর স্মৃতিপথে আজও জাগরূক এবং নিতান্ত সজীব আছে। এইগুলির সহিত পরিচিত না হইলে আমীর খস্‌রুর প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে ভাষার পার্থক্য ক্রমশঃ দূর করিয়া উভয় সমাজের মধ্যে ভাবের আদান ও নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য সুগম করিবার উদ্দেশ্যে কবি 'খালেক-বারী' নামে পরিচিত এক অপূর্ব্ব শব্দকোষ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রচলিত এবং নিত্য-ব্যবহার্য্য হিন্দী শব্দসমূহের আর্বী ফার্সী কিংবা তুর্কী প্রতিশব্দ দেওয়া হইয়াছে। যথা :—

মুশ্‌ক্‌ কাফর অস্ত্‌ কস্তূরী কপুর।
হিন্দবী আনন্দ্‌ শাদী ও সরুর।
মুশ্‌ চুহা গুর্বা বিল্লী মার নাগ।
সোজন্‌ ও রিশ্‌তা বহিন্দী সুই তাগ।

এই শব্দকোষের অধিকাংশই অধুনা লুপ্ত হইয়াছে; চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এইরূপ শব্দ-কোষের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।* আমীর খুস্‌রু দরবারী কবি হইলেও তাঁহার আমিরী মেজাজ ছিল না। তাঁহার শৈশব কাল গ্রাম্য ভাব ও বেষ্টনীর মধ্যে অতিবাহিত

---

* খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একই কারণে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মুসলমানী ভাষার সহিত পরিচয় আবশ্যক হইয়াছিল। এই 'খালেকবারী'র মত এই সময়ে 'রাজব্যবহারকোষঃ' নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। উদাহরণ :—

ঋষিঃ পৈগম্বরো জ্ঞেয়ো যোগীশস্তু কলন্দরঃ।
যোগী ফকীর ইত্যুক্তঃ কাজী পণ্ডিতনামকঃ।
শিরসা বন্দনং শিজ্‌দা প্রণামস্তীস্‌লমা ভবেৎ।
নমস্কারঃ সলামঃ স্যাদাশীর্ব্বাদো দুবা স্মৃতঃ।

হইয়াছিল বলিয়াই অতি গরীব ও সরল হিন্দু-পল্লীবাসীর প্রতি তাঁহার প্রাণের টান ছিল; শহরেও তিনি ছোট বড় সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিতেন।

এই শ্রেণীর লোকদের জন্যও তিনি সরল ও সরস দোহা, পঁহেলী এবং গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, দিল্লী শহরে কবির বাড়ীর পাশে চম্মু নামে এক বুড়ীর ভাঙের দোকান ছিল; হিন্দু মুসলমান অষ্টপ্রহর তাহার দোকানে ভিড় জমাইত। কবি চম্মুর ভাং মাঝে মাঝে আস্বাদন করিতেন কি না জানি না; তবে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া মনে হয়। একদিন চম্মু কবিকে পাইয়া বসিল, তাহার নামে কবিতা লিখিতে হইবে। তিনি মুখে মুখে নিম্নলিখিত কবিতা আওড়াইলেন; আজও উহা হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। কবিতাটি এই :—

আরোঁ কী চৌপহরী বাজে,
চম্মুকী আটপহরী।
বাহর কা কোই আয়ে নাহীঁ,
আয়ে সারা শহরী।
সাফ্ সুফ্ করি আগে রাখে,
জামেঁ নাহীঁ তুসল।
আরোঁ কে জঁহা সীঁক সমাবে,
চম্মুকী বাঁ মুসল।

—অন্যের দরজায়, অর্থাৎ বাদশাহী নহবৎখানায়—চারি প্রহর নহবৎ বাজে; কিন্তু চম্মুর দোকানে অষ্টপ্রহর [ভিড়ের গোলমাল]। এইখানে বাহিরের কেহ আসে না; সারা শহরবাসী ঐখানে ভিড় জমায়। চম্মু তাহার ভাং পরিষ্কার ভাবে তৈয়ার করে—উহাতে তুষের কণামাত্রও থাকে না। অন্যের (ভাঙের ডেলায়) যেখানে শিক প্রবেশ করিতে পারে, চম্মুর সেখানে মুষল প্রবেশ করিতে পারে।

নবোঢ়া বধূর সখীর কাছে রাত্রির অভিজ্ঞতা বর্ণন এবং নিন্দাচ্ছলে পতির প্রশংসা-বিষয়ক "মুকরি" কবিতা আমীর খুস্রু রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত দোহা হইতে একটি ঐতিহাসিক তথ্যও পাওয়া যাইবে—চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বেচারা স্বামীর স্বভাব ও দুরবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। স্ত্রী স্বামীকে চোর, বাঁদর, কম্পজ্বর, রুমাল, ঢোল, জুতা, কুত্তা, মশা, মাছির পর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। নিম্নে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া গেল।

পতিবিষয়ক :—

(ক) নংগে পাঁও ফিরন্ নহি দেত,
পাঁও-সে মিট্টী লগন্ নহি দেত।
পাঁও-কা চুমা লেত নিপুতা,
এ সখী সাজন না সখী জুতা।

(খ) দুর দুর করু তো দৌড়া আয়ে,
ছন্‌ আঙ্গন ছন্‌ বাহর জায়ে।
দীহল ছোড় কহীঁ নহীঁ সুত্‌তা,
এ সখী সাজন না সখী কুত্তা।

(গ) মেরা মুঁহ্‌ পোঁছে মোকো প্যার্‌ করে।
গর্‌মী লগে তো বয়ার করে।
এসা চাহত সুন্‌ য়হ হাল।
এ সখী সাজন না সখী রুমাল।

(ঘ) জব্‌ মাঁগু তব্‌ জল ভর লাবে।
মেরে মনকী বিপত বুঝাবে।
মন্‌কা ভারী তন্‌কা ছোটা।
এ সখী সাজন না সখী লোটা।

অনুবাদ অনাবশ্যক। সার কথা, স্ত্রীর পায়ে মাটি লাগিবার জো সেকালেও ছিল না; একালেও নাই। সাত শত বর্ষ পূর্ব্বেও দেবী ঘর্ম্মাক্ত হইলে সেবককেই বাতাস করিতে হইত; যখনই স্ত্রীর জলের দরকার, তখনই লোটা ভরিয়া হাজির থাকিতে হইত।

খুস্‌রুর কয়েকটি পঁহেলী (হেঁয়ালী):—

(ক) আবে তো অঁধেরী লাবে। জাবে তো সব সুখ লেজাবে।
ক্যা জাঁনু বহ কেসা হ্যায়। জৈসা দেখো বৈসা হ্যায়।*

(খ) গোরী সুন্দর পাতলী, কেসর কালে রংগ্‌।
গ্যারহ দেবর ছোড়্‌কে চলী জেঠ্‌কে সংগ্‌।†

(গ) উজ্জ্বল বরণ অধীন তন্‌, একচিত্ত দো ধ্যান।
দেখত্‌ মে তো সাধু হ্যায়, পর্‌ নিপট পাপকী খান॥‡

কবি আমীর খস্‌রু হিন্দী ভাষা-স্রোতস্বিনীকে রাজস্থানী অপভ্রংশ ও ব্রজভাষার খাত হইতে তাহার বর্ত্তমান প্রবাহে আনয়ন করিয়াছিলেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। খস্‌রুর ভাষা এবং বর্ত্তমান প্রচলিত হিন্দীর মধ্যে বেশী পার্থক্য নাই। তাঁহার সময়ে ভাষায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ ছিল না। তাঁহার রচনায় কোন কোন স্থলে আর্বী ফার্সী ইডিয়ম ও শব্দ প্রবেশ করিয়াছে বটে; কিন্তু উহা বর্ত্তমান কালে বাংলা ভাষায় ইংরেজীর প্রভাবের

* চক্ষু। আঁখ আনা=চক্ষু উঠা।

† এগার দেবর থাকিতে যে ভাশুরের সঙ্গে চলিয়া যায়—অরহর—যাহা জ্যৈষ্ঠ মাসে উৎপন্ন হয়।

‡ বক। অধীন—পাত্‌লা, খান—খনি, আধার।

মতই অপরিহার্য্য ছিল।* আমীর খস্রুর পূর্ব্ববর্ত্তী তিন জন মুসলমান হিন্দী লেখকের উল্লেখ আছে; কিন্তু ভাষার উপর তাঁহাদের প্রভাব কি ছিল, জানিতে পারা যায় নাই। খুস্রুই সর্ব্বপ্রথমে হিন্দীর উৎকর্ষতা মুসলমান শিক্ষিত ও সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুর বসন্তোৎসবের মত তিনি মুসলমানদের মধ্যে বসন্তের মেলা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; এবং এই উৎসবে গান করিবার উপযোগী মুসলমানী গীতও† লিখিয়া গিয়াছেন। আমীর খুসরুর এই প্রচেষ্টা অচিরেই ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অর্দ্ধ শতাব্দী পরে হিন্দীর প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কত দূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত আমরা সুলতান ফিরোজ তোগলকের রাজত্বে দেখিতে পাই। সুলতানের উজীর-ই-আজম প্রথম খাঁ-জাহানের পুত্র দ্বিতীয় খাঁ-জাহানের (জুনা শাহ্) আদেশে মৌলানা দায়ুদ নুরুক-চন্দার‡ প্রেম-কাহিনী সম্বন্ধে এক হিন্দী মস্নবী লিখিয়াছিলেন। উহা এতই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল যে, তৎকালীন প্রসিদ্ধ সুফী সাধক তকী-উদ্দীন রব্বানী ধর্ম্ম উপদেশ দিবার সময় মসজিদের মিম্বর (pulpit) হইতে মাঝে মাঝে এই কাব্য হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতেন। মোল্লা বদায়ুনী লিখিয়াছেন :—

---

* দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রজীর একটি কবিতা তুলনা-সৌকর্য্যার্থ উদ্ধৃত হইল :—

"চূরন্ খাতে য়ডিটর্ জাত্; জিন্‌কে পেট্ পচৈ নহিঁ বাত্;
চূরন্ অমলা বালে খাঁবে; দূনী রিশবত্ তুরত্ পঁচাবৈ।
চূরন্ পুলিসবালে খাতে; সব কানুন হজম্ কর্ জাতে;
চূরন্ সভী মহাজন্ খাতে; জিস্‌সে জমা হজম কর জাতে।"

† যথা— হজরত খাজা সংগ খেলিয়ে ধমাল
বাইস খাজা মিল বন্ বন্ আয়ো তামেঁ
হজরত রসুল সাহেব জমাল—হজরত…
অরব ইয়ার তেরো বসন্ত বনায়ো
সদা রখিয়ে লাল গুলাল—হজরত…

‡ হিন্দী-সাহিত্যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ দান, প্রেমগাথা কাব্য-সমূহের মধ্যে 'নুরুক্-চন্দা' প্রথম না হইলেও অন্যতম। আমীর খুসরুর ফার্সী খেয়ালী কাব্য 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ'র অনুকরণে এ শ্রেণীর কাব্য লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়; অধিকাংশের মধ্যেই সেই "হমদ্ মোনাজাৎ" ইত্যাদি এবং সেই ঐতিহাসিক আবেষ্টনী। বহিখানির নাম বোধ হয় 'চন্দাবৎ' (সংস্কৃত চন্দ্রাবতী); যথা—জায়সীকৃত পদ্মাবৎ (পদ্মাবতী)। চন্দাবত্ এবং জায়সীর 'পদ্মাবৎ' রচনাকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে হিন্দী কবিগণ 'মৃগাবতী' (কুতবন শেখ, ৯০৯ হিঃ), 'মধু-মালতী' (চতুর্ভুজ দাস-কৃত) 'প্রেমাবতী' (অপ্রাপ্য) ও মুগ্ধাবতী (অপ্রাপ্য) রচনা করিয়াছিলেন। 'জায়সী'র পরেও হিন্দী সাহিত্যের এই ধারা বহুদিন চলিয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময় উস্মান-কবি 'চিত্রাবলী' এবং মহম্মদ শাহ্‌র রাজত্বে কবি নূরমহম্মদ 'ইন্দ্রাবৎ' লিখিয়া গিয়াছেন।

.... when certain learned men of that time asked the Shaikh saying, what is the reason for this Hindi Masnavi being selected? he answered, the whole of it is divine truth and pleasing in subject, worthy of the ecstatic contemplation of divine lovers, and conformable to the interpretation of some of the *Ayats* of the Quran, and the sweet singers of Hindustan. Moreover by its public recitation human hearts are taken captive" (Badayuni, i. Ranking, p. 333).

সংস্কৃত ভাষা হইতে জ্ঞানরাজি আহরণ করিয়া ফার্সীকে সমৃদ্ধ এবং হিন্দু-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত মুসলমান বিদ্বৎমণ্ডলীকে পরিচিত করিবার আয়োজন সুলতান ফিরোজ শাহ্‌র রাজত্বকালে আরম্ভ হইয়াছিল। এ সময় কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়—পিঙ্গল* (হিন্দী অলঙ্কার), জ্যোতিষ (Dalail-i-Firuzshahi), নৃত্যকলা-বিষয়ক পুস্তকই ইহার মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

কবি আমীর খুস্রু তাঁহার 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্যে ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, আর্বী ভাষা—যে ভাষায় কোরাণ নাজেল (অবতীর্ণ) হইয়াছিল, উহা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষাও উহার ন্যায় ব্যাকরণ ও অলঙ্কার দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। আর্বীর সহিত কিছুই মিশ খায় না; কিন্তু ফার্সী ভাষা পোষাকী ভাষা; উহার সহিত অন্য ভাষা মিশ্রিত করা চলে। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, হিন্দুস্থানের গাথা (নামা-ই-হিন্দ) ফার্সী ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? পরে তাঁহার এই ভুল ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি ইহাই ইশারা করিয়া লিখিয়াছেন,—

গলত্‌ করদম্‌ গর্‌ আজ দানিশজনী দম্‌।
না লফ্‌জ-ই-হিন্দ্‌ ইস্ত্‌ আজ ফারসী কম্‌। মূল পৃ. ৪১
জে কত্‌রা দর্‌ চশীদন্‌ গশ্‌ত মালুম্‌।
কে মোর্‌গ-ই ওয়াদীস্ত আজ দিজলা মাহরুম।
কসে কজ গংগ-ই-হিন্দুস্থান ববদ্‌ দূর।
জে নীল ওয়া দিজলা লাফদ্‌ হস্ত মা'জুর॥

ভাবার্থ:—হিন্দী-দরিয়ার জল এক ফোঁটা চাকিয়াই মালুম হইল, মরুভূমির পাখী বাস্তবিকই তাইগ্রীস নদীর জলের আস্বাদ হইতে বঞ্চিত। যে ব্যক্তি হিন্দুস্থানের গঙ্গানদী হইতে বহুদূরে বাস করে, সে বেচারার নীল ও তাইগ্রীস নদীর প্রশংসা না করিয়া উপায় কি?

হিন্দী ও হিন্দুস্থানের প্রশংসা করিতে করিতে কবি আত্মহারা হইয়াছেন, ভাবোচ্ছ্বাসে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুস্থানী হইলেও তাঁহার পিতা ছিলেন খোরাসানী। হিন্দুস্থান হাজার হইলেও কাফেরের মুলুক; ইহাকে বেহেশ্‌তের সঙ্গে তুলনা করিলে মোল্লারা তাঁহাকে হয়ত কাফের বলিবে—এই আশঙ্কা উপেক্ষা করিয়া তিনি নির্ভীকচিত্তে প্রাণের কথা কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

* মিশ্রবন্ধুবিনোদ, প্রথম ভাগ, পৃ. ৪৯-৫০।

চূঁ দর্ চীন দীদ্ বুলবুল্-ই-বোস্তাঁ-রা।
চেহ্‌ দানন্দ তুতি-ই-হিন্দুস্থাঁ-রা ॥
কসে কামরূদ্ ওয়া আবী দাশ্‌ত দর্ কাম।
ন-খোরদাহ্‌ মউজ-রা সুমুজ দেহেন্দ নাম ॥
খোরাসানী কে হিন্দী গির্দ-শ্‌ ঘোল।
খসে বাশদ্ নিজ্‌দ-শ তম্বোল ॥
সিহা গোয়ন্দ্‌ হিন্দু হমচুনীঁ আস্ত।
সওয়াদ্-ই-আজম-ই-আলম হমীঁ আস্ত ॥
বেহেস্‌তে ফরজ কুণ্‌ হিন্দুস্থাঁ-রা।
কজ আঁজা নিস্‌বৎ আস্ত ঈঁ বোস্তাঁ-রা ॥
ওয়াগর্‌ না আদম্ ওয়া তাউস-জ আঁ জায়ে।
কুজা ঈঁ জা শুদন্দে মঞ্জল-আরায়ে ॥

ভাবার্থ:---যে ব্যক্তি চীন দেশের উজার ময়দানে (প্যাঁচা দেখিয়াই) বোস্তানের (সবুজ উদ্যানের) বুলবুল দেখিয়াছে বলিয়া ভুল করে, সে হিন্দুস্থানের তোতার বিষয় কি জানিবে ?

যাহার জিহ্বা শুধু পেয়ারা (কামরূদ = হিন্দুস্থানী অম্রূদ্) ও পানিফল (? আবী = quince) আস্বাদন করিয়াছে, সে কলা না খাইয়াই কলাকে বলে লাল বড়ই (সুমুজ্‌ = red quince)।

খোরাসানের লোক যাহারা মনে করে, হিন্দুস্থানের অধিবাসী তাহাদের তুলনায় মানুষই নয়, মূর্খ বোকা জানোয়ার—তাহাদের কাছে খস্‌ঘাসই তাম্বূল; অর্থাৎ একই পদার্থ। লোকে বলে, হিন্দুর রং কাল; হাঁ, ইহা ঠিক বটে; কিন্তু এই হিন্দুস্থানই আবার দুনিয়ার সব দেশের সেরা। হিন্দুস্থানকে বেহেশ্‌ত অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া জ্ঞান করা উচিত—কেন না, আমার এই বোস্তান, এই হিন্দুস্থান বেহেশ্‌তের সহিত নিস্‌বৎ (সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ) রাখে। তাহা না হইলে ঐ স্থান অর্থাৎ বেহেশ্‌ত হইতে আসিয়া বাবা আদম ও ময়ূর* অন্য কোন স্থানে না গিয়া এই দেশেই বসতি স্থাপন করিতেন না।

'দিবান্-ই-আমীর খুস্‌রু' নামক পুস্তকে কবি আমীর খুস্‌রুর ভগবৎ-প্রেমোন্মাদনার পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুর কৃপায় তিনি তত্ত্ব-জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মে মতবাদ মাত্রই (dogmatism) সমাজে সংকীর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য, পরধর্ম্মে ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতা, পরধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি বিদ্বেষ ও অশুভ-কামনার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মতবাদীর দৃষ্টিতে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ববাদীরা† দিগ্‌ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান ও

* ইব্‌লিস্ (শয়তানদের সর্দ্দার) ময়ূরের রূপ ধরিয়া মানবজননী ঈভকে জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিতে প্রলোভিত করিয়াছিল। ইস্‌লামী মতে এই জ্ঞানবৃক্ষ ছিল গমের গাছ; গম মুখে দেওয়ার পর তাঁহার লজ্জা, যৌনবোধ ইত্যাদি দেহধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল। স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মানবদম্পতি সরন্ দ্বীপ অর্থাৎ বর্ত্তমান লঙ্কাদ্বীপে আসিয়াছিলেন।

† "মত্‌বাদী জানে নাহী তত্ত্‌-বাদীকা বাত।
সূরজ উগে উলুয়া গিনে আঁধারী রাত॥"

ভাবোচ্ছ্বাস পাগলের প্রলাপোক্তি মাত্র। আমীর খুস্‌রুর রচনায় মাঝে মাঝে এই প্রকার ভাবের "বেইমানী" বা কাফেরী দৃষ্ট হয়। যথা :—

কাফের্-ইশকম্ মুসলমানী মারা দরকার্ নিস্ত।
হর্ রগ-ই-মন্ তার্ গশতা হাজত-ই-জুন্নার নিস্ত।
খল্‌ক্ মি-গোয়েদ কে খুসরু বুৎ-পরস্তী মি-কুনদ্।
আরে আরে মি-কুনম্ বা-খলক্-ই-আলম কারে নিস্ত।

—প্রেম আমাকে বেইমান্ কাফের করিয়া তুলিয়াছে; মুসলমানীতে আমার দরকার নাই। আমার শরীরের প্রত্যেক শিরা (রগ) পৈতার গুণ হইয়াছে; (ব্রাহ্মণের স্কন্ধশোভিত) যজ্ঞোপবীতে আমার প্রয়োজন নাই। লোকে বলে, খুসরু পুতুল পূজা করে। হাঁ ঠিক! ঠিক! আমি তাহাই করি; দুনিয়ার মানুষের সহিত আমার কোন কাজই নাই।

খুস্‌রু সুফিয়ানা খেয়ালে একথা বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাও সত্য, যাঁহাদের মনে ভগবৎপ্রেমের আঁচ লাগিয়াছে, বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা তাঁহাদের মনকে কলুষিত করে না। শেখজী আমীর খুস্‌রুকে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা ও সতেজ ভগবৎপ্রেমের জন্য তুর্ক-ই-আল্লা বলিতেন। ইতিহাসের দৃষ্টিতে খুস্‌রু শুধু তুর্ক-ই-আল্লা নহেন; প্রকৃত পক্ষে তিনি এ দেশের প্রথম "তুর্ক-ই-হিন্দ" (Champion of Hind)। দেশাভিমানী কবি হিন্দুস্থান এবং ইরাণ-তুরাণে তুতি-ই-হিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুস্থানের তোতা ইরাণী বুলবুলের পালক পরিয়া জাত ভাঁড়াইবার চেষ্টা করেন নাই। নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার দরগাস্থিত আমীর খুস্‌রুর জীর্ণ কবরকে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমাননির্ব্বিশেষে সকলেরই জাতীয়তার মহাতীর্থ জ্ঞানে ভক্তি করা উচিত।

কাব্য-পরিচয়

কবি আমীর খুস্‌রু-রচিত 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কাব্যের ঐতিহাসিক বিচার করিবার পূর্ব্বে ইহার কথাবস্তু ও চরিত্রাঙ্কন ইত্যাদির সংক্ষেপ আলোচনা প্রয়োজন; নতুবা এই কাব্যের যথার্থ রূপ যাহা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রমূলক ও ভারতীয় রুচিসঙ্গত, উহা আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে না। প্রথমেই বলা আবশ্যক, খুস্‌রু কবি-গুরু ফিরদৌসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ফিরদৌসী-রচিত 'ইউসুফ-ওয়া-জুলেখা' কিংবা পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কবি-গণের লায়লী-মজনুঁ, শিরীঁ-ফরহাদ্ প্রভৃতি প্রেম-কথার ছন্দ ও কাব্য-রীতি হয়ত অনুকরণ করিয়াছেন; কিন্তু খুস্‌রুর বিষয়বস্তু, রচনাভঙ্গী ও চরিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ মৌলিক।

ফিরদৌসীর বিষয়বস্তু প্রাগৈতিহাসিক—বাইবেলোক্ত জোসেফ কর্ত্তৃক তাঁহার প্রভু-পত্নীর প্রেম প্রত্যাখানের কাহিনী; কিন্তু আমীর খুস্‌রুর বিষয়বস্তু ছিল সম্পূর্ণ সমসাময়িক—নায়ক খিজির খাঁ তখনও জীবিত; নায়কের পিতা বিজয়ী আলাউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। ফিরদৌসীর ইউসুফ-জুলেখা কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের মত প্রাচীন কাহিনীমূলক; কিন্তু আমীর খুস্‌রুর 'দেবলরাণী-খিজির খাঁ' কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'

নাটকের মত অর্দ্ধ ঐতিহাসিক ; অর্থাৎ নায়ক সুপরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্র ; মালবিকা কাল্পনিক নায়িকা ; শেষোক্ত কাব্যের ঐতিহাসিক বেষ্টনীও কাল্পনিক। কিন্তু আমীর খুস্রুর ঐতিহাসিক পটভূমির চারি ভাগের তিন ভাগ সম্পূর্ণ সমসাময়িক অভ্রান্ত ইতিহাস। এই পার্থক্যের দরুন কালিদাস আমাদের যে ঐতিহাসিক ভ্রম জন্মাইতে পারেন নাই, আমীর খুস্রু তাহা পারিয়াছেন—কেন না, এক সের খাঁটি দুধে আধ পোয়া জল মিশাইলে ল্যাক্‌টোমিটারের আবিষ্কর্ত্তাও গোয়ালার কারসাজী ধরিতে পারিবেন না।

সংস্কৃত কাব্য "আশীর্নমস্ক্রিয়া বা" ইত্যাদির দ্বারা আরম্ভ করা হয় ; ফার্সী কাব্য কিন্তু শুধু "নমস্ক্রিয়া" (হমদ্) বা আল্লাস্তুতি দ্বারা আরম্ভ করিতে হয়। আল্লাস্তুতির পর "মোনাজাৎ" বা প্রার্থনা ; মোনাজাতের পর হজরত রসুলাল্লার বন্দনা। তৎকালীন তক্তের মালিক বাদ্‌শার প্রশংসাও কাব্যারম্ভে অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই পর্য্যন্ত ফিরদৌসী ও আমীর খুস্রু একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমীর খুস্রু ছিলেন পাকা সুন্নী এবং গুরুবাদী সুফী ; এ জন্য যাহা ফিরদৌসীর কাব্যে নাই, যথা—"মিহরাজের" (রসুলাল্লার সশরীরে শূন্যপ্রয়াণ ও প্রত্যাবর্ত্তন) মাহাত্ম্য, প্রথম চারি খলিফার প্রশংসা এবং "মদে-শেখ" বা পীর-বন্দনা—এই সমস্ত আমীর খুস্রুর কাব্যারম্ভে নিবদ্ধ হইয়াছে। আমীর খুস্রুর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তিনি সহিফা-ই-নসীহৎ বা উপদেশ-পত্রিকা নামক এক অধ্যায়ে রাজাকে উপদেশচ্ছলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে আলাউদ্দীনের পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের বিজয়, আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক তাঁহার খুল্লতাত ও শ্বশুর জালালউদ্দীনকে হত্যা ও রাজ্যারোহণ, আলাউদ্দীনের দিগ্বিজয় ও হিন্দু ধর্ম্মের নাম ও নিশানা লোপ ইত্যাদি বর্ণিত আছে। রণস্তম্ভপুর-চিতোর, তৈলঙ্গ-মাবার বিজয়ের যথাযথ উল্লেখও এই গ্রন্থে আছে। 'তারিখ-ই-আলাই' গ্রন্থে কবি যাহা লিখিয়াছেন, ইহাতে নাম ও স্থানের কোন অদলবদল করেন নাই। চিতোরবিজয় উপাখ্যানে কবি তাঁহার কাব্য কিংবা ইতিহাসে রাণী পদ্মিনীর কথা লেখেন নাই। রণস্তম্ভপুর-বিজয়েও নারী-সম্পর্কিত কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ তাঁহার কাব্য বা ইতিহাসে নাই। আমীর খুস্রু তাঁহার ইতিহাসে উলুগ খাঁ কর্ত্তৃক একবার মাত্র গুজরাট-আক্রমণের কথা লিখিয়াছেন। উহাতে মাত্র মন্দির-ধ্বংস ও আনিলওয়ারা পট্টন অধিকারের কথা আছে। রাজা করণের নামোল্লেখ, তাঁহার কারাবাস, স্ত্রী পুত্র পরিবারের বন্দি-দশা কিছুই নাই। ৬৯৮ হিঃ বা ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট বিজিত হইয়াছিল। ৭১০ হিঃ পর্য্যন্ত (যেখানে তাঁহার ইতিহাস শেষ হইয়াছে) উলুগ খাঁ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বার পশ্চিম দিকে অভিযানের কথা 'তারিখ-ই-আলাই' গ্রন্থে নাই। (Elliot & Dowson, iii. 74, 92.) আশিকী কাব্যে কবি প্রথম অভিযান প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—রায়-ই-গুজরাত উপতাদ্ ব-বন্দশ অর্থাৎ গুজরাটের রাজা বন্দী হইলেন ; রাজার কোন নাম নাই (মূল পৃ. ৬৪)।

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর বিজিত হওয়ার পর খিজির খাঁ চিতোরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ পর্য্যন্ত কবির

সহিত ঐতিহাসিকের বিরোধ নাই। আমীর খুস্‌রু তাঁহার ইতিহাসে আলাউদ্দীনের রাজত্বের শেষ পাঁচ বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছুই লেখেন নাই। কবি ইতিহাসের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া এখানে কল্পিত নায়িকাকে পটভূমিতে আনয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আলাউদ্দীন দক্ষিণ ও পূর্ব্বসমুদ্র পর্যান্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া পশ্চিমসমুদ্র অর্থাৎ কাঠিয়াবার উপদ্বীপ জয় করিবার সংকল্প করিলেন, এবং উলুগ খাঁকে সমুদ্রের দিকে (জানিব্-ই-দরিয়া) সৈন্য চালনা করিবার হুকুম দিলেন। ঐ সীমান্তে রাজা করণ নামে এক ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন (মূল পৃ. ৮০)। উলুগ খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্ত্রী কমলা দেবীকে দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন (পৃ. ৮১)।

কমলাদেবী আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরবাসিনী হওয়ার কিছু দিন পরে এক দিন তিনি দিল্লীশ্বরকে নিবেদন করিলেন, রায়করণের ঔরসে তাঁহার দুই কন্যা জন্মিয়াছিল; যখন তিনি দিল্লীতে আনীত হইলেন, তখন কন্যাদ্বয় স্বামী করণের কাছে ছিল—ইহাদের মধ্যে ছোটটির বয়স ছিল তখন মাত্র ৬ মাস ২ সপ্তাহ; তাহার নাম দেবলদেবী। ইহাকে দিল্লীতে আনিয়া শাহজাদা খিজির খাঁর সহিত বিবাহ দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা। সুলতান উলুগ খাঁকে আদেশ দিলেন, আপোষ কিংবা যুদ্ধ করিয়া দেবলদেবীকে হস্তগত করিতে হইবে। উলুগ খাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রায়করণ দেবলদেবী সহ দাক্ষিণাত্যে দেবগিরির দিকে পলায়ন করিলেন; মুসলমান সৈন্য তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য দ্রুত পশ্চাৎ ধাবিত হইল। দেবগিরি-রাজ রায়-রায়াঁন সংকন দেব দেবলদেবীকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। (পৃ. ৮৫-৮৬)।

হৃতরাজ্য গুজরাটপতিকে সসম্মানে দেবগিরিতে আনয়ন করিবার জন্য সংকনদেবের ভ্রাতা ভীলম্‌দেব আদিষ্ট হইলেন। রায়করণ দেবলদেবীর সহিত দেবগিরিরাজের বিবাহ প্রস্তাবে অনিচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিলেন। রায়করণ দেবগিরি হইতে মাত্র এক ফরসংগ্ বা চারি মাইল দূরে পৌঁছিয়াছেন, এমন সময় অনুসরণকারী তুর্কী সৈন্য অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া দেবলদেবীকে বন্দী করিল। উলুগ খাঁ বালিকাকে নিজ কন্যার মত* তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত অন্তঃপুরে স্থান দিলেন এবং পরে রাজধানীতে আনয়ন করিলেন।

আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে যখন নায়ক-নায়িকার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন খিজির খাঁর বয়স ১০ বৎসর এবং দেবলদেবীর বয়স ছিল ৮ বৎসর ২ সপ্তাহ (পৃ. ৯৩)। দেবলদেবী খিজির খাঁর চেহারার সহিত তাহার ভাইএর চেহারার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া খিজির খাঁর প্রতি ভগ্নীর ন্যায় অনুরক্তা হইয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে শাহজাদা খিজির খাঁর সহিত তাঁহার মামা (খালা) আলপ্ খাঁর কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ৭১১ হিজরীর ২৩এ রমজান বুধবার (ফাল্গুন, ১৩১২ খ্রীঃ)। কবি এই বিবাহোৎসবের—যাহা একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা—সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। শাহজাদা শম্‌স-উল-হক

* চূঁ ফরজন্দ-ই-খোদ্ দর্ পর্‌দা-ই-নূর।

খিজির খাঁ বরাত সহ বায়ুগামী, শিরাজীর মত লাল গায়ের রং, কাল চমর ও চুলবিশিষ্ট কমৈত-জাতীয় ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে গগনভেদী "বিস্‌মিল্লা" ধ্বনির প্রত্যুত্তরস্বরূপ চন্দ্রলোক হইতে তারকারাজি "হম্‌দুদ-ইল্লাহ্‌" বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। আলপ্‌ খাঁর (উজ্জয়িনীস্থিত ?) প্রাসাদে উপস্থিত হইলে বর-সভায় শাহজাদা "চার-বালিশের" মধ্যে উচ্চ মস্‌নদে সমাসীন হইলেন; তাঁহার বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে বসিলেন—সহযাত্রী আমীর-বৃন্দ। বরকন্যার উপর দরবারীগণ অজস্র ধন "নিসার" স্বরূপ বর্ষণ করিল। উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য হদিয়া বা উপহার প্রদত্ত হইল। মিশরের খেরাজ (রাজস্ব) কিংবা মদাইন শহরের মাশুল (খাজনা) সমপরিমাণ ধন ইহাতে খরচ হইল। শাহজাদার বাহিরে বেশ প্রফুল্লতা ও মুখে হাসি, অথচ এই লৌকিক হাসির অন্তরালে দেবলরাণীর প্রতি তাঁহার আসক্ত হৃদয় অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল। বরাত কন্যাগৃহে তিন মাস অতিবাহিত করিয়া ঐ বৎসরের অর্থাৎ ৭১১ হিজরীর জিলহিজ্জা মাসের প্রথম তারিখ রবিবার রাত্রি ১২টার পর (যখন সোমবার আরম্ভ হয়), এক শুভ মুহূর্ত্তে উষাক্ষণে দিল্লী যাত্রা করিল; বাদশাহী প্রথামত শাহজাদা রত্নখচিত মহামূল্য চতুর্দ্দোলে (কুরসী) উপবিষ্ট হইলেন; তাঁহার উপর অপরিমিত ধন বর্ষিত হইল।

বিবাহের পর নায়ক-নায়িকার মিলনের পথে অভিনব বাধা সৃষ্টি হওয়াতে উভয়ের প্রেমবহ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শাহজাদার গুপ্তপ্রেমের কথা প্রকাশিত হওয়ায় খিজির খাঁ জাঁহাতুমা প্রাসাদে আবদ্ধ এবং দেবলরাণী কসর-ই-লাল বা পান্নামহল-দুর্গে প্রেরিত হইলেন। এই সময়ে উভয়ের মধ্যে প্রণয়-পত্রিকা বিনিময় ও মধ্যে মধ্যে গোপন সাক্ষাৎকার হইত। দেবলরাণীর বিনয়-পত্রিকার প্রত্যুত্তরে শাহজাদা নিজরক্তে রঞ্জিত করিয়া* (খুন-আলুদা) পত্র লিখিলেন। রাজপুত্রের "স্রস্তং স্রস্তং কনকবলয়ম্‌" অবস্থা; তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মাতা জাহানারা আলাউদ্দীনকে অনেক বুঝাইয়া দেবলরাণীর সহিত শাহজাদার বিবাহের অনুমতি লাভ করিলেন। কসর-ই-লাল দুর্গ হইতে সসম্মানে দেবলরাণীকে রাজঅন্তঃপুরে আনয়ন করিয়া ঐখানে গোপনে কয়েক জন অতি অন্তরঙ্গ ব্যক্তির সম্মুখে দু-জনের বিবাহ-অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হইল।

* এটা কথার কথা কিংবা কবিপ্রসিদ্ধি নয়। কালির পরিবর্ত্তে রক্তদ্বারা এখনও প্রেমিক চিঠী লিখিয়া থাকে। দুই বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশিলায় এক রেলের কুলী আমার পথপ্রদর্শক হইয়াছিল। কুলীর কাজ করিলেও তাহার চেহারা ও কথাবার্ত্তায় ভদ্রবংশের ছাপ ছিল; সে সাদী ও হাফেজের কবিতা ভাল রকম আবৃত্তি করিত। তাহার নাম মীর্জ্জা সরওয়ার খাঁ; বাহাদুর শাহ ছিল নাকি তাহার পূর্ব্বপুরুষ। সরওয়ার এক সময়ে রেলে মিস্ত্রীর কাজ করিত; অবস্থাও ছিল ভাল। সে এক নাপিতের ছেলের প্রেমে পড়িয়াছিল এবং তাহার জন্য দুই তিন শত টাকা খরচও করিয়াছিল। মাশুক অভিমান করাতে সে তাহার কাছে একবার রক্তদ্বারা চিঠি লিখিয়াছিল; তাহার বাঁ-হাতে স্বেচ্ছাকৃত জখমের দাগ এখনও আছে।

দীন চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী

কাপালীমিলন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

শ্রীকৃষ্ণের 'স্বয়ংদৌত্যে' নানাপ্রকার বেশ কল্পিত হইয়াছে। কখনও তিনি বাজিকর, কখনও বাদিয়া, কখনও দোকানী, কখনও দেয়াশিনী, কখনও গণকী, কখনও চিকিৎসক, কখনও নাপিতানী সাজিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছেন এবং শ্রীরাধিকার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, অথবা মানভঞ্জনের উপায় উদ্‌ভাবন করিতেছেন। কিন্তু কাপালী বা কপালী বা কাপালিক মিলনের কোনও পদ আমরা এ পর্যন্ত পাই নাই। অনেক প্রাচীন কীর্তন-গায়কের নিকট সন্ধান লইয়াও ইহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি একখানি পুথিতে কতকগুলি পদ পাওয়া যাইতেছে, তাহারই পরিচয় এখানে দিতেছি। পুথিখানির বয়স আড়াই শত বৎসর। ইহার এক স্থলে 'সন ১০৯৫ সাল' পাওয়া যাইতেছে। ইহার স্বত্বাধিকারী পুরুলিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত বিমলপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের। দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে সমস্যা উত্থিত হইয়াছে, এখনও বোধ হয়, তাহার মীমাংসার সময় আসে নাই। দীন চণ্ডীদাসের বেশী পদ আমাদের জানা নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে পুথি আছে, তাহাতে বেশী পদ নাই। তবে দীন চণ্ডীদাস যে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং সেগুলি বাঁকুড়া জেলায় সংগৃহীত হইয়া সুরক্ষিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসুও তাঁহার 'দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী' গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, "দীন চণ্ডীদাস-রচিত দুই সহস্রাধিক পদের মধ্যে প্রায় বার শত পদ মাত্র পাওয়া যাইতেছে।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ২৩৮৯ সংখ্যক পুথির উপর নির্ভর করিয়াই তিনি ঐ উক্তি করিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত পুথিতে ২০০২ পদ পর্যন্ত সংখ্যা আছে। আমার পুথিতে দেখিতেছি, পদের সংখ্যা ২৬৫৮ পর্যন্ত আছে। ইহা ছাড়া আরও পদ হয়ত আছে। এই পুথির সকল পদগুলিতে ক্রমিক সংখ্যা নাই। ২৬৪১ হইতে ২৬৪৫ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্বের সংখ্যা নাই। ২৬৪৫-এর পরে ৯টি পদ এগারো হইতে গণিত হইয়াছে। শেষের পদসংখ্যা ২৬৫৮। মাঝের পদগুলি গণনা করিলে সংখ্যা হয় ২৬৪৫+২০=২৬৬৫, কিন্তু তাহা হইল না কেন? এই পুথিতে যে উচ্চ সংখ্যাযুক্ত পদ আছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমান করা চলে না যে, এ পুথি কোনও বৃহত্তর পুথির খণ্ডিত

অংশ। এ পুথিখানি ক্ষুদ্র (আকার ডবল ক্রাউন অপেক্ষা ছোট এবং পত্রসংখ্যা মাত্র ৩২)। এই ছোট পুথিতে এরূপ ভাবে পদসংখ্যা দেওয়া হইল কেন, ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

নিম্নে যে পদগুলি দেওয়া যাইতেছে, তাহা 'স্বয়ংদৌত্যে'র পদ। বৈষ্ণবদাস 'পদকল্পতরু'তে এই জাতীয় পদের পূর্বে প্রবেশক দিয়াছেন—"সম্ভোগরসস্য স্বয়ংদৌত্য"। উজ্জ্বলনীলমণিতে 'সম্ভোগ' এবং 'স্বয়ংদৌত্যে'র অর্থ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেওয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত হইবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করিতেছেন—ইহাই বর্ত্তমান পদগুলির ও পদকল্পতরুধৃত স্বয়ংদৌত্য সম্বন্ধীয় পদগুলির (প্রকারান্তর) বর্ণনীয় বিষয়। পদকল্পতরুতে বাদিয়ার বেশে, নাপিতানী বেশে, চিকিৎসক প্রভৃতি বেশে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার দর্শন-লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। এই পদগুলিতে কবি কাপালিকবেশে মিলনের বর্ণনা করিতেছেন। এইরূপ মিলনকে কেহ কেহ স্বয়ংদৌত্যের অন্তর্ভুক্ত মনে করিতে প্রস্তুত নহেন। কেন না, তাঁহাদের মতে 'স্বয়ংদূতী' অর্থে শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষ ও বংশীধ্বনি বুঝায়। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, বৈষ্ণবদাস একটি মনগড়া বিভাগ খাড়া করিয়াছেন।* কিন্তু বৈষ্ণবদাসের এই রসবিভাগ উজ্জ্বলনীলমণির বিরোধী নহে। প্রথমতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, স্বয়ংদূতী শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। এই পদগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধেই স্বয়ংদৌত্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজের প্রেম-নিবেদন করিবার নানা ছল অবলম্বন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে উজ্জ্বলে দেখা যাইবে, দূত্য অর্থে দূরবর্ত্তী নায়ক নায়িকার অভিসার করানো—"দূত্যমত্র তু তদ্দূরাদ্ যূনোর্যদভিসারণম্।" উভয়েই এই অভিসারের নিমিত্ত অনেক সময়ে আপ্তদূতী (সখীকে বা সুবলকে) পাঠাইতেছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে নিজেরাও অভিসার করিতেছেন। অর্থাৎ স্বয়ং মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য উপনীত হইতেছেন। যথা—বর্ত্মরোধ, পুষ্পচয়নচ্ছলে, যমুনাবারি আনয়নচ্ছলে মিলন। স্বয়ংদূতী অর্থে সেই নায়ক বা নায়িকাকে বুঝায়, যিনি অনুরাগ-মোহিত হইয়া স্বয়ং 'অভিযোগ' করেন অর্থাৎ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

অভিযোগো ভবেদ্ভাবব্যক্তিঃ স্বেন পরেণ চ।

নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা মনোভাব প্রকাশের নাম অভিযোগ। তুলনা করুন :

গিরিবর কুঞ্জে চললি দুহুঁ নিরজনে
উজ্জ্বল সমরক লাগি।
নিজ অভিযোগ- বচনক কৌশলে
মনহিঁ মনোভব জাগি।—রাধামোহন

'স্বয়ংদৌত্য' বহুপ্রকার হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণপক্ষে ইহা কটাক্ষ ও মুরলীধ্বনিতেই পর্যবসিত নহে। শ্রীরূপ গোস্বামী দুই একটি প্রকারের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, আমি দিগ্‌দর্শন করিলাম মাত্র।

ইত্যেতেষামসংখ্যানাং দিগেবেয়ং প্রদর্শিতা।
যথোচিত্তমমী জ্ঞেয়া নায়কেহপ্যযবিবিবি।—উজ্জ্বলঃ, দূতীভেদঃ।

---

* দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃ.।

অর্থাৎ স্বয়ংদূতীর লক্ষণ অসংখ্যপ্রকার। অঘারি শ্রীকৃষ্ণে ঐ সকল লক্ষণ যথোচিতরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। অর্থাৎ কখনও কখনও তিনি স্বয়ংদূতীর ন্যায় স্বীয় অভীষ্টও প্রার্থনা করিয়া থাকেন।—(রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ)।

ছদ্মবেশাত্মক স্বয়ংদৌত্য-পদগুলি প্রায় সমস্তই চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়:—

বাদিয়ার বেশ—	দ্বিজ চণ্ডীদাস	
নাপিতানী বেশ—	"	ও চণ্ডীদাস
গ্রহবিপ্র বেশ—	,,	
দেয়াশিনী বেশ—	,,	ও চণ্ডীদাস
মালিনী বেশ—	চণ্ডীদাস	
চিকিৎসক বেশ—	,,	
বণিকিনি বেশ—	,,	
বাজিকর বেশ—*	,,	
দোকানী বেশ—	,,	

এতদ্ব্যতীত পটুয়া বা পাটদার বেশের পদ দীন চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। দানলীলা এবং নৌকাবিলাসে যে দানী (শুল্কগ্রাহক) বা নাবিকের সাজে নায়ককে দেখিতে পাই, তাহা দান ও নৌকাখণ্ড নামক প্রসিদ্ধ স্বতন্ত্র পালার বিষয়ীভূত।

উপরে যে ছদ্মবেশের পদগুলির উল্লেখ আছে, তাহা পদকল্পতরুগ্রন্থে এবং নীলরতন বাবুর সম্পাদিত চণ্ডীদাসে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐগুলি যে একই ব্যক্তির রচিত, তাহা বোধ হয় না। চিকিৎসকরূপে মিলনের যে পদ আছে, তাহাতে বাশুলীর নাম আছে:

বাশুলী নিকটে　　চণ্ডীদাস রটে
এমন কাহার কাজ॥

আবার একটি পদের (দোকানী বেশ) ভণিতায় আছে:

রজকী সঙ্গতি　　চণ্ডীদাস গীতি
রচিল আনন্দ বটে।
দোকান দাকান　　হৈল সমাধান
সকলি গেল যে লুটে।

দীন চণ্ডীদাসের রজকীসঙ্গতি নাই, বাশুলীর সংস্রবও নাই। সুতরাং দীন চণ্ডীদাস ইঁহাদের অপেক্ষা অর্বাচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ, তিনি যে কোনও অপেক্ষাকৃত পুরাতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া পদগুলি রচনা করিতেছেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। কাপালী-মিলনের পদে সুবল সখা সহায়। শ্রীকৃষ্ণ সুবলের পরামর্শে কাপালী সাজিয়া মৌন-

* পদকল্পতরুতে যে বাজিকরমিলনের পদটি আছে, তাহা উদ্ধবদাসের ভণিতায় এবং পদটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। দাসীর বেশে দৌত্যের ভার একরূপ সুবলই গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্ধবদাস ব্যতীত (বাজিকরমিলন) অন্য কাহারও 'স্বয়ংদৌত্য' পদে সুবল সঙ্গী নহেন। উপরন্তু এই পদগুলিতে উভয়ের ছদ্মবেশ দেখা যায়। স্বয়ংদৌত্যের পদগুলিতে মাত্র নায়কেরই ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ আছে।

যাহা হউক, দীন চণ্ডীদাস সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যায় এই অপ্রকাশিতপূর্ব পদগুলি কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিলেও করিতে পারে।

মল্লার

কহেন সুব[ল] সুন রমনি মোহন।
নিবেদি তোমার পায় করিয়া জতন॥
বৃষভানু পুরে জদী জাবে প্রাণনাথ।
আছএ জুগতি এক মরমক বাত॥
এক ছলা কআ জাইতে হএ তথি।
অষ্ট কপালির তুমি ধরহ মুরতি॥
কপাল জুড়ি লহ ষিন্দুর রোচনা।
করের মাঝারে দুর্ব্বা ধান্য লেহ সামা॥
মোর হাথে রামখড়ি কহেন সুবল।
তুমি সে থাকিবে মোনে কহিঅ গোচর॥
আমি সে কহিব কথা তোমা আরাধিআ।
তোমারে বসাই জেন কুসাশন দিয়া॥
তুমি জান আমি দাশী রহিবে মৌনেতে।
সকল কহিব আমি তোমার সাক্ষাতে।
জতেক মনের কথা আমি সে কহিব।
তুমি সে করিআ মোন নিগুঢ়ে রহিব॥
আমি মনের সব্বী জানিএ সকল।
গনিএ করিব প্রস্ন অতি সে নির্ম্মল॥
দিন চণ্ডিদাস কহে এই ভাল মানি।
চলিলা সুবল সনে শ্যাম গুনমনি॥৬॥২৬৪১॥

তুড়ি।

ভাল জুড়ি দিলা ষিন্দুর রোচনা
আটকপালির মত।
চলিলা সত্তরে বৃষভানুপুরে
জেন কপালির মত।
সুবলের করে রামখড়ি ধরে
নগর ভিতরে গেলা।
এক বৃক্ষমূলে বসি কুতুহলে
আসন পাতিআ দিলা॥
আপনি বষিলা দাষিরূপ হঞা
দেখিতে রূপসি বড়ি।
নগরের লোক আসিআ দেখল
অতি সে সুন্দরি নারি॥
সুধাই সকল লোক অনুকুল
এ জন কে জন বটে।
কহ নব রামা এই কোন জনা
কেন বা বসিলে বাটে॥
চণ্ডিদাস কএ শুন গুনিশ্চএ
এই সে কপাসি হএ।
মনের বাসনা পুরএ কামনা
আপন হৃদএ কএ॥৭॥২৬৪২॥

বেলয়ার॥

কেহ কেহ বলে কানাকানি করে
কোথাহ তোদের বাষ।
কেন বা রাইলে কিসের কারনে
এই কবে ইতিহাষ।
কহে সেই দাষি মুখে মধু হাষি
নাগরি মুখেতে চাএ।
সুন সর্ব জন জথির কারন
গমন হইল এথায়।

ইহ যে সর্ব্বজ্ঞ সকলে জজ্ঞ
কহেন মনের কথা।
ইহারে লইয়া ফিরি দেয দিয়া
গমন হইল এথা॥
জার জেবা কার্য্য আষি সব্ব রার্য্য
কহেন সর্ব্বজ্ঞ বানি।
এ কথা শুনিঞা হরসিত হঞা
সর্ব্বজনা পুছে পুনি॥
তবে কহে তারা হরষিত পারা
কি লাগে ইহার পুজা।
কহেত দাষি বচন উকাষি
চণ্ডিদাষ কহে ধজা॥৮॥২৬৪৩॥

ধানষী॥

কপালির দাসি কহে সভা গোচর।
খণ্ড পুস্প দুর্ব্ব ফল রাখিবে গোচরে॥
আতপ তণ্ডুল ধুপ চন্দন আগর।
রম্ভাফল মণ্ডা আর ঝুনা নারিকল॥
[ছয় ?] পাই আতব সুপেতে ফেলিয়া।
অষ্ট কলাই নিবে তাহাতে পুরিয়া।
রক্ত বস্ত্র কড়ি তিনি নিবে সাত গণ্ডা।
বষিবে ইহার কাছে না কহিবে বাড়া।
একধাস্ত একধ্যান একমন করি।
বসিবে ইহার কাছে না কহিবে বেরি॥
আমি সে পাতি খড়ি ইহার আজ্ঞা পায়া।
ইহ সে আছেন মোনব্রত আরোপিয়া॥
মোরে আজ্ঞা আছে আমি কব সকল।
দিন চণ্ডিদাস কহে সবার গোচর॥৯॥২৬৪৪॥

কানড়া॥

এ কথা শুনিঞা হরষিত হঞা
নগরের নারি জত।
পুজার বিধান করি আয়োজন
জনে২ আন্য কত॥
কপালির কাছে সভে বসিয়াছে
করিয়া একেক ধ্যান।
জানিয়া কারণ করিয়া জতন
পুযার সামৃগৃ আন।
বসিলা রমণি কুলের কামিনী
করিয়া একটি ধ্যান।
দাসি মন জানি কহিল কাহিনি
খড়ি পাতি বির্দ্যমান॥
কহেন সকল হইঞা নির্ম্মল
জতেক মনের কথা।
বিস্ময় লাগিল কপালি কহিল
ঘুচিল হিআর বেথা।
চণ্ডিদাস কএ লাগিল বিস্মঅ
জতেক নগররামা।
ঐছন বেভার সহিতে লাগিল
চণ্ডিদাস জানে প্রেমা॥১০॥২৬৪৫॥

তুড়ি রাগ॥

তবে সে বলিলা অন্তঃপুর দিয়া
জেখেনে কির্ত্তিকা আছে।
কপালিরে কহে কহ ২ পুন
কোথারে বসতি আছে॥
দাসি কহে তাএ পুছহ আমাএ
কপালি মৌনের ব্রতে।
ইহার আসিযে তরি অনাআসে
সকলি কহিব চিতে॥
কাহারে না কহি মোনব্রতে রহি
ইহা না বোলই কাহু।
এই সে কপালি জানিহ নিশ্চএ
বড়ই বড়ার বহু।
বাচাসির্দ্ধ হএ জানিহ নিশ্চএ
ইহার পুজন পুজা।
তবে কাম্যসিদ্ধি বহু হএ বিধি
ইহার উত্তর ধজা।
চণ্ডিদাসে কএ সব সিদ্ধি হএ
এই সে দাসির হৈতে।
মনের মানস পুরি তার আস
এসব ইহারি রীতে॥১১॥

মালব ॥

ইহার মহিমা কে জন জানে।
বাচসির্দ্ধ করি ইহারে মানে ॥
এই সে কপালি জা কহে বোল।
সেই সিদ্ধ হএ কহিল ওর ॥
তুমি রাজরানি লহি [লহএ ?] বানি।
মনের কামনা মনে সে জানি ॥
পুজহ ইহারে মনে সরে।
মনের বাঞ্ছিত পুরব তোরে ॥
সকল জানিব পাইবে সাক্ষি।
কে বোল আমার মুলের লক্ষি ॥
হাসি রাজরানি কির্ত্তিকা কএ।
জে কথা আমার মনেতে লএ ॥
পুজন সামিগৃ সাক্ষাতে রাখি।
একটী খিআনে মুদি আখি ॥
তবে রাজরানি বৈঠল ঠাঞ।
কপালিবদন সঘনে চাএ ॥
কর জোড়ে রহী একটি ধ্যানে।
চণ্ডিদাস দেখি হরস মানে ॥১২॥

কানড়া ॥

কির্ত্তিকা জুড়িএ কর ভাবএ মনে সর
কহ ২ কপালিরে কএ।
মোর জেবা আছে সাধ ইহা না করিবে বাদ
এই বর মাগি তুআ পাএ ॥
তুমি সে সকল জান কী বলিব বিদ্যমান
আমার বাসনা ক[র] পুর।
তবে সে তুমার পাএ সব নিবেদিব তুএ
জদি হএ দয়ার ঠাকুর ॥
কি মোর বাসনা বটে কহ মোর শুনিকটে
তবে সে মহিমা জানি তোর।
হৃদএর কথা আছে জানিঞা কহিবে কাছে
এই নিবেদন আছে মোর ॥
সকল কহিবে তুমি তবে সে মহিমা জানি
কহ দেখি বিচার করিয়া।
ভাল বলি মাথা লাড়ি সঘনে হুঙ্কার ছাড়ি
কপালি কম্পিত কলেবর।
ভূমে ফেলে খড়ি দাসী কহে সব পরকাষি
কহে জত হৃদএ সর ॥
জানিল সকল তত্ত মুখে পড়ে মহামন্ত্র
কির্ত্তিকার হৃদএ জে ছিল।
একে২ সব জানি কহিতে লাগিলা পুনি
জেবা চির্ত্ত সকল কহিল ॥
কহিল কির্ত্তিকা রানি মোর মনে কথা জানি
বিস্তার করিআ কিছু বল।
দিন চণ্ডিদাসের বানি জে বর মাগিলা রাণী
শুনিঞা আনন্দ চিত হল্য ॥১৩॥

কহেন শুবল হরস হয়্যা।
কহিতে লাগিলা বদন চায়্যা ॥
তোমার বাসনা জে আছে মনে।
সকল কহিব মনে শুনে ॥
তবে কহে দাসি হৃদ[য়] কথা।
ঘুচাইব সব মনের বেথা ॥
তবে কহে দাসি শুনগো রানি।
সাফল করিব তোমার প্রাণি ॥
রাণি কহে তবে কি মোর চিতে।
খড়ির কথন কী কহে ভিতে ॥
তবে কহে দাসি বাসনা এই।
শুভকর্ম্ম ফল ভাবিলে সেই ॥
তোমার নন্দিনী সমান বর।
এই সে হইল তোমার সর ॥
মনের মরম কহিলা রানি।
সকল বীচার কহিলে তুমি।
এই সে কামনা মনেতে ছিল।
খড়ি উঠাইতে সকল পাল্য।
চণ্ডিদাস কহে এই সে ভাল।
তোমার জনম সাফল্য হেল ॥১৪॥

শ্রীরাগ ॥

কির্ত্তিকা কহেন সুন কপালির দাষি।
ভালমতে ইহারে করিয়্যা দিব খুসি ॥
আমার বাসনা জদি অবস্য পুরিবা।
ভালমতে তোমার করিআ দিব সেবা ॥
কনক কঙ্কন দিব নানা আভরন।
গলে গজমোতি দিব অনেক ভুসন ॥
মোর বড় সাদ আছে সকল কহিলে।
তুমি সর্ব্ব জান বট সক[ল] জানিলে ॥
এই মোর বাসনা হই জবে সিদ্ধি।
তোমারে তুসিব দিব কত সত নিধি ॥
হাসিয়া কপালি কহে ঘন মাথা নাড়ে।
মুদিত নঅন সঘন নিস্বাস এড়ে ॥
বাম করে নানা পুষ্প কির্ত্তিকার করে।
পুরিব কামনা তোর জানিহ অন্তরে ॥
জে বর মাগিবে রাণি সেই বর দিব।
চণ্ডিদাস বলে আমি বর মাগি নিব ॥১৫॥

কহেন সুবল হইয়া নির্ম্মল
সুনগো কির্ত্তিকা রাণি।
সাফল করিব তোমার জীবন
বর দিব ইহা জানি ॥
করজোড়ে বলে কপালির পাএ
এই বর দেহ তুমি।
জনমে ২ তোমারে সেবিব
পুজন করিব আমি ॥
তুমি অন্তজামি সব জানি তুমি
কিবা সে আমার মনে।
বিচারিআ কহ কপট না রহ
বঞ্চনা করহ কেনে।
মনের মরম কিবা সে করম
কিবা দিবে তুমী বর।
আমার অন্তরে ভাবিনু সন্তরে
কহ ২ দেখি তার সর।
তবে কহে দাসি হৃদঅ প্রকাসি
সুনগো কির্ত্তিকা রাণি।
আপন তনআ ভাল বর পায়্যা
তারে সমর্পিব আমি ॥
এই বর মাগি হয়্যাছ বিয়োগি
সাফল করিব তাই।
এমন পিরিতি সুখের আরতি
দিন চণ্ডিদাসে গাই ॥১৫॥

ভৈরবী ॥

মনের মরম পাইল তখন
পুলকিত হল্য তনু।
কপালির পাএ সঘনে লোটাএ
নিবেদন করে পুনু ॥
মোর জে বা মনে জানিল কেমনে
কহিল মনের কথা।
এত দিনে মোর সুভ দসা ভেল
ঘুচিল হিয়ার বেথা ॥
কহ ২ বাণি আরবার সুনি
তুমি সিদ্ধ বট দেবা।
আপন নিছিআ তোমারে ভজিব
নিগুড়ে করিব সেবা ॥
বলিহারি জাই তোমার বালাই
মনের কথাটী জানি।
বর দিলে জদি সুখের অবধী
জেন সুভ হএ স্বামি।
তবে মাথা নাড়ি কপালি উঘাড়ি
ঠারিয়া দাসিরে কএ।
মাগি লেহ বর আমার গোচর
দিব তোরে অতিবএ।
চণ্ডিদাস বলে বর দিল তোরে
আছএ জগতে সারা।
তোমার তনএ আনিহ এথাএ
সকল বরের সারা ॥১৬॥

বেহাগড়া ॥

দাসি বলে.শুন রাণি আমা[রি] বচন।
কপালিরে আসিয়া করুন দরসন ॥

গোচর নহিলে বর দিব কিবারূপে।
তোমারে কহিল রাণি সগন সরূপে ॥

দেখিয়া দিবেন বর হরস হইয়া।
আসিয়া পড়ুন পাএ প্রণাম করিয়া ॥

কপালির দাসির সুনিঞা বাণি।
হরসে আনিতে গেলা আপন নন্দিনি ॥

প্রবেসি মহল ঘরে কির্ত্তিকা রমণী।
সুতিআ মন্দির ঘরে সুখে বিনদিনি ॥

কির্ত্তিকা জাইআ নিল আপনার কোলে।
লক্ষ২ চুম্ব দিল বদনকমলে ॥

রাধারে লইয়া কোলে বাহির হইল।
চণ্ডিদাস কহে রূপে সব আল কৈল ॥১৬॥

নাসাএ বেসর অতি মনোহর
নআনে কাজররেখা।
দেখিতে কি দেখি পিছলএ আখি
জেন কাল মেঘ দেখা ॥
দসন জেমন কি কহি উপাম
জেন দাড়িম্ব বিজে।
বিম্বু অধর জেন হিঙ্গুল
সোভিছে তাহার মাঝে ॥
হিয়ার কাচুলি করে ঝলমলি
গলাএ মোতিমহার।
কনক ভূষন নানা অভরন
মহিমা নাহিক তার ॥
ঝিল সে অম্বর জেন মেঘবর
তৈছন তাহার ছটা।
চরনে নপুর বাজএ মধুর
চণ্ডিদাস দে[খে] ঘটা ॥১৭॥

গড়াধানসী ॥

রাধা নিঞা কোলে আনন্দ হিলোলে
সুখের নাহিক ষোর।
আসিআ সাগরে থাই নাহি পাএ
আপন আপনি ভোর ॥
হেরিতে তনয় মুখ।
কত নিধি পাএ আনন্দ হিয়াএ
কতি গেল বোহ দুখ ॥
বান্ধল চাঁচর চিকুর সুন্দর
কবরি সাজল তাএ।
নানা ফুলদাম অতি অনুপাম
সুগন্ধে ভমরা ধাএ।
ভালে সে সিন্দুর কোটা বিলখ[র্ষ]ণ
চৌদিগে চন্দনবিন্দু।
অরুন বেড়িআ তারার পশরা
উদয় হইল ইন্দু।

বাহির হইলা রাণি কোলে লঞা রাধা।
সনার প্রতিমা জে[ন] তাহে নাহি বাধা ॥

বিজুরি ইজুরি পড়ে চলিতে ধরণী।
সনার কমল জেন কনকদাপুনি ॥

কিএ গোরচনা জিনি কেঁতকির দল।
কনক চম্পক জিনী বরণ উর্জ্জল ॥

ধরনি পুলক মানি চলিতে চরন।
মনসিজ লাখ ভরি হরিল চেতন ॥

কির্ত্তিকা জননি কোলে পড়িছে বিজুরি।
বিহি নীরমিল কীএ এমত কুমারি ॥

চলিলা কিসোরি গুরি বালি দি[ঠি ?] এড়ি।
চরন নপুর বাএ সভা হল্য বড়ি ॥

দেখিআ সুবল চির্ত্ত হরিল তখন।
কৃষ্ণের সমুখে দাণ্ডাইল দুই যন ॥

দাসি কহে কপালির চরন কমলে।
দিনী খিনি চণ্ডিদাস দুরেতে নিহালে ॥১৮॥

বড় অপরূপ দেখিআ সুন্দর
মোহিত মানল চিতে।
রূপের ছটাএ মদন মুরুছে
সুনিতে নুপুর গিতে ॥
বিহি নিরমিল কি।
হেন তোর কন্যা জগজন ধন্যা
তাহারে বলিব কি ॥
তুমার ভাগ্যের দিতে নাহি ওর
সুবল দাসিতে কএ।
কপালির পানে চাহে ঘনে ২
মুগধ হইয়া রএ ॥
কৃষ্ণে চিত ভেল আধিক বাড়িল
ধরি কপালির বেস।
মুর্চ্ছিত মানল হিআ ভেল চল
না হএ সম্বিত লেস ॥
পাছে সহ[চ]রি নিতুম্বেতে ধরি
লইল কপালি আগে।
কটাক্ষ তপনে নঅনে২
উঠিল বিসন রাগে ॥
এক দিঠি তাএ দিলা জদুরাএ
তন মন ভেল ভোর।
চণ্ডিদাস কএ হেন মনে লএ
ধরিতে চাহেন কোর ॥১৯॥

দাক্ষিণাত্য শ্রী।

নঅনে২ মিলন হৈত্যে।
হিয়া ভরি পিঅল চিতে ॥
মনসিজবান বিন্ধিল তাএ।
অস্থির হইল এ জদুরাএ ॥
রূপের ছটাএ নয়ান ঝাপে।
জেমত পড়িলা রসের কুপে ॥
পড়িআ অগাদ দরিআ পরে।
থাহ না পায়ই রসের ভরে ॥
মুগদ নাগর সাঁতুরি তায়ে।
উঠিতে কিনারে স্থলা [না] পাএ ॥
রসের সমুদ্রে চাহিএ মিন।
নয়ান সফরি দুহার চিন ॥
আবসে চাহিএ সিহালা তাএ।
শ্রীমতি কিকো[শো?]রি চিকুর ভাএ ॥
আবেসে চাহিত্যে কমল ফুল।
শ্রীমতি রাধার আনন মুল ॥
বাড়ব আগুন সমুদ্রে থাকে।
কানুর বিরহ আগুন চাকে (?) ॥
আবসে থাকএ সাগর মিন।
শ্যাম তাহে ভেল মগরচিন ॥
রসের সমুহ সুখের সার।
চণ্ডিদাস কহে লীলা অপার ॥২০॥২৬৫৮॥

ব্রহ্মসূত্রার্থে মতভেদ

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

যাহার উপর যত প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা হয়, তাহার বিষয়ে তত জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক হয়,—এই নীতির অনুসরণ, সকলেই সকল ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন। এই প্রভুত্বের শেষ, জগতের উপর প্রভুত্বে, এবং এই জ্ঞান লাভের শেষ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের কারণের জ্ঞানে। সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ হইলে, প্রভুত্বলাভের অপর বিষয় আর না থাকায় সেই স্থলেই প্রভুত্বলাভ-কামনার শেষ হয়, আর যে বিষয়ের জ্ঞান লাভের ইচ্ছা হয়, সেই বিষয়ের কারণের জ্ঞান লাভ হইলে তাহার বিষয়ে জ্ঞাতব্য আর কিছু থাকে না; আর তখন তাহার উপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য লাভের সামর্থ্য হয়। আর এই প্রভুত্বলাভের কামনা আমাদের যেমন স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই কামনার শেষও আমাদের হয় না—ইহাই আমাদের স্বভাব। এইরূপে সমগ্র জগতের উপর প্রভুত্ব লাভের জন্য, জগতের কারণজ্ঞান-লাভার্থ, সুধীসমাজ সর্ব্বদাই সমুৎসুক; আবহমান কাল হইতে মনুষ্য-সমাজে এই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যোগবিজ্ঞান, সকল পথেই অবিরত এই চেষ্টা কত যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন পথেই অদ্যাবধি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না; অধিক কি, হইবে বলিয়াও আশা-ভরসা বড় বেশী নাই। কারণ, সমগ্র জগতের মূল কারণের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ, জগতের মধ্যে থাকিয়া সম্ভবপর হয় না। জগৎ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে এবং জগতের বাহিরে না থাকিতে পারিলে, এক কথায় জগদতীত না হইতে পারিলে জগৎকারণের পরিচয় লাভ অসম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেও জগৎকারণের জ্ঞানলাভচেষ্টা পরিত্যক্ত হয় নাই, এবং হইবে বলিয়াও আশা নাই। জগতের উপর প্রভুত্ব লাভের স্পৃহা যেমন আমাদের স্বাভাবিক, জগতের মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভস্পৃহাও তদ্রূপ আমাদের স্বাভাবিক। বিশেষ এই যে, জগতের মূলতত্ত্বের জ্ঞানলাভস্পৃহা অপেক্ষা প্রভুত্বলাভের স্পৃহাটি প্রবলা।

এইরূপে এই স্বাভাবিক চেষ্টার ফলে জগৎকারণ-বিষয়ে অনাদিকাল হইতে নানা মতবাদ জন্মলাভ করিয়াছে, এবং ইহাদের মতভেদের কোন মীমাংসাও এ পর্য্যন্ত হয় নাই, এবং বর্ত্তমানেও হইতেছে না, এবং ভবিষ্যতেও হইবে কি না, সে বিষয়েও বিদ্বদ্‌বৃন্দ সন্দিহান। ইহা দেখিয়া এক দল সুধী বা ঋষিবৃন্দ, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জগদতীত এক জন ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, তাঁহার বাণীর সাহায্যে এই জগৎকারণতত্ত্ব নির্ণয়ে স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেই ঈশ্বরবাণীর স্বরূপ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। নানা ধর্ম্মাবলম্বীর অথবা নানা সম্প্রদায়ের নানা ধর্ম্মগ্রন্থের বাণীই ঈশ্বরবাণী কেন নহে, বলিয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। ইহাতে কতকগুলি ব্যক্তি প্রাচীনত্বের প্রামাণ্যাধিক্য

স্বীকার করিয়া বেদশাস্ত্রকেই প্রকৃত ঈশ্বরবাণী বলিয়া জগৎকারণতত্ত্ব নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কালক্রমে সেই বেদার্থেই আবার বিরোধ উপস্থিত হইল, এবং বেদ-বিভাগকর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাসের কথাতেই সেই বিরোধ মীমাংসিত হইল বলিয়া অনেকেই মানিয়া লইলেন। এই বেদ এ স্থলে বেদান্ত বা উপনিষৎ এবং সেই বেদব্যাসের কথা এ স্থলে ব্রহ্মসূত্র নামক একখানি দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া সুধীসমাজে পরিচিত। মহর্ষি বেদব্যাস এই সূত্রগ্রন্থসাহায্যে উক্ত বেদান্ত বা উপনিষদের অর্থ নির্ণয় করিয়া দিলেন।

কিন্তু কালক্রমে সেই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ লইয়াই আবার মতভেদ উপস্থিত হইল, এবং এই মতভেদ এতই অধিক হইল যে, ইহার মীমাংসা, স্বয়ং বেদব্যাস আবার হস্তক্ষেপ না করিলে বুঝি হইবার নহে,—মনে হয়। এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থাবিষ্কারের জন্য কালে কালে যে সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত যে সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়, সেগুলির কোনটিই দেড় হাজার বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নহে। এই সব ভাষ্য বৃত্তি প্রভৃতি অগণ্য হইলেও যেগুলি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং তজ্জন্য মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারা সংখ্যায় দশখানির অধিক নহে। যথা—১। শাঙ্করভাষ্য, ২। ভাস্করভাষ্য, ৩। রামানুজভাষ্য, ৪। নিম্বার্কভাষ্য, ৫। মাধ্বভাষ্য, ৬। শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্য, ৭। শ্রীকর বা শ্রীপতিভাষ্য, ৮। বল্লভভাষ্য, ৯। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য, এবং ১০। বলদেবভাষ্য। এস্থলে ইহাদের আবির্ভাবক্রম-অনুসারে ইহাদের উল্লেখ করা হইল।

এই সকল ভাষ্যই প্রায় সকল বিষয়েই বিভিন্ন মতাবলম্বী। শাঙ্কর মতের প্রতিবাদ ভিন্ন প্রায় কোন বিষয়েই সকলে একমত নহেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারা সকলেই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসসম্মত অর্থের আবিষ্কারে উদ্যত। জগৎকারণ সম্বন্ধে যেমন ইহারা বিভিন্ন মতাবলম্বী, তদ্রূপ ব্রহ্মসূত্রের সংখ্যায়, ব্রহ্মসূত্রের পাঠে, সূত্রের অর্থে, সূত্রের ক্রমে, বিচার্য্য বিষয়ানুসারে সূত্রসংগ্রহে, এইরূপ বহু বিষয়েই ইহারা বিভিন্নমতাবলম্বী। ইহাদের এই প্রকার মতভেদ দেখিলে, মনে হয়, সূত্রকারের কি অভিপ্রায়, কি তাৎপর্য্য, তাহা জানিবার বুঝি আর উপায় নাই। ইহাদের পাণ্ডিত্য, ইহাদের প্রতিভা, ইহাদের যুক্তিপটুতা দেখিলে, মনে হয়, ইহাদের যুক্তির বা ব্যাখ্যার দোষগুণ, শ্রেষ্ঠত্বাশ্রেষ্ঠত্ব-নির্ণয় এক প্রকার অসাধ্য ব্যাপার। বিশেষতঃ সূত্রপাঠাদিতে মতভেদ দেখিয়া মনে হয়, এই ব্রহ্মসূত্রকে ব্যাসের "মত" বা উপনিষদের "মত" বলিয়া প্রমাণ প্রদর্শনের চেষ্টাই আমাদের ব্যর্থ। যাহার পাঠেই এত মতভেদ, তাহার অর্থে যে ঐকমত্য আরও অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ ব্রহ্মসূত্রকার যে তাঁহার গ্রন্থের এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ অর্থ হউক বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছিলেন—ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্তু ফলতঃ তাহাই আজ ঘটিয়াছে। আজ বৈদিক ভারতের অধিকাংশ ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন দেখা যায়। যখন যে সম্প্রদায় জন্মলাভ করিয়াছে, তখন সেই সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যাদি করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের দৃঢ়তা-সাধন করিয়াছেন, এবং তাহাই ব্যাসমত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য,

সকলেরই লক্ষ্য এই ব্রহ্মসূত্রদ্বারা জগৎকারণ নির্ণয় করা, আর তদনুসারে জীবনের কর্ত্তব্য-নির্ণয় বা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ। যে সকল সুধীবৃন্দ অন্য উপায়ে জগৎকারণ-নির্ণয় অসম্ভব বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরবাণী বেদ অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, আজ কালক্রমে সেই সুধীসম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার এই অবস্থা। এই সব দেখিয়া মনে হয়, ব্রহ্মসূত্রের নাম করিয়া কোন মতবাদ সমর্থন বা প্রতিষ্ঠা করা আজ নিষ্ফল। নিম্নে এই মতভেদ সম্বন্ধে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ সূত্র-সংখ্যাতে যে বিরোধ, তাহা এই—

শাঙ্করভাষ্যে	সূত্র-সংখ্যা—	৫৫৫	শ্রীকণ্ঠভাষ্যে	সূত্র-সংখ্যা—	৫৪৫
ভাস্কর „	„	৫৪১	শ্রীকর „	„	৫৪৪
রামানুজ	„	৫৪৫	বল্লভ „	„	৫৫৪
নিম্বার্ক „	„	৫৪৯	বিজ্ঞানভিক্ষু	„	৫৫৫
মাধ্ব „	„	৫৬৪	বলদেব „	„	৫৫৮

তাহার পর এই সব সূত্রের দ্বারা এই গ্রন্থে যে সকল বিচার্য্য বিষয় অর্থাৎ অধিকরণ রচিত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাতেও ভাষ্যকারগণের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়াছে, যথা—

শাঙ্করভাষ্যে	অধিকরণ-সংখ্যা—		১৯১	মাধ্বভাষ্যে	অধিকরণ-সংখ্যা—		২২৩
ভাস্করভাষ্যে	„	„	১৮৯	শ্রীকণ্ঠভাষ্যে	„	„	১৮১
রামানুজভাষ্যে	„	„	১৫৭	শ্রীকরভাষ্যে	„	„	১৭৪
নিম্বার্কভাষ্যে	„	„	১৩৫	বল্লভভাষ্যে	„	„	১৬০

তাহার পর সূত্রপাঠে শব্দভেদ বা বর্ণভেদ নিবন্ধন বিরোধও যথেষ্ট ; যথা—

শাঙ্করভাষ্যে	পাঠভেদ—	৩	সূত্রে	শ্রীকণ্ঠভাষ্যে	পাঠভেদ—	৩৯	সূত্রে
ভাস্কর „	„	৬০	„	শ্রীকর „	„	৭৯	„
রামানুজ „	„	৫৪	„	বল্লভ „	„	৩২	
নিম্বার্ক „	„	৪৫	„	বিজ্ঞানভিক্ষু	„	৩৬	
মাধ্ব „	„	৬২	„	বলদেব „	„	৫৪	

এইরূপ একটি সূত্রকে দুইটি করায় যে পাঠভেদ হইয়াছে, তাহা এই—

রামানুজভাষ্যে দুইটি সূত্রকে একটি সূত্র করা হইয়াছে		—৬ স্থলে
শ্রীকণ্ঠভাষ্যে	...	৬ „
নিম্বার্কভাষ্যে	...	২ „
মাধ্বভাষ্যে	...	৬ „
বলদেবভাষ্যে	...	৪ „

তদ্রূপ দুইটি সূত্রকে একটি সূত্র করায় যে পাঠভেদ হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

ভাস্করভাষ্যে দুইটি সূত্রকে একটি করা হইয়াছে		—৪ স্থলে
রামানুজ	...	১৪ ,,
নিম্বার্ক	...	৮ ,,
মাধ্ব	...	১ ,,
শ্রীকণ্ঠ	...	১৪ ,,
শ্রীকর	...	১২ ,,
বল্লভ	...	২ ,,
বলদেব	...	২ ,,

অতিরিক্ত সূত্রগ্রহণে পাঠভেদ, যথা—

রামানুজভাষ্যে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হইয়াছে		৩টি সূত্র।
নিম্বার্ক	...	৩ ,,
শ্রীকর	...	২ ,,
মাধ্ব	...	১ ,,
বল্লভ	...	১ ,,
বিজ্ঞানভিক্ষু	...	১ ,,
বলদেব	...	১ ,,

গৃহীত সূত্র বর্জ্জনে পাঠভেদ, যথা—

ভাস্করভাষ্যে বর্জ্জিত হইয়াছে		৬টি সূত্র।
রামানুজ	...	২ ,,
নিম্বার্ক	...	২ ,,
মাধ্ব	...	৩ ,,
শ্রীকণ্ঠ	...	২ ,,
বল্লভ	...	১ ,,

সূত্রক্রম-বিপর্য্যয়ে পাঠভেদ, যথা—

রামানুজভাষ্যে সূত্রক্রম বিপর্য্যয় করা হইয়াছে		—২ স্থলে
মাধ্ব	...	১ ,,
শ্রীকণ্ঠ	...	২ ,,

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সব বিরোধের মূলে কেহই শাঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষা কোনও প্রাচীন ভাষ্যের স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। মনে হয়, তাঁহারা কেহই এরূপ প্রাচীন ভাষ্য দেখেন নাই। এ সব স্থলে ইঁহাদের নিজ নিজ উক্তি বা যুক্তিই প্রমাণ

বলিয়া বিবেচিত হউক—ইহাই যেন ইহাদের ইচ্ছা। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ ভেদ করিতে হইলে প্রাচীনতর গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন যে একান্ত আবশ্যক, তাহা যে কেন ইহাদের মনে উদিত হইল না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই জন্যই মনে হয়, তাঁহাদের সময় প্রাচীন ভাষ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে, ব্রহ্মসূত্রমধ্যে সূত্র-সংখ্যায়, বিচার্য্য বিষয়-সংখ্যায় অর্থাৎ অধিকরণ-সংখ্যায়, সূত্রপাঠে, ১০ জন ভাষ্যকারের মধ্যে কতই মতভেদ ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বপক্ষের সূত্র এবং সিদ্ধান্তপক্ষের সূত্রনির্দ্দেশেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এখানেও সকলে একমত নহেন। ইহার পর সূত্রমধ্যে যে শ্রুতির বিচার করা হইয়াছে, তাহাতেও মতভেদ। কেহ বলেন—এই শ্রুতি এই স্থলে বিচারিত হইয়াছে, কেহ বলেন—না, এই শ্রুতি বিচারিত হইয়াছে। কেহ বলেন—এ স্থলে এই স্মৃতি লক্ষিত হইয়াছে; কেহ বলেন—না, অন্য। কেহ বলেন—এ স্থলে পাঞ্চরাত্র মত খণ্ডিত হইয়াছে, কেহ বলেন—না, এ স্থলে পাঞ্চরাত্র মত স্থাপন করা হইয়াছে। আবার অপরে বলেন—না, এস্থলে শাক্ত মত খণ্ডন করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি কেহ বলেন—ব্রহ্মসূত্রের মত—অদ্বৈতবাদ, কেহ বলেন—ভেদাভেদবাদ, কেহ বলেন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কেহ বলেন—দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, কেহ বলেন—দ্বৈতবাদ। আবার কেহ বলেন—নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য, কেহ বলেন—সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য। কেহ বলেন—উভয়ই। কেহ বলেন—বিষ্ণুই প্রতিপাদ্য, কেহ বলেন—শিবই প্রতিপাদ্য, আবার কেহ বলেন—না, শক্তিই প্রতিপাদ্য। শুনা যায়, পঞ্চ দেবতাপর পাঁচ প্রকার ভাষ্যই ব্রহ্মসূত্রের ছিল। এইরূপে দেখা যাইবে, ব্রহ্মসূত্র অবলম্বনে কত প্রকার মতভেদ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক মতের ভাষ্যেরই অনুগামী যে কত লোক, কত মনীষী, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক মত-প্রবর্ত্তকই অসাধারণ শক্তি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন; ইহা তাঁহাদের জীবনচরিত এবং কিম্বদন্তী হইতেও জানা যায়। তাহার পর এই সকল ভাষ্যকারই প্রায় নিজ নিজ মতের এবং নিজ নিজ ব্যাখ্যার প্রাচীন ঋষিমূলকত্বও প্রদর্শন করিয়াছেন। অধিক কি, ইহারা সকলেই প্রায় নিজ নিজ সম্প্রদায়কে ব্যাস-সম্প্রদায়ভুক্ত অথবা ব্যাস-সম্প্রদায়সংশ্লিষ্ট করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। অথচ সকলেই বহু বিষয়েই বিভিন্নমতাবলম্বী। ফলতঃ ব্রহ্মসূত্রের অর্থ নির্ণয় করিয়া জগৎকারণনির্ণয়রূপ অলৌকিক বিষয়ে অলৌকিক প্রমাণ-স্বরূপ শ্রুতির অর্থ নির্ণয় আজ যেন এক প্রকার অসম্ভব বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে। জানি না—প্রাচীন কালেও ব্যাসসম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-নির্ণয়ে এইরূপ মতভেদ হইয়াছিল কি না? কারণ, অদ্বৈতবাদিগণ, স্কন্দ উপপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতাকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলেন, আর বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বলেন। উভয়েই শাস্ত্রপ্রমাণ দেন। কিন্তু যথার্থ ভাষ্যলক্ষণ কোন স্থলেই নাই—ইহা অতিস্পষ্ট। সূতসংহিতা বা ভাগবতে সূত্রও নাই, সূত্রব্যাখ্যাও নাই। ইহাদিগকে বৈশেষিকের প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের ন্যায় ভাষ্য বলাও যায় যায় না। এ জন্যও উহা অর্থবাদবিশেষ, মনে হয়।

এখন তাহা হইলে উপায় কি? যাঁহারা বেদকে ঈশ্বরবাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া জগৎকারণনির্ণয়ে সমুৎসুক, তাঁহাদের উপায় কি? তাঁহারা কি শ্রুতির প্রামাণ্যই পরিত্যাগ করিবেন? অথবা মহর্ষি ব্যাস-প্রদর্শিত শ্রুত্যর্থমীমাংসারূপ ব্রহ্মসূত্রকেই পরিত্যাগ করিবেন? এবং নিজেরাই যাহা যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত, তাহাই জগৎকারণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন? অথবা যোগশক্তি অর্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন? কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর শ্রুতি পরিত্যাগ করা যেমন অসম্ভব, তদ্রূপ ব্যাসসূত্র উপেক্ষা করাও অসম্ভব। কারণ, তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিয়াছেন, একমাত্র শ্রুতিই অভ্রান্ত, এবং একমাত্র ভগবদবতার বেদব্যাসই সেই শ্রুতির বিভাগাদি করিয়া এবং ব্রহ্মসূত্রাদি গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার রক্ষাসাধন করিয়াছেন। তাহার পর যুক্তি ও বিজ্ঞানের এতাদৃশ অলৌকিক তত্ত্ব নির্ণয়ের সামর্থ্য আছে কি না, সেই বিষয়েই দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়। কারণ, বিজ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান; নিত্য নূতন আবিষ্কার হইতেছে, নিত্য নূতন "মত" বাহির হইতেছে এবং পুরাতন "মত" পরিত্যক্ত হইতেছে। আর এই আবিষ্কারের যে সীমা আছে, তাহা বিজ্ঞানই বলিতে পারে না। আর যুক্তি যখন এই বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন যুক্তিও সেই জগৎকারণ নির্ণয় করিতে যে পারিবে, সে বিষয়েও সন্দেহ অপনীত হইবার নহে। তাহার পর যোগশক্তিদ্বারাও এই আশা পূর্ণ হইবার নহে। কারণ, এ পর্য্যন্ত যাঁহারা সিদ্ধযোগী বলিয়া পূজিত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও সকলে একমত নহেন। তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ বর্ত্তমান। কপিল-কণাদ, ব্যাস-জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিবৃন্দের মধ্যেই যখন মতভেদ, তখন সিদ্ধযোগীর মধ্যেও যে মতভেদ হইবে—ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? আর যোগীও জগদতীত অবস্থায় উপনীত হন কি না, সে-বিষয়েও ত নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যোগশক্তির দ্বারাও সেই অলৌকিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ দুরাশা বলিতে পারা যায়। অতএব উপায় কি?

সত্য কথা বলিতে গেলে একমাত্র ভগবৎকৃপা ভিন্ন এরূপ স্থলে কোন উপায় নাই, ইহাই বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা হইলেও আশামরীচিকা আমাদের নিবৃত্ত হয় না। মনে হয়—নিবিড় অন্ধকার দেখিয়া যেমন প্রথমে ভয় হয়, কোন পথই দেখা যায় না, কিন্তু কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিতি করিলে সে ভয় আর থাকে না, পথও কিছু কিছু দেখা যায়, এস্থলেও তদ্রূপ কি হইবে না? মনে হয়—এই সকল ভাষ্যকারের মধ্যে অধিকাংশ ভাষ্যকার যে যে বিষয়ে একমত, সেই সেই বিষয়গুলি ব্যাসসম্মত, অন্যগুলি ব্যাসসম্মত নহে, সুতরাং সূত্রসংখ্যা, সূত্রপাঠ, অধিকরণ-সংখ্যা প্রভৃতিতে, যাঁহারা অল্পসংখ্যক ভাষ্যকারের দলভুক্ত, তাঁহাদের ভাষ্য ব্যাসসম্মত ভাষ্য নহে, অর্থাৎ তাঁহারা যেরূপ সূত্রার্থ করিয়াছেন, তাহা সূত্রকারের অনুমোদিত নহে—এইরূপ একটা নিয়ম করিলে কি ব্যাসসম্মত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-নির্ণয় কতকটা সম্ভবপর হইবে না? তাহার পর মনে হয়—আরও একটা পথ আছে। এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থখানি এবং অন্যান্য সূত্রগ্রন্থ দেখিয়া এই ব্রহ্মসূত্ররচনার একটা নিয়ম আবিষ্কার হইতে পারে। এই নিয়মও এস্থলে অধিকাংশ ভাষ্যকারের সম্মতিতে সঙ্কলন করিয়া যে সব

ভাষ্যকার এই নিয়ম যত লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহারা তত ব্যাস-মত হইতে দূরে, এবং যাঁহারা যত পালন করিবেন, তাঁহারা ততই ব্যাস-মতের নিকটবর্ত্তী—এইরূপ একটা পথ পাওয়া যাইতে পারে। অতঃপর ভাষ্যের প্রাচীনত্ব এবং ব্যাস-সম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধাধিক্য—এই বিষয়দ্বয় যে-ভাষ্যের যত অনুকূল হইবে, সেই ভাষ্যকে তত ব্যাসসম্মত বলিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হয়, আমরা আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আরও নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব, অর্থাৎ সেই ভাষ্যের সূত্রার্থ ই ব্যাসসম্মত সূত্রার্থ বলা যাইতে পারিবে।

মদীয় অধ্যাপক পরমপূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীলক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রবিড় মহোদয়ের নিকট আমি এই পথটি দেখিতে পাই। অতঃপর বহু বৎসর বহু পরিশ্রমের পর এই বিষয়টি সম্বন্ধে যে ফললাভ করিয়াছি, তাহাই এ স্থলে পাঠকবর্গকে উপহার দিব। এ বিষয়ে তাঁহাদের সহযোগিতা পাইলে বোধ হয়, একটা সৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে।

বলা বাহুল্য, এ স্থলে আমরা সূত্রের অর্থ বিচার না করিয়া, অথবা ভাষ্যকারগণের মতবাদ বিচার না করিয়া, অথবা শ্রুতির অর্থ বিচার না করিয়াই এই নির্ণয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কারণ, এই বিষয়গুলি অতীব দুরবগাহ, এবং বহু শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। কেবল তাহাই নহে, ইহা আমাদের এক প্রকার সাধ্যাতীত বিষয় বলিলে শোভন হয়। এই জন্য এই স্থলে আমরা প্রথমতঃ অধিক-সম্মতি অনুসারে, অধিকরণ-রচনা এবং সূত্রপাঠ প্রভৃতি দ্বারাই ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব; তৎপরে সূত্র-রচনার অধিক-সম্মত নিয়ম আবিষ্কার করিয়া তদ্দ্বারা কেবল মাত্র অধিকরণ-রচনায় কোন্ ভাষ্যের কত দোষ, তাহার নির্ণয় করিয়া ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব। অর্থাৎ সূত্রপাঠাদি ভিন্ন অধিকরণরচনাবিষয়ক বিচারে আমরা দুইটি পথ অবলম্বন করিব, যথা—একটি নিয়মনিরপেক্ষ নির্ণয়ের পথ, এবং দ্বিতীয়টি নিয়মসাপেক্ষ নির্ণয়ের পথ। এইরূপে সূত্রার্থের বিচার না করিয়া সূত্রের পাঠাদির দ্বারা এবং অধিকরণ-রচনাদ্বারাই আমরা এ স্থলে ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয় করিব। ইহাতেই ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয়ের অধিক সম্ভাবনা। কারণ, গ্রন্থরচনার বিষয়বিন্যাসে গ্রন্থকর্ত্তার ব্যক্তিত্ব যত ফুটিয়া উঠে, বিষয়-আলোচনার মধ্যে তত ফুটিতে পারে না। বিষয়বিন্যাস স্বেচ্ছাকৃত হয়, কিন্তু বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান বা নির্দ্দিষ্ট থাকে, গ্রন্থকারকে বিষয়ের অনুসরণই করিতে হয়। নিম্নে এ জন্য একটি প্রকোষ্ঠচিত্র প্রদান করিলাম, ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ ভাষ্যে উক্ত পথে কত দোষ ঘটিয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এই দোষ-নির্ণয়ের মূলে অধিক-সম্মতিই মানদণ্ডরূপে গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যনাম	নিয়মসাপেক্ষ অধিকরণ রচনায় দোষ	নিয়মনিরপেক্ষ অধিকরণ রচনায় দোষ	সূত্রপাঠে দোষ	সূত্রযোগে দোষ	সূত্রবিভাগে দোষ	অতিরিক্ত সূত্রগ্রহণে দোষ	গৃহীত সূত্রবর্জনে দোষ	সূত্রক্রমের বিপর্যায়ে দোষ	দোষসমষ্টি
শাঙ্কর ভাষ্যে	০	১৩	১০	১	০	০	০	০	২৪
ভাস্করভাষ্যে	৩	১১	৪৬	৪	০	০	৪	০	৬৮
রামানুজভাষ্যে	৪৯	২৩	৩৬	১৪	৬	৩	২	২	১৩৫
নিম্বার্কভাষ্যে	৬৯	৪৩	৩৩	৮	২	৩	২	০	১৬০
মাধ্বভাষ্যে	১২১	১০৬	৪৭	১		৬	৩	১	২৯১
শ্রীকণ্ঠভাষ্যে	৪৭	২৮	২৬	১৪	৬	৩	২	২	১২৮
শ্রীকরভাষ্যে	৩৯	১৯	৬৩	১১	০	২	০	৪	১৩৮
বল্লভভাষ্যে	৮৮	৭৬	২৪	২	০	১	১	০	১৯২
বিজ্ঞানভিক্ষু	?	?	২৯	১	০	১	০	০	৩১
বলদেব	?	?	৪১	২	০	১	০	০	৪৪
ভাষ্য ১০	৪১৬	৩১৯	৩৫৫	৫৮	২০	২০	১৪	৯	১২১১

এ স্থলে বিজ্ঞানভিক্ষু ও বলদেব-ভাষ্যের অধিকরণ-রচনার দোষসংখ্যা প্রদর্শিত হইল না। কারণ, আমার উপলব্ধ মুদ্রিত গ্রন্থে উহা নির্ণয় করা হয় নাই। ভাস্করভাষ্যের অধিকরণ মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তাহার অধিকরণ-সংখ্যার দোষ নির্ণয় করিবার জন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীঅনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় আমার জন্য উহার অধিকরণ নির্ণয় করিয়া দেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে—সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দোষ শাঙ্কর ভাষ্যে। তন্মধ্যে নিয়মসাপেক্ষ অধিকরণ-রচনার দোষ শাঙ্কর ভাষ্যে একটিও হয় নাই। তাহার পর ভাস্করভাষ্যের দোষ। তাহার পর শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর ও রামানুজভাষ্যের দোষ। আর তাহা হইলে প্রাচীনতর ভাষ্যই ব্যাসমতের নিকটবর্ত্তী, ইহা স্থূলভাবে বলা যায়। অবশ্য এ স্থলে অধিকরণ-রচনামাত্র, নিয়ম-নির্ণয়দ্বারাও নির্ণয় করা হইয়াছে। কারণ, ইহাতেই ব্যাসমত নির্ণয়ের অধিক সম্ভাবনা আছে বোধ হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সূত্রপাঠাদি বিষয়গুলি আর নিয়ম-নির্ণয় দ্বারা তুলনা করা হয় নাই। উহা করিতে পারিলে আরও ভাল হইত। কিন্তু ইহাতেই একখানি পাঁচ সাত শত পৃষ্ঠার পুস্তক হইয়া গিয়াছে। উহার মুদ্রণের ব্যবস্থা এখনও করিতে পারি নাই।* সূত্রপাঠাদি নির্ণয়ের নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করিলে গ্রন্থকলেবর আরও বৃদ্ধি পাইবে,

* এই গ্রন্থখানি প্রথমে বঙ্গভাষায় রচিত হয়, পরে সন্ন্যাসিবৃন্দের অনুরোধে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছে এবং চারিটি পাদে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম পাদটি ভূমিকা। ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের রচনাকৌশল, ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, সূত্রকার-পরিচয়, সূত্রকারের সময় প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এবং ইহা মুদ্রিতও হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে অধিক-সম্মতি দ্বারা ব্যাসাভিমত ভাষ্য নির্ণয়, তৃতীয় পাদে অধিকরণ-রচনার অধিকসম্মত নিয়ম আবিষ্কার, এবং তাহার দ্বারা তুলনা, ব্রহ্মসূত্রের শব্দকোষ, নিয়ম পরীক্ষা প্রভৃতি, এবং চতুর্থ পাদে সম্প্রদায় বিচারদ্বারা তুলনা এবং সাম্প্রদায়িক মত বিচার করা হইয়াছে।

এই ভয়ে উহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। যাহা হউক, যে ব্রহ্মসূত্রের এত আদর, এত অধিক প্রামাণ্য যে, সকল সম্প্রদায়ই ইহার উপর ভাষ্য-টীকাদি করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মসূত্রের পাঠ এবং অধিকরণ নির্ণয়ে যথোচিত চেষ্টা যে হয় নাই, ইহাতে কোন সন্দেহই নাই। এক সময়ে মহামতি বাচস্পতি মিশ্র মহোদয় ন্যায়সূত্রের পাঠের জন্য, তাহার অক্ষর-সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিয়া 'ন্যায়সূচিনিবন্ধ' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও বেদান্তাচার্য্য বা বেদান্তের কোন ভাষ্যটীকাকারই এই ব্রহ্মসূত্রের জন্য সেরূপ পরিশ্রম করেন নাই। কোনও ভাষ্যকারই স্বমতের সূত্রার্থ সুদৃঢ় করিবার জন্যও পরমতের সূত্রার্থ এবং অধিকরণ রচনা প্রভৃতি প্রায়ই খণ্ডন করেন নাই। যাহাও করিয়াছেন, তাহা অতি অল্পই। যথোচিতভাবে খণ্ডন ত দূরের কথা, যাহা কিছু খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা মতবাদ লইয়াই খণ্ডন। তাহাতেই তাঁহাদের কৃতিত্ব অত্যধিক। যে অধিকরণ বিচার দ্বারা ব্যাসমতের সূত্রার্থ জানিবার অধিক সুযোগ, তাহাই উপেক্ষিত। আর শাঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন ভাষ্যই পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন সূত্রার্থ বা অধিকরণ-বিচারের কোন গ্রন্থও পাওয়া যায় না। তথাপি শাঙ্কর ভাষ্যের প্রথম প্রতিবাদ ভাস্করভাষ্যেই দেখা যায়। কিন্তু সে মতেও কোন অধিকরণ-বিচারের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, ইহার পর রামানুজভাষ্যের সময়, প্রথম অধিকরণ-বিচারের গ্রন্থ রচিত হয়। ইহা তাঁহার 'বেদান্তদীপ' নামক গ্রন্থ। ইহাতেও পরমত বিচার নাই। ইহার পর শাঙ্কর সম্প্রদায়ের ভারতীতীর্থ ও অমলানন্দের অধিকরণমালা ও শাস্ত্রদর্পণের জন্ম দেখা যায়। কিন্তু ইহাতেও স্বমতে অধিকরণের রূপমাত্র বর্ণিত হইয়াছে। পরমতের অধিকরণের খণ্ডন নাই। ইহার পর বেঙ্কটনাথের অধিকরণসারাবলী এবং অতি অল্প দিন পূর্ব্বে সুদর্শনাচার্য্যের অধিকরণমালা রচিত হয়। কিন্তু ইহাতেও স্বমতমাত্র বর্ণিত, পরমতের অধিকরণ-রচনার দোষ প্রদর্শিত হয় নাই। রামানুজীয় বেদান্তদীপের বহু পরে মাধ্বমতের অধিকরণমালার জন্ম; তাহাও তদ্রূপ। নিম্বার্কমতের অধিকরণমালার সন্ধান পাওয়াই যায় নাই। অন্য মতেও প্রায় তদ্রূপ। এইরূপে দেখা যায়, যে অধিকরণ-বিচার দ্বারা ব্যাসসম্মত ভাষ্য নির্ণয়ের সম্ভাবনা আছে, সেই বিষয়টিই উপেক্ষিত। বোধ হয়, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি বলিতেন—সূত্র ও অধিকরণ-রচনার কোন ব্যাকরণবিশেষ ছিল, বহুকাল হইতে তাহা বিস্মৃত। এই জন্যই ব্রহ্মসূত্রার্থ-নির্ণয়ে এত মতভেদ ঘটিয়াছে। ফলতঃ পরমতের অধিকরণ খণ্ডন করিয়া, অর্থাৎ কোথায় অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত এবং কোথায় তাহা অনুচিত ইত্যাদি বিচার করিয়া অধিকরণ বিচার, যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, কেহই করেন নাই। অথচ এই অধিকরণ-বিচারেই ব্যাসাভিমত সূত্রার্থ নির্ণয়ে যত সুবিধা, এত আর সূত্রার্থবিচারে বা "মত" বিচারে নাই, যেহেতু অধিকরণ-রচনার একটা নিয়ম পাওয়া যায়। ইহাতে তর্ক বিচারের অবসর অল্প। এ স্থলে সূত্রের আকার মাত্র দেখিয়া অধিকরণ-নির্ণয়ের জন্য যে নিয়মগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেই উপরি উক্ত নিয়মসাপেক্ষ ফললাভ হইয়াছে।

বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়

(৫) ব্রাহ্মণ-রচনাকাল

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদ 'ত্রয়ীবিদ্যা' নামে খ্যাত ছিল। এই তিনের মধ্যে ঋগ্‌বেদ প্রাচীনতম। তাহা হইতে যজুঃ ও সাম বেদের উৎপত্তি। পূর্বে দেখা গিয়াছে, খ্রি-পূ ২৫০০ অব্দের কালে যজুঃ ও সামবেদ প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদের পরে অথর্ব-বেদ। কত বৎসর পরে তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহার শেষের দিকে নক্ষত্রীয় সূক্ত আছে। নক্ষত্রদিগের বিশেষণ চিন্তা করিলে সূক্তটি খ্রি-পূ ১৮০০ অব্দের নিকটবর্তী কালের মনে হয়। অতএব খ্রি-পূ ২৫০০ হইতে খ্রি-পূ ১৮০০ অব্দের মধ্যে অথর্ববেদ প্রণীত হইয়াছিল। স্থূলতঃ খ্রি-পূ ২০০০ অব্দ ধরা যাইতে পারে। বোধ হয় 'ত্রয়ীবিদ্যা'র পরবর্তী কালের প্রণীত বলিয়া অথর্ববেদ বহুকালযাবৎ চতুর্থবেদ গণ্য হয় নাই।

যজ্ঞার্থে বেদের মন্ত্র উচ্চারিত হইত। কোন্ যজ্ঞে কোন্ মন্ত্র প্রযোজ্য এবং কেন সে মন্ত্র প্রযোজ্য, তাহা ব্রাহ্মণগ্রন্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগ্রন্থ-প্রণয়নের পর প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। মন্ত্রাত্মক ভাগ সংহিতা, প্রয়োগাত্মক ভাগ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হইতে আরণ্যক ও উপনিষদের উৎপত্তি।

যজুর্বেদের কাল-নির্ণয় প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে, তাহাতে ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। যজুর্বেদের পূর্বে এই দিনে হেমন্ত বৎসর আরম্ভ হইত। সেদিন রবির উত্তরায়ণ আরম্ভ। অতএব রবি ২৭০° অংশে আসিতেন। কিন্তু যজুর্বেদের কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিনে ৩০০° অংশে আসিতেন। বৈষুব ঋতু-গণনায় সেদিন বসন্তেরও আরম্ভ। ব্রাহ্মণগ্রন্থেও বৈষুব ঋতুগণনা অনুসৃত হইয়াছে এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। যজুর্বেদে অদৃশ্য গণিত ফাল্গুনী, ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃশ্য ফাল্গুনী। ইহাকে ধরিয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থের কাল অনুমান করা যাইতেছে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত। এই ব্রাহ্মণে মাস পূর্ণিমান্ত এবং বসন্ত প্রথম ঋতু। কিন্তু ইহাতে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা কোন নক্ষত্রের নাম নাই। এই হেতু ইহার কাল-নির্ণয় অসম্ভব। ইহার প্রথম কয়েক অধ্যায় প্রাচীন। স্পষ্ট বুঝা যায় পরবর্তী অধ্যায় পরে যোজিত হইয়াছে।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণও ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত। ইহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রাচীন অংশের পরে প্রণীত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয়ের দ্বিতীয় উপায় আছে। তাহা পরে লিখিতেছি।

কৃষ্ণ যজুর্বেদের নাম তৈত্তিরীয় সংহিতা। ইহার ব্রাহ্মণের নাম তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। শুক্ল যজুর্বেদের নাম বাজসনেয়ী সংহিতা। ইহার ব্রাহ্মণের নাম শতপথ ব্রাহ্মণ। সামবেদের ব্রাহ্মণের নাম তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। অপর নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। অথর্ববেদের ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ। এই পাঁচ ব্রাহ্মণেই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলা হইয়াছে। যাঁহারা চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের নাম 'সাম্বৎসরিক' ছিল। তাঁহারাই ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে সম্বৎসরের মুখ বলিতেন।

কোন কোন ব্রাহ্মণে দৃশ্য ফাল্গুনী পূর্ণিমাকে বসন্তের মুখ বলা হইয়াছে। সূর্য কত অংশে আসিলে এই বসন্ত হইত? ৩৬০° অংশ হইতে পারে না। কারণ এই অবস্থা এখনও আসে নাই। সূর্য ৩৩০° অংশে আসিলেও এই বসন্ত আরম্ভ হইতে পারিত না। কেননা তদ্দ্বারা ব্রাহ্মণগ্রন্থকে খ্রিষ্টের পরবর্তী কালে আনিতে হয়। অতএব যখন সূর্য ৩০০° অংশে আসিতেন, তখন বসন্ত আরম্ভ হইত। যজুর্বেদেও তাই। ৩০০° অংশে সূর্যের স্থিতিকালে পূর্ণিমা হইলে চন্দ্রকে ৩০০°—১৮০°=১২০° অংশে থাকিতেই হইবে। অতএব দৃশ্য ফল্গুনী নক্ষত্রও এত অংশে থাকিত। যজুর্বেদে গণিত ফল্গুনী নক্ষত্র, দৃশ্য ফল্গুনী নহে। তৎকালে দৃশ্য উত্তর ফল্গুনী প্রায় ১০১° অংশে ছিল, ১২০° অংশে নয়।

ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি। পূর্ব ফল্গুনী ও উত্তর ফল্গুনী। উভয় ফল্গুনীতে দুই তারা। সে দুই তারা প্রায় উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত। দুইটি ফল্গুনী যেন যমল বৃক্ষ। চারিটিতে
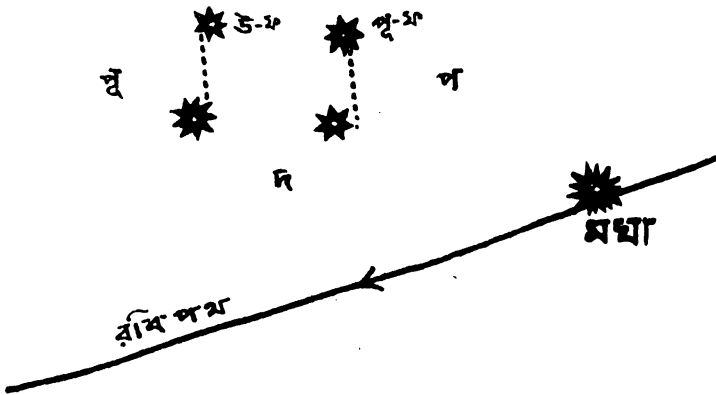
খট্বারূপ কল্পিত হইয়াছিল। (চিত্র পশ্য)। চন্দ্র যমলবৃক্ষাকার ফল্গুনীদ্বয়কে ভেদ করে না। নিকটবর্তী হইলেও প্রায় ৫° অংশ দক্ষিণে থাকিয়া গমন করে। অতএব যদি বলি চন্দ্র ফল্গুনী নক্ষত্রে আছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বৃক্ষদ্বয়ের সমসূত্রে আছে। ধ্রুব-বিন্দু ও কোন তারা একসূত্র দ্বারা বদ্ধ করিলে সে তারা সমসূত্রে অবস্থিত। ফল্গুনী পূর্ণিমা সেই রাত্রি, যে রাত্রি পূর্ব ফল্গুনীর কিংবা উত্তর ফল্গুনীর সমসূত্রে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ-

গ্রন্থে এই অর্থ স্পষ্ট আছে। যথা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।২।৮) এবং গোপথ ব্রাহ্মণ (১।১৯) বলিতেছেন,—উত্তর ফল্গুনীতে পূর্ণিমা সম্বৎসরের মুখ, এবং পূর্ব ফল্গুনীতে পূর্ণিমা সম্বৎসরের অন্ত। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ (৪।৪) আরও স্পষ্ট। ইহাতে প্রত্যেক ফল্গুনীতে দুই তারার উল্লেখ আছে। অতএব বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক নক্ষত্রের সমসূত্রে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রের নাম 'রাকা'। তৎপূর্বসন্ধ্যার প্রায় পূর্ণচন্দ্রের নাম 'অনুমতি'। উত্তর ফল্গুনীতে রাকা, এবং পূর্বসন্ধ্যাকালে অনুমতি দৃষ্ট হইয়াছিল।

কোন্ কালে এইরূপ ঘটিয়াছিল? গণিত দ্বারা দেখিতেছি, খ্রি-পূ ১৮৪১ অব্দে উত্তর ফল্গুনীর দুই তারার সমসূত্র ১২০°২৪´ অংশাদিতে এবং পূর্ব ফল্গুনীর দুই তারার সমসূত্র ১১১° অংশে ছিল। অতএব উত্তর ফল্গুনীতে পূর্ণচন্দ্র ১২০°২৪´ অংশাদিতে ছিল। ১২০° পরিবর্তে ১২০°২৪´ পাইতেছি। এই অন্তর গ্রাহ্য নয়। তৎপূর্বদিন সূর্যাস্তকালে চন্দ্র পূর্বফল্গুনীর সূত্র হইতে প্রায় ৪° অংশ দূরে ছিল। দুই সূত্রের মধ্যে ৯° অংশ অন্তর। এক দিনে চন্দ্র ১৩° অংশ অতিক্রম করে। অতএব পরে পরে দুই সূর্যাস্তকালে চন্দ্র দুই ফল্গুনীর সমসূত্রে আসিতে পারিত না। এই গণিত-ফল হইতে বুঝিতেছি, খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের পূর্বে দৃশ্য উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিন বসন্ত আরম্ভ হইতে পারিত না। উক্ত অব্দের পরে উত্তর ফল্গুনীর ধ্রুবসূত্র ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরিয়া গিয়াছে। যথা, খ্রি-পূ ১৪৪০ অব্দে ইহা ১২৬°৩০´ অংশাদিতে আসিয়াছিল। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রকেও অত অংশাদিতে আসিতে হইত। কিন্তু তখন সূর্য ১২৬°৩০´+১৮০° = ৩০৬°৩০´ অংশাদিতে থাকিত, ৩০০° অংশে নয়। নক্ষত্রের সমসূত্রে চন্দ্র-দর্শনে ৩° অংশ ভ্রম স্বীকার করা যাইতে পারে। ৩° অংশের অর্থ উত্তর ফল্গুনীর ধ্রুবসূত্র হইতে ছয়টি চন্দ্রবিম্ব দূরে চন্দ্র ছিল। নক্ষত্র-দর্শকেরা স্বকর্মে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। নচেৎ দুই ফল্গুনী ধরিয়া সম্বৎসরের আরম্ভ ও অন্ত বলিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের পক্ষে ৩° অংশের অধিক ভ্রম সম্ভবপর বোধ হয় না। অতএব দেখিতেছি, খ্রি-পূ ১৮৫০ হইতে খ্রি-পূ ১৬৫০ অব্দের মধ্যে ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণ কিছু পরে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে আছে (৬।২।১৮), "ফল্গুনী পূর্ণিমা সম্বৎসরের প্রথমা রাত্রি। উত্তর ফল্গুনীতে পূর্ণিমা উত্তমা রাত্রি। কিন্তু পূর্ব ফল্গুনীতে পূর্ণিমায় বৎসর আরম্ভ হয়।" ইহা হইতে অনুমান হয়, দুই ফল্গুনীর সূত্রের মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্র দৃষ্ট হইলে বৎসর আরম্ভ হইত। ইহা হইতে খ্রি-পূ ১৭০০ অব্দ পাইতেছি। ভ্রম ৩° অংশ হইয়া থাকিলে খ্রি-পূ ১৬০০ অব্দ শতপথ ব্রাহ্মণ-রচনাকাল আসিতেছে।

সামবেদের ব্রাহ্মণের নাম তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ। অপর নাম পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। ইহাতে বসন্তের আরম্ভদিন স্পষ্ট লিখিত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে (৪।৯।৭) 'ফাল্গুন' এই মাসনাম আছে। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ইত্যাদি মাসনাম খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের পরে প্রচলিত হইয়াছে, পূর্বে হয় নাই। বস্তুতঃ যে যে বৈদিক গ্রন্থে নক্ষত্রের বিশেষণ মাসনাম আছে, সে সে গ্রন্থ উক্ত অব্দের পরে প্রণীত হইয়াছিল।

অবশ্য বর্ষে বর্ষে ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইত না, হয় না। খ্রি-পূ ১৮৪১ অব্দের পরের বৎসর খুজিলে খ্রি-পূ ১৮২৭ অব্দে এইরূপ ঘটনা প্রথম পাই। সে বৎসর ৮ জানুআরি মাঘী পূর্ণিমায় দক্ষিণায়নান্ত হইয়া ৭ ফেব্রুআরি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রবি ৩০০° অংশে আসিয়াছিলেন, বসন্তের আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রি-পূ ১৮২৭ অব্দের অপর এক বিশেষ ঘটিয়াছিল। এই অব্দ পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের প্রথম বর্ষ সম্বৎসরও বটে। এই বিশেষ খুজিলে দুই শত বৎসরের মধ্যে অল্প অব্দ পাওয়া যাইবে।

এই বিচার হইতে জানিতেছি, উল্লিখিত পাঁচ ব্রাহ্মণগ্রন্থ খ্রি-পূ ১৮২৭ হইতে ১৬০০ অব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ

সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ নামে ঋগ্‌বেদের আর এক ব্রাহ্মণ আছে। ইহাকে কেহ কেহ সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের নামান্তর মনে করিতেন। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয়ের আর এক উপজীব্য আছে। ইহাতে (১৯।২) সম্বৎসর-সত্রের আরম্ভদিন বর্ণিত হইয়াছে। যথা, "তাঁহারা পৌষ অমার এক দিন পরে দীক্ষিত হইবেন, অথবা মাঘ অমার এক দিন পরে। প্রথম ব্যবস্থা অধিক প্রচলিত। তদ্দ্বারা তাঁহারা ত্রয়োদশ মাস পাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ বৎসরটিতে ত্রয়োদশ মাস আছে। সূর্য মাঘ অমায় স্থির থাকিয়া উত্তরাভিমুখ হন। তখন তাঁহাকে প্রথম বার পাওয়া যায়। ছয় মাস পরে বিষুবন্ত দিনে তিনি স্থির হন। তাঁহাকে দ্বিতীয় বার পাওয়া যায়। তখন তিনি দক্ষিণাভিমুখ হন। ছয় মাস পরে 'মহাব্রত' দিবসে তাঁহাকে তৃতীয় বার পাওয়া যায়। এইরূপে সূর্যের তিন স্থান হইতে বৎসর নির্ণীত হয়। * * * তাঁহারা সে সময়ে দীক্ষিত হইবেন না। কারণ, সে সময়ে শস্য সংগৃহীত হয় না। সে সময়ে অত্যন্ত শীত। তাঁহারা স্নানের সময় কাঁপিতে থাকেন। তাঁহারা চৈত্র অমার পরদিন দীক্ষিত হইবেন।" ইত্যাদি।

এই বিবৃতি হইতে বৈদিক কালের যজ্ঞক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। ঋষিগণ নবমাসব্যাপী, দশমাসব্যাপী, দ্বাদশমাসব্যাপী সত্র করিতেন। ব্যাপারটি সামান্য নয়। এত দীর্ঘকালব্যাপী সত্রের কি প্রয়োজন হইয়াছিল? তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ পরীক্ষণ দ্বারা রবির উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন দিন নিরূপিত হইত। যে-সে বৎসর এই সকল দীর্ঘকালব্যাপী সত্র অনুষ্ঠিত হইত না। গৃহস্থেরা প্রাণধারণের নিমিত্ত কৃষিকর্ম করিতেন। তাঁহাদের হিতার্থে ঋষিগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা বৎসরের ঋতু-আরম্ভ ঘোষণা করিতেন। এই কারণে এইরূপ সত্রের অনুষ্ঠান পুণ্যকর্ম বিবেচিত হইত। গণিতসিদ্ধ শুদ্ধ পঞ্জিকা ছিল না। কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর অয়ন-পরিবর্তন-দিন নির্ণয় করিতে হইত।

উক্ত বিবৃতিতে লিখিত আছে, বৎসরের মধ্যে সূর্যের তিনটি স্থান জানিতে পারা যাইবে। অয়নান্ত স্থানে সূর্য স্থির থাকেন। প্রথম বার উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে, দ্বিতীয় বার দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনে, তৃতীয় বার পুনশ্চ উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে সূর্যের উদয়ের স্থান দেখা হইত। উন্মুক্ত স্থানে খুঁটি পুতিয়া পূর্ব পশ্চিমে বিন্দু চিহ্নিত করা হইত। যজন-শালার নামই প্রাগ্‌বংশ হইয়াছিল। প্রত্যহ দেখিতে থাকিলে কোন্ দিন সূর্য স্থির হইয়াছেন, তাহা অক্লেশে বলিতে পারা যায়।

যে বৎসরে সম্বৎসর-সত্র আরম্ভের কথা আছে, সে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস ছিল। এই অতিরিক্ত ত্রয়োদশ মাসটি কোথায় ধরা হইবে? আমরা এই অতিরিক্ত মাস অর্থাৎ মলমাস উৎপন্ন হইলেই গণনা করি। কভু বৈশাখ দুইটি, কভু জ্যৈষ্ঠ, কভু আষাঢ়, ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মণ-রচনাকালে এই বিধি ছিল না। কোন্ বৎসরে ত্রয়োদশ মাস, তাহা জানা ছিল। দেখিতেছি, উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে বৎসর আরম্ভ হইত এবং সে সময়ে অতিরিক্ত মাসটি ধরা হইত। (ঋগ্‌বেদে কিন্তু দক্ষিণায়ন-আরম্ভ-দিনে ত্রয়োদশ মাসটি ধরা হইত। তখন বরুণের আধিপত্য। ঋগ্‌বেদে আছে, বরুণ ত্রয়োদশ মাস জানেন। সবিতা নহেন। সবিতা উত্তরায়ণ-আরম্ভকালের অধিপতি।) বৎসর আরম্ভে অতিরিক্ত মাসটি ফেলা হইত বলিয়া পৌষ অমার পরদিন দীক্ষা বিহিত হইয়াছিল। এই মাস ধরিতে না হইলে মাঘী অমার পরদিন (অর্থাৎ ফাল্গুন শুক্লপ্রতিপৎ) বৎসর আরম্ভ হইত। বাস্তবিক মাঘী অমার পরদিন আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, ইহার পূর্বদিন সূর্য স্থির ছিলেন। সে দিন মাঘী অমাবস্যা। এই দিবসের তিন মাস পরে মাসে মাসে এক তিথি বৃদ্ধি ধরিয়া বৈশাখ অমার দুই দিন পরে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়ায় বাসন্ত বিষুবৎ-দিন, এবং চৈত্র অমার পরদিন, অর্থাৎ বৈশাখ শুক্ল প্রতিপদে সাধারণ চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হইত। এই কারণে এই দিনটি দীক্ষা গ্রহণে প্রশস্ত বিবেচিত হইয়াছে। এই ঐক্য দ্বারা বুঝিতেছি, মাঘী অমার আরম্ভে অয়নান্ত হইত। পৌষ অমায় হইলে বৈশাখ শুক্ল দ্বিতীয়ায় সাধারণ চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হইত।

এক্ষণে উক্ত ব্রাহ্মণের রচনাকাল চিন্তা করি। প্রথমতঃ ইহাতে তৈষ (পৌষ), মাঘ, চৈত্র, এই এই মাসনাম আছে। অতএব ব্রাহ্মণখানি খ্রি-পূ ১৮৫০ অব্দের পরে প্রণীত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই ব্রাহ্মণে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিন বসন্তের আরম্ভ। অতএব ব্রাহ্মণখানি খ্রি-পূ ১৮৫০ হইতে ১৬০০ অব্দের মধ্যে প্রণীত হইয়াছিল।

হেমন্ত বৎসরে অর্থাৎ উত্তরায়ণ হইতে উত্তরায়ণ পর্যন্ত বৎসরে উত্তরায়ণ-আরম্ভ-দিনে সম্বৎসর-সত্রে দীক্ষিত হইবার ব্যবস্থা ছিল। যজুর্বেদের কাল-নির্ণয়-প্রবন্ধে দেখিয়াছি, মাঘী কৃষ্ণাষ্টমীতে হেমন্ত বৎসর আরম্ভ হইত। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেও সেই ব্যবস্থা বটে, কিন্তু দুই কালের। সে বৎসরে এক মাস অধিক হইত না। সে মাস কোথায় গণ্য হইবে, সে প্রশ্নও উঠিত না। কিন্তু সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণে দীক্ষিত হইবার হেমন্ত বৎসরে এক মাস অধিক হইত। ইহার কারণ এই,—মাঘী অমায় যে বৎসরের আরম্ভ,

সে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস ঘটিয়া থাকে। মাসগুলি স্পষ্টতঃ অমান্ত। মাঘী কৃষ্ণচতুর্দশী (পূর্ণিমান্ত ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দশী) শিবরাত্রির মাহাত্ম্যের কারণ পাওয়া গেল। এক কালে রাত্রিকালে মাঘী অমাবস্যা-আরম্ভে সূর্য অয়ন পরিবর্তন করিতেন। তখন চতুর্দ্দশীর অন্ত।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। সেকালে মাহেশ্বর যুগ প্রচলিত ছিল। তাহার গণিত শুদ্ধ। তাহার সাহায্যে গণিয়া একটি বৎসর পাইয়াছি। খ্রি-পূ ১৭১৭ অব্দে মাঘী অমার আরম্ভে (সূর্যাস্তকালে) অয়নান্ত হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বিতীয়া বিষুবৎ-দিন। অতএব বৈশাখ শুক্ল প্রতিপদে চান্দ্র বৎসর আরম্ভ। পর বৎসর ফাল্গুন শুক্ল একাদশীতে দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভ। মলমাসটি বর্তমান কালের ন্যায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে চৈত্র শুক্ল একাদশীতে অয়নান্ত হইত। বোধ হয়, চৈত্র মাসে আসিয়া পড়িতে হয় বলিয়া পৌষ অমা হইতে বৎসর ধরা হইয়াছিল। উক্ত অব্দের যোগটি আর ঘটে নাই। বোধ হয়, তাহাকে আদি ধরিয়া ১৯ বৎসর অন্তর অন্তর মাঘী অমায় দক্ষিণায়নান্তদিনে বৎসর আরম্ভ হইত। অর্থাৎ প্রতি বিংশ বৎসরে সম্বৎসর-সত্র অনুষ্ঠিত হইত। বিংশ বর্ষে পাঁচ বর্ষের ও চারি বর্ষের যুগও মিলিত হইত।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ ফাল্গুন মাস বসন্তের প্রথম মাস ধরিয়া ভুল বুঝিয়াছেন। ফাল্গুন পূর্ণিমায় বসন্ত আরম্ভ হইলে, ফাল্গুন নয় চৈত্র মাস বসন্তের প্রথম মাস হয়। ডক্টর থিব. সে ভুলের কর্তা। তিনি ব্রাহ্মণগ্রন্থকে আধুনিক কালে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রোফেসর মেকডোনেল ও কীথ কৌষীতকি (সাংখ্যায়ন) ব্রাহ্মণে মাঘী অমায় অয়নান্তের উল্লেখ পাইয়া হৃষ্ট হইয়াছেন। মনে করিয়াছেন, ইহার দ্বারা অন্ততঃ এই ব্রাহ্মণের কাল নিরূপিত হইয়া গেল! ভুলিয়াছেন, খ্রি-পূ ২৫০০ হইতে দুই সহস্র পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে মাঘী অমায় অয়নান্ত হইতে পারিত। ডক্টর থিব. মাঘী অমার এক অদ্ভুত ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কেহ অমান্ত মাস, কেহ পূর্ণিমান্ত মাস গণিতেন। যাঁহারা অমান্ত মাস গণিতেন, তাঁহারা পৌষ অমায় অয়নান্ত ধরিতেন। অপরের গণনায় সেদিন মাঘী অমা। অর্থাৎ অমান্ত পৌষ অমায় অয়নান্ত হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষেও পৌষ অমায় অয়নান্ত। অতএব কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ সমকালীন! এবং যেহেতু প্রোফেসরদিগের মতে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ খ্রি-পূ ৮০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল, সেহেতু কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ও অপরাপর ব্রাহ্মণের কালও সেই! এই যুক্তি আশ্চর্যজনক। কিন্তু তিন পণ্ডিতই কৌষীতকি ব্রাহ্মণের বৎসরের ত্রয়োদশ মাসটি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। অপিচ ভুলিয়াছেন, পৌষ অমায় অয়নান্ত হইলে সাধারণ বৎসর চৈত্র শুক্লা দ্বিতীয়াতে আরম্ভ হইত। কিন্তু মূলে আছে, বৈশাখ শুক্ল প্রতিপদ্। কেবল তিথি ধরিয়া কোন ঘটনার কাল নির্ণয় হইতে পারে না। এখনও পৌষ অমায় অয়নান্ত হইতেছে। প্রোফেসর মেকডোনেল ও

কীথ ডক্টর থিব. সাহেবের জল্পনায় বিশ্বাস করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। ডক্টর থিব. বৈদিক কৃষ্টির কাল-নির্ণয়ে যে যে জ্যোতিষিক প্রমাণ খণ্ডন করিতে গিয়াছেন, সে সে ক্ষেত্রেই ঋজুপথ ত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা পণ্ডিতদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। যজুর্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমকালীন ও খ্রি-পূ ৮০০ অব্দের কালে প্রণীত। ইহার চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ঋগ্‌বেদ। বৈদিক কৃষ্টির সীমা লঙ্ঘিত হইল না। কারণ, তাহাঁদের বিবেচনায় ঋগ্‌বেদ ইহার অধিক প্রাচীন হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রথমে এই প্রতিজ্ঞা, পরে তদনুরূপ ব্যাখ্যা। তাহাঁদের মত স্বীকার করিলে বলিতে হয়, সেকালের ঋষিগণ কেবল পুথী লিখিতেন, প্রতি শতবর্ষে এক একখানা বৈদিকগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। পুরাণবিৎ সুধাইতেছেন, কবে ভারত-যুদ্ধ হইল, কবেই বা রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, মান্ধাতা, ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি চির-খ্যাত রাজন্যবর্গ রাজ্য করিয়াছিলেন?

দ্রষ্টব্য :—এই সংখ্যায় প্রকাশিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" প্রবন্ধের ২৬৬ পৃষ্ঠায় শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির মৃত্যু-তারিখ "১৮৪২ সনের আগষ্ট (?)" এইরূপ দেওয়া হইয়াছে; উহা "১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর" হইবে।— General Report of the late General Committee of Public Instruction for 1840-41 and 1841-42, p. 126*n* দ্রষ্টব্য।

২৪৭ পৃষ্ঠায় যোগধ্যান মিশ্র-প্রকাশিত 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা'র প্রকাশকাল ভ্রমক্রমে "১৮৪০ সন" মুদ্রিত হইয়াছে; উহা ১৮৩৯ সাল হইবে। 'ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা' হটনের ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত।

২৫০ পৃষ্ঠায় মধুসূদন গুপ্তের রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজের পুরাতন কাগজপত্র-পাঠে আরও জানা গিয়াছে, তিনি সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক-শ্রেণীর জন্য হুপারের একখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এই অনুদিত গ্রন্থ যে ১৮৩৫ সালে মুদ্রিত হইতেছিল, তাহা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী—ট্রয়ারকে ১৬ জানুয়ারি ১৮৩৫ তারিখে লিখিত জন্ টাইটলার সাহেবের পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা হইবে :—

3. The Pandit of the class Modhusudan Gupta informs me that he is now engaged in the publication of a translation into Sanscrit of Hooper's *Anatomists' Vade-mecum*,...

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দোম আন্তোনিয়োর পুথিতে অশোক-যুগের ভাষা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, এম-এ, পিএইচ-ডি.

[১৯৩৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন-সম্পাদিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক' সংবাদ প্রকাশিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রোমান হরফে লিখিত এই বাংলা পুথিটি এত দিন পর্ত্তুগালে এভোরা নগরীর একটি পুথিশালায় পাণ্ডুলিপি আকারেই রক্ষিত ছিল। ডক্টর সেনই সর্ব্বপ্রথম ইহার অধিকাংশ নকল করিয়া আনিয়া প্রকাশ করেন। পুথিটি ভূষণার রাজপুত্র রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী দোম আন্তোনিয়োর লিখিত এবং বাংলা ভাষার মুদ্রিত গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র সমসাময়িক। ইহাও পূর্ব্ববঙ্গের প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত। বর্ত্তমান আলোচনায় ডক্টর সেন এই পুথির দুই একটি শব্দের সহিত অশোক-অনুশাসন-লিপির দুই একটি শব্দের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। আশা করি, ভাষা ও শব্দতাত্ত্বিকেরা এদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই সাদৃশ্যের কারণ নির্ণয় করিবেন।—পত্রিকাধ্যক্ষ, সা. প. প.]

যখন দোম আন্তোনিয়োর 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক-সংবাদ' প্রথম পাঠ করি, তখন কতকগুলি শব্দ লিপিকরপ্রমাদ বলিয়া মনে হইয়াছিল। মুদ্রিত পুস্তকের ৬, ৪১ ও ৫১ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে "প্রব জন্মিয়াছিলো" (Prob, পর্ত্তুগীজ ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী এই শব্দটির "প্রুব" পাঠও হইতে পারে), "প্রুবে কহিয়াছি," "তাহারা প্রোব্বে নৈরাকারে জানে" এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। এখনকার সাধুভাষায় "প্রুব", "প্রোবে" বা "প্রুবে" এবং "প্রোব্বে" স্থলে "পূর্ব্বে" প্রয়োগ হইবে। অথচ "পূর্ব্ব" শব্দ দোম আন্তোনিয়োর অপরিজ্ঞাত ছিল না; কারণ, তিনি এক জায়গায় (১৭ পৃষ্ঠায়) "অপূর্ব্ব" (opurbo) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং মনে হইয়াছে যে, হয়ত মূল পুথিতে এরূপ পাঠ ছিল না,—পূর্ব্ববঙ্গ-প্রবাসী পর্ত্তুগীজ পাদ্রীরা রোমান হরফে পুথি নকল করিতে গিয়া "পূর্ব" বা "পূর্ব্ব"কে "প্রুবে" পরিণত করিয়া থাকিবেন।

সম্প্রতি অশোকের অনুশাসনাবলী পাঠ করিয়া এই ধারণা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। অশোকের অনুশাসনগুলির বিশেষত্ব এই যে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য রচিত হওয়ায় বিভিন্ন প্রদেশে অশোক-অনুশাসনে একই শব্দের বিভিন্ন রূপের প্রয়োগ দেখা যায়। হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ববঙ্গের "পূর্ব্ব" শব্দের "প্রুব" রূপই প্রচলিত ছিল। অন্ততঃ অশোকের একাধিক অনুশাসনে "প্রুব" পাঠ পাওয়া যায়। যথা,

গিরনার-লিপির পঞ্চম অনুশাসনে—"ন ভূত প্রুবম্ ধংম মহামাতা নাম"

শাবাজগড়ী-লিপির চতুর্থ অনুশাসনে—"ন ভুতপ্রুবে তদিশে"

পঞ্চম অনুশাসনে—"নো ভুতপ্রুব ধংমম [হ] ম [ত্র] নম"

ষষ্ঠ অনুশাসনে—"ন ভুত প্রুবম্"

মানসেরা-লিপির চতুর্থ অনুশাসনে—"ন [হু] ত প্র [উ]বে তদিশে"

পঞ্চম অনুশাসনে—"ন ভূত প্রুব ধ্ম [ম] হমত্র নম"

ষষ্ঠ অনুশাসনে—"ন হুত প্রুবে"

গিরনার বর্ত্তমান কাথিয়াবাড়ে এবং শাবাজগড়ী ও মানসেরা বর্ত্তমান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি প্রদেশে অশোকের সময় "পূর্ব্ব" শব্দের "প্রুব" রূপ প্রচলিত ছিল, আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে লেখা বাঙ্গালী প্রচারকের গ্রন্থেও এইরূপই পাইতেছি। স্থান ও কালের ব্যবধান বিবেচনা করিলে ইহা বাস্তবিকই কৌতূহলের বিষয়; কারণ, অশোকের কালসী, জৌগড় ও ধৌলি লিপিতে এরূপ পাঠ পাওয়া যায় নাই। বাঙ্গালার সমীপবর্ত্তী কলিঙ্গের ধৌলি ও জৌগড়ে এইরূপ পাঠ পাইলে বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অস্তিত্ব ততটা বিস্ময়ের বিষয় হইত না। কিন্তু ধৌলি ও জৌগড়ে "প্রুবে"র পরিবর্ত্তে "পুলুবা" ও "পুলুবে" পাঠ পাওয়া যাইতেছে। যুক্ত-প্রদেশের অন্তর্গত কালসীতে ঐ "পুলুব" ও "পুলুবে" রূপই দেখিতে পাই।

কিন্তু জৌগড় ও ধৌলির ভাষার সহিত যে দোম আন্তোনিয়োর ভাষার কোথাও সাদৃশ্য নাই, তাহা নহে। আন্তোনিয়োর গ্রন্থে মনুষ্যবাচক "মুনিস" (৫, ৩৯) এবং "মুনিষ্যো" (৩, ৫, ৯, ৩৪, ৩৮, ৪১-২, ৪৭-৮, ৫১-৩, ৫৫-৬, ৬৭ পৃ.) একাধিক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে মনুষ্যের উকার ইকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং উকার আদ্যক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। ধৌলি ও জৌগড় লিপির ভাষার উচ্চারণ-রীতি আলোচনা প্রসঙ্গে হুলট্‌শ্ সাহেব (Hultzsch) লিখিয়াছেন, "It (the vowel *a*) becomes *u* after a labial in *munisa*." জৌগড় ও ধৌলির গিরিলিপিতে এবং দিল্লী তোপরার স্তম্ভলিপিতে "মুনিষা," "মুনিসানং," "মুনিসে," "মুনিসেসু" পাঠ দেখা যায় এবং "মনুষ্যোপযোগী" অর্থে "মুনিসোপগানি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

দোম আন্তোনিয়োর ব্যবহৃত বহু শব্দ ও বাক্য এখনও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁহার পুথি সম্পাদনকালে দুই-একটি বিভক্তি বর্ত্তমানে অপ্রচলিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। পুস্তকের প্রস্তাবনার ২৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলাম,—

তুলনা করিবার সময়ে আমরা এখন "হইতে" শব্দের ব্যবহার করি, ৪৫ ও ৪৬ পৃষ্ঠায় "হইতে"র পরিবর্ত্তে "করিতে" পাওয়া যায়; যথা—"তিনি কি প্রথিবীর রাজারে করিতেও অধোম", "আর আর যতো অবোতার করিয়াছো তাহারে করিতে কৃষ্ণো বিস্তর কার্য্যো করিয়াছেন অসম্ভব্য"।

তুলনাবাচক "হইতে" অর্থে নদীয়া জিলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও "করিতে" শব্দের ব্যবহার হয়। দোম আন্তোনিয়োর পুথির ভাষা আলোচনা করিলে মনে হয় যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম-বঙ্গের চলিত ভাষার মধ্যে এখন যত পার্থক্য জন্মিয়াছে, পূর্ব্বে হয়ত তত প্রভেদ ছিল না।

তন্ত্রে কৃষ্ণচরিত্র

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

অনেকের ধারণা—তন্ত্রে কেবল শক্তিপূজার কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু এ ধারণা আদৌ সত্য নহে। বিভিন্ন পুরুষ ও স্ত্রী-দেবতার উপাসনার প্রকার বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ, শাক্ত-তন্ত্রে যেরূপ শক্তিপূজার বিশদ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, বৈষ্ণব তন্ত্রে সেইরূপ বিষ্ণুপূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শাক্ত-তন্ত্রেও যে মাঝে মাঝে বৈষ্ণব দেবতার প্রসঙ্গ দেখিতে না পাওয়া যায়, এমন নহে। কোন কোন শাক্তগ্রন্থে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা সর্বথা প্রামাণিক না হইলেও কৌতুককর। এই সমস্ত বিবরণের মধ্যে তন্ত্রোক্ত চৈতন্যদেবের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থের অধ্যায়বিশেষ বলিয়া উল্লিখিত গ্রন্থাংশে চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে—তাঁহার আবির্ভাবকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং জীবনবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কৃষ্ণরাধা সম্বন্ধে রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহারই আভাস দেওয়া হইতেছে। একাধিক শাক্ত গ্রন্থে বিভিন্ন দেবতা ও মহাপুরুষকে শক্তির উপাসক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শাক্তদের মতে বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, লোপামুদ্রা, রাম লক্ষ্মণ, এমন কি, বুদ্ধদেব পর্যন্ত শক্তির উপাসক। কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও শক্তির উপাসক বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য বিস্তৃত গ্রন্থ রচিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের শাক্তত্বের উল্লেখ বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থে শক্তির উপাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনতিসংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা শাক্ত উপাসনার জীবন্ত চিত্র। রাধার সহিত মিলনেই শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সিদ্ধিলাভ হয়, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে রাধা ও কৃষ্ণের উপাসনার ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। ফলে, আপাততঃ বৈষ্ণব গ্রন্থ বলিয়া মনে হইলেও এই গ্রন্থখানি মূলতঃ শাক্তধর্মের রহস্যব্যাখ্যায়ই ব্যাপৃত। গ্রন্থখানির রচনার পারিপাট্য ও গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। কৃষ্ণের চরিত্র ইহাতে আদৌ লঘু বা হীন করা হয় নাই—পক্ষান্তরে উহার দেবভাব ইহাতে বিশদীকৃত হইয়াছে।

রাধাতন্ত্র গ্রন্থখানিকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাব ও ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। বাংলা দেশেই বোধ হয়, ইহার উৎপত্তি। অন্ততঃ বাংলা দেশেই ইহার প্রচলন। ইহার যে কয়টী সংস্করণ[১] এ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই

১। রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণ, স্থূলভতন্ত্রপ্রকাশ নামক তন্ত্রসংগ্রহে প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১২৯৪ সন), কামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায়-প্রকাশিত সংস্করণ (প্রথম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ; দ্বিতীয় মুদ্রণ—কলিকাতা, ১৩৪১), কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩১৩), সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য-প্রকাশিত সংস্করণ (কলিকাতা, ১৩২৪)।

বাংলা দেশ হইতে। ইহার হস্তলিখিত পুঁথি অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে লিখিত ও বাংলা দেশে প্রাপ্তব্য[২]। উত্তর-পশ্চিম-ভারতে ইহার কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায়[৩]। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে কোন কোন নিবন্ধগ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতে ইহার সময়ের একটা সীমা নির্ধারণ করা যায়। রাজকিশোরকৃত শক্তিরত্নাকর[৪] গ্রন্থে একাধিক বার রাধাতন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে এই গ্রন্থের তারিখ জানা নাই। ১৬৯৯ শকাব্দ বা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-বিরচিত শ্যামা-সপর্য্যাবিধি গ্রন্থের[৫] উপক্রমে গ্রন্থরচনার জন্য আলোচিত গ্রন্থসমূহের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাধাতন্ত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে এই মাত্র স্থির করা যায় যে, রাধাতন্ত্র ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। তাহা ছাড়া, এই দুই গ্রন্থে ইহার উল্লেখ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, রাধাতন্ত্র গ্রন্থখানি একেবারে অপ্রামাণিক বা তান্ত্রিকসমাজে অপ্রচলিত নহে। বৃহদ্‌রাধাতন্ত্র[৬] নামে যে একখানি গ্রন্থের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাও রাধাতন্ত্রের অল্পবিস্তর প্রসিদ্ধিরই সাক্ষ্য দেয় বলিয়া মনে হয়। রাধাতন্ত্র নামক গ্রন্থের প্রসিদ্ধিই এই নামের সহিত বৃহৎ শব্দ যোগ করিয়া অন্য গ্রন্থের নামকরণ করিবার কারণ হওয়া বিচিত্র নহে।

নিম্নে রসিক চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত ও সুলভ তন্ত্রপ্রকাশে প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বনে রাধাতন্ত্রোক্ত শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্তের সার সংকলিত হইতেছে :—

এই গ্রন্থের বিভিন্ন পুঁথিতে ও মুদ্রিত সংস্করণে পটল বা অধ্যায়ের সংখ্যায় বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত মুদ্রিত সংস্করণগুলির মধ্যে প্রথম দুইটীতে পটলসংখ্যা ৩২, তৃতীয়টীতে ৩৩।

২। Descriptive Catalogue of Sans. Mss. Royal Asiatic Soc. Bengal—৮।৬০০২-৩, Cat. Printed Books and Mss. As. Soc. Beng—পৃ: ২৬১, Descr. Cat. Sans. Coll. Mss.—৫।৭৬, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কৃত Notices Sans. Mss.—১।৩৮৩। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত পুঁথি দুইখানিতে যথাক্রমে প্রথম পাঁচটী অধ্যায় ও মাত্র ত্রয়োবিংশ অধ্যায়টী আছে।

৩। Catalogus Catalogorum—১।৫০৪

৪। অউফ্রেট কৃত বোডলিয়ন লাইব্রেরীর পুঁথির বিবরণ—পৃ: ১০১। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথির পূর্বোল্লিখিত বিবরণ—৮।৬২১৬। শেষোক্ত পুথির ৯ক পত্রে উদ্ধৃত একটী শ্লোক অষ্টাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পাওয়া যায়।

৫। বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটীর পূর্বোল্লিখিত বিবরণ—৮।৬৩০৩। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোন কোন পুঁথিতে ইহার রচনার তারিখের (১৬৯৯ শকাব্দ) স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও পরবর্তী কালে (১৭০০শকাব্দে) রচিত কৌলিকার্চনদীপিকার উল্লেখ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুই গ্রন্থের মধ্যে যে কোন একটীর তারিখ ভুল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

৬। Catalogus Catalogorum—১।৫০৪

অপর দুইটী সংস্করণ দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। প্রথম দুইটী সংস্করণে তৃতীয়টীর ও সোসাইটীর পুথিগুলির ৭ম ও ৮ম, এই দুইটী পটলই ৭ম পটল নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য উনবিংশ পটলের পরবর্ত্তী পটলের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ২১। তাহা ছাড়া, এই দুই সংস্করণে পর পর দুইটী পটলের সংখ্যা ৩২। সোসাইটীর পুথিগুলিতে ছাপার ২৯শ পটল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ২৯শ ও ৩০শ রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ৬০০২ সংখ্যক পুথিতে ৩২শ পটলের পর পুনরায় ৩১ হইতে পটলসংখ্যা আরম্ভ করার জন্য ও ৬০০৩ পুথিতে ৩৩শ সংখ্যাটীর একাধিক বার পুনরাবৃত্তির জন্য এই দুই পুথিতে মোট পটলসংখ্যা ৩৫ ও অপর দুইখানিতে ৩৭।

মোটের উপর, পুথিগুলির শেষ তিনটী পটল আমার দেখা মুদ্রিত তিনটী সংস্করণের মধ্যে কোনটাতেই নাই। ইহাদের মধ্যে প্রথম পটলে লীলাবসানে পদ্মিনী প্রভৃতির অন্তর্ধানের কথা বলা হইয়াছে। পদ্মিনী ত্রিপুরাপদে লীন হইলেন—চন্দ্রাক্ষী প্রভৃতি ত্রিপুরা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে প্রদত্ত মালার মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। শেষ দুই পটলের বিষয়—সতীর কেশ হইতে ব্রজমণ্ডলের উৎপত্তির বিবরণ, উহার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ, ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাসঙ্গিনীগণের স্থান নির্দ্দেশ ও কৃষ্ণদেহে বিভিন্ন স্ত্রীদেবতার অবস্থান নিরূপণ।

মহাদেব একবার জিজ্ঞাসু শরণাগত বাসুদেবকে ত্রিপুরসুন্দরী ভজনা করিবার উপদেশ দিলে বাসুদেব কাশীপুরে যাইয়া তাঁহার আরাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল সাধনা করিয়াও তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেন না (পটল ১)। অবশেষে দেবী তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইবে না— মদংশসম্ভূতা লক্ষ্মী দেবীকে ত্যাগ করিয়া তুমি বৃথাই তপস্যা করিতেছ (পটল ২)। তবে তোমার আশঙ্কার কোনও কারণ নাই। তুমি এই সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী কলাবতী মালা ধারণ কর (পটল ৩)। তুমি মথুরায় যাইয়া রাধারূপে অবতীর্ণ আমার দূতী পদ্মিনীর সঙ্গ কর।' পদ্মিনীও তখন আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—'হে মহাবাহো, তুমি সত্বর ব্রজে গমন কর। তোমার সহিত আমি কুলাচার অনুষ্ঠান করিব। তোমার অগ্রেই বৃকভানুর গৃহে আমার জন্ম হইবে (পটল ৬)।' চৈত্র মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে যমুনা নদীর জলে পদ্মমধ্যে উজ্জল ডিম্বাকারে পদ্মিনী আবির্ভূত হইলেন। মহাকালীর উপাসক বৃকভানু কাত্যায়নী দেবীর নিকট কাত্যায়নীসদৃশী কন্যা কামনা করিলে দেবী তাঁহাকে সেই ডিম্ব দান করিলেন। বৃকভানুপত্নী কীর্ত্তিদা দেবী হাতে লইয়া সেই ডিম্ব দেখিতেছিলেন—সহসা তাহা দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং রক্তবিদ্যুল্লতাকারা কৃষ্ণমোহিনী পদ্মিনী আবির্ভূত হইলেন। কীর্ত্তিদা তাঁহাকে স্তন্য পান করাইলেন— রক্তবিদ্যুতের প্রভা ধারণ করেন বলিয়া বৃকভানু তাঁহার নাম রাখিলেন 'রাধা'। ইহার পর ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন।

শিশুকাল হইতেই রাধা শক্তির উপাসনা আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহার দেহ হইতে তাঁহারই তুল্যাকৃতি আর এক রাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় রাধিকাই অতিমন্যু

বা অভিমন্যুর স্ত্রী (পটল ৭)।[৭] তাঁহার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাত্যায়নী তাঁহাকে বর দিয়া বলিলেন,—'হেমন্ত কালে পূর্ণিমা তিথিতে বাসুদেবের সহিত তোমার মিলন হইবে। তোমার সঙ্গ ব্যতীত তিনি কোনও কার্য করিতে পারিবেন না—আর তোমার সঙ্গ লাভের ফলেই তাঁহার কৈবল্য লাভ হইবে (পটল ১৮)।'

অতঃপর তন্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে রাধার সহিত কৃষ্ণ কুলাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।[৮] তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া দেবী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও বলিলেন,—'কলিকালে ভারতবর্ষে তোমার কীর্ত্তি প্রচারিত হইবে—তোমার গুণকীর্ত্তন প্রচলিত হইবে (পটল ২১)।'

দেবী তখন পদ্মিনীকে বলিলেন,—'কালীয়দমন প্রভৃতি কৃষ্ণের যত কিছু কীর্তি, সকলই কালিকার প্রসাদে। দৃশ্যাদৃশ্য যাহা কিছু, সকলই মহামায়ার স্বরূপ। শক্তি ব্যতীত এ জগতে কিছুরই অস্তিত্ব নাই। মহাবিদ্যার উপাসনা করিয়াই রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করা কর্তব্য—অন্যথা সে উপাসনা নিষ্ফল (পটল ২২)।'

ত্রয়োবিংশ পটল হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি পটলে তরিখণ্ড বা নৌকাখণ্ডের এক কৌতুককর তান্ত্রিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এক রাত্রিতে পদ্মিনীর সহিত কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখিলেন—কালিকা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন,—'বৎস, আমি তিন রাত্রি নৌকারূপে যমুনামধ্যে অবস্থান করিব। তুমি সেই নৌকায় রাধার সহিত ক্রীড়া ও জপ করিলে পরম সুখ লাভ করিবে।' শ্রীকৃষ্ণও সত্বর নৌকার নিকট গমন করিয়া নমস্কার করিলেন। পরে, তাহাতে আরোহণ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিশেষে তিনি কালীরূপিণী বংশী বাজাইতে লাগিলেন। এই সময়ে গব্য বিক্রয়ের ছলে

৭। ৮ম-১৭শ পটলে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য ও শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের রহস্য কীর্তিত হইয়াছে। বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যের বিবরণ পরবর্তী পাদটীকায় দ্রষ্টব্য। নির্গুণ হরি প্রকৃতিরূপী বিগ্রহের সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছেন। (শরীরং হি মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরি—৯ম পটল ; কৃষ্ণস্য শ্যামদেহস্তু স্বয়ং কালী মহেশ্বরি—১৫শ পটল ; নির্গুণঃ সততং বিষ্ণুর্গুণস্তু প্রকৃতিঃ পরা। ততস্তু সগুণো বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাঃ সঙ্গমাশ্রিতঃ। বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। এতদ্ধি ভূষণং দেবি বিগ্রহঃ প্রকৃতেঃ সদা—১৭শ পটল)।

৮। মথুরা ও বৃন্দাবন বা ব্রজমণ্ডল তাঁহার সাধনার সম্পূর্ণ অনুকূল স্থান। বৃন্দাবন কেশপীঠ বা সতীর কেশ হইতে সমুদ্ভূত (সতীকেশাৎ সমুদ্ভূতং পূর্ণপ্রেমসুখাশ্রয়ম্—১৩ পটল, তব কেশসমূহেন নির্মিতং ব্রজমণ্ডলম্—২১ পটল)। মথুরা সহস্রপত্রকমলাকারা শক্তিচক্রোপরি অবস্থিত (সহস্রপত্র-কমলাকারং মাথুরমণ্ডলম্। শক্তিচক্রোপরি শ্রীমদ্ধাম বৈষ্ণবমদ্ভুতম্—পটল ১০)। ব্রজভূমিতে দেবী সর্বদা অধিষ্ঠিত—এখানকার তমাল বৃক্ষ স্বয়ং কালী এবং কদম্ব ত্রিপুরা (যত্র কালী মহামায়া মহাকালী সদা স্থিতা। তত্র বৃক্ষো মহেশানি স্বয়ং কালী তমালকম্। কদম্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ব্রজমণ্ডলে।—পটল ২১)। ৯ম-১১শ পটলেও বৃন্দাবনের এইরূপ মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে।

সখীগণ সহ রাধা যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন (পটল ২৩)। নদী পার করিয়া দিবার জন্য রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলে কৃষ্ণ গোপীগণের নিকট রতি কামনা করিলেন। এই লইয়া রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ের মধ্যে বহু কথাকাটাকাটি হইল (পটল ২৪—২৬)। তার পর রাধা নিজের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনের জন্য নিজ দেহে বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন (পটল ২৭)। রাধা কৃষ্ণকে স্পষ্টই বলিলেন,—'তোমাকে আমার মনুষ্য বলিয়া মনে হয়। মনুষ্যের সহিত আমার মিলন কদাচ সম্ভবপর নহে। তুমি যদি তোমার দেবত্ব প্রতিপাদন করিতে পার, তবেই আমি তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি।' শ্রীকৃষ্ণও তখন কালীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া নিজরূপ ধারণ করিলেন ও বলিলেন,—'আমিই সেই মহাবিষ্ণু, আত্ম-গোপনার্থে দ্বিভুজ ধারণ করিয়াছি মাত্র।' এই রূপ দেখিয়া রাধা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রিতে যমুনানদীতে নৌকার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কৃষ্ণ তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কুলাচারের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। রাত্রিশেষে পদ্মিনী অন্তর্হিত হইয়া স্বস্থানে গমন করিলে কালী আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণকে বলিলেন,—'তুমি বহু চেষ্টায় আজ সিদ্ধি লাভ করিলে। এখন তুমি অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে যথেচ্ছ বিলাস কর (পটল ২৮)।'

অতঃপর কৃষ্ণ যৌবনোচিত বিলাসে নিমগ্ন হইয়া ব্রজমণ্ডলে বিহার করিতে লাগিলেন। যমুনার তীরে রাধার জন্য বিলাপ করিয়া তিনি বাঁশী বাজাইতেন। তার পর মথুরায় কংস প্রভৃতি দৈত্যকে নিহত করিয়া কৃষ্ণ শক্তিস্বরূপিণী দ্বারকাপুরীতে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি রুক্মিণী প্রভৃতি আট জনকে বিবাহ করিলেন। ষোড়শ সহস্র অন্য রূপবতী নারী বিবাহ করিলেও ইঁহারাই হইলেন তাঁহার প্রধানা মহিষী—কুলসাধনার অষ্ট প্রকৃতি বা অষ্ট নায়িকা। প্রত্যহ দিনে ও রাত্রিতে রত্নমন্দিরে এই অষ্ট প্রকৃতির সহিত শ্রীকৃষ্ণ দেবীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরমান্ন, পায়স প্রভৃতি বিবিধ ভোগ ও অষ্ট তণ্ডুল দূর্বা প্রভৃতির সাহায্যে দেবীর পূজা করিয়া তিনি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেন। এইরূপে কৃষ্ণ অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার পূজা করিলে সে পূজা নিষ্ফল হয় (পটল ২৯)। যে তন্ত্রে এই তত্ত্ব কীর্তিত হইয়াছে, তাহাই আসল শ্রীমদ্ভাগবত। সুতরাং এই রাধাতন্ত্রই শ্রীমদ্ভাগবত (এতদ্ ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্রমিদং স্মৃতম্—১৭শ পটল ; এতদ্ধি পদ্মিনীতন্ত্রং শ্রীমদ্‌ভাগবতং স্মৃতম্—১৮শ পটল)।

বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (৮)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

উইলিয়ম কেরী ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীর কর্ম্মময় দীর্ঘ জীবনের কাহিনী যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া আমরা সর্ব্বশেষে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই অংশটুকুই প্রয়োজনীয়—আসল মানুষটিকে বাদ দিয়া তাঁহার কীর্ত্তিকথামাত্র প্রচার করিতে বসিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; কিন্তু একটি মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখিলে কোনও খণ্ড বিষয়েও তাঁহার কৃতিত্বের পরিমাপ করা সহজ হয়; গোটা মানুষটি সম্বন্ধে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জাগ্রত করিতে পারিলে তৎসংক্রান্ত বিষয়টিও অনাগত ভবিষ্যতে একটি জাগ্রত মহিমা লাভ করে; ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা বিষয়ের অন্তরঙ্গতায় পর্য্যবসিত হয়। কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সহিত অনুধাবন করিয়াছেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না; সাহিত্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়া সাহিত্যিকের জীবনী আলোচনা এই কারণেই এত মূল্যবান্; বিশেষ করিয়া কেরী, মৃত্যুঞ্জয়, রামমোহন, ভবানীচরণ, ঈশ্বর গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচরণ, কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণকমল প্রভৃতি বিরাট্ অথচ অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সেবকদের কীর্ত্তি আজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কীর্ত্তির সম্যক্ পরিচয় লাভ করা কখনই সম্ভব নয়।

কেহ কেহ কেরীর সহিত বাংলা-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্পর্ককে কাকতালীয় ঘটনার পর্য্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার কৃতিত্ব লাঘব করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচাররূপ মূল লক্ষ্যে পৌঁছিতে অনিবার্য্যভাবে বাংলা ভাষার যে সমৃদ্ধি ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার জন্য কেরীকে ষোল আনা পূজা দিতে তাঁহারা নারাজ। কেহ কেহ উৎসাহদাতা ও সঙ্কলয়িতা মাত্র হিসাবে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ গৌরব কীর্ত্তনে কার্পণ্য করিয়াছেন; কেহ কেহ আবার ব্যাকরণ-অভিধানকার মাত্র জ্ঞানে তাঁহাকে শিল্পীর পর্য্যায়ে স্থান দেন নাই; মজুরের কোঠায় ফেলিয়া মজুরের প্রাপ্য সম্মানটুকু মাত্র তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু আজ আমরা বুঝিতেছি, ইহার কোনও একটিতেই কেরীর পরিচয় সম্পূর্ণ নয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে তিনি সব মিলিয়া এক জন মাত্র উইলিয়ম কেরী, কোনও অপ্রিয় তুলনার দ্বারা অথবা বৈদেশিকত্বের কারণ দর্শাইয়া আজ তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলে না।

বাংলা দেশে কেরীর অপর সকল কীর্ত্তিও যদি কোনও দিন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়, বাংলা-সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে তিনি স্বমহিমায় চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন, কারণ তিনিই

সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন। এক দিক্ হইতে আরবী ও ফারসী এবং অন্য দিক্ হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্য্য রকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার মৌখিক প্রচারমাত্র নয়, তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে দীর্ঘ জীবনের সাধনার দ্বারা মুখের উক্তিকে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন—একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ব্ববিধ ভাব প্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক ও ব্যবহারিক সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষার মাধ্যমই যথেষ্ট; মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিলেও তাহার চলিতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈদেশিক কেরী যাহা বুঝিয়াছিলেন, বাঙালী প্রধানদের তাহা সম্যক্ প্রণিধান করিতে আরও শতাব্দীকাল সময় লাগিয়াছিল। কিন্তু কেরীর সেদিনকার চিন্তা ও ভাবনার ফসল আমরাই পাইয়াছি এবং পাইয়া লাভবান্ হইয়াছি।

কেরীর এই ভাবনার সাক্ষ্যস্বরূপ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাউন্সিলকে লিখিত তাঁহার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পত্র আমরা পাইয়াছি। কলেজের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ, কর্ত্তৃপক্ষ এই ওজুহাতে কলেজের বাংলা-বিভাগ উঠাইয়া দিবার আয়োজন করিতেছিলেন; এই ব্যবস্থায় বৃদ্ধ কেরী মর্ম্মে আঘাত পাইয়া লিখিয়াছিলেন—

To the Council of the College of Fort William.
GENTLEMEN,

In reply to a letter from the Secretary to the College Council, under date of the 8th instant, calling upon me to state how far it may be necessary to maintain the Native Bengali Establishment in the College, which under existing circumstances appears "to be excessive," I beg leave to observe that the Establishment for the Bengalee and Sanskrit languages consists of

A First Pundit	at	200 Rs. per month.
A Second Pundit	at	100 Rs. ,,
A Writing Master	at	60 Rs. ,,
A Pundit	at	60 Rs. ,,
Four Pundits	at	40 Rs. each Rs. 160

making a total of Sa. Rs. 580 per month.

Convinced as I am that the Bengalee language is superior in point of intrinsic merit to every language spoken in India, and in point of real utility yields to none, I can never persuade myself to advise a step which would place it in a degraded point of view in the College. While therefore a first and second pundit are retained in the Persian and Hindoostanee Departments I must consider them as equally necessary in this.

. . . . . . It is to be hoped that the present unprecedented and unmerited neglect of the Sanskrit and Bengalee languages will not continue. . . . . .

13 August 1822. W. Carey*

---

*Proceedings of the College of Fort William.—*Home Miscelleneous No. 567.* up. 65-66.

কেরী নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি না, তাহা আজ বিচার করিতে বসিলে হয়ত বিচারে ভুল হইবে, কিন্তু তিনি যে সুদক্ষ সেনাপতি হিসাবে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিচালনাতেই যে যুদ্ধ জয় হইয়াছে, এ কথা আজ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই গোষ্ঠীপতি উইলিয়ম কেরীই বাংলা-সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। এ কথাও আমাদের চিরদিনই মনে রাখিতে হইবে যে—

To Carey belongs the credit of having raised the language from its debased condition of an unsettled dialect to the character of a regular and permanent form of speech, capable, as in the past, of becoming the refined and comprehensive vehicle of a great literature in the future.*

ভবিষ্যতের সেই উত্তরাধিকার আমরা অর্জ্জন করিয়াছি, সুতরাং কেরীকে স্বীকার করার মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষকে স্মরণের পুণ্য আছে।

সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান রামকমল সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে কেরীর দান প্রসঙ্গে যে প্রশস্তি করিয়াছেন আমরা পূর্ব্বে (৪৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৫৭) তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, কেরীর সমসাময়িক প্রাচ্যসাহিত্যবিশারদ পণ্ডিত এইচ. এইচ. উইলসন যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহাও উদ্ধৃত করিলাম—

When Mr. Carey commenced his lectures, there were scarcely any but *viva voce* means of communicating instruction. There were no printed books. Manuscripts were rare; and the style or tendency of the few that were procurable, precluded their employment as class-books. It was necessary, therefore, to prepare works that should be available for this purpose; and so assiduously and zealously did Dr. Carey apply himself to this object, that either by his own exertions, or those of others, which he instigated and superintended, he left not only the students of the language well provided with elementary books, but supplied standard compositions to the natives of Bengal, and laid the foundation of a cultivated tongue and flourishing literature throughout the country.†

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলিই বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে প্রথম কয়েক ধাপরূপে আজিও গণ্য হইতেছে; সেগুলি এবং সেগুলির রচয়িতাগণের ইতিহাসই সেই কারণে বিশেষভাবে আমাদের আলোচ্য। এই আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ের জন্য রাখিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিব।

কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় যে, কলেজ-বৎসর (college year) দুই মাস কাল স্থায়ী চারিটি "টার্মে" বিভক্ত হইবে এবং প্রত্যেক টার্মের শেষে এক মাস করিয়া ছুটি দেওয়া হইবে। বৎসরে দুই বার করিয়া ছাত্রদের পরীক্ষা লওয়ার ব্যবস্থা হইবে এবং সর্ব্বাধ্যক্ষ (গবর্ণর-জেনারাল) ও গবর্ণরদের উপস্থিতিতে

* S. K. De: *Bengali Literature*, p. 156.
† *Memoir of William Carey, D.D.* (1836), p. 596.

প্রোভোষ্ট মহোদয় প্রকাশ্য সভায় পুরস্কার ও অন্যান্য সম্মানীয় "ইনাম" বিতরণ করিবেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ টার্মের শেষে পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত হইবে ও প্রত্যেক বৎসরের ৪ মে তারিখে পুরস্কার ঘোষণা করা হইলে পরবর্ত্তী বৎসরের ৬ ফেব্রুয়ারি সেগুলি বিতরিত হইবে।

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা করা হইল তাহা—কলেজ-কাউন্সিল কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দিবসে প্রাচ্যভাষায় অনুষ্ঠিত "ডিসপিউটেশন" ও "ডিক্ল্যামেশন"গুলি। প্রত্যেক টার্মের মধ্যে প্রত্যেক ছাত্রকে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ বা "ডিক্ল্যামেশন" রচনা করিতে হইত। তা ছাড়া, কলেজ-কাউন্সিল কাহাকেও কাহাকেও প্রাচ্যভাষায় "ডিক্ল্যামেশন" রচনার আদেশ দিতেন—প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও কাউন্সিল স্থির করিয়া দিতেন। যে-সকল প্রবন্ধ উপযুক্ত বিবেচিত হইত "ডিসপিউ-টেশন"রূপে সেগুলি সাধারণ সভায় পঠিত হইত। ১৮০২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে কলেজ-কাউন্সিলের অধিবেশনে স্থির হয় যে প্রত্যেক টার্মের শ্রেষ্ঠ তিনটি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে এবং পাবলিক ডিসপিউটেশনে প্রাচ্যভাষায় পঠিত প্রবন্ধগুলিও (theses) সেই সেই ভাষাতেই মুদ্রিত হইবে।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত পাবলিক ডিসপিউটেশনে মাননীয় অস্থায়ী পরিদর্শক (Visitor) বার্লো সাহেব এবং সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্যগণের উপস্থিতিতে ছাত্রদের রচিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হয়; কলেজের প্রোভোষ্ট, ভাইস-প্রোভোষ্ট, অধ্যাপক ও কর্ম্মচারিবৃন্দও সকলে উপস্থিত ছিলেন। বাংলার বিষয় ছিল—"The Asiaticks are capable of as high a degree of Civilization, as the Europeans."

Defended by (বিধায়ক) ডব্লু. বি. মার্টিন W. B. Martin
Chief Opponent (প্রধান নিষেধক) ডব্লু. বি. বেলী W. B. Bayley
Second Opponent (দ্বিতীয় নিষেধক) এইচ. হজসন H. Hodgson
Moderator (বিচারক) ডব্লু. সি. ব্ল্যাকিয়ার W. C. Blaquiere

এই ডিসপিউটেশনে প্রথম টার্মের দ্বিতীয় পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য বেলীকে একটি পদক ও নগদ ১৫০০ টাকা ও মার্টিনকে একটি পদক ও নগদ ১০০০ টাকা পুরস্কৃত করা হয়।

বেলী নিষেধকরূপে উক্ত সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পাওয়া যায় না; মার্টিনের থীসিসটি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রথম বৎসরের বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ আজিও বর্ত্তমান আছে। বৈদেশিক সিবিলিয়ান ছাত্রদের বাংলায় পারদর্শিতা ও রচনার নমুনা হিসাবে যে তিনটি মাত্র রচনা আমরা পাইয়াছি, মার্টিনের থীসিসটি তাহার অন্যতম ও আদিমতম। এই রচনাটি অন্ততঃ অংশতঃ বাংলা-গদ্যের ইতিহাসের সহিত যুক্ত রাখা সমীচীন বিবেচনা করিলাম।

আসীয়ীয়েরা ইয়ুরোপীয়েরদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে।

অনেক লোকের অনুমান যে আসীয়ীয়েদের বুদ্ধি ইয়ুরোপীয়েরদের বুদ্ধির মত নহে তন্নিমিত্ত তাহারা ইহারদের মত নীতিজ্ঞ হইতে পারিবে না এ দুই এক বাক্য হইতে উৎপন্ন। যে তাহারদের দেশে গ্রীষ্মশীত কি আর কোন গুণ আছে যাহাতে মনের ক্ষমতা এবং বুদ্ধি হ্রাস হয় কিম্বা তাহারদের এই স্বভাব যে মনের পরাক্রম অতিক্ষুদ্র কি সৃষ্টি কর্ত্তৃ করণক এই মত জন্মিয়াছে যে সে উত্তম সুখ ও ভোগ যাহা বুদ্ধিতে প্রাপ্ত হয় তাহার অযোগ্য। এ দুই বাক্যের মধ্যে এক বাক্যের মিথ্যাতা এবং অন্যের অপ্রকৃততা প্রকাশ করিতে যত্ন করি।

যাঁহারা একথা কহেন তাঁহারা অন্য কথার মধ্যে বলিয়াছেন যে গ্রীষ্মশীতের এমত স্বভাব যে তাহাতে মনের যোগ্যতা হ্রাস হয় এবং সে কারণ অন্তঃকরণের রাগ ও হ্রাস হয়।

ইহার সত্যমিথ্যা বোধার্থে প্রথমে আমারদের বিচার করিতে হবে মনে অনুভব কিমত হয়। তাহার পর সে অনুভব গ্রীষ্মশীত করণক ন্যূনাধিক হয় কি না।

যে এক মহাপুরুষ জগতের কর্ত্তা আছেন সে সহজ অনুভব। কিন্তু অন্য যত অনুভব প্রত্যক্ষের দ্বারা। যে মতে অনুভবের বাহুল্য হয় এবং স্মৃতিতে থাকে এবং যুক্ত হয় সেই মত আমারদের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এবং বিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়। যদি গ্রীষ্মশীতের সে পরাক্রম যাহা অনেক লোকে বলে তবে অবশ্য যে ইন্দ্রিয় করণক বাহ্য বস্তুর সন্নিকর্ষ হয় এবং যাহার দ্বারায় মনের প্রত্যক্ষপ্রাপ্ত হয় সে ইন্দ্রিয়ের গ্রীষ্মশীতেতে হ্রাস বৃদ্ধি হয় কিম্বা যে সামর্থ্যে অনুভূতের স্মৃতি এবং একত্র করণ হয় সে সামর্থ্যের নাশ হয়। কিন্তু আমরা কি বুঝিতে পারি যে গ্রীষ্মশীতের স্বভাবে কোন গুণ আছে যাহাতে এমত ফল হয়? আমরা কি আস্থা করিতে পারি যে কেবল গ্রীষ্মশীতের স্বভাবে ইন্দ্রিয় ও স্মৃতিও একত্র করণের ক্ষমতা নষ্ট হয়? এক জ্ঞানবান রচনা কর্ত্তা বলেন "মানুষের গঠনানুসারি যাহাতে অক্ষম হয় তদ্ব্যতিরেক প্রতী প্রাধান্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা যাহা মানুষেরা পাইতে পারে তাহা পাওনের সামর্থ্য আছে।"......

উপাখ্যানে প্রচুর প্রমাণ আছে যে বুদ্ধির আগমন পূর্ব্বদিক হইতে হইয়াছে এবং যে শিল্প বিদ্যা এবং আর আর জ্ঞানের উদয় এবং শিক্ষা ছিল এদেশে মিছর এবং ফিনিকিয়ার মধ্যে প্রকাশ হওনের বহুকাল পূর্ব্বে। এক বুদ্ধিমান রচক বলে যে পূর্ব্ব কালে গ্রিক দেশের মধ্যে এক বর্ণ ছিল তাহার নাম পেলাসগি যাহারা উপবিষ্ট হইল পূর্ব্ব দেশ হইতে বিশেষত আসীয়া হইতে। এবং বুদ্ধি এ স্থানে প্রফুল্লা হইয়াছিল সে স্থানে প্রচার হওনের অনেককাল পূর্ব্বে।......

যাহারা হিন্দু লোকেরদের গ্রন্থ পড়িয়াছে তাহারা হিন্দু লোকেরদের যেরূপ ব্যাখ্যা করে তাহা গ্রন্থ হইতে অধিক। তত্রাপি "তাহারা নিতান্ত উৎপন্নমতি এবং বুদ্ধিমান"। তাহারদের কবিতার অত্যন্ত অসম্ভব কথা কিন্তু অলঙ্কারাদি রচনা ভাল ও সে লাটিন কয়েক কাব্যের তুল্য মানিতে হইবে যাহা আমরা এত ব্যাখ্যা করি।......

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ মার্চ তারিখে প্রাচ্যভাষাসমূহের দ্বিতীয় সাধারণ তর্কসভার অনুষ্ঠান হয়, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিদর্শক মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; নূতন গবর্মেণ্ট হাউসে বেলা ৯টায় সকলে সমবেত হন। কলেজের সকল ছাত্র অধ্যাপক ও কর্ম্মচারীরা ছাড়াও তখনকার দিনের প্রধান বিচারপতি প্রমুখ কোম্পানীর সকল উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। এবারে বাংলা তর্কের বিষয় ছিল—

"The distribution of Hindoos into Casts, retards their progress in improvement."

বিধায়ক	জে. হাণ্টার
প্রধান নিষেধক	ডব্লু. বি. মার্টিন
দ্বিতীয় নিষেধক	ডব্লু. মর্টন
বিচারক	ডব্লু. সি. ব্ল্যাকিয়ার

মাত্র জে. হাণ্টারের বক্তৃতাটি কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বাংলা ভাষা শিক্ষায় ছাত্রদের অগ্রগতি বুঝাইবার জন্ম তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

হিন্দুলোকেরা ভিন্ন২ জাতি এইপ্রযুক্ত তাহারদের বিদ্যা বৃদ্ধির হানি হয়

মানুষেরদের নীতিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছতাপ্রাপ্তি সম্বাদি ভ্রমস্থায় যখন আমরা দেখি তখন আমরা বিস্ময়াপন্ন হই সকলে বুঝে যে ভিন্ন দেশীয় লোকেরদের ভিন্ন২ রীতির এই কারণ যে আপন২ স্বভাব এবং গ্রীষ্ম শীতের গুণ বহুজ্ঞ দেশীয় ব্যবস্থাপকেরা ব্যবস্থা করণ কালে এই দুই কারণ প্রধান করিয়া মানিয়াছেন সর্ব্ব দেশে পৃথক২ ব্যবহার সংসারের চলন নিমিত্ত অবশ্য মান্য হইয়াছে······

ব্রাহ্মণেরা বলে স্বষ্ট্যারম্ভে ঈশ্বর পৃথক২ চারি বর্ণ সৃজন করিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারদিগের পৃথক২ ধর্ম্মাচার দ্বিজধর্ম্ম এই. সুদ্ধাচার যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়াচার রাজ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ রক্ষণ ধনুর্বিদ্যা অভ্যাসন শিষ্ট পালন দুষ্ট দমন রাজ্য শাসন প্রজাপালন ন্যায্য কর গ্রহণ বৈশ্য বৃত্তি কৃষি কর্ম্ম এবং বাণিজ্য. শূদ্রের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ সেবা মাত্র······

হিন্দুরদের পৃথক২ জাতি হওয়া সকল বিদ্যা হওনের প্রতিবন্ধক পুত্র যদি পৈতৃক বিদ্যা ভিন্নান্ন বিদ্যাভ্যাসন ইচ্ছুক হয় এবং তাহাতে যোগ্য বুঝা যায় সে পুত্র আপন জাতি রক্ষা প্রযুক্ত স্বীয় অভিলষিত বিদ্যাতে প্রবর্ত্ত হইতে পারে না এই তাহার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তির বাধক হয় তাহার স্থল এই, যদি কোন শূদ্র বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করে তবে হিন্দুরদের শাস্ত্রমত এই দণ্ড কর্ত্তব্য, অভ্যাসে জিহ্বা ছেদন করিবেক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিলে সে শূদ্রের কর্ণেতে তপ্ত সীসা প্রদান করিবেক আর শূদ্র হইয়া যদি বেদের অর্থ মনেতে ধারণ করে তবে তাহাকে বধ করিতে হয়

অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা ভাষাতে কাশী দাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল, সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না······

১৮০৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রাচ্যভাষার তৃতীয় সাধারণ তর্কসভার তারিখ। এবারেও পরিদর্শক লর্ড ওয়েলেসলি ও তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব ওয়েলিংটন উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই সংস্কৃত ভাষার প্রবন্ধ পঠিত হইবার পর কেরী নিজে ঐ ভাষায় একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। বাংলার বিষয় ছিল—

"The Translations of the best works extant in Sunskrit into the popular languages of India, would promote the extension of science and civilization."

স্বয়ং কেরী ছিলেন বিচারক এবং মূল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন এ. বি. টড; প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন মিঃ হেইস্ (Hayes)। বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের বাংলা ভাষা বিষয়ক কৃতিত্বের শেষ-চিহ্নস্বরূপ টডের প্রবন্ধটি এখনও বাঁচিয়া আছে। ইহার পর প্রবন্ধের তালিকা মাত্র পাওয়া যায়, এই ধরণের নিদর্শন আর মেলে না। কৌতূহলী পাঠকের জন্য টডের প্রবন্ধের কিয়দংশও উদ্ধৃত হইল—

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচার হয় এবং লোকেরদের নীতজ্ঞতাচরণ দ্বারা উপকার হয়—

ইওরোপীয়েরদের মধ্যে যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও সঙ্গ তাহা বিশেষত গ্রন্থ প্রচার ও বিদ্যার ব্যাখ্যা দ্বারায় হয় ইহা প্রায় সকল দেশের পণ্ডিত লোকেরদের স্বীকৃত হয়···দেবতাভিমানি ব্রাহ্মণেরদের প্রতি যে আত্যন্তিকী ভক্তি ও মর্য্যাদা করিতে ইতর লোক শিক্ষিত ও আজ্ঞাপিত হয় তত্ প্রযুক্ত এই হয় ইতর লোক এই চলিত ব্যবহারের অন্যথা যেন না করে এই বিষয়ের বড় শাসন ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদা করে ইহাতে লোকেরদের পরস্পর মেলা আহার ব্যবহারের বাধা হয় এবং কোন দেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর মেলা আহার ব্যবহার যদি না হয় ও না চলে তবে ইতর লোকের বড় বিদ্যা ও শিষ্টাচার হওয়া অতি দুর্ল্লভ ইহা নিঃসন্দেহ—

···সংস্কৃত শাস্ত্র অত্যন্ত দীর্ঘ কালাবধি আছে ইহা সকলেই বলে অতএব অনেক হিতকারী ও সুখকারী অতি সুন্দর জ্ঞান তাহার মধ্যে পাওয়া যায় ইহা আমরা স্থির করি এবং সর্ব্বদেশীয় জ্ঞানি ও বিজ্ঞানিরদের সন্তোষ সেই বিচারে হয় অতএব সংস্কৃত শাস্ত্র চলিত ভাষাতে তরজমা করিলে তাহার মধ্যে বিদ্বান লোকেরদের চেষ্টিত যে যে উত্তম কথা আছে তাহাও তাহারা অনায়াসে পাইতে পারিবেন—

ইহার পরেও প্রাচ্যভাষার কয়েকটি সাধারণ তর্কসভার বর্ণনা টমাস রোবাকের *Annals of the College of Fort William* (১৮১৯) পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পঠিত প্রবন্ধগুলি আর পাওয়া যায় না। বাংলা-বিভাগের ছাত্রদের কৃতিত্বের স্থায়ী নিদর্শনও আর বড় মেলে না। কেবল অষ্টম তর্কসভার পরিদর্শক লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতায় দুই এক জন ছাত্রের কোনও কোনও কীর্ত্তির উল্লেখ আছে। ১৮০৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত অধিবেশন হয়। বাংলা বক্তৃতার বিষয় ছিল—

"An accurate knowledge of the manners and genius of the Hindoos is to be acquired by an attentive examination of their written compositions."

হেনরী সারজেণ্ট ছিলেন মূল বক্তা এবং বিচারক ছিলেন কেরী। পুরস্কার বিতরিত হইবার পর লর্ড মিণ্টো তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

It must be considered as a remarkable feature of the present examination, and may, perhaps, be thought to form an æra in the studies of Fort William, if not in the literature of Asia, that Mr. Sargent [H. Sargent] has qualified himself to translate four books of Virgil's Æneid into the language of Bengal, and has performed the work in a manner to merit the highest commendation of those who are competent to judge of it. If it has, indeed, been possible, by the classical execution even of a prose version,

to set before the native scholars of the provinces, present or to come, that model of epic genius and Augustan taste; . . . . . .

Another enterprize of a similar nature has distinguished the Collegiate exercises of this year. Mr. Monckton [Claud] has undertaken, and has been able to execute, a translation into Bengalee, of Shakespeare's tragedy of the Tempest. The difficulty of rendering a work of that peculiar stamp, into the language of a nation whose idiom and manners have so little affinity either to the genius of the author, or to the times and people for which he wrote, may be easily appreciated. That Mr. Monckton has triumphed over these obstacles, and has achieved his singular labour, bears sufficient testimony both to his knowledge and command of a language which he has been able to bind to so arduous a purpose.

নিতান্তই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই দুইটি অনুবাদের কোনটিরই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হেনরী সার্জেণ্ট-অনূদিত *Virgi'ls Æneid* যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও জানা গিয়াছে। লঙের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রথম খণ্ড ১৮০৫ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে। ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত তালিকায় নিম্নলিখিত নামটি তালিকাভুক্ত দেখিতেছি—

Sargent (H.) Virgil's Æneid 8vo Serampore 1810.

লর্ড মিণ্টোর বক্তৃতা হইতে ইহাও জানা যায় যে, কাব্যটি বাংলা গদ্যে অনূদিত হইয়াছিল।

পীয়র্স কেরী-রচিত উইলিয়ম কেরীর জীবনীর (১৯৩৪) ২২৫ পৃষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র Lewin Anderson কর্ত্তৃক অনূদিত টেলিমেকস পুস্তকের উল্লেখ আছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ও সেগুলির রচয়িতাগণ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগের সহিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পর্ক পাঠ্যপুস্তকগুলির জন্য। প্রথম যুগের বাংলা-গদ্য নির্ম্মাণে এইগুলির মধ্য দিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ গৌণতঃ সহায়ক হইয়াছিল। সুতরাং আমাদের ইতিহাসে এই পাঠ্য-পুস্তকগুলিই মূল্যবান্‌। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বাংলা-বিভাগে পণ্ডিত ও মুন্শী হিসাবে অনেকেই যুক্ত ছিলেন; ইহাদের কয়েক জনের সহিত নামমাত্র আমাদের পরিচয়; কোনও সাহিত্যসাধনার নিদর্শন ইহারা রাখিয়া যান নাই এবং সমসাময়িক বিবরণীতেও ইহাদের কীর্ত্তির উল্লেখ নাই। দুই-এক জনের কীর্ত্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু কীর্ত্তি বাঁচিয়া নাই। কীর্ত্তির সহিত যাঁহাদের নাম বাঁচিয়া আছে আমাদের ইতিহাসে তাঁহারাই স্মরণীয়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড জে. লঙের *Selections from the Records of the Government Published by Authority* No. XXXII প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকেরই পরিশিষ্টে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারার্থ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ক্রীত পুস্তকের তালিকা আছে। সেটি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

সাল	নাম	কয় খণ্ড কেনা হইয়াছিল	দাম
১৮০২	বত্রিশ সিংহাসন	১০০	৬৲
”	লিপিমালা	১০০	৬৲
”	দাউদের গীত	১০০	৬।/২
”	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১০০	৫৲
”	রামায়ণ ৫ খণ্ড	১০০	২৪৲
”	মহাভারত ৪ খণ্ড	১০০	৮৲
”	হিতোপদেশ	১০০	৮৲
”	কেরীর বাংলা ব্যাকরণ	১০০	৪৲
”	” কথোপকথন	১০০	৮৲
”	ফরষ্টারের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	৫৫৲
১৮০৫	কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্	১০০	৫৲
”	তোতা ইতিহাস	১০০	৬৲
১৮১৬	পুরুষ পরীক্ষা	১০০	৮৸৶৩
১৮২২	দত্তক কৌমুদী	৮০	১৲
”	ব্যবস্থা সংগ্রহ—লক্ষ্মীনারায়ণ	১০০	২৲
১৮২৪	মিতাক্ষরাদর্পণ	১০০	১৭।/৭
১৮২৫	কেরীর বাংলা অভিধান ২ খণ্ড	১০০	১০০৲
১৮২৭	ব্যবস্থা সংগ্রহ—রামজয়	১০০	৯৸০
১৮২৯	মার্শম্যানের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	২৪৲
”	মেণ্ডিসের অভিধান ২খণ্ড, ১ম খণ্ড	১০	৮৲
	২য় খণ্ড	৫০	১০।০
	সদ্‌গুণ ও বীর্য্যের ইতিহাস	৫০	২৲
১৮৩৪	রামকমলের অভিধান ২ খণ্ড	১০০	৫০৲
১৮৩৬	মহাভারত নূতন সংস্করণ ২ খণ্ডে	৫০	১০৲
১৮৪৬	বাংলার ইতিহাস	১০০	২৲
১৮৪৭	বেতাল পঞ্চবিংশতি	১০০	৩৲
	অন্নদা মঙ্গল ২ খণ্ডে	১০০	৬৲
	শ্যামাচরণের বাংলা ব্যাকরণ	১০০	১০৲
১৮৫২	কুসুমাবলী—বাংলা কবিতাসংগ্রহ	১০০	২৲

এই তালিকায় তারিখ এবং নামের ভুল আছে, ইহা সম্পূর্ণও নয়, তথাপি ইহা হইতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মোটামুটি একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। বুকানন ও রোবাকের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ সংক্রান্ত পুস্তকে এবং কলেজ হইতে প্রকাশিত থীসিস-সংগ্রহ-পুস্তক *Primitiæ Orientales* তিন খণ্ডের পরিশিষ্টে কলেজের জন্য মুদ্রিত ও মুদ্রাযন্ত্রের জন্য প্রস্তুত পুস্তকের তালিকা দেওয়া আছে। এই তালিকাগুলি হইতে আমাদের কাজের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত লেখক ও তাঁহাদের

পুস্তকের নাম আমরা বাছিয়া লইতে পারি। কেরীর পুস্তকের আলোচনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল।

রামরাম বসু	১।	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১
	২।	লিপিমালা	১৮০২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১।	বত্রিশ সিংহাসন	১৮০২
	২।	হিতোপদেশ	১৮০৮
	৩।	রাজাবলি	১৮০৮
	৪।	প্রবোধ চন্দ্রিকা	১৮৩৩
গোলোকনাথ শর্ম্মা	১।	হিতোপদেশ	১৮০১
তারিণীচরণ মিত্র	১।	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট	১৮০৩
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১।	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	১।	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
হরপ্রসাদ রায়	১।	পুরুষ পরীক্ষা	১৮১৫

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-প্রণীত 'হিতোপদেশে'র নাম মাত্র পাওয়া যায়, পুস্তকখানির সন্ধান এযাবৎ কাল পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীচরণ মুন্‌শী-অনূদিত 'ভগবদ্গীতা'র বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, জানা যায় না।

গ্রন্থাধ্যক্ষ মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের সংস্কৃত-বাংলা (১৮০৯) এবং ইংরেজী-বাংলা (১৮১০) শব্দসংগ্রহ একটি বৃহত্তর অভিধান-রচনার জন্য মুদ্রিত ও বিতরিত হইয়াছিল।

আমরা অতঃপর এই কয়েক জন লেখক ও তাঁহাদের রচিত পুস্তক লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

রামরাম বসু

রামরাম বসু কবে এবং কোথায় জন্মিয়াছিলেন তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই, তাঁহার পিতৃপরিচয়ও আমরা পাই নাই। তবে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কেটারিঙ ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলীর নিকট প্রদত্ত জন টমাসের বিবৃতি হইতে আন্দাজ করা যায় যে, তিনি ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরোক্ষ প্রমাণে আরও অনুমান করা যায়, চব্বিশ-পরগণা ও খুলনার সীমান্তে সুন্দরবন অঞ্চলে টাকি-দেবহাটা-নাল্‌তা-কালীগঞ্জের কাছাকাছি কোনও স্থানে তাঁহার বাসস্থান ছিল; 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র সূচনায় তিনি আপনাকে বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়াছেন এবং কেরী যখন দেবহাটায় ছিলেন, তখন রামরাম বসুর খুড়ার জমিদারীতে জমি লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ মার্চ টমাসের মুন্‌শী নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ রামরাম বসুর ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। এই মাত্র

জানা যায়, তিনি ঠিক ঐ সময়ে সুপ্রীম কোর্টের ফার্সী দোভাষী উইলিয়ম চেম্বর্সের মুন্সী ছিলেন এবং রামরাম বসুর সহায়তায় চেম্বর্স বাইবেলের ফার্সী অনুবাদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। উইলিয়ম চেম্বর্সের সাহায্যেই রামরাম বসু কিছু পরিমাণ ইংরেজী বলিতে কহিতে শিখিয়াছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির 'পিরিয়ডিক্যাল অ্যাকাউণ্টসে' প্রসঙ্গতঃ রামরাম বসুর সামান্য সামান্য পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রামরাম বসুর জীবনীর উপকরণ সেইটুকু মাত্র। সেইটুকু জীবনী ও তাঁহার রচিত দুইখানি পাঠ্যপুস্তক হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণা গড়িয়া তুলিতে হইতেছে।

রামরাম বসু যে অনেক গুণে গুণী ছিলেন মিশনরীরা তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন; তিনি সে যুগেই ইংরেজী বলিতে কহিতে পারিতেন, ফার্সী ভাষায় তাঁহার ভাল দখল ছিল এবং বাংলা ভাষার তিনি এক জন চৌকস লিখিয়ে ছিলেন। জন ক্লার্ক মার্শম্যান লিখিয়াছেন, রামরাম বসু ক্ষুরধার ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং মনের তীব্রতা ভাষায় সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। শেষোক্ত গুণ বিশেষ ভাবে তাঁহার কবিতায় লক্ষিত হইত। তিনি বাংলা গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনাতেই দক্ষ ছিলেন।

রামরাম বসুর এই সকল উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াও পাদরিরা মসীবর্ণে তাঁহার চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়, তিনি পাদরিদের সংস্পর্শে আসিয়া মনে মনে অনেক সামাজিক কুসংস্কার-মুক্ত হইলেও চারিত্রিক দুর্ব্বলতাবশতঃ সেগুলি মানিয়া চলিতেন; খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন হইয়াও কখনও খোলাখুলি-ভাবে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। এই হইল প্রাথমিক পরিচয়। পরে তাঁহারা তাঁহাকে মতলববাজ ও জুয়াচোর, পরদারাসক্ত ও ভ্রূণহত্যাকারী বলিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম স্বীকারের লোভ দেখাইয়া তিনি বারম্বার পাদরিদের নিকট টাকা খাইয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত আপনার পৈতৃক ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াই গিয়াছেন। ইহাতে পাদরিরা তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। জন টমাসের উন্মাদ হইবার অন্যতম কারণ রামরাম বসুর প্রতারণা। দীর্ঘ দেড় শতাব্দী কাল পরে রামরাম বসুর চরিত্র আলোচনা করিতে বসিয়া আমাদের ইহাই মনে হয় যে, তিনি সকল সংস্কারকে গুলিয়া খাইয়াছিলেন এবং বরাবরই আপনার স্বার্থ বজায় রাখিয়া চলিতে জানিতেন। প্রথমেই তাঁহার মত ধূর্ত্ত ও বুদ্ধিমান্ বাঙালীর সংস্পর্শে আসিয়া অতিলোভী পাদরিরা কম লাঞ্ছনা ভোগ করেন নাই।

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কেরী রামরাম বসুর প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন, কঠিন নৈতিক অপরাধের জন্য তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়াও আবার আশ্রয় দিয়াছেন; রামরাম বসুর সাহায্য লইতে দ্বিধা করেন নাই। কেরীর জার্ণালের বহু স্থলে রামরাম বসুর বদান্যতা ও দয়াধর্ম্মের উল্লেখ আছে, তাঁহার শাস্ত্রীয় বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা আছে। তর্কে কেহ তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। মোটের উপর, রামরাম বসু দোষগুণে

খাঁটি বাঙালী ছিলেন; নিজের প্রয়োজনে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে তাঁহার বাধিত না।

সকল অপরাধ সত্ত্বেও বাংলা দেশের প্রথম মিশনরী-সম্প্রদায়ের রামরাম বসুর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আজ পর্য্যন্ত অখ্রীষ্টান কোন বাঙালী খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারে এতখানি যত্ন ও পরিশ্রম করেন নাই। প্রথম বাইবেল-অনুবাদ পরোক্ষভাবে তাঁহারই কীর্ত্তি; প্রথমে টমাস ও পরে কেরীকে লইয়া তিনিই সম্পূর্ণ বাইবেলের অনুবাদ সমাপ্ত করেন। টমাস ও কেরীর একমাত্র বাংলা-শিক্ষক তিনিই; বাংলা বক্তৃতাতে তিনিই তাঁহাদিগকে দক্ষ করিয়া তুলেন এবং প্রচার ও শাস্ত্রীয় বিচারের স্থলে বরাবরই তাঁহাদের পুরোভাগে থাকিয়া স্বজাতীয়দের অপ্রীতিভাজন হন। রামরাম বসুই বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম খ্রীষ্টসঙ্গীত-রচয়িতা; কবিতায় খ্রীষ্টজীবনীর* লেখক এবং এদেশে প্রথম খ্রীষ্টশুভসংবাদদাতা। তাঁহার রচিত দুইখানি সামান্য কবিতা-পুস্তিকা 'হরকরা' ও 'জ্ঞানোদয়' সে-যুগের গোঁড়া-ব্রাহ্মণ সমাজকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৭৮৭ সালের মার্চ হইতে ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পূরা পাঁচ বৎসর কাল রামরাম বসু টমাসের শিক্ষক ও সহকর্ম্মী ছিলেন; ইহার অধিকাংশ সময়ই তাঁহাদের মালদহে থাকিতে হইয়াছিল, শেষ বৎসর টমাস সংস্কৃত-শিক্ষার্থ নবদ্বীপে যান। রামরাম বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। টমাস ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত গিয়া কেরীকে সঙ্গে লইয়া ১৭৯৩ সালের ১১ নবেম্বর কলিকাতা পৌঁছেন। রামরাম বসু জাহাজ-ঘাটেই তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। সেই দিন হইতে রামরাম বসু কেরীর মুন্‌শী নিযুক্ত হন, মাসিক কুড়ি টাকা বেতন ধার্য্য হয়। এই সময় হইতে ১৭৯৬ সালের মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্ত রামরাম বসু কেরীর সহিত যুক্ত ছিলেন; ব্যাণ্ডেল, কলিকাতা, দেবহাট্টা ও মদনাবাটী সর্ব্বত্রই তাঁহারা একত্রে পরস্পর সহযোগিতায় যাপন করিতেন। ১৭৯৬ সালে রামরাম বসুর একটি বিশেষ অপরাধের জন্য তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হয়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শ্রীরামপুর মিশনের পত্তন হয়, সে মাসে অনুতপ্ত রামরাম বসু আসিয়া আবার কেরীর সহিত মিলিত হন এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে পুরাদমে পাদরিদের সাহায্য করিতে থাকেন। ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা দুইটি এই কালেই রচিত। ১৮০১ সালের ৪ মে হইতে কেরী রামরাম বসুকে মাসিক ৪০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা-বিভাগে অন্যতম সহকারী পণ্ডিত করিয়া লন।

রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার উপর পাঠ্যপুস্তক-রচনার আদেশ হইল। নিরঙ্কুশ এবং অদম্য রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় এই গুরুভার গ্রহণ করিলেন এবং দুই মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষার প্রথম (মৌলিক) গদ্যপুস্তক 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' রচনা করিয়া কেরীর হস্তে প্রদান করিলেন। ১৮০১ সালের

* 'খ্রীষ্টবিবরণামৃতং'—১৮০৫ খ্রীঃ

জুলাই মাসে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে পুস্তকটি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের জন্য কলেজ-কাউন্সিল তাঁহাকে তিন শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

১৮০২ সালে রামরাম বসুর দ্বিতীয় পাঠ্যপুস্তক 'লিপি মালা' প্রকাশিত হয়। ১৮০১ সালের ৪ মে হইতে ১৮১৩ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে মৃত্যু পর্য্যন্ত রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত পণ্ডিত হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নরোত্তম বসু ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

যে কারণেই হউক, কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলা দেশের শিক্ষিত মহলে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে রামরাম বসু রামমোহন রায়ের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছু হইতে পারে না। রামরাম বসু রামমোহন অপেক্ষা বয়সে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় এবং রামমোহন কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিবার পুর্ব্বেই তিনি গতায়ু হইয়াছিলেন। রামমোহনের সহিত তাঁহার কোনও কালে সাক্ষাৎ হইয়াছিল এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী কালে বোধ হয় নামসাদৃশ্যে রামরাম বসু রামমোহনের শিষ্য হইয়া গিয়াছেন, রামমোহনের অধিকাংশ সহচর ও অনুচরের "রাম" যুক্ত নাম লক্ষণীয়। কিন্তু আসলে মনের সংস্কারমুক্ততার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে রামরাম বসুই রামমোহনের অগ্রজ ; রামমোহনের অনেক পূর্ব্বেই ('লিপি মালা'র ভূমিকায়) তিনি এক পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে নতি জানাইয়াছিলেন।

মানুষ রামরাম বসুর পরিচয় ইহার অধিক জানা যায় না ; লেখক রামরাম বসুর পরিচয় তাঁহার দুইখানি পুস্তকের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। সে পরিচয় খুব বিরাটের নয় কিন্তু পাইওনীয়রের। তাঁহার পাণ্ডিত্য বা ভাষাজ্ঞান গোড়ায় খুব যে অধিক ছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু দুর্জ্জয় সাহস ছিল। সাহসের জোরেই তিনি নির্ভয়ে ফার্সী আরবী বাংলা সংস্কৃত শব্দ পাশাপাশি সাজাইয়া আদর্শহীন গদ্যের যুগে একটা কিছু খাড়া করিয়াছেন এবং পাণ্ডিত্যজনিত সঙ্কোচ ছিল না বলিয়াই লজ্জিত হইয়া হাল ছাড়েন নাই। ফলে যে-ভাষার উদ্ভব হইয়াছে তাহার বিরূপ বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া পরবর্ত্তীয়েরা সাবধান হইতে পারিয়াছেন। বিনা আদর্শে রামরাম বসু যে অত বড় একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ অতি অল্পকালে সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন ইহাতে আজ আমরা বিস্ময় বোধ না করিয়া পারি না। প্রারম্ভেই তাঁহার ভাষা এই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল—

> যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙ্ বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বেহারের নবাব পরে হোমাঙ্ বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্তানে বাদসাহ হইতে ব্যাজ হইল এ কারণ হোমাঙ্ ছিলেন বৃহত গোষ্ঠী তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর২ ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল না।—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ. ২।

এই নমুনাটুকুর মধ্যের আমরা দেখিতে পাইতেছি, অন্বয়ের বালাই নাই। "ওফাত" ও "আত্মকলহ" নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি বসিয়াছে ; "ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত" হয় নাই। ভাষার মন্বন্তরে এ যেন নিতান্ত অরাজক অবস্থা। কিন্তু অরাজক হইলেও রামরাম বসুর এই সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে শৃঙ্খলার বীজ নিহিত আছে।

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'—প্রকৃতপক্ষে বাংলা-গদ্যে প্রথম একটানা দীর্ঘ মৌলিক রচনার নিদর্শন এবং এই কারণেই বিচিত্র ভাষায় রচিত। বাংলাদেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবহারে তখনও ফার্সী ভাষার প্রাধান্য ছিল, বাংলা বাক্যের অন্বয় সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী হইতে আরম্ভ হয় নাই। রামরাম বসু ফার্সী জবানকে মানিতে গিয়া বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে তাঁহার ভাষা "কদর্য্য" বিশেষণে বিশেষিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে

পণ্ডিতজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ওয়েঙ্গার, ইয়েট্‌স এবং নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের সংগ্রহপুস্তকে রামরাম বসুকে স্থান দেন নাই। পুস্তকের আখ্যাপত্রটি এইরূপ ছিল—

রাজা প্রতাপাদিত্য | চরিত্র | যিনি বাস করিলেন যশহরের ধূমঘাটে | একব্বর বাদসাহের আমলে।— | রাম রাম বসুর রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০১।— |

মূল গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার প্রতিলিপিটিও এখানে মুদ্রিত হইল।

রাজা প্রতাপাদিত্য।—

চরিত্র।—

এ বঙ্গ ভূমিতে রাজা চন্দ্রকেতু প্রভৃতি অনেক, রাজাগন ওদ্ভব হইয়া ছিলেন কিন্তু কদাচিত তাহারদের কেবল নাম মাত্র শুনা যায় তদব্যতিরেক তাহারদের বিশেষ বিশেষন কি মতে বৃদ্ধি কি মতে পতন নিরা করন কিছুই ওপস্থিত নাহি তাহাতে যে সমস্ত লোকেরা এ সকল প্রশঙ্গ শ্রবন করে আনুপূর্ব্বক না জাননেতে ক্ষোভিত হয়।

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়া ছিলেন তাহার বিবরন কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ

পুস্তক-বর্ণিত বিষয়ের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে স্বর্গীয় নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তিনি ১৩১৩ বঙ্গাব্দে 'প্রতাপাদিত্য' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহাতে অন্যান্য রচনার সঙ্গে রামরাম বসুর রচনাটিও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় রামরাম বসুর জীবনী প্রসঙ্গে কেরীর কাগজপত্র বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, বাস্তবে তাহার কোনও অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা জানি না। রামরাম বসুর লেখার ঐতিহাসিকত্ব এই ভূমিকায় আলোচিত হইয়াছে। আমাদের ইতিহাসের পক্ষে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক, তবে প্রারম্ভেই রামরাম বসু নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সেইটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

সংপ্রতি সর্ব্বারম্ভে এ দেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিত পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গ পাঙ্গ রূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগেব স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত এবং আর২ অনেকে মহারাজার উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক জানিতে আকিঞ্চন করিলেন এ জন্য যে মত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ি লেখা যাইতেছে।

রামরাম বসুর সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান যে এই সময়ে তেমন ছিল না এবং ফার্সী ভাষায় জ্ঞান যে ভালই ছিল, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে। তাছাড়া রামরাম বসু বিনা দ্বিধায় অনেক পরস্পরবিরোধী কর্ত্তাকে একই ক্রিয়ার কাঁধে চাপাইয়াছেন, বহু ভিন্নধর্ম্মী বাক্যকে এক জোয়ালে জুতিয়া দিয়া নানা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন; অর্থ বুঝিবার জন্য অনেক সময় আন্দাজে কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া ও বিশেষণের যোগাযোগ ঘটাইতে হয়। দুঃসাহসী সেনাপতির মত তিনি বহু জাতীয় এবং বিজাতীয় শব্দকে যেমন তেমন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ভাষা-সমরে মহামার বাধাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ভাষা কোনও নির্দ্দিষ্ট রীতি বা পদ্ধতির পর্য্যায়ে পড়ে না। ইহার উপমা কেবলমাত্র ইহাই। বাংলা-গদ্যের ইতিহাসে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষা প্রত্নতাত্ত্বিক মহিমায় চিরকাল বিরাজ করিবে। এই পুস্তকের যে কোনও স্থান উদ্ধৃত করিয়া রামরাম বসুর ভাষারীতি বুঝান যাইতে পারে। যথা—

ইহাতে বাদসাহ উহাকে সন্তুষ্ট হইয়া ওজিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কেটা। পরে ওজির প্রতাপাদিত্যের দিগে দৃষ্টিপাত করিলে প্রতাপাদিত্য ফের আদব বাজাইয়া নিবেদন করিলেন যাহাঁপনা গোলামের নাম প্রতাপাদিত্য বঙ্গদেশের যশহর চাকলা ওগএরহের জমিদার বিক্রমাদিত্যের তরফ লোক। এ সমস্ত ওজির পুনরার নিবেদন করিলেন বাদসাহের সম্মুখে। ইহাতে বাদসাহেব অনুমতিতে ওজির উহাকে খেলাত দিয়া সম্রান্ত করিলেন।—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সংস্করণ, পৃ. ২৭।

ভাষা ও শব্দসম্পদের দৈন্য যে দুঃসাহসী সাহিত্যিককে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' তাহার একটি প্রমাণ। সে যুগের পাঠকেরা যদি এই পুস্তক পড়িয়া অর্থ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে ফার্সী ভাষায় যে তাঁহাদিগকে রীতিমত পাঠ লইতে হইত, এই সত্যটাই মানিতে হইবে।

'লিপি মালা'র বাংলা আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

লিপি মালা | পুস্তক।— | রাম রাম বসুর রচিত।— | শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।— | ১৮০২।—

'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' ও 'লিপি মালা'র মাঝখানে পণ্ডিত ও শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন; বিশৃঙ্খল শব্দচমূকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া কাজে লাগাইবার কৌশল তাঁহার সহজাত ছিল। রামরাম বসু যে মাত্র এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আদর্শে অনেকখানি শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ 'লিপিমালা'য় আছে। নিরঙ্কুশ রামরাম বসু এই পুস্তকে আশ্চর্য্য দক্ষতার সহিত রীতিবৈচিত্র্যও প্রকাশ করিয়াছেন। সূচনাতেই তিনি বলিতেছেন—

এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজ ক্রিয়া ক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন। এতদর্থে এ ভূমীয় যাবদীয় লেখা পড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপি মালা নাম পুস্তক রচনা করা গেল।—পৃ. ৩-৪।

যে রামরাম বসু ফার্সী শব্দকোষের সহায়তা ব্যতিরেকে তাঁহার পূর্ব্ব গ্রন্থের একটি বাক্যও সম্পূর্ণ রচনা করিতে পারেন নাই, তিনিই 'লিপি মালা'য় লিখিলেন—

এই মতে প্রেমাশক্ত সতীও মাতাকে প্রণাম করিয়া আর২ সমস্ত ভগিনী ও অমাত্যগণকে সম্ভার করিয়া যজ্ঞ স্থানে পিতার নিকটে যাইয়া প্রণাম করিলে দক্ষ তাহাকে দেখিবা মাত্রেই হরকোপে

কোপিত হইয়া শিব নিন্দায় প্রবর্ত্ত হইল। কহিল কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশান মশানে তাহার অবস্থিতি হাড় মালা গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। এ দেবসভা আমি ব্রহ্মার পুত্র বাদিয়ার নিমন্ত্রণ দেবসভায় হইতে পারে না। সতী কহিলেন পিতা এমত কুৎসা মহাদেবের প্রতি কহ কেন মহাদেব দেবদেব ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি যাহার পদযুগে শরণাগত যে হর মহাবীর ত্রিপুরাসুরকে সংহার করিলেন যে হর কালকূট পান করিয়া সৃষ্টি রক্ষা করিলেন তাহাকে কুৎসা বাক্য তোমা ব্যতিরেক কেহ কহে না তুমি এ অনুচিত ক্রিয়া কেন কর।...এই সকল বাক্যে দক্ষ পুনর্ব্বার শিব নিন্দা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে সতী মহা ক্রোধে উত্থান করিয়া কহিতেছেন পিতা সকলের উপযুক্ত গুরু নিন্দা শ্রবণে লোক নিন্দকের শির ছেদন করিবেক নতুবা নিজ প্রাণ ত্যাগ করিবেক কিম্বা সে স্থান ত্যাগ করিবেক আমি আপন প্রাণ ত্যাগ করিব তোমার আত্মজা তনু আর রাখিব না এই কহিয়া বসন আটিয়া পরিয়া যাইয়া মধ্যস্থানে বসিয়া শিব রূপ ধ্যানে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।—'লিপি মালা' (১৮০২), পৃ. ১১১-১৩।

যাঁহারা শুধু 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' দেখিয়া রামরাম বসুর ভাষার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহারা একটু পরিশ্রম করিয়া 'লিপি মালা' গ্রন্থখানি পাঠ করিলে নিঃসংশয় হইতে পারিতেন যে তিনি মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্বয়ের দোষ পুরাপুরি পরিহার করিয়া প্রসাদগুণবিশিষ্ট সুপাঠ্য ভাষা রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, অপ্রচলিত শব্দের জন্যও তাঁহাকে ফার্সী শব্দকোষের আশ্রয় লইতে হয় নাই। রামরাম বসুর প্রতি এই অবিচার বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কলঙ্কেরই অধ্যায়।

ভূমিকা ও গ্রন্থশেষে বট, কড়া, পণ, শতক ও ভূমির অঙ্ক সম্বলিত "অঙ্কমালা" অধ্যায় ছাড়া 'লিপি মালা'র প্রথম ধারায় রাজা অন্য রাজাকে দশখানি, রাজা চাকরকে পাঁচখানি মোট পনেরটি লিপি; দ্বিতীয় ধারায় সামাজিক (পিতা পুত্রকে, গুরু লঘুকে, সমান সমানকে, চাকর মনিবকে, মনিব চাকরকে ইত্যাদি) ২৫ খানি, সর্ব্বসমেত চল্লিশটি লিপি আছে। প্রত্যেকটি লিপিই মূল্যবান্। রামরাম বসুর ভাষা শেষ পর্য্যন্ত কত দূর সহজবোধ্য হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য "সামান্য চাকরকে লিখিত মনিবে"র পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

তোমার পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীকানাইদাস মাঝী প্রভৃতি যে তিন নৌকার চালান লইয়া গিয়াছিল তাহাতে সে তিন ভরা কাষ্ঠ ভবানীপুর গ্রামে কাটা গঙ্গার মধ্যে রাখিয়া শ্রীকানাইদাস মাঝী কল্য এখানে আসিয়াছে ভরা অদ্যাপি বিক্রী হয় নাই অতএব তুমি পত্র পাঠ ভবানীপুর গ্রামে যাইয়া পাঁচ সাত দিবস সেই স্থানে থাকিয়া তিন ভরা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া টাকা শীঘ্র পাঠাইবা এখানে ব্যায় ব্যসনের বড়ই অপ্রতুল হইয়াছে এবং আর কএকখান নৌকার চালান দিতে হইবেক আমি এখান হইতে কানাই মাঝিকে শীঘ্র বিদায় করিব তুমি তাহার অপেক্ষা করিবা না আর ওখানে কি মত চোদ্দ পদ ও যোল পদ নৌকার ভরা বিক্রী হইতেছে তাহা জানিয়া লিখিবা তোমার বাটী হইতে পরশ্বঃ এক লোক এখানে আসিয়াছিল তাহার মারফত তোমার খুড়া লিখিয়াছিলেন তুমি অদ্য চারি মাস বাটী হইতে আসিয়াছ সমাচার কিছুই লেখহ না এবং টাকা কড়ি কিছুই পাঠাও না...। 'লিপি মালা' (১৮০২) পৃ. ২২৮-২৯।

এই সামান্য দৃষ্টান্তগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে রামরাম বসু বাংলা-গদ্যের শুধু আদি লেখকই নহেন, নিঃসন্দেহে এক জন ভাল লেখক। এই শেষোক্ত পরিচয়ে যে কারণেই হউক তিনি পরিচিত নহেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত এক জন শাস্ত্রজ্ঞ অগাধ পাণ্ডিত্য-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যাহা করিয়াছিলেন রামরাম বসু যে তাহারই সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আদিপুরুষের গৌরব তিনি পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কৃতিত্বের গৌরব পান নাই। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যথাযথ লিখিতে বসিয়া রামরাম বসুর সেই গৌরব আমাদিগকে দিতেই হইবে।

নবযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উদ্ধারক

আয়ুর্বেদ-প্রচারে অগ্রণী

সি. কে. সেন এণ্ড কোং-র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭৷৷০, ডাকমাশুল ১৶০

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬৷৷০, ডাকমাশুল ১৶০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১৷৶০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

২৯, কলুটোলা, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির। এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়

বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

"..........Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland—1939.* P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নাথ কর্তৃক মুদ্রিত।